ইসলাম ও বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইসলাম ও বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

রচনাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ।
engineerazizulbari@gmail.com

✲✲✲✲ বিষয়সূচী ✲✲✲✲

ইসলাম ও বিজ্ঞান (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

রচনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

গবেষণা বিভাগ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন
শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

দু'আ ও বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমার প্রিয় মুরীদ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী এই গ্রন্থটি বেশ পরিশ্রমের বিনিময়ে রচনা করেছেন। এতে ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাস ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

আধুনিক যুগে মানুষ বিজ্ঞানকে খুব বেশি আকড়ে ধরেছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কেউ কিছু বুঝতে বা বিশ্বাস করতে চায় না। লেখক বইটিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা চালিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের কোনো হক্ব তথ্য ইসলামের সঙ্গে মোটেই সংঘাতময় নয়- বরং এসব ক্ষেত্রে শুধু মিল আর মিল বিদ্যমান। আমি মনে করি সকলেই এই কিতাব পাঠ করে উপকৃত হবেন। আমি দু'আ করি এটা পাঠকদের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হোক।

আমি লেখকের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। সবশেষে বইটির বহুল প্রচার কামনা করে শেষ করছি।

মুহাম্মদ আমীনুদ্দীন

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামীম
দারুল উলূম জামিয়া ইসলামিয়া অলৈতলী ও কাতিয়া
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
২৩ জুন, ২০০৬ ঈসায়ী।

"শাহানশাহ্, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে যাকিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যাকিছু আছে ভূমণ্ডলে" [সুরা জুমু'আ ঃ ১]।

ভূমিকা

অলহামদুলিল্লাহ্। যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য। যিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী। যাঁর মর্তবা, মর্যাদা ও শান সর্বোচ্চে। যিনি আকাশসমূহ এবং এর মধ্যে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। যাঁর যাবতীয় নামসমূহ সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সুন্দর। তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ইহ-পরলোকে সবকিছুর ওপর। তিনিই গুপ্ত ও ব্যাপ্ত এবং তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে তাঁর একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া কেউ কিছু আয়ত্ব করতে পারে না। মহান মেহেরবান বিশ্বপ্রভু যিনি জীন ও ইনসানের মধ্যে সকল দ্বীনদার, ঈমানদার, সন্দেহবাদী, কাফির-বেঈমান ও জীবজন্তুসহ যাবতীয় মাখলুকাতের পালনকর্তা। যাঁর শক্তি ও হুকুম ছাড়া এ মহাবিশ্বের একটি বস্তুও অস্তিত্ব বজায় রাখতে অক্ষম। কত মহান আমাদের একমাত্র প্রভু, কত মহামহীম বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা। তাঁর প্রশংসা করে কেউ শেষ করতে পারবে না। এ অনভিজ্ঞ লেখক তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার ভিক্ষাপ্রার্থী। তাঁর অনুগ্রহ ও ইচ্ছা ছাড়া, একটি অক্ষরও লেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার কলমটিকে সঠিক পথে, তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টির পথে পরিচালনার জন্য। আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ্র কাছে অভিশপ্ত শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং নফসে আম্মারার কুমন্ত্রণা থেকে।

নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

গণনাতীত দরূদ ও সালাম পেয়ারে নবীজী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন। যাঁর ওয়াছিলায় বিশ্ব হয়েছে আলোকিত তাওহীদের পবিত্র নূরে। যে আখেরী নবীর আগমনের ফলে বর্বর যুগের ইতি হয়েছিলো। যাঁর মাধ্যমে প্রভু দয়াময় মানুষকে দান করেছেন চিরন্তন মহাসত্যের আলো আল-কুরআনুল কারীম। পেয়ারে নবীজী, মাহবুবে খোদা, রাহমাতুল্লিল আলামীন, দু'জাহানের বাদশা, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, উম্মতের শাফায়াতকারী- দরূদ ও

সালাম প্রেরণ করছি তাঁর প্রতি কোটি কোটি বার। আল্লাহ পাক শান্তি বর্ষণ করুন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী সাহাবায়ে কিরামের প্রতি, তাঁর বংশধরদের প্রতি, তাঁর পবিত্র বিবিগণদের প্রতি।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পবিত্র দরবারে অশেষ শুকরিয়া। আল্লাহর এই নাচিজ বান্দাহ ঈমানী আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষণামূলক এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আনন্দবোধ করছি। তবে এই বিরাট কাজটি আঞ্জাম দেওয়া মহান আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না, সুতরাং এ কাজের জন্য আমার নিজের গৌরবের মোটেই কিছু নেই। আমি তাই আবারও মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে উন্মুক্তচিত্তে উচ্চারণ করছি- আলহামদুলিল্লাহ!

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষণায় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই ভূমিকায় কিছু মৌলিক কথা লিপিবদ্ধ করেছি। আমি আশা করবো সবাই মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু পাঠের পূর্বে একটু ধৈর্য সহকারে অপেক্ষাকৃত কিছুটা দীর্ঘ এই ভূমিকাটি পাঠ করবেন।

জ্ঞান আহরণের কারণ ও উপায়

এটা জেনে রাখা দরকার, জ্ঞান হচ্ছে একটি অপূর্ব নূর। আরবি 'ইল্‌ম' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'জ্ঞান'। ইল্‌ম শব্দের পূর্ণ অর্থ ব্যাপক। অহির্জ্ঞান, আল্লাহর পছন্দসই জীবন পরিচালনা ও উপাসনা পদ্ধতির জ্ঞান, মহাসত্যের জ্ঞান, আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপায়-পদ্ধতির জ্ঞান, আল্লাহ-পরিচিতির জ্ঞান, বস্তুজগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি প্রত্যেক জ্ঞানের শাখার সমন্বয়ে যে মহাজ্ঞান তা-ই হচ্ছে ইল্‌ম।

ইল্‌মের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের পরিচিতি, প্রভুর পরিচিতি, ইহ-পরজীবনের সার্বিক সুখ-শান্তি ইত্যাদি অর্জন করতে সক্ষম হয়। কয়েকটি পদ্ধতিতে এ লক্ষ্য হাসিল হতে পারে।

(১) বুদ্ধি বা আক্বল দ্বারা ইলম অর্জন

আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাকই মানুষকে অনেক ধরনের উপাদান ও উপায়-অবলম্বন দান করেছেন। এর মধ্যে আক্বল বা বুদ্ধি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় উপাদান। এটা মানবীয় একটি মৌলিক গুণ। আক্বল সঠিকভাবে ব্যবহার করলে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়। অপরদিকে এর অপব্যবহারে আল্লাহ থেকে দূরে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এ দু'টি দিক বিশ্লেষণ করা জরুরী।

ঈমান বা গায়েবে বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিরাট নিয়ামত। এটা এমন এক উপাদান যা চেতনাশীল মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়। অবশ্য আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ঈমানের ছোঁয়া কেউ পায় না। ঈমানহীন মানুষ আদলে দুর্বল চেতনাহীন। এরূপ মানুষের মধ্যে লুকানো অনেক মানবিক গুণাবলী বিকশিত হয় না। তাদের মধ্যে সত্যিকার ভালোবাসা অনুপস্থিত। ঈমানহীন মানুষ আক্বলকেও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানে না। তবে ঈমানদারও আপন ঈমানের শক্তির মানদণ্ডে তার আক্বলকে সঠিক পথে চালাতে পারে মাত্র। যার ঈমান যতো বেশি সবল তার আক্বলও ততো বেশি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যার ঈমানে দুর্বলতা আছে তার আক্বলও ব্যবহৃত হয় দুর্বলভাবে। তার আক্বল দিয়ে সঠিক ইলম তথা প্রভুর পরিচিতির পূর্ণতাপ্রাপ্তি লাভ করে না।

ঈমানের নূর যে ভাগ্যবানের বুকে প্রজ্জ্বলিত, সে আক্বল দিয়ে আল্লাহর সঠিক পরিচিতি অর্জন করতে পারে তথা ইলমের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে ধন্য হতে পারে। এরূপ মহাত্মন এ জগতে বিরল। নবী, রাসূলরা এবং আল্লাহর একান্ত বন্ধুজনরাই এই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। বস্তুত এরূপ সর্বোচ্চ ইলম একমাত্র স্বয়ং প্রভুর অনুগ্রহ থেকেই অর্জিত হয়। এটা প্রভু-প্রদত্ত জ্ঞান।

ঈমান নিয়ে আক্বলকে আরো একাধিক রাস্তায় পরিচালিত করে ইলমের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব। এসব রাস্তা বা উপায় হচ্ছে মূলত দু'টিঃ

(১) সৃষ্ট জগৎ (আলমে খালক) নিয়ে গবেষণা ও (২) আল্লাহর মুহাব্বাতের মাধ্যমে ইলম হাসিল।

(১) সৃষ্ট জগৎ নিয়ে গবেষণায় আক্বলের ব্যবহার

আক্বল বা বুদ্ধি দিয়েই মানুষ সৃষ্ট জগৎ নিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে গবেষণা করে। কিন্তু ঈমান ছাড়া এ গবেষণায় বাহ্যিক জগতের কার্যকারিতা উদঘাটন হলেও চূড়ান্ত ইলম বা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হয় না। পক্ষান্তরে ঈমানের নূর সহকারে আলমে খালক নিয়ে গবেষণা ও এর চলনপদ্ধতি অবলোকন করা এবং জানার মাধ্যমে ইলমের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা যায়। ঈমানসহ গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সময় যখন সৃষ্টির রহস্যাবলী উদঘাটিত হতে থাকে, তখন গবেষকের ঈমানী শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে এসে সে চূড়ান্ত ইলমের নাগাল পেয়ে যায়। এ থেকে হৃদয়ে খোদাপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণে সে বিভোর হয়ে প্রভুর সান্নিধ্য তথা পারিচিতি লাভে ধন্য হয়।

ঈমানসহ বিজ্ঞানচেতনা একটি অমূল্য সম্পদ। এর মাধ্যমে ইহলৌকিক উপকার (বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে) এবং আল্লাহপ্রাপ্তি, এ উভয়টিই মানুষের ভাগ্যে জুটে। পক্ষান্তরে ঈমানহীন বিজ্ঞানচেতনায় ইহলৌকিক উন্নয়নে উপকারী হলেও চূড়ান্ত ইলম তথা আল্লাহর পরিচিতি অর্জিত হয় না। এরূপ ইহলৌকিক বা বৈষয়িক উন্নয়ন থেকেও শেষ পর্যন্ত মানবজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষের মনের গভীরে যে আকাঙ্ক্ষা সদাসক্রিয় তা হচ্ছে, আত্মিক প্রশান্তি কামনা। এ প্রশান্তি আসে একমাত্র আল্লাহর পরিচিতি ও তাঁর প্রতি মুহাব্বাতের মাধ্যমে। জাগতিক বস্তু চোখের জন্য শান্তিময় ও চমকপ্রদ হতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরের জন্যও তা আরামদায়ক হয়। কিন্তু মনের গভীরে মানুষ যে প্রশান্তির অন্বেষা ও তৃষ্ণা অনুভব করে তা কিন্তু বস্তু থেকে কখনো পাওয়া যায় না। এ তৃষ্ণা বস্তু ও ধন-দৌলত দিয়ে মেটানো থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, এ তৃষ্ণা তো মেটাতে পারে আল্লাহর স্বরণ ও প্রেমের সুধা। দেহের মধ্যে সুস্থতা, নতুন দামী কাপড়, সুন্দরী নারীর সংসর্গ, দালান-অট্টালিকা, টাকা-কড়ি-গাড়ি এগুলোই যদি হৃদয়ের প্রশান্তির উপাদান হয়ে যেতো তবে মানুষ, মানুষ হতো না বরং যন্ত্র হতো। কিন্তু মানুষ তো আর যন্ত্র নয়।

ঈমান বুকে পুষে জগৎ নিয়ে চিন্তাশীল মানুষ ইলম অর্জন করতে পারে। এ ইলম তাকে খোদাপ্রাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম। ইহলৌকিক বাহ্যিক জ্ঞান থেকে বৈষয়িক অভাব অনটন দূর হতে সহায়ক হয়, এবং আত্মিকভাবে উন্নত হয়ে পারলৌকিক জ্ঞানের দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত হয়।

মনে রাখা দরকার ঈমান হচ্ছে চূড়ান্ত ইলমের পূর্বশর্ত। আর জাগতিক জ্ঞানার্জনে অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনে ঈমানদারিত্ব এক অপূর্ব নিয়ামত। এরূপ পদ্ধতিতে ইলম হাসিল হলে জগতের জন্য হবে কল্যাণময়। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত শান্তি।

(২) আল্লাহর মুহাব্বাতের মাধ্যমে ইলম হাসিল

চূড়ান্ত ইলম অর্জন করার এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সিদ্দিকীনদের পথ। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত গোটা কিছু লোকের জন্য প্রযোজ্য। এটা সর্বসাধারণের জন্য নয়। তবে এ পথই সর্বোচ্চ। এ পথে ইলম অর্জনকারীরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর খাস অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন মানুষ একমাত্র সে-সময়েই থাকতে পারে যখন তাঁর ঈমানী শক্তি সুদৃঢ় হয় এবং হৃদয়ে প্রভুকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। আল্লাহকে জানা-চেনা, তাঁর দীদার লাভ করা এই অন্বেষীর মনে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষা থেকে তার মধ্যে ইলমের দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে তখন জগতসমূহের অন্তর্নিহিত স্বরূপ উপলব্ধি করতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের চিত্র তাঁর উন্মুক্ত হৃদয়নেত্রে দৃশ্যমান হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে সে হয়ে ওঠে সত্যিকার জ্ঞানবান। তবে এ জ্ঞান বিজ্ঞান নয়, বরং ইহ ও পরজগৎ সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান। এ জ্ঞানের মাধ্যমে ইহলোকে বৈষয়িক ফায়দা না হলেও পারলৌলিক ক্ষেত্রে এটা অসীম সম্বল। খোদার আশিক হয়ে জ্ঞানলাভ সর্বোচ্চ জ্ঞান। একমাত্র অনুগ্রহপ্রাপ্তরাই এ জ্ঞানের সন্ধান পান।

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার সারাংশ হচ্ছে, জ্ঞানের সংজ্ঞা হলো ঈমানের সাথে ইহ-পারলৌকিক জীবন ও জগতসমূহের রসহ্য জেনে নেওয়া, এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে

আল্লাহর পরিচিতি অর্জন করে হৃদয়ে প্রশান্তি স্থায়ী করা। এবার জ্ঞানের ব্যাখ্যা আরোও ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা জরুরী।

জ্ঞানের প্রকারভেদ

জ্ঞানের প্রধান দু'টি পদ্ধতি অর্থাৎ সৃষ্টজগৎ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে এবং আল্লাহর ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের, একাধিক শাখা-প্রশাখা আছে। এগুলোর মধ্যে সৃষ্টজগৎ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধান শাখা হচ্ছে ৩ টি যথাঃ (ক) পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহারে জ্ঞানলাভ, (খ) বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণার মাধ্যমে ও (গ) জগৎ নিয়ে চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন। এ তিনটির পূর্ণ ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

(ক) পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে জ্ঞান

বাহ্যিক জগতে আমাদের চলাফেরা ও বস্তুজগতকে চেনার জন্য যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে এগুলোকে সবাই ব্যবহার করে। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্রের সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটে। একটি শিশুর জন্ম থেকেই এ জ্ঞান অর্জন শুরু হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে যে স্মরণ রাখার মেমরী সেলগুলো আছে সেখানে তা রক্ষিত হয়। এ মেমরী ইউনিটটি অত্যন্ত ব্যাপক। সারাজীবনের যাবতীয় তথ্য এখানে জমা থাকার পরও তা পরিপূর্ণ হয় না। মগজের মধ্যে জমাকৃত মেমরীতে পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানই শুধু থাকে না, বরং সবধরনের জ্ঞান বা ইলম এখানে রক্ষিত হয়ে প্রয়োজনে তা ব্যবহৃত হয়। আমরা তা তাগিদমাফিক কাজে লাগাই। জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী এই মেমরী থেকেই আমরা সময় সময় স্মরণ করে থাকি। বিশ বছর আগে বা ত্রিশ বছর আগে সংঘটিত কোন ঘটনা, কোন একটি মুখের ছবি, কোন দুঃখ-কষ্ট-অনুভূতির কথা এই মেমরী থেকে আমরা খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম। এ হচ্ছে মেমরীর শক্তি।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কিন্তু সীমাবদ্ধ। এটা বাহ্যিক জগতের জ্ঞান। কোন বস্তু বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞান বা রহস্য পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে উদঘাটিত হতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি লৌহখণ্ডে হাত দিয়ে আমরা বলতে পারবো এটা উষ্ণ না ঠাণ্ডা। আমাদের মধ্যে তক্ (Touch) নামক যে ইন্দ্রিয়টি আছে সেটি দিয়েই আমরা এ জ্ঞানটি আর্জন করতে পারি। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, এ লৌহখণ্ডটির ভেতরের প্রতিটি অণু-পরমাণু শীতল বা উত্তপ্ত হয়ে আছে কোন্ কারণে, তাহলে আমরা কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে এর জবাব দেব? সুতরাং বুঝা গেল তক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুটির তাপমাত্রা আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু তাপমাত্রা হওয়ার কারণ জানতে অক্ষম। এর কারণ জানতে হলে আক্লকে (বুদ্ধিকে) ব্যবহার করে অন্য কোন উপায় আবিষ্কার করতে হবে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সীমাবদ্ধতার অপর একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন। চোখ একটি অপূর্ব ইন্দ্রিয়। এর মাধ্যমে আমরা সবকিছুই দেখতে পারি। মনে করুন একটি কক্ষে মেঝের উপর একটি বস্তু আছে। কক্ষের ভেতর আলো জ্বলে আছে তাই ব৯তুটিকে আপনি দেখতে পারছেন। কিন্তু যখন গভীর রাতে বাতিটি নিভিয়ে দেবেন তখন বস্তুটি আর আপনি দেখতে পারবেন না। এর কারণ কি? কারণ হলো বাতি ছাড়া বা আলো ছাড়া কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব আপনার ইন্দ্রিয় থেকে পাবেন না। চোখ শুধু জানে আলো থাকলে সে বস্তুটি দেখতে পারে আর না থাকলে পারে না। এর সঠিক জবাব জানতে হলে আপনার আক্লকে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে পরীক্ষা করে জানতে হবে যে, আলো যখন বস্তুর উপর পতিত হয় তখন সে আলো বস্তুটি থেকে ফিরে এসে আপনার চোখের ভেতর পড়ছে- এ কারণেই আপনি দেখতে পারেন। মোটকথা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগতের ঘটনাবলী (চোখের মাধ্যমে) দেখা যায়, (তক্কের মাধ্যমে) অনুভব করা যায়, (কর্ণের মাধ্যমে) শোনা যায়, (নাকের মাধ্যমে) গন্ধ পাওয়া যায় এবং (জিহ্বার মাধ্যমে) স্বাদ নেওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত কারণ জানা যায় না। এরজন্য প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের অন্য কোন উপায়-অবলম্বন। আর যে উপায়ে তা সম্ভব সেটি হলো জগৎ নিয়ে গবেষণা তথা বিজ্ঞানের ব্যবহার।

(খ) বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণার মাধ্যমে ইলম অর্জন

আমরা এ জগতে অনেককিছু অহরহ দেখি। অনেককিছু হাত দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করি। সচরাচর সংঘটিত ঘটনাবলী আমাদের বাহ্যিক পঞ্চেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে। বস্তু জগতের এসব ঘটনাবলীকে নেচারেল ফেনোমেনা বা স্বাভাবিক ঘটনাবলী বলা হয়। আমাদের মনে এই প্রাকৃতিক কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। বিভিন্ন ঘটনাবলী কেন ঘটে? এর পেছনে কারণ কি? আমাদের ইন্দ্রিয় এর জবাব দিতে পারে না। আমরা তখন আক্বলকে ব্যবহার করা শুরু করি। নানান উপায়-অবলম্বন ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর রহস্য উদঘাটনে অগ্রসর হই। ঘটনাবলীর কারণ সম্পর্কে মনের মধ্যে জাগ্রত কল্পনা বা ধারণার সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে থিওরী (সু-চিন্তিত ধারণা) আবিষ্কার করি। তারপর এটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করি। এ উপায়ে জ্ঞানার্জনকে বলে বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন জাগতিক বা নেচারেল ঘটনাবলীর রহস্য উদঘাটন করে আমরা মনের আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা নিবারণ করি। এ উপায়ে জ্ঞানান্বেষণের মাধ্যমে অপর একটি ফায়দা হয়- আর তাহলো, উদঘাটিত তথ্য থেকে প্রযৌক্তিক উপায়ে মানবকল্যাণে ব্যবহারযোগ্য অনেক বস্তু সৃষ্টি করা। একটা দৃষ্টান্ত হলো, সূর্য কেন জলন্ত আছে তা জানার মাধ্যমে আমাদের মনের প্রশ্নের জবাব মেলে, এবং এর থেকে আগত উত্তপ্ত আলো ব্যবহার করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। এর ফলে একটি ছোট্ট শহরকে হয়তো রাতের বেলা আলোকিত করা যেতে পারে বা সোলার গাড়ি তৈরী হতে পারে। অপর আরেকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

মানুষ নিজের মনে জাগ্রত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বস্তু বা মেটারের ভেতরে যে পারমাণবিক ক্ষেত্রে আনবিক বিরাট শক্তি নিহিত আছে তা জানতে পারলো। এরপর শুরু হলো এ শক্তিকে কিভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। চললো গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শেষ পর্যন্ত আনবিক চুল্লি তৈরী করে ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের বিদ্যুৎ সৃষ্টির পথ খোলা হয়ে গেল। তাহলে এটা পরিষ্কার যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বস্তু জগতকে জানার মধ্যে দু'টি উপকার আছে- ১. মনের মধ্যে জাগ্রত প্রশ্নের জবাব আর ২. প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহারে মানবকল্যাণ তথা বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন।

তবে ইলম অর্জনের এ শাখাটিরও সীমাবদ্ধতা আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই বস্তু জগতের বেলায়ও সচরাচর ঘটিত ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত কারণ বলতে অপারগ। অবশ্য কার্য-কারণ নীতি কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম। যেমন কোন ঘটনার পেছনে যে আরেকটি ঘটনা নিহিত তা কার্য-কারণ নীতির মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা প্রয়োজনীয় মনে করছি।

আমরা জানি পানি একটি তরল পদার্থ। কিন্তু এ পানি বিশেষ কারণে কঠিন পদার্থ ও গ্যাসে রূপান্তরিত হতে পারে। কঠিন পদার্থ হিসেবে এই পানিকে আমরা আইস বা বরফ অবস্থায় দেখতে পাই। আর গ্যাস হিসেবে ওয়াটার ভেপার বা বাস্পাকারে দেখি। পানির এই বিভিন্ন অবস্থার কারণ আছে। আর এ কারণ হচ্ছে পানির মধ্যকার তাপমাত্রা। তাপমাত্রা এক একটি সীমার মধ্যে থাকলে পানি তরল, কঠিন বা বাস্পাকারে থাকে। অর্থাৎ পানির তাপমাত্রা ১ থেকে ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ভেতর হলে তা তরল, ০ বা তার নীচে হলে কঠিন এবং ১০০ ডিগ্রীর বেশি হলে বাস্প হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে একই পানির মধ্যে এই তাপমাত্রার তারতম্যে এ বিভিন্ন অবস্থা কেন হয়? এর পেছনে কোন্ কারণটি নিহিত? এ প্রশ্নের জবাব জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমে তাপমাত্রা বা তাপ আসলে কি তা জানতে হয়। এবার আমরা তাপ সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। তাপমাত্রায় রদবদল আনতে হলে পানির মধ্যে হিট এনার্জি বা তাপশক্তি প্রদান করতে হবে। এরপর প্রশ্ন আসে তাপশক্তি কি? এভাবে একটার পর আরেকটা প্রশ্ন আমাদের মনে পানির বিভিন্ন অবস্থার কারণ জানার জন্য জাগ্রত হতে থাকে। একটি অবস্থার কারণ জানতে গিয়ে একগুচ্ছ কারণ জানার প্রয়োজন পড়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকেই কার্যকারণ নীতি বলা হয়। প্রত্যেকটি ফিজিক্যাল ঘটনার পেছনে কারণ থাকে, বরং একটি চেইন অব রিজোন আছে। এই কারণসমূহ জানার মাধ্যমেই আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জগতকে চিনতে পারি। কিন্তু এ কারণগুলো মানুষ সহজে জানতে পারে নি। বর্তমান পর্যন্ত জানা বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী হাজার হাজার বছরের গবেষণার ফল। 'কারণ' বের করতে যেয়ে মানুষ অতীতে ভুল করেছে (অর্থাৎ কারণ যা ভেবেছিলো, তা পরবর্তীতে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে) এবং আজো ভুল হচ্ছে। এছাড়া কার্যকারণ নীতির মাধ্যমে চুড়ান্ত কারণ জানা যায় না। এ উপায়ে দৃশ্যমান জগৎ সর্ম্পকে জানার বা জ্ঞানার্জন করার সীমাবদ্ধতা আছে। বাস্তবে কার্যকারণ

নীতির মাধ্যমে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করার পরই চূড়ান্ত কারণ জানার প্রয়োজন এসে উপস্থিত হয়। তখন আর অগ্রসর হওয়া যায় না। উল্লেখিত পানির দৃষ্টান্তটি আবার গবেষণা করলেই কথাটি স্পষ্ট হবে।

আমরা যখন জানতে পারলাম তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বা হ্রাস হলে পানির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পরবর্তিতে দু'টি প্রশ্ন সাথে সাথে আমাদের মনে জাগ্রত হয়: (ক) তাপমাত্রার জন্য দায়ী হিট এনার্জি বা তাপশক্তি কি এবং (খ) এই তাপের প্রতিক্রিয়ায় পানির মধ্যে কেন পরিবর্তন আসে? এ দু'টি প্রশ্নের মধ্যে দু'টি ভিন্ন কার্যকারণ চেইন নিহিত। প্রথমটি স্বয়ং তাপমাত্রার তারতম্যের কারণ ও এর পেছনের কার্যকারণ চেইনের উপর সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়টি পানির মধ্যে তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ এ কার্যকারণ চেইন পানির উপরই সীমাবদ্ধ। এবার এ চেইন দুটোর একটি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে দেখা যাক।

দ্বিতীয় চেইনের প্রশ্নগুলো এভাবে হবে: পানির মধ্যে তাপমাত্রা কেন বাড়ে এবং এর প্রতিক্রিয়া কি? এর উত্তরে বিজ্ঞান বলে, পানির ভেতরে যে মলিকিউল বা কণাগুলো আছে তাপশক্তির প্রভাবে তা কম্পন করতে থাকে। তাপমাত্রা যতো বাড়তে থাকবে এই কম্পন ততো বেশি হবে। মলিকিউল-গুলো একটা আরেকটার সাথে ঘর্ষণ করে পানির তাপমাত্রা বাড়াতে থাকে। এক পর্যায়ে (১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হলে) পানির এই কম্পন স্বচক্ষে দেখা যায়, অর্থাৎ পানি ফুটতে থাকে। তাপমাত্রা আরো বেড়ে গেলে মলিকিউলগুলো পানি থাকাবস্থার বন্ড (একটা আরেকটার সাথে আকর্ষণ অবস্থা) থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এই মলিকিউলগুলোর ওজন কমে আসে এবং বাস্পে পরিণত হয়ে বায়ূমণ্ডলে উড়ে যায়। এটুকু হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নের উত্তর। এবার প্রশ্ন জাগে মলিকিউলগুলো তাপশক্তি পেয়ে কেন এভাবে কম্পন শুরু করে? এর জবাবে বিজ্ঞান বলে, মলিকিউলার বা কণার স্তরে বস্তু এনার্জি পেয়ে কিছু নির্দিষ্ট কারণে এভাবে কম্পন বা এক্সাইটমেন্ট শুরু করে। এনার্জির মাধ্যমে বস্তুর ভেতর কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যার ফলে এটা স্থির থাকতে পারে না। এ বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে আর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এখানে এসে আমাদের মনের স্পৃহা কিন্তু শেষ হয় না। আমরা এরপর প্রশ্ন করি মলিকিউল এনার্জি পেয়ে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করে তা না করে অন্যভাবে প্রতিক্রিয়া কেন করে না বা প্রতিক্রিয়াই বা কেন করে? বিজ্ঞান বলে এটা নেচারেল আইন। আমরা আবার প্রশ্ন করি, নেচারেল আইন এরূপ

কেন, অন্যভাবে কেন হলো না? বিজ্ঞান বলে জানি না! আমরা চুড়ান্ত প্রশ্নে এসে পৌঁছে গেছি।

নেচারেল আইনকে যেরূপ আছে সেরূপ গ্রহণ করে নিতে হবে, আর প্রশ্ন করলে উত্তর মিলবে না, তবে প্রশ্ন অবশ্যই জাগ্রত হয়। (বিজ্ঞানের মাধ্যমে) জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু প্রশ্নের ক্ষেত্রে তা নয়। এখানেই মানুষের রহস্য। সে সীমাবদ্ধতা পছন্দ করে না অথচ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাকে থাকতে হয়। মানুষ হচ্ছে বস্তুজগতের বিচরণশীল জীবী কিন্তু তার ভেতরে কি যেন বাস করে যা বস্তুজগতের সীমাবদ্ধতা থেকেও বাড়তি কিছু। জ্ঞানার্জন তথা জানার ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা মনের ভেতর অশান্তির বীজ বপন করে। সে অনুভব করে নিশ্চয়ই জানার অনেককিছু আছে যা বিজ্ঞানের মাধ্যমে পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু কোন উপায়ে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে রহস্য উদঘাটন হবে? এ প্রশ্নের জবাব পেতে সৃষ্ট জগতের উপর ইলম অর্জনের তৃতীয় শাখার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

(গ) সৃষ্ট জগৎ নিয়ে চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন

জ্ঞানের এ শাখাটি হচ্ছে দর্শন। দর্শনের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা সহজ নয়। বলতে হয়, দর্শন কি- তা সিক্সটি-ফোর মিলিয়ন ডলার কুয়েসশন। তবে দর্শনের উদ্দেশ্য অনেকেই বলেন, সত্য উদঘাটন। কিন্তু এ লক্ষ্যে পৌঁছতে দর্শন এ পর্যন্ত ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু দেখাতে পারে নি। দর্শনের মাধ্যমে অগণিত প্রশ্নই মানব মানসে জাগ্রত হয়েছে মাত্র, জবাব বেরিয়ে এসেছে অত্যল্প। যুগে যুগে অসংখ্য 'ইজম' মানুষ সৃষ্টি করেছে কিন্তু চুড়ান্ত কোন সত্য বা 'সত্যইজম' আবিষ্কার করতে পারে নি। তবে দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ইতিহাসে সক্রিয় ছিলো বা আছে, সুতরাং এর গুরুত্ব অপরিমীস। এছাড়া ইলম অর্জনের এ শাখাটি মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে। দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়ে মানবগোষ্ঠি ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে- কিন্তু সে পথটি সর্বদা সুপথই ছিলো বা আজো আছে, তা কিন্তু কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে না।

বিজ্ঞান ও ধর্ম থেকে ভিন্ন এ জ্ঞানের শাখা, 'দর্শনে'র স্বতন্ত্র একটা স্বরূপ আছে।

সৃষ্ট জগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার দু'টি পৃথক পন্থা আছে। এর প্রথমটি হচ্ছে ঈমান সহকারে চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা- যা হলো সর্বোত্তম, আর অপরটি ঈমানহীনভাবে চিন্তা-ভাবনা ও সত্যোপলব্ধির চেষ্টা- যা হলো নিম্নপর্যায়ের।

ঈমানসহ চিন্তা-গবেষণা

ঈমান সহকারে সৃষ্ট জগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা-ভাবনায় কয়েকটি সুফল পাওয়া যায়: (ক) আল্লাহর কুদরতকে অবলোকন, (খ) ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি, (গ) আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে অবগতি ও (ঘ) মানবজীবনের রহস্য উদঘাটন।

(ক) আল্লাহর কুদরতকে অবলোকন

চিন্তার একটি অপূর্ব খোরাক হচ্ছে বিশ্বজগতকে ঈমানী আলোকে দেখা। জগতের অসংখ্য পরিচালনার পদ্ধতিকে- নেচারেল আইন বা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে অন্ধভাবে বসে থাকা থেকে যে জিনিসটি আভ্যন্তরীণ মানস মননকে রক্ষা করে, তা হচ্ছে প্রভুর প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান। প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন যে মূলত আল্লাহর কুদরত ছাড়া আর কিছুই নয় তা অনুধাবন করা যায় ঈমনাী চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে। মানুষ যখন এ সত্য উপলব্ধি করে তখনই প্রকৃত দর্শনের সন্ধান পায়।

আসলে দর্শনের মূলে আছে তাওহিদ। আজকের বিভ্রান্ত মানবসমাজকে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে। তাওহীদহীন যাবতীয় দর্শনই মৌলিকভাবে ভ্রান্ত। জগতভাবনায় কেউ যদি তাওহিদী শক্তি বুকে নিয়ে দার্শনিক উপায়ে চিন্তা-গবেষণা করে তবে অবশ্যই তার দৃষ্টিতে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ধরা পড়বে। চরম যুক্তিবাদের গণ্ডীসীমা ও ডিগবাজী খেলা থেকে সে মুক্ত হবে। যুক্তিবাদ যে, দর্শনকে পঙ্গু করে রেখেছে সে তা প্রত্যক্ষ করে এর বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে এবং আসল সত্যের সন্ধানে ব্রত হতে পারবে। জগতজুড়ে আল্লাহর সংখ্যাতিত নিদর্শন ও কুদরত অবলোকন করে প্রকৃত জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে জীবনকে ধন্য করে তুলতে পারবে এ সত্যান্বেষী ঈমানদার।

(খ) ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি

ঈমান সহকারে জগতভাবনায় দ্বিতীয় যে উপকার হাসিল হয় তা হলো ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি। প্রত্যেক ঈমনাদারেরও ঈমানী স্তর আছে। ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হয়েছিলেন নবী ও রাসূলগণ। এর পরের স্তরে আছেন আল্লাহর বন্ধুজনেরা তথা আওলিয়া ও দরবেশরা। এরপরে যাদের অবস্থান তারা হলেন আলিম-উলামা এবং সবশেষে সাধারণ মুসলমানরা। অবশ্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও কারো কারো ঈমানের বিরাট শক্তি থাকতে পারে। আবার অনেক আলিম-উলামার মাঝেও দুর্বলতা থাকাটা অসম্ভব নয়।

ঈমানকে আগে অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী করে কেউ যদি সূক্ষ্মভাবে জগতভাবনায় রত হয় তবে অবশ্যই তার সেই ঈমান আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠবে। আর ঈমানী শক্তি হচ্ছে চুড়ান্ত জ্ঞানার্জন তথা খোদাপ্রাপ্তির চাবিকাঠি।

(গ) আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে অবগতি

সৃষ্ট জগতভাবনা-গবেষণায় যদি ঈমানী নূর সম্পৃক্ত থাকে তবে সে চিন্তাশীল মন অচিরেই বুঝতে সক্ষম হয় যে, সত্যিকার অর্থে একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা হচ্ছে অসীম। এই মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর ক্ষমতার বিরাটত্বের বিকাশ বৈ আর কিছু নয়। মূলত সবকিছু আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর অসীম গুণাবলী থেকেই এ জগৎ সৃষ্টি ও পালিত হচ্ছে। একটু গভীরভাবে ভাবলেই এ সত্য ঈমানী হৃদয়ে ধরা পড়বে।

এটা বিজ্ঞানসম্মত সত্য যে, আমরা যে বিশ্বে বাস করছি তা কল্পনাতীতভাবে বিরাট। এর আয়তন সম্পর্কে ধারণা দিতে যেয়ে একটি উপমা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি। মনে করুন, এক ফুট সমান এক আলোক বৎসর। আর এক আলোক বৎসর হচ্ছে আলোক রশ্মি এক বছরে যেটুকু পথ পাড়ি দিতে সক্ষম

হয়। সর্বজনস্বীকৃত আলোকের গতি হচ্ছে ১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ড। এ হিসেবে ১ বছরে যেটুকু দূরত্ব আলোক রশ্মি পাড়ি দেবে তাহলো- ১,৮৬,০০০ * ৮৬,৪০০ (একদিনে যেসংখ্যক সেকেণ্ড আছে) * ৩৬৫ (এক বছরে যতো দিন আছে) = ৫৮,৬৫৬৯,৬০০০০০০ মাইলের পথ। এই মোটা সংখ্যাকে আমরা সংক্ষিপ্ত করে বলতে পারি যে, প্রায় ৫৯ হাজার কোটি মাইলের পথ। এ হচ্ছে এক আলোক বৎসরের অর্থ। এখন এই সংখ্যাকে যেহেতু আমরা একফুট সমান বলেছি, তাহলে বিজ্ঞানের তথ্যানুযায়ী জগতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত কতো ফুট দীর্ঘ রাস্তা হবে? বিজ্ঞান বলছে তা অন্তত ১৪ হাজার মিলিয়ন আলোক বৎসর বা আমাদের ফুটের হিসেবে ১৪ হাজার মিলিয়ন ফুট। অর্থাৎ ১,৪০০ (চৌদ্দ শত) হাজার কোটি ফুট, আর এই পথ পাড়ি দিতে হলে মনে রাখবেন, আপনাকে প্রতিটি সংখ্যা কমাতে এক একটি আলোক বৎসর পার হয়ে যেতে হবে।

এখন চিন্তা করে দেখুন এ মহাবিশ্ব কত বিরাট। এর স্রষ্টা যিনি তাঁর ক্ষমতাও যে কী অসীম- তা এবার আরেকবার চিন্তা করুন। তবে এখানেই ব্যাপারটির শেষ নয়। এই মহাবিশ্বে প্রায় অসীম পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের বস্তু আছে। যেমন, গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য, সৌরমণ্ডল, তারা, তারাজগত, তারা ক্লাস্টার (কয়েকটি তারাজগৎ নিয়ে একেকটি তারাক্লাস্টার ঘটিত), গ্যালাক্সি (লক্ষ-লক্ষ তারা নিয়ে একেকটি গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়েছে) এবং ক্লাস্টার-সুপারক্লাস্টার (একাধিক গ্যালাক্সি নিয়ে ক্লাস্টার ও একাধিক ক্লাস্টার নিয়ে একেকটি সুপারকাস্টার তৈরী হয়েছে)। এই অসংখ্য-প্রায় বস্তুকে মহাপ্রভু সৃষ্টি করেছেন, পরিচালনা-লালন-পালন করছেন। সুতরাং তাঁর ক্ষমতার অসীমত্ব এসব কর্মক্ষমতা থেকে অনুধাবন করা যায়। তবে এর জন্য তাঁর প্রতি ঈমান থাকতে হবে। অবিশ্বাসীরা বলে এসব হচ্ছে প্রকৃতি, স্বভাব বা নেচার। এর পেছনে খোদায়ী কোন শক্তি নেই! কী অদ্ভুত কথা! ঈমানী নূর থেকে বঞ্চিত মানুষ এভাবেই বলে থাকে। যেসব ব্যাপারে অন্য কোন যৌক্তিক জবাব খুঁজে পায় না তখন তারা এরূপই বলে, "এটা হচ্ছে নেচার"। কিন্তু এই নেচারকে যে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁকে তারা কিছুতেই মানতে রাজী নয়। বাস্তবে মানার জন্য যে পূর্বশর্ত অথাৎ ঈমানী নূর, এটা থেকে তারা বঞ্চিত থাকার কারণে উপরোক্ত অদ্ভুত কথা বলে থাকে। কুরআনে তাই এদেরকে "অন্ধ, বধির, বোবা" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এদের হৃদয়ের উপর একটি দুর্ভেদ্য পর্দা

আছে। এরফলে তারা অন্তর দিয়ে সত্যকে অনুধাবন করতে পারে না। আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(ঘ) মানবজীবনের রহস্য উদঘাটন

ঈমান সহকারে সৃষ্ট জগৎ নিয়ে ভাবনায় চতুর্থ যে উপকার সধিত হয়, তা হলো জীবনের রহস্য উদঘাটনে সহায়তা। সৃষ্ট জগৎ নিয়ে গবেষণা করতে করতে প্রভুর অনুগ্রহ ও কুদরত অবলোকন শেষে এক পর্যায়ে গবেষক তার নিজের দিকে মনোনিবেশ করে। তার দেহ-মন-প্রাণ আসলে কী, এবং জীবন-মরণের রহস্যাবলী কী- ওসব প্রশ্নসহ গভীর ভাবনায়, সে বিভোর হয়ে উঠে। নিজের পরিচিতি, ইহলোকে আসার অন্তর্নিহিত কারণ প্রভৃতি ব্যাপারে সে সচেতন হয়ে উঠে এবং অবশেষে তার জ্ঞানেন্দ্রিয়তে ধরা পড়ে যে, এ জীবন মূলত আল্লাহকে জানা-চেনার জন্যই। আল্লাহকে চেনার মধ্যেই প্রকৃত ইলম লুক্কায়িত আছে। ঈমান সহকারে আল্লাহর পরিচিতি অর্জনে মানুষ জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। যাবতীয় দর্শনের মূল এই প্রভু-পরিচিতিতেই নিহিত।

প্রভু-পরিচিতির রাস্তার পথিক ইহ-পরলোকে সুন্দর-সুখী জীবনের অধিকারী হতে পারে। আর এটাই সত্যদর্শন। জাগতিক জীবনে এরূপ প্রভু-অন্বেষী হয়ে ওঠে চারিত্রিক গুলাবলীর অধিকারী এবং ইহ-পারলৌকিক জ্ঞান আহরণ করে সে আত্মিকভাবে শান্তির উৎসও খুঁজে পায়। দর্শন তো প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে চায়, মানবজীবন কল্যাণময় করতে চায়, জীবন-মরণের রহস্য বের করতে চায়, জড়জগৎ ও মানবজগতের মধ্যে এবং প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে সত্য তথ্য আবিষ্কার করতে চায়। মানবসমাজকে উন্নততর করতে চায়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে গড়ে তুলতে চায় সুন্দর সংঘাতহীন সুষ্ঠু সামঞ্জস্যতা। দর্শন যদি এসব বিষয় নিয়ে হয়ে থাকে, প্রকৃত সত্যের সন্ধানী হয়ে থাকে, তবে তা যে একামাত্র ঈমনী চিন্তা-চেতনায় নিহিত তা দার্শনিকরা কবে উপলব্ধি করবেন?

উপরোক্ত কিছুটা দীর্ঘ ভূমিকা থেকে পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করছেন, এই গ্রন্থ রচনার পেছনে কোন্ জিনিষটি আমাকে অনুপ্রেরণা যোগিয়েছে। সে জিনসটি আর

কিছুই নয়- জ্ঞানের পিপাসা। ছোট থেকেই এই সৃষ্টজগৎ ও এর মধ্যে অসংখ্য বস্তু নিয়ে আমি ভাবতাম। ভাবতাম, এসব কী? কেন? আমি কে? প্রভু কে? জগতের অসংখ্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী কেন সংঘটিত হয়? এর পেছনে রহস্য কি থাকতে পারে? ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন জাগতো। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস এসব প্রশ্ন শুধু আমার মনেই জাগ্রত হয় না, অল্প-বিস্তর সবার মনেই কোন না কোন সময় এসব প্রশ্ন এসে হানা দেয়। আর এ থেকেই মনের মধ্যে জানার স্পৃহা ও এক তীব্র পিপাসা আত্মপ্রকাশ করে। তাই শুরু হলো, সন্ধান।

আলহামদুলিল্লাহ! জীবনের সিংহভাগ সময় থেকে যেটুকু অত্যল্প জ্ঞান আহরণ করার তাওফিক আল্লাহ পাক দান করেছেন সেটুকু এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী আমার প্রিয় ভাই-বোনদের সামনে তুলে ধরলাম। আমার এ লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং এ থেকে যদি কেউ সমান্যও উপকৃত হন তবে তা হবে সেই সন্তুটি অর্জনে সহায়ক। আর তার জন্য অবশ্য আমার নিজের গৌরবের কিছুই নেই। প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'আলা।

বাংলা ভাষায় ঈমান ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা হয়েছে অত্যল্প। বিশেষকরে বিজ্ঞানের মতো একটি কঠিন বিষয়কে সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমি এই গ্রন্থের ভাষা-ব্যবহারে সেদিকে খুব খেয়াল রেখেছি। তবে এটা সর্বসাধারণের বোধমগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সফল হয়েছে- সে দাবী আমি করবো না। গ্রন্থটি কোন স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও রচিত নয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের উপর সার্বিক গবেষণা ও টেকনিক্যাল তথ্যাদি অথবা গণিতশাস্ত্রের জটিল সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখা এখানে পাঠকরা পাবেন না। বিজ্ঞান ও ইসলাম যে মূলত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল সেটা পরিষ্কার করা এবং বিজ্ঞানের প্রতি বাংলাদেশী সাধারণ্যের মাঝে কিছুটা হলেও আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে চেতনা জন্মানোও এই গ্রন্থ রচনার একটি উদ্দেশ্য। পাঠকরা যাতে এটা পাঠে আনন্দবোধ করেন সেদিকে যথাসাধ্য খিয়াল রেখেছি।

তিনটি ভিন্ন খণ্ডে গন্থের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক দিক নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান একটু ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ হলো,

বিজ্ঞান যে ইসলামী স্বর্ণযুগের অবদান তা প্রমাণ করা। আমাদের পূর্বসূরী মুসলিম বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন আমাদের গৌরব। বিভিন্ন মনীষী বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে সে যুগে বিশ্বকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন এক বিরাট জ্ঞানের সম্ভার। আমরা তাঁদের কথা আজ ভুলতে বসেছি। তাঁদের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পাশ্চাত্যে প্রায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ বিজ্ঞানচেতনা ছাড়া আজকের ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বশীল বিশ্বে জীবনের মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশীল জাতিগঠন কিছুতেই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর সারসংক্ষেপ আলোচনা হয়েছে। এ পর্বে যেসব বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে তা পাঠ করে অনুধাবন করতে পারলেই, আশাকরা যায় বিজ্ঞানের মৌলিক বিভিন্ন দিকগুলো পাঠকদের জানা হয়ে যাবে। তবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় আমি ইচ্ছে করেই কাঠিন্যতা বর্জন করেছি। অর্থাৎ কোন বিষয়ে গাণিতিক কিংবা টেকনিক্যাল তথ্য গভীরভাবে উপস্থাপন করি নি। এর কারণ হলো, আগেই বলেছি- এই গ্রন্থটি বিজ্ঞানের কোন পাঠ্যপুস্তক নয়। এ খণ্ডে তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বরূপ এবং মৌলিক দিকগুলো বর্ণিত হয়েছে।

শেষ খণ্ডে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ খণ্ডটির বেশিরভাগ কথা আমার নিজের। সুতরাং এখানে ভুল-ত্রুটির মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই পর্ব আমি একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে বদ্ধমূল রেখে উপস্থাপন করেছি- তাহলো, বিজ্ঞান ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক কি? আমি আশাকরি এই শেষ পর্বটি পাঠ করে অনেকে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, বিজ্ঞান আসলে ঈমানবৃদ্ধির জন্য সহায়ক-শক্তি। বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী মানুষ ঈমানী শক্তিতে দৃঢ় হতে বাধ্য। অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য বিজ্ঞানী হওয়া আল্লাহ-প্রদত্ত এক বিরাট নিয়ামত। এরূপ বিজ্ঞানী বৈষয়িক উন্নয়নে মানবজীবনের ইহলৌকিক মানোন্নয়ন যেমন করে থাকেন তেমনি তিনি নিজেও ঈমানী শক্তির ফলে আল্লাহর নৈকট্যশীল ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেন।

সবশেষে আবারও আল্লাহর পবিত্র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং এই বড় গ্রন্থটি রচনায় যারা আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের

সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে কয়েকজন বিশিষ্ট গুণিজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী হিসেবে অনুভব করবো।

আমার বাবা আলাহজ্জ আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আমার আম্মা মুছাম্মত মমরাজ বিবি, আমার স্ত্রী ও সন্তানাদি যাদের মধ্য থেকে আমি পেয়েছি অফুরন্ত প্রেরণা। এছাড়া যে কম্পিউটার দিয়ে এ গ্রন্থটি কম্পোজ করেছি তা আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী মুছাম্মত মমতাজ বেগম উপহার হিসেবে আমাকে দিয়েছিল। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

গুণিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে স্মরণ করছি মাসিক মদীনা সম্পাদক জ্ঞানতাপস মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দামাত বারাকাতুহুম, লন্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক ইসলামী সমাচার ও সাপ্তাহিক হিজরত সম্পাদক বন্ধুবর কবি আবদুল মুকিত মুখতার, সাপ্তাহিক হিজরতের সহকারী সম্পাদক কলামিস্ট বন্ধুবর দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী, বন্ধুবর ক্বারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ আমিনী, আলহাজ্জ হাফিজ ফরহাদ আহমদ আমিনী, আলহাজ্জ মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী, সহকর্মী ও বন্ধুবর মাওলানা জালাল উদ্দীন, লেখিকা ও একান্ত আত্মীয়া হুসনুল আম্বিয়া চৌধুরী প্রখুম। এদের সবার উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সহযোগিতা ছাড়া এই গ্রন্থটি হয়তো কোনদিন লেখা হতো না। এছাড়া অন্যান্য অনেক বন্ধু-বান্ধবের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

সধারণ মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। নিশ্চয়ই আমারও অনেক ভুল হয়েছে। সুহৃদ পাঠকদের চোখে যদি কোন ভুল-ক্রটি ধরা পড়ে তবে অনুগ্রহ করে আমাকে অবগত করতে দ্বিধা করবেন না। আমি এজন্যে আপনাদের কাছে ঋণী থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আমি আশাকরি বইটি পাঠ করে একদিকে যেমন আপনি আনন্দ পাবেন তেমনি উপকৃতও হবেন।

বিনীত
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
সিলেট, রামাদ্বান ১৪৩২ হিজরী, আগস্ট ২০১১ ঈসায়ী।

"আমি (আল্লাহ) আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাকিছু আছে এসব কৌতুক হেতু সৃষ্টি করি নি" [সূরা দুখান ঃ ৩৮]।

ইতিহাসের আলোকে বিজ্ঞান

পরিচ্ছেদ ১

সৃষ্ট জগত, মানুষ ও বিজ্ঞান

এ মহাবিশ্ব একটি বস্তু জগত। এর প্রতিটি অনুকণা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত কিছু মৌলিক আইনের আওতাভূক্ত থেকে অস্থিত্বশীল আছে। সমগ্র জগতটি একটি ফিজিক্যাল বাস্তবতা। এর মধ্যে প্রতিনিয়ত রদবদল ঘটছে। সৃষ্টির শুরুতে এ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে এবং তা শেষ অবধি অব্যাহত থাকবে।

সৃষ্ট এই মহাবিশ্বের এক অংশ সৌরমণ্ডল নামক একটি জগতে নীল রংয়ের ভাসমান এক গ্রহের মধ্যে মানুষ নামক সৃষ্টির সেরা জীবীর বসবাস। জগতের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় এই মানবসন্তানের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক বিরাট শক্তি। এই শক্তির বহিঃপ্রকাশ থেকেই তার মনে জাগ্রত হয় অসংখ্য প্রশ্ন। জানার পিপাসায় সে সর্বদাই ব্যকুল। দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগতের কার্যকারিতা, এর বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জন্ম-মৃত্যু-জীবনের রহস্য প্রভৃতি হাজারো প্রশ্ন তার মনে দোলা দেয়। সে জানতে চায়, বুঝতে চায়, জ্ঞানবান হতে চায়। মানুষের এই অনুসন্ধিৎসু মনের স্পৃহা থেকেই সুদূর অতীতে প্রণালীবদ্ধভাবে জানার একটি জ্ঞানের শাখার জন্ম নেয়। এই জ্ঞানের শাখার নামই হচ্ছে বিজ্ঞান।

'বিজ্ঞান' শব্দটির ইংজেরী প্রতিশব্দ 'সায়েন্স'। সায়েন্স শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সায়েন্স হচ্ছে সার্বিকভাবে বিশ্বজগৎ নিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে গবেষণা চালিয়ে জ্ঞানার্জন করার নাম। এখানে 'প্রণালীবদ্ধভাবে' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যে, সত্যিকার অর্থে যে কোন তথ্যকে 'বৈজ্ঞানিক তথ্য' হিসেবে গ্রহণ করার আগে বিজ্ঞানের কিছু টেস্ট এসব তথ্য পাশ করে আসতে হবে। অর্থাৎ মৌলিক কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার

নিরিখে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক কি না তা যাচাই করে এর সত্যতা প্রমাণিত না করা পর্যন্ত কথিত তথ্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য বা ফেক্ট বলা যাবে না। এই 'সিস্টেমেটিক' শিক্ষাপদ্ধতিই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মেথোড বা প্রাণালী।

আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে সভ্যতার উন্মেষ ঘটে মেসোপটামিয়া (বর্তমান ইরাক) এবং নীল নদের তীরবর্তী প্রাচীন মিশরে। এসব সভ্যতার লীলাভূমিতেই সর্বপ্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে জগৎ ও এর বিভিন্ন দৃশ্যমান কার্যকারিতা সম্পর্কে জানার উদ্ভাবন ঘটে। মানুষ পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে বিভিন্ন ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কারণ জানার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রচীন সে যুগে কিভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে এর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল সেব্যাপারে এবার বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যাক।

প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান

প্রাথমিকভাবে অবশ্যই, মানবিক সাধারণ প্রয়োজনীতা পূরণে বৈজ্ঞানিক চেতনার জন্ম হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সময় সময় জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। যেমন- অতি সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য অঙ্ক, জমির মাপ-জোখের জন্য জ্যামিতির চিন্তা-ভাবনা এবং বিভিন্ন মৌসুম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনচলার জন্যে জরুরী বিষয়। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং, সময় নির্ণয়, চাষাবাদ প্রভৃতি কাজের জন্যও কিছু মৌলিক প্রণালী আবিষ্কারের প্রয়োজন দাঁড়ায়। অপরদিকে মানুষ সর্বদাই রোগ-শোকে ভুগে এবং কর্মক্ষেত্রে বা জীবনচলার যে কোন সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিজেকে আহত-বিক্ষত করতে পারে। সুতরাং মানুষ তার নিজের শারীরিক নিরাপত্তা ও রোগ-ব্যধি থেকে আরোগ্য লাভের আশায় আদি কাল থেকেই 'নিরাময়' খুঁজে আসছে। এ মৌলিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্ম।

মোসোপটামিয়ার বেবিলন ও আসিরিয়ার মানুষ সর্বপ্রথম জ্যোতিষশাস্ত্র (এটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন, বাস্তবে জ্যোতিষশাস্ত্র কোন বিজ্ঞান নয়) ও সংখ্যা শাস্ত্রের জন্ম দেয়। দেখা গেছে এসময় বেবিলনের গাণিতিকরা সাধারণ যোগ-বিয়োগ-ভাগ-পূরণ ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বীজগণিতের সাধারণ

সমীকরণ নিয়েও গবেষণা করেছেন। অবশ্য এসব কর্মতৎপরতার পেছনে মূলত প্রাকটিক্যাল সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে বের করাই ছিলো তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য।

প্রচীন গ্রীকপূর্ব যুগে মিশর, মেসোপটামিয়া, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূলত বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপরই নির্ভর ছিলো। তবে ভারতবর্ষে পরবর্তীতে লিখিত যে সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিলো তা সমগ্র বিশ্বব্যাপী আজও প্রচলিত আছে। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা হবে।

গ্রীক বিজ্ঞান

যুক্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গভীর গবেষণার মাধ্যমে জগতকে জানার পদ্ধতিগত বিজ্ঞানের উদ্ভাবক গ্রীকরাই ছিলেন। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। বেবিলন ও মিশরে যেখানে বিজ্ঞান ছিলো মূলত মানবিক প্রয়োজনীয়তার সম্পূরক, কিন্তু গ্রীকদের নিকট তা ছিলো জানার গভীর স্পৃহা। জগতকে জানার এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রাচীন গ্রীসে বিজ্ঞানচেতনা ব্যাপকভাবে জাগ্রত হয়। এই জাগরণের অগ্রপুরুষ ছিলেন মিলেটাসের থেলিস (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক) নামক এক ব্যক্তি। একজন বণিক, যিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞানের জন্যে নিজের ব্যবসা থেকে ইস্তিফা দেন। থেলিস হয়তো তখনকার যুগের সভ্যতার লীলাভূমি বেবিলন ও মিশরে ভ্রমণ করেছেন এবং সেসব জায়গার গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞানার্জন করে এসব ধারণা গ্রীক বিজ্ঞানে এনে সম্পৃক্ত করেন। বিশ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনার সূত্রপাত ঘটান। তার ধারণা ছিলো জগতের মৌলিক উপাদান হচ্ছে পানি। পানি থেকেই সবকিছু সৃষ্ট।

বিশ্বজগৎ নিয়ে গবেষণায় থেলিসের পদ্ধতি অনুসরণ করে পরবর্তী ২ শতকের গ্রীক বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন থিওরী তুলে ধরেন। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে সক্রেটিস-পূর্ব যুগের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা অনেক ধরণের কথা বলেছেন। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তারা দার্শনিক প্রশ্নদ্বয় ‘অস্তিত্ব’ ও ‘পরিবর্তনশীলতা’ নিয়ে সংলাপ শুরু করেন। এসব প্রশ্নের প্রবক্তা ছিলেন হিরাক্লিটাস (খ্রি.পূ. ৫৪০-৪৮০) ও পারমেনাইডিস (জন্ম: খ্রি.পূ. ৫১৫)। একদিকে তারা একটি অনন্তকাল অপরিবর্তনীয় জগতকে দেখেন অথচ অপরদিকে এই জগতের আভ্যন্তরে অসংখ্য

পরিবর্তন ঘটছে। এই আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী অবস্থানের মৌলিক রদবদল ঘটে ডিমোক্রিটাসের (খ্রি.পূ. ৪৬০-৩৭০) মাধ্যমে। তিনি 'এটমের' ধারণার জন্ম দিয়ে জাগতিক পরিবর্তনশীলতার ব্যাখ্যা দেন। বলাই বাহুল্য প্রাথমিক এই এটোমিক ধারণা আজও বিজ্ঞানমহলে বহাল আছে। তবে ডিমোক্রিটাসও সার্বিকভাবে এ বিশ্বকে একটি অপরিবর্তনীয় অনন্ত জগৎ মনে করতেন। এটোমিক রদবদল এই মহাবিশ্বের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন গণিতবিদ পিথাগোরাস (খ্রি.পূ. ৫৪০-৫০০)। তিনি একটি সংখ্যা থিওরীর উদ্ভাবন করেন। এর মাধ্যমে শুধু অঙ্কশাস্ত্র নয় বিশ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন চেতনা সৃষ্টি হয়। সক্রেটিস-পূর্ব বৈজ্ঞানিক চেতনায় একটি জিনিস অনুপস্থিত ছিলো- তাহলো চিন্তাবিদরা জগৎ নিয়ে ভেবেছেন ঠিকই কিন্তু মানুষ যে এই সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু সেদিকে খেয়াল তাদের ছিলো না। এই নতুন দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার উদ্ভাবক ছিলেন সক্রেটিস (খ্রি.পূ. ৪৭০-৩৯৯)। তার মতে জগৎ নিয়ে বেশী গবেষণার চেয়ে মানবিক চিন্তাচেতনার মৌলিক উদ্দেশ্য হতে হবে সত্যকে খুঁজে বের করা, সঠিক ন্যায়নিষ্ঠতা এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য কিভাবে উন্নততর করা যায় সেদিকে খেয়াল দেওয়া। এসব লক্ষ্য অর্জনে সক্রেটিস শক্তিশালী সংলাপভিত্তিক যুক্তিবিদ্যার জন্ম দেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে সক্রেটিসকে আমরা বিজ্ঞানবিরোধী মানবতাবাদী বলতে পারি কিন্তু তার যুক্তিতর্কভিত্তিক গবেষণা মোটেই অবৈজ্ঞানিক কিছু নয়। বরং পরবর্তীতে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে এরূপ পদ্ধতিই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

সক্রেটিসের ছাত্র ও একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা প্লেটোও (খ্রি.পূ. ৪২৮-৩৪৭) সক্রেটিসের চিন্তা-চেতনাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি গণিতশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং সত্যতা মেনে নিলেও সক্রেটিসের মতো দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাই তাকে বেশী আড়ষ্ট করে রাখে।

একাডেমী থেকে বেরিয়ে আসা সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন, এ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২)। তার পূর্বসূরী সক্রেটিস ও প্লেটোর মতো তিনিও সঠিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সত্যিকার জ্ঞানের সন্ধানী ছিলেন। তবে তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান ছিলো- তাহলো, যুক্তির মানদণ্ডে কোন সত্যপ্রতিষ্ঠায় থিওরী বা

বুদ্ধিসম্পন্ন ধারণার ব্যবহার। অর্থাৎ প্রথমে ধারণা করে কিছু থিওরী তুলে ধরা এরপর এর সত্যতা যুক্তির মাধ্যমে যাচাই করা। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই পরবর্তীতে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। কোন নেচারেল বা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাপারে বিজ্ঞানী একটি থিওরী সৃষ্টি করেন, এরপর এটা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা- যেমন অঙ্কশাস্ত্রের ব্যবহার কিংবা পর্যবেক্ষণমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে থিওরীর সত্যতা যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা। গ্রীক বিজ্ঞানের এই দিকটিই স্থায়ী প্রভাব ফেলে। এছাড়া ইউক্লিড (জন্ম: খ্রি.পূ. ৩০০), পিথাগরাস (খি.পূ. ৫৮০-৫০০) প্রমুখ গণিতশাস্ত্রকে পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

আলেকজান্ড্রিয়ায় বিজ্ঞানচেতনা

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিস্তারলাভ করে। ক্রমান্বয়ে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরের আলেকজান্ড্রিয়া শহরে বিজ্ঞানচর্চার চরম উৎকর্ষ শুরু হয়। তখন থেকে বিজ্ঞান গবেষণার দীর্ঘস্থায়ী প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এই আলেকজান্ড্রিয়া শহর। এমনকি গ্রীক রাজধানী এথেন্স থেকেও এই গবেষণাকেন্দ্র আরও প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এর বিশেষ একটি কারণ হলো- আলেকজান্ড্রিয়ায় তখনকার যুগের বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল। এখানেই প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ ইউক্লিড (খ্রি.পূ. ৩য় শতক) তাঁর জগতখ্যাত গ্রন্থ ‘ইলেমেন্ট’ রচনা করেন। এছাড়া বিজ্ঞানী এ্যাপোলোনিয়াস অব পেরগা (২৪০-১৯০ ঈ.) এবং এ্যারিস্টারকাস অব সামোস (৩১০-২৩০ ঈ.) এই শহরেই বিজ্ঞানের উপর গবেষণা চালান। তবে ইউক্লিড ছাড়াও আলেকজান্ড্রিয়ার অপর প্রসিদ্ধ যে বিজ্ঞানীর থিওরী বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর নাম হলো ‘টলেমি অব আলেকজান্ড্রিয়া’ (১০০-১৭০ ঈ.)। তাঁর লিখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘আলমাজেষ্ট’। বইয়ের এই নামটি হচ্ছে আরবি নাম। এটা পরবর্তীতে মুসলমানরা আরবি ভাষায় এই নামেই প্রকাশ করেছিলেন।

রোমানরা যদিও গ্রীক কৃষ্টি-ঐতিহ্য থেকে প্রভাবিত হয়েছিল কিন্তু বিজ্ঞানচেতনায় তারা ছিলো অত্যন্ত অনাগ্রহী। বাস্তবে রোমানরা ছিলো একটি মিলিটারী শাসক জাতি। বিজ্ঞানের উৎকর্ষে তাদের ভূমিকা অবিশ্বাস্যভাবে কম ছিলো। গ্রীক

অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তারা মোটেই তেমন তোয়াক্কা করে নি। তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু মননের অভাব ছিলো বলেই মনে হয়। তবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের অবদান অবশ্যই আছে। বড় বড় শহর নির্মাণ থেকে মিলিটারী শক্তিগঠন ও শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্র তৈরীতে এ জাতি ছিল পারদর্শী। এসব কার্য সমাধানে প্রযুক্তি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।
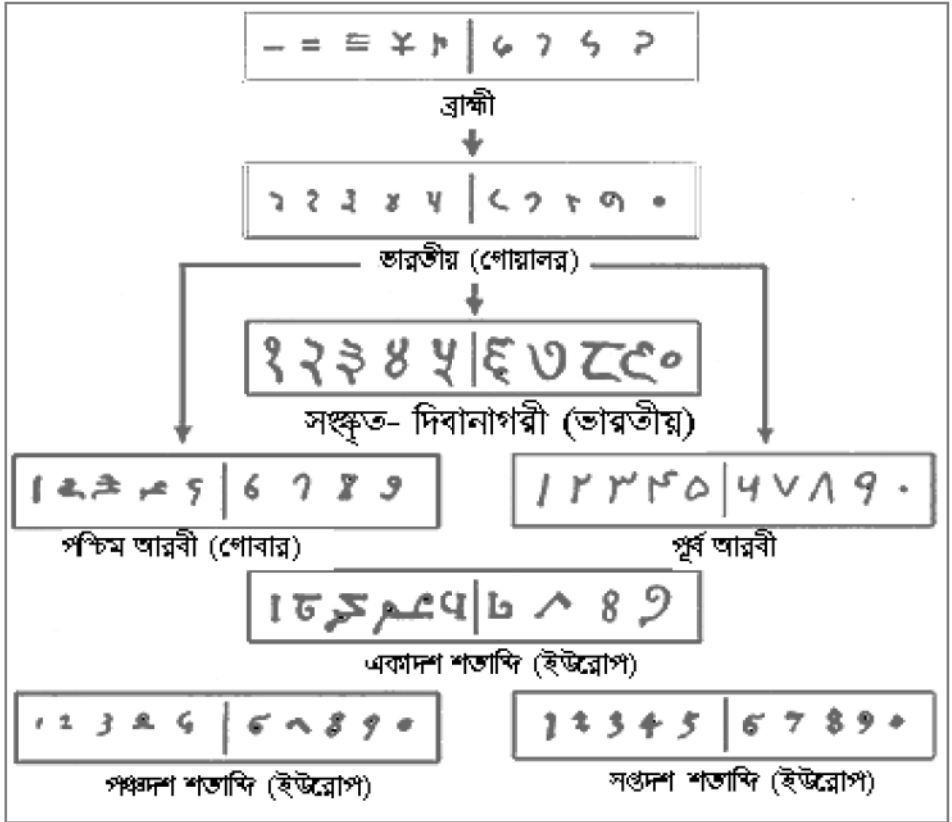
চিত্র ১: প্রাচীন ভারতে আবিষ্কৃত সংখ্যা সিস্টেম যা আজো ব্যবহৃত হচেছ।

রোমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে জ্ঞানের উপর গবেষক ভার্রো (খ্রি.পূ. ১১৬-২৭), প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপর লেখক প্লিনি দ্যা এল্ডার (২৩-৭৯ ঈ.), এ্যানাটমী ও ঔষধ বিজ্ঞানের গবেষক গ্যালেন (১৩০-২০০ ঈসায়ী সাল- তিনি ছিলেন

বংশগতভাবে গ্রীক), স্রাবো অব পন্টাস (৬৩ খ্রি.পূ- ২১ ঈ.) এবং স্পেনিশ বংশোদ্ভুত পম্পোনিয়াস মেলা (জন্ম: ৪৩ ঈ.) প্রমুখের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দু'জন রোম শহরে কর্মরত ছিলেন। তারা ভূগোলের উপর গবেষণা করেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান

প্রাচীন যুগে ভারতীয় বিজ্ঞানের গতিধারা ছিলো স্বতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দির আগেই কিন্তু মেসোপটামিয়া ও গ্রীক বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে ভারতীয় সভ্যতায়। ইতোপূর্বে হিন্দুদের জ্যেতির্বিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু ছিলো ক্যালেন্ডার সিষ্টেম। এছাড়া হিন্দু পুরোহিতরা তখনই গ্রীক থেকে ধারকরা জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তবে এ শাস্ত্রটির সঙ্গে সত্যিকার বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সুদূর মহাকাশে অবস্থানরত তারাদের সাথে সম্পর্ক আছে বলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে ভারতে সত্যিকার বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হয় এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের মৌলিক শাখাগুলোর উপর গবেষণায় লিপ্ত হন। বিশেষকরে হিন্দুরা অঙ্ক শাস্ত্রে সে সময় প্রভুত উন্নতি সাধন করেন। তাদের আবিষ্কৃত সংখ্যা সিষ্টেম আজও বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও পশ্চিমে এই সংখ্যাকে 'আরাবিক' বলা হয়ে থাকে- এর কারণ হলো, মুসলমানরা এই সিস্টেমটি পরবর্তীতে পাশ্চাত্যে (ইউরোপে) পরিচিত করেছিলেন।
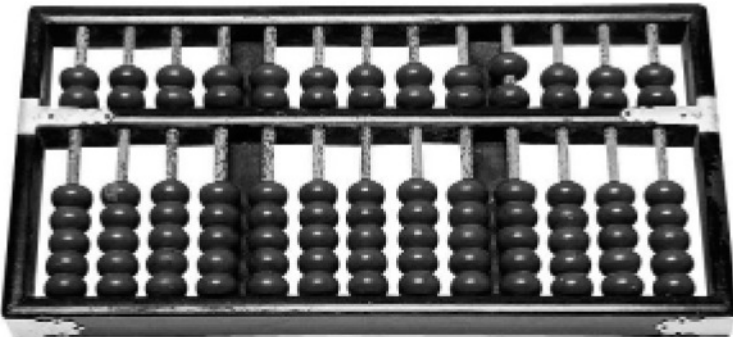
চিত্র ২: চীনে আবিস্কৃত প্রথম 'কালক্যুলেটর' আবাকাস।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন যে, আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই” [সূরা আলে ইমরান ঃ ৫]।

পরিচ্ছেদ ২

মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চা

প্রাচীন যুগের ইতি ঘটিয়ে প্রথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি সভ্যতা ও ধর্মের জন্ম হয় ঈসায়ী সপ্তম শতকে। এই মহান ধর্মভিত্তিক সভ্যতার নাম হচ্ছে ইসলাম। বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপর আলোচনায়- মুসলমানদের সোনালী যুগের বৈজ্ঞানিক চেতনারই সুফল আজকের বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগ বিবেচনায়, এ প্রসঙ্গে মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিরাট অবদানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। পাঠকরা মুসলামদের বৈজ্ঞানিক চেতনার ব্যাপকতা উপলব্ধি করে বুঝতে পারবেন, সে যুগের আমাদের পূর্বসুরীরা এ যুগের আমরা মুসলমানদের তুলনায় কতো এডভান্স ছিলেন। এছাড়া তাঁদের বৈজ্ঞানিক অবদান থেকে সমগ্র পৃথিবী কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা সহজেই ধরা পড়বে।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র আরব জাতিসহ, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, জিব্রালটার ও স্পেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলিম উম্মার মধ্যে একত্রিত হয়। সাথে সাথে ইসলামী একটি নবতর সভ্যতার জন্ম হয় যা আজো স্থায়ী আছে।

মুসলমান আরবরা দ্রুত তাদের দ্বারা শাসিত নতুন নতুন জাতিদের ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হন ও শিক্ষা গ্রহণ করেন। একই সময় ইসলামে দীক্ষিত অনারবদের অনেকেই কুরআনের ভাষা, আরবিকে গ্রহণ করে নেয়। পারস্য, সিরিয়া, বারবার এবং অন্যান্য জাতি আরবি ভাষাকে নিজস্ব ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরই আরবরা সব ধরনের শিক্ষার্জনে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সমগ্র ইসলামী বিশ্বে অচিরেই গড়ে ওঠে অসংখ্য বিদ্যাপীঠ, কলেজ, লাইব্রেরী, অবজারভেটরী (মহাকাশ পর্যবেক্ষণকেন্দ্র) ও হাসপাতাল। একই সাথে তখনকার দিনের জ্ঞানার্জনের প্রসিদ্ধ দু'টি শহর দামেস্ক ও বাগদাদে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিতদেরকে নিমন্ত্রিত করে আনা হয়। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের নিজস্ব ধর্ম, জাতিগত পরিচিতি বা ঐতিহ্যের উপর কোন ধরনের বিবেচনা না করে যারতার যোগ্যতার উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। নবাগত পণ্ডিতরা দক্ষতার সাথে ও শাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে তখন গ্রীক-বিজ্ঞানের অনেক বই-পুস্তক, আলোচনা-সমালোচনা-মতামত সহকারে আরবিতে ভাষান্তর করেন।

অতএব, এর ফলস্বরূপ পুরাতন ও নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণার জন্ম নেয়, এবং সাধারণ মুক্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন মরুবাসীদের হৃদয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। তবে এ নবজাগরণের পেছনে বিশ্বজগৎ নিয়ে গবেষণা করার কুরআনী নির্দেশনাবলী বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলো তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রাথমিক দিনগুলোতে মুসলমানরা জ্ঞানার্জনের অন্বেষণে বাগদাদকে তখনকার বিশ্বের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলেন। বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে ইতিহাসবিদরা সঠিকই বলেছেন যে, উহা বৈজ্ঞানিক চেতনায় উজ্জীবিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো।

জানা থেকে অজানার পথে পাড়ি দিয়ে বিজ্ঞানের নতুন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাকে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ভূয়োদর্শন ব্যতীত কিছুই দ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। এসব মৌলিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলক বিষয়-বস্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাগদাদেই শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানে ইসলামের অবদানের ইতিহাস তাই অষ্টম শতাব্দির এ বাগদাদ নগরী থেকেই শুরু করা আবশ্যক। জর্জ সারটন তাঁর ইনট্রোডাকশন টু দ্যা হিস্টরি অব সাইন্স গ্রন্থে অষ্টম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধ হতে একাদশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত সময়কে নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

(ক) জাবির ইবনে হাইয়ান এর সময়, যা অষ্টম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত।
(খ) আল-খোওয়ারিজমির কাল, যা নবম শতাব্দির প্রথমার্ধে স্থায়ী ছিলো।
(গ) আর-রাজির সময়, যা নবম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে স্থায়ী ছিলো।
(ঘ) আল-মাসুদের সময়, যা দশম শতাব্দির প্রথমার্ধে বিস্তৃত ছিলো।
(ঙ) আবু-ই-ওয়াফার কাল, যার কার্যকাল দশম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে স্থায়ী ছিলো।
(চ) আল-বিরুনির সময়, যা ছিলো একাদশ শতাব্দির প্রথমার্ধে স্থায়ী।
(ছ) সবশেষে উমর খৈয়ামের কার্যকাল, যা একাদশ শতাব্দির শেষার্ধে স্থায়ী ছিলো।

এ প্রসঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদানের কথা পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখিত যে কোন বিজ্ঞানী সম্পর্কে পাঠকরা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন সূত্র থেকে আরও জানতে পারবেন।

চিত্র ৩: মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে বহুলব্যবহৃত 'অ্যাস্ট্রলেব' যন্ত্র।

(ক) জাবির ইবনে হাইয়ানের কার্যকাল

ধর্মের সঙ্গে সংঘাতহীন নিষ্কলুষ মুক্ত-চিন্তার বিকাশের ফলে মুসলমানরা বৈজ্ঞানিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, অষ্টম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধের সময়। এ সময়কেই ইসলামী বিজ্ঞানের সূচনাকাল বলা চলে। জাবির ইবনে হাইয়ান এ সময় বিজ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। জাবিরের লিখিত আরবি বা লেটিন পুস্তকাদি থেকে এটা ভাল করে অনুধাবন করা যায় যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ছিলো অগাধ।

এ সময় দু'জন আব্বাসী খলিফা তাঁদের ক্ষমতা ব্যবহার করেন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন ও মঙ্গলের জন্য। এ দু'জনের মধ্যে প্রথমজনের নাম হলো বাগদাদের প্রতিষ্ঠাতা, খলিফা আল-মনসুর (৭০৯-৭৭৫ ঈ.) ও দ্বিতীয়জনের নাম, খলিফা হারুন-উর-রশিদ (৭৬৩-৮০৯ ঈ.)। এ দু'জন খালিফাই গ্রীক বিজ্ঞানীদের বই-পুস্তক ভাষান্তর করার লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

খলিফা আবু জাফর আব্দুল্লাহ আল-মনসুর ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার নিকটবর্তী বীর মায়মুন নামক স্থানে ৬৮ বছর বয়েসে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন এবং তাঁর শাসনকাল ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর অবদান অতুলনীয়। এই জ্ঞানবান খলিফার প্রচেষ্টায় অনেক সিরিয়াক, পারস্য, গ্রীক ও হিন্দুদের বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের উপর লিখিত বই-পুস্তক আরবিতে ভাষান্তরিত হয়।

খলিফা হারুন-উর-রশিদের জন্ম হয় ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে আল-রায় নামক স্থানে। ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তুস নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। হারুন-উর-রশিদ ছিলেন আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে পঞ্চম খলিফা এবং হয়তবা আব্বাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধও। তিনি বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নির্দেশে আরও বহু মূল্যবান গ্রীক পুস্তকাদি ভাষান্তর করা হয়েছিলো। ৮০৭ খ্রিস্টাব্দে হারুন-উর-রশিদ ফরাসীদের বাদশাহ শারলেমেইনকে একটি সুন্দর পানির-ঘড়ি উপহার দেন।

এ সময়ে যাবতীয় গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণা একমাত্র মুসলমান বিজ্ঞানীরা করে আসছিলেন। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, ইতোপূর্বে গণিত শাস্ত্রের উপর চীনা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশ্য গণিতের উপর মুসলমানদের আগ্রহ জন্মে ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহিত গাণিতিক বই-পুস্তকের কারণে। ইব্রাহিম আল-ফজরীই ছিলেন প্রমথ মুসলিম বিজ্ঞানী যিনি অ্যাস্ট্রলেব নামক সমুদ্রে চলার নাবিগেশন যন্ত্রটি তৈরী করেন। হিন্দুদের গণিত শাস্ত্রের সাথে যাঁরা প্রথমে জড়িত হন তাঁদের মধ্যে, ইয়াকুব ইবনে-তারিক ও মুহাম্মদ আল-ফজরী (ইব্রাহিম আল-ফজরীর পূত্র), এঁদের নাম শোনা যায়।

কানকাহ নামক একজন হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাথে ইয়াকুবের সাক্ষাৎ ঘটে খলিফা আল-মনসুরের দরবারে। যার ফলে হিন্দু গণিত শাস্ত্র ‘সিদ্ধান্ত’ এর সাথে তাঁর পরিচিতি ঘটে। খলিফা তারপর এ বইটিকে আরবিতে ভাষান্তর করার জন্য মুহাম্মদ ইবনে আল-ফজরীকে নির্দেশ দেন। একই সময় চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী আল-বাতরিক আলেকজান্ড্রিয়ার প্রখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি এঁর বই ‘কোয়াড্রিপারটিয়াম’ আরবিতে ভাষান্তর করেন। দু’জন জ্যোতিষী- একজন ইহুদি যাঁর নাম ছিলো, মাশাল্লা ও অপর আরেকজন পারস্য দেশীয় যাঁর নাম ছিলো, আল-নৌবখত, একত্রে কাজ করেন বাগদাদ শহরকে গড়ে তুলতে।

ইব্রাহিম আল-ফজরী

এই বিজ্ঞানীর সাথে ইতোমধ্যে আমরা পরিচিত হয়েছি। ৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম আল-ফজরী মৃত্যুবরণ করেন। আল-ফজরী একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে একাধিক বই লিখে গেছেন, এবং একটি প্রখ্যাত কছিদা বা কবিতাও তিনি লিখেছিলেন যেটির বিষয়বস্তু ছিলো রাশিচক্র।

ইয়াকুব ইবনে তারিক

ইতোমধ্যে এই বিজ্ঞানী সম্পর্কেও বলেছি। তাঁর সময়ে সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ইয়াকুবের জন্মস্থান হলো পারস্যে। ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি কর্মরত ছিলেন এবং ৭৯৬

খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ইয়াকুব ভূগোলক সম্পর্কে লিখেছেন এবং হিন্দু গ্রন্থ সিদ্ধান্তে প্রকাশিত গাণিতিক টেবিলের উপরও লেখালেখি করেন।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-ফজরী

তিনি বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফজরীর পূত্র। পিতা ও পূত্রের প্রায় একই নাম থাকায় কোন কোন সময় ভুলবশতঃ কে কি ছিলেন বা করেছেন সে ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, প্রখ্যাত রাশিচক্রের উপর লিখিত কবিতার লেখক (যেটা সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি) মুহাম্মদ ফজরী ছিলেন, তাঁর পিতা আল-ফজরী নন। তবে এই মুসলমান বিজ্ঞানীই যে খলিফা আল-মনসুরের নির্দেশে সিদ্ধান্ত বইটি আরবিতে ভাষান্তর করেছিলেন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। ৭৭২ থেকে ৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি এ কার্য সমাধা করেন। ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত নাম্বার সিষ্টেম যা আজো মানুষ ব্যবহার করছে, মুহাম্মদ ফজরীর এ ভাষান্তরের ফলেই ইসলামী বিজ্ঞানে প্রবেশ করে। মুহাম্মদ আল-ফজরী ৭৯৬ থেকে ৮০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও এক তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

মাশাল্লাহ

তাঁর প্রকৃত নাম হয়ত মানাশিহ (আরবিতে, মিশাহ) ছিলো। লেটিন ভাষাবিদরা তাঁর নাম মেছাহালা, মাসেলামা ও মাসেলারমা প্রভৃতিতে রূপান্তরিত করেছেন। মাশাল্লাহ অবশ্য আরবি 'মা-শাআল্লাহ' কথার একটি সংকোচিত রূপ, যার অর্থ হলো, কি বিস্ময় আল্লাহর অভিপ্রায়!

মাশাল্লাহ খলিফা আল-মনসুরের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং ৮১৫ থেকে ৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ইসলামের একজন প্রাথমিক পর্যায়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষী ছিলেন মাশাল্লাহ। অথচ তিনি ইহুদি ধর্মাবলম্বী একজন মিশরীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লিখিত একটি মাত্র আরবি বইয়ের খবর পাওয়া যায়, তবে তিনি লেটিন ও হিবরু ভাষায় বহু পুস্তক লিখে গেছেন। ৭৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের জ্যোতিষী আল-নৌবখত এঁর সাথে মাশাল্লাহ বাগদাদ

নগরীর ভিত্তি স্থাপনে সহযোগিতা করেন। মধ্যযুগে তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় যে পুস্তক ছিলো তা হলো 'ডি সাইনটিয়া মোটাস অরবিস' যা গেরারডো ক্রেমোনিসি নামে একব্যক্তি মূল আরবি 'সপ্ত-বিংশ' থেকে লেটিনে ভাষান্তরিত করেন। লেটিন সংস্করণ ১৫০১ ইংরেজিতে জার্মানির নিউরেমবোর্গ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ 'ডি ইলেমেনটিস এট অরবিবাস কয়েলিসটিবাস' নামে ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এতে সর্বমোট ২৭টা আলাদা পরিচ্ছেদ ছিলো।

জাবির ইবনে হাইয়ান

এই প্রখ্যাত মুসলিম আল-কেমিষ্টের পূর্ণ নাম হলো, আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান (আল-তুসী, আল-তারতুসী, আল-হাররানী)। অনেকের মতে তিনি একজন সূফী দরবেশও ছিলেন। ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আরবের কুফা নামক স্থান তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিলো। আরব আল-কেমিষ্টদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। মধ্যযুগে গেবের নামে যে আলকেমিষ্ট সুপরিচিত ছিলেন, এ ব্যক্তিই সেই গেবের।

আষ্ট্রল্যাব যন্ত্রের উপর তাঁর লেখা একখানা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে জাবিরের খ্যাতি যে কারণে প্রসিদ্ধ তা হলো তাঁর লিখিত আলকেমির (রসায়ন শাস্ত্রের) বই-পুস্তক যেগুলো আরবিতে প্রকাশিত হয়েছিলো। রাজ্যের বই, ভারসাম্যের ছোট গ্রন্থ, কৃপার বই, সমাহরণের বই, প্রাচ্যের পারদের বই প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর লেখক হচ্ছেন জাবির ইবনে হাইয়ান। তাঁর বই পুস্তক থেকে এটাই ধারণা করা যায় যে, রসায়ন শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী একজন গবেষক ছিলেন। ভূতাত্ত্বিক ধাতু সৃষ্টির থিওরী (তথাকথিত সালফার-পারদ থিওরী অব ধাতু), সাধারণ পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী (যেমন লেড কারবনেট; আরসেনিক ও আনটিমনি ও তাদের সালফেইত থেকে) প্রভৃতি বিষয়বস্তু তাঁরই দ্বারা আবিস্কৃত হয়।

জাবির ধাতু বিশুদ্ধকরণ, কাপড় ও চামড়ায় রং করার পদ্ধতি, ওয়াটার-প্রুফ, কাপড়ে ভারনিসকরণ, কাচ তৈরীতে মেঙ্গানিস ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার, সোনার অক্ষরে লেখার জন্য লৌহ পাইরাইটস এর ব্যবহার, এসেটিক এ্যাসিড বৃদ্ধির জন্য সিরকা পাতন পদ্ধতি (ডিসটিলেশন) প্রভৃতি মৌলিক রসায়নিক কার্যকলাপের জনক ছিলেন। নিঃসন্দেহে ইসলামী বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে জাবির ইবনে হাইয়ানের অবদান অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিরাট ছিলো। তাঁর লেখা আরবি

অনেক উৎসগুলোকে ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে তাঁর অবদানের পূর্ণ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। এ পর্যন্ত জাবির সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, তা থেকেই সহজে অনুধাবন করা যায় যে, তিনি মধ্যযুগের সর্বপ্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন।

(খ) আল-খোওয়ারিজমির যুগ

বলতে গেলে নবম শতাব্দি মূলত মুসলিম বিজ্ঞানের শতাব্দি বলা যায়। যদিও অন্যান্য শতাব্দিতে মুসলিম বিজ্ঞানের কার্যাবলী বন্ধ হয়ে যায়নি, তথাপি নবম শতাব্দির মতো ইসলামী বিজ্ঞানের এমন চরম উন্নতি আর কোনটাতে হয়নি। বাস্তবে সেকালের সত্যিকার ইসলামী সভ্যতার অদর্শের-প্রতীক ছিলেন এসব জ্ঞান-পিপাসু বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এঁদের কার্যাবলী উন্নতমানের ছিলো। এ শতাব্দির প্রথমার্ধের কথা বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানের অগ্রদূতসকল, আল-কিন্দি, আল-মুসার পূত্ররা, আল-খোওয়ারিজমি, আল-ফারগানি প্রমুখ সকলেই মুসলিম বিজ্ঞানী ছিলেন। একমাত্র ইবনে মাসাওয়া খ্রিস্টান ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনিও আরবিতে লিখেছেন।

সপ্তম আব্বাসী খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩), হারুন-উর-রশিদ থেকেও বেশী বিজ্ঞানের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বাগদাদে একটি বৈজ্ঞানিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত করেন, গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহিত ও ভাষান্তর করার ব্যবস্থা করেন এবং সব ধরনের পণ্ডিতকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করেন। যার ফলে তাঁর শাসনামলে বিশাল বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী সাধিত হয়।

আল-মামুন (৭৮৬ - ৮৩৩ খ্রিঃ)

আব্দুল্লাহ আল-মামুন ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন ও ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তারসাস নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা মহীয়ান খলিফা। তাঁর মাতা ও স্ত্রী পারস্যের নিবাসী ছিলেন। তিনি ইসলামের মুতাজিলা সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে শক্তহস্ত ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেন নি।

কুরআান শরীফ সৃষ্ট- অসৃষ্ট নয়, এই মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। যাঁরা এর বিরোধিতা করতেন, যেমন ইমাম হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, এঁদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। যদিও মুতাজিলা মতবাদ বিরোধীদেরে তিনি কঠোর হস্তে

দমন করেছিলেন, তথাপি তাঁর দরবারে সুশিক্ষিত ইহুদি-খ্রিস্টানরা আমন্ত্রিত হতেন। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনায় ইতিহাসেরই স্বার্থে তার কার্যাবলীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু এটাও সুস্পষ্টভাবে সবাইকে জ্ঞাত করা প্রয়োজন যে, খলীফা আল-মামুনের 'মুতাজিলা' মতবাদের প্রতি বিশ্বাসকে এই লেখা দ্বারা সমর্থন কিংবা এর গুণগান বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়। বিজ্ঞানের প্রতি তার অবদানকে তুলে ধরাই এ প্রসঙ্গে মূখ্য।

আল-মামুন গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করেন এবং এর জন্য বাইজান্টাইন সম্রাট লিওন দ্যা আরমেনিয়ানের নিকট একদল দূত পাঠান। সংগৃহীত গ্রীক পাণ্ডুলিপি আরবিতে ভাষান্তর করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। 'বাইতুল হিকমা' বা জ্ঞানের ঘর নামে একটি বৈজ্ঞানিক একাডেমীরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খলিফা আল-মামুন। এখানে একটা বড় পাঠাগার ও একটা মানমন্দিরও (মহাকাশ অবজারভেটরী) ছিলো। পালমিরা উপত্যকায় তিনি আরও একটি মানমন্দির তৈরি করেন। এ মানমন্দির ব্যবহারের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের ক্রান্তিবৃত্তের মাত্রা নির্ণয় করতে সক্ষম হন। গ্রহগুলোর কক্ষপথ সম্পর্কে টেবিলও তৈরী করা হয় এ দু'টি মানমন্দির ব্যবহারের মাধ্যমে।

আল-মামুন পৃথিবীর সঠিক পরিধি আবিস্কারের জন্য বিজ্ঞানীদেরে নির্দেশ দেন, এবং এর ফলে পৃথিবীর পরিধি ২০,৪০০ মাইল বলে পাওয়া যায়। পৃথিবীর একটি বড় মানচিত্র তাঁর নির্দেশে অঙ্কিত করা হয়। আল-মামুন সর্বদাই দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিৎ, ঐতিহ্যবিৎ, গাণিতিক, চিকিৎসক, জ্যোতিষবিৎ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদেরে উৎসাহ ও সাহায্য দান করতেন।

আল-কিন্দি

আবু ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে আল-সাব্বাহ আল-কিন্দি 'আরবদের দার্শনিক' নামে খ্যাত ছিলেন। খলিফা আল-মামুনের শাসনকালে বসরায় তাঁর জন্ম হয়। মুতাওয়াক্কালীর নেতৃত্বে নৈষ্ঠিক প্রতিক্রিয়ার সময় তাঁকে নির্যাতন করা হয়। এ দার্শনিক ৮৭৩ ইংরেজিতে মৃত্যুবরণ করেন।

আল-কিন্দি প্রথম এবং একমাত্র আরব জাতির প্রখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো। নিও-প্লেটোনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ্যারিস্টটলকে অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে এ জ্ঞান তাপস ২৭০ খানা বইয়ের লেখক ছিলেন, যদিও আজ এর অনেক কমসংখ্যক বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে মাত্র। তাঁর বইগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, সংগীত, ঔষধ, ফারমেসী এবং ভূগোল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি হিন্দুদের ব্যবহৃত সংখ্যার উপর চারটা বই লিখেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক গ্রীক পুস্তকাদি আরবিতে ভাষান্তরিত হয়। তাঁর লেখা দু'টি বই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। এগুলোর লেটিন নাম হলোঃ "ডি এসপেকটিবাস" ও "ডি মেডিসিনেরাম কমপোজিটেরাম গ্রাডিবাস"। প্রথম বইটির বিষয়বস্তু হলো জ্যামিতি এবং শরীরবৃত্ত-সম্পর্কীয় আলোক বিজ্ঞান, যা সাধারণতঃ ইউক্লিড ও এ্যারিস্টটলের ধারণার উপর ভিত্তি করে লেখা। দ্বিতীয় বইটিতে তিনি দেহের ও মনের ভাবভঙ্গিকে গাণিতিক উপায়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন।

আল-কিন্দি মুসলমান লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম লেখক যিনি সঙ্গীতের উপর লেখালেখি করেন, যা আজো মানুষ ব্যবহার করে থাকে। সঙ্গীতে পিচ বা সুর বাঁধার স্বরলিপির জনক হচ্ছেন আল-কিন্দি। তাঁর লেখালেখি গেরারডো ডা ক্রেমোনা নামক একব্যক্তি লেটিনে ভাষান্তর করেন। বিশিষ্ট দার্শনিক কারডানোর মতে আল-কিন্দি ছিলেন তখনকার মধ্যযুগ ও প্রাচীনকালের ১২ জন জ্ঞান তাপসের মধ্যে একজন।

ইসলামী গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

এ সময়ে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতিসাধন হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য টেবিল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গণিতের ট্রিগোনোমেট্রি শাখার প্রসার ঘটে। ভৌগোলিক আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইউক্লিডের প্রখ্যাত গ্রন্থ ইলেমেন্ট আরবিতে ভাষান্তর করেন, এবং আল-আব্বাস এ গ্রন্থের উপর আলোচনা করেন। একই সময় আবু সাঈদ আদ-দারীর জ্যামিতির উপর বই রচনা করেন।

আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ

বাগদাদে ৭৮৬ থেকে ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ বিজ্ঞানী কর্মরত ছিলেন। তিনিই ইউক্লিডের ইলেমেন্ট গ্রন্থকে প্রথমে আরবিতে তরজমা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক আলমাজেষ্ট বইটিও আরবিতে ভাষান্তরিত হয়। বাস্তবে তিনি দু'বার এ বইটি তরজমা করেন। খলিফা হারুন-উর-রশিদের সময় একবার ও খলিফা আল-মামুনের সময় আরেকবার।

আল-আব্বাস ইবনে সাঈদ

মুসলিম গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ইবনে সাঈদ খলিফা আল-মামুনের সময় বাগদাদে কর্মরত ছিলেন। ৮২৯-৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মহাকাশ পর্যবেক্ষণে তিনি সক্রিয় অঙ্কগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে দামেস্কতে অনুষ্ঠিত পর্যবেক্ষণেও যোগ দেন। ইবনে সাঈদ ইউক্লিডের ইলেমেন্টের উপর মূল্যবান আলোচনা-সমালোচনা করেন।

আবু সাঈদ আদ-দারীর

আবু সাঈদ আদ-দারীর নবন শতাব্দির প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। ৮৪৫ থেকে ৮৪৬ এর কোনও সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিও একজন মুসলমান গাণিতিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর অবদানের মধ্যে জ্যামিতির উপর লেখা একখানা পুস্তক ও পৃথিবীর মধ্যরেখা বা মেরিডিয়ানের উপর লেখা আরেকখানা বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল-খোওয়ারিজমী

এই প্রখ্যাত গণিতবিদের পূর্ণ নাম ছিলো, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খোওয়ারিজমী (খোয়ারিজমী ও খারিজমীও বলা হয়ে থাকে)। এ্যারেল সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত খোওয়ারিজম্ (বর্তমানে উজবেকিস্তানের খিবা) নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। তবে খোওয়ারিজমী নামেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ। বস্তুত

খোওয়ারিজমী নামের বিকৃত রূপই হচ্ছে আজকের অঙ্ক শাস্ত্রে (কম্পিউটার বিজ্ঞানে) ব্যবহৃত শব্দ আলগরিথিম।

খলিফা আল-মামুনের সময়ে আল-খোওয়ারিজমী কর্মরত ছিলেন এবং ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আল-খোওয়ারিজমী তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। মধ্যযুগে অঙ্ক শাস্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার তাঁর মতো আর কেউই করতে পারেননি। পাঠীগণিত ও বীজগণিতের উপর তাঁর লেখা বই পুস্তক মূল আরবি ভাষার কপিগুলো আজো পাওয়া যায়নি, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দিতে লেটিনে ভাষান্তরিত সংস্করণ এখনো আছে। আল-খোওয়ারিজমী এই পুস্তকগুলোর মাধ্যমে মুসলিম আরব-অনারব ও ইউরোপীয়দেরকে ভারতে আবিষ্কৃত সংখ্যা পদ্ধতি জানিয়ে দেন যা আজো পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিনি এ্যালজেবরা বা বীজগণিতেরও জনক ছিলেন। শূন্যসহ ১০টি সংখ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি বীজগণিতের বহু সমীকরণের সমাধান করে গিয়েছেন। তাঁর দ্বারা সৃষ্ট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল টেবিল ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে আবেলার্ড অব বাথ নামক একজন ইংরেজ লেটিনে তরজমা করেন। এসব টেবিলে শুধু সাইন ফাংশনই ছিলো না, এতে টানজেন্ট ফাংশনও ছিলো। আল-খোওয়ারিজমী টলেমির জ্যামিতিকেও সংস্কার করেন।

সহল আল-তাবারি

তাঁর অন্য নাম হলো রাব্বান আল-তাবারি, যার অর্থ হচ্ছে- তাবারিস্তানের রাবি। নবম শতকের শুরুতে এ ইহুদি বিজ্ঞানী জীবিত ছিলেন এবং তিনিই টলেমির আলমাজেষ্ট গ্রন্থটিকে প্রথমে আরবি ভাষায় তরজমা করেন।

হামিদ আল-নাহাওয়ান্দি

এই মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো, হামিদ ইবনে মুহাম্মদ আল-নাহাওয়ান্দি এবং জুন্দিশপুর নামক স্থানে ৮০০ খ্রিস্টাব্দে কর্মরত ছিলেন। তিনি

জুন্দিশপুরে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর 'মুসতামিল' নামে একটি বিশেষ ডাটা (তথ্য) টেবিল তৈরী করেন।

হাবাশ আল-হাসিব

হামিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মারওয়াজি হাবাশ আল-হাসিব, বাগদাদে কর্মরত ছিলেন এবং ৮৬৪-৮৭৪ এর কোন এক সময়ে ইন্তেকাল করেন। আল-হাসিব শব্দের অর্থ হচ্ছে হিসাবী বা হিসাবকারক। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে এ ব্যক্তি একজন গাণিতজ্ঞ ছিলেন। আল-মামুন ও আল-মুনতাসিমের দরবারে তিনি কাজ করেন। হিন্দুদের পদ্ধতি অবলম্বন করে একটি টেবিলসহ তিনি মোট তিনটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের টেবিল তৈরী করেন।

ইসলামী চিকিৎসা বিদ্যা বা ঔষধবিজ্ঞান

চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অতুলনীয়। নিম্নে এ শাস্ত্রের সাথে জড়িত বহু বিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা হলো।

ইবনে শাহদা

বাগদাদের নিকটে আল-খার্ক নামক স্থানে এ বিজ্ঞানী নবম শতাব্দির প্রথমার্ধে কর্মরত ছিলেন। বহু গ্রীক লেখা তিনি আরবি ও সিরিয়াক ভাষায় তরজমা করেন। গ্রীক হিপোক্রিটাসের লেখা তিনি আরবিতে ভাষান্তর করেন এবং গ্যালেনের লেখালেখি সিরিয়াক ভাষায় তরজমা করেন।

জিব্রিল ইবনে বাখতিসু

এ প্রখ্যাত ডাক্তার খলিফা হারুন-উর-রশিদ ও আল-মামুনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। ৮২৮-৮২৯ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক সময়ে এ বিজ্ঞানী মৃত্যুবরণ করেন। জিব্রিল ইবনে বাখতিসু খ্রিস্টান ছিলেন। তিনি ডাক্তারীর উপর একাদিক পুস্তক রচনা করেন এবং তাঁর ধারণা পরবর্তীতে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে

এ বিষয়ের উপর। জিব্রিল ইবনে বাখতিসু, বাগদাদের প্রখ্যাত বাখতিসু পরিবারের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং বেশ কষ্ট স্বীকার করে তিনি গ্রীকদের চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন।

সালমাওয়াই ইবনে বুয়ান

নেষ্টরিয়ান একজন খ্রিস্টান ডাক্তার ছিলেন ইবনে বুয়ান, যিনি আল-মামুন ও আল-মুনতাসিমের শাসনামলে বাগদাদে জীবিত ছিলেন। ৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি হুনাইনকে গ্যালেনের 'মেথডাস মেডেন্ডি' ভাষান্তর করতে সাহায্য করেন ও পরে হুনাইনের কার্যাবলীর উপর উৎসাহ দান করেন।

ইবনে বুয়ান, ইবনে মাসাওয়াই এর সাথে বৈজ্ঞানিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন।

ইবনে মাসাওয়াই

লেটিন ভাষায় তিনি মিসু মেজর নামে সুপরিচিত। তবে তাঁর প্রকৃত নাম হলো- আবু জাকারিয়া ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াই। তিনি জুনদিশপুর নিবাসী একজন ঔষধবিক্রেতার পূত্র ছিলেন। বাগদাদে গমন করে মাসাওয়াই, বকতিয়াসুর নিকট পড়াশুনা করেন। ৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সামারা নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিও একজন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ডাক্তার ছিলেন এবং আরবি ও সিরিয়াক ভাষায় লেখালেখি করেন। তিনি ইবনে ইসহাকের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু গ্রীক বই-পুস্তক আরবি ও সিরিয়াক ভাষায় তরজমা করা হয়। খলিফা আল-মুনতাসিম তাঁকে বানর সংগ্রহ করে দিতেন, কেটে মেডিক্যাল পরীক্ষা করার জন্য। এ্যানাটমি ও মেডিক্যাল বিষয়ে এ ডাক্তার বহু লেখালেখি করেছেন। এসব লেখা মধ্যযুগে চিকিৎসকদের ব্যবহারের জন্য খুব বেশী প্রয়োজনীয় ছিলো।

(গ) আর-রাজির যুগ

আব্বাসী খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরে মুক্তমনে পূর্ণ নিরাপত্তায় কাজ করতে উৎসাহিত করতে থাকেন তাঁর পূর্বসুরিদের মতো। কুরআন শরীফ গবেষণার জন্যও দাউদ আয-যাহিরী একটি নতুন ধার্মিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। কুরআন শরীফের আক্ষরিক ব্যাখ্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে। তবে এ প্রচেষ্টা স্থায়ী ছিলো না।

ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুসলিম চিন্তাবিদরা নতুন নতুন বই প্রকাশ করেন ইসলামী মৌলিক বিষয়বস্তুর উপর, যার ভিত্তি ছিলো থিওরিটিক্যাল। একই সময় মিশরের প্রখ্যাত দরবেশ ঝুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুফিতত্ত্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি প্রকাশ করেন।

আল-মাহানি

পারস্য দেশের কিরমানের মাহান নামক স্থানে আবু আব্দুল্লাহ আল-মাহানির জন্ম হয়। তিনি ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কর্মরত ছিলেন এবং ৮৭৪-৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে মারা যান। তিনি একজন গাণিতিক ছিলেন, মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের উপর লেখালেখি করেন। তিনি ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসের উপর আলোচনা-সমালোচনা করেন এবং ইসহাক ইবনে হুনাইনের দ্বারা ভাষান্তরিত বই-পুস্তকের সংস্কার করেন।

হামিদ ইবনে ইউসুফ আল-মিশরী

মিশরের আবু জাফর হামিদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ইব্রাহিম আদ-দায়া আল-মিশরী হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দিতে মিশরে কর্মরত ছিলেন। খ্রিস্টীয় ৯১২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মিশরে তুলুনী শাসকদের জন্য তিনি কাজ করেন। তাঁর লেখালেখির মধ্যে টলেমির সেন্টিলোকুইয়াম ও প্রপরশন এর উপর একটি বই উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বইটি পরবর্তীতে ইউরোপীয় গণিতে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে।

আন-নাইরিজি

পারস্যের সিরাজ নামক স্থানে এ গাণিতিকের জন্ম হয়। তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবু-ই-আব্বাস আল-ফজল ইবনে হাতিম আন-নাইরিজি। বাগদাদের খলিফা আল-মুক্তাদিরের সময় তিনি কর্মরত ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর বেশ কিছু কাজ তিনি করে গেছেন এবং মুক্তাদিরের জন্য বায়ুমণ্ডলের উপর একখানা বইও লিখেন। ইউক্লিড ও টলেমির উপর তিনি অভিমত লিখেন। অ্যাস্ট্রলেবের উপর একখানা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লেখক হলেন আন-নাইরিজি, যেটি অনেকের মতে এ বিষয়ের উপর আরাবী ভাষায় প্রকাশিত প্রধান বই।

তাবিত ইবনে কুররা

ইরাকের হারান নামক স্থানে আবু হাসান তাবিত ইবনে কুররা মারওয়ান আল-হারানি এর জন্ম হয় ৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বাগদাদে কাজ করেন এবং ৯০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে কুররা ডাক্তার, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গাণিতিক ছিলেন এবং গ্রীক ও সিরিয়াক থেকে তিনি বহু মূল্যবান বই আরবি ভাষায় তরজমা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাগদাদে ভাষান্তর করার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যেখানে তাঁর নিজস্ব পরিবারের অনেকেই কর্মরত ছিলেন। তিনি সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে গবেষণামূলক লেখা প্রকাশ করেন।

ইউসুফ আল-খুরী

খলিফা আল-মুকতাফিরের সময়ে এই ডাক্তার ও গাণিতিক জীবিত ছিলেন। তিনিও অন্যান্যদের মতো একজন অনুবাদক ছিলেন। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তিনি সিরিয়াক থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন। তিনি আরকিমিডিস ও গ্যালেনের বই-পুস্তক ভাষান্তর করেন।

হামিদ ইবনে আলী

আবু-ই-রাবি হামিদ ইবনে আলী আল-ওয়াসিতি হলো এই ইরাকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম। নবম শতাব্দির শেষের দিকে তিনি কর্মরত ছিলেন। ইবনে ইউনুসের মতে আলী ইবনে ঈসা ও হামিদ আষ্ট্রলেবের প্রাথমিক নির্মাতা ছিলেন। এবং তাঁদেরে তিনি টলেমী ও গ্যালেনের সাথে তুলনা করে দেখেছেন। এতে এটা সহজেই বুঝা যায় যে, তখনকার মুসলমানরা ভাল যন্ত্রপাতির উপর কতটুকু গুরুত্ত্ব দিতেন।

সবুর ইবনে সহল

এই খ্রিস্টান চিকিৎসক জুনদিশপুরে কাজ করেন ও ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। মেডিক্যাল বিজ্ঞানের উপর ২২ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন এই বিজ্ঞানী। ইবনে আল-তিলমিজের নতুন বই প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মেডিসিনের জন্য এ বইটি আদর্শ হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

ইয়াহইয়া ইবনে সারাফিন

দামেস্ক শহরে নবম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে এই খ্রিস্টান চিকিৎসক কর্মরত ছিলেন। দু'টি মেডিক্যাল পুস্তকের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ, এগুলোর মধ্যে একটির নাম ছিলো কুন্নাস আর অপরটির নাম পানডেকটস। শেষোক্ত বইটি মূল সিরিয়াক থেকে আরবিতে তরজমা করা হয় এবং পরবর্তীতে এর গুরুত্ত্ব বিবেচনা করে লেটিনে ভাষান্তর করা হয়। এ বইটি মধ্যযুগে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যার মধ্যে রোগের ঔষধের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিলো।

আর-রাজি

লেটিনে তাঁকে রাঝিজ বলা হয়, কিন্তু মধ্যযুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রধান এই ব্যাক্তিত্বের পূর্ণ নাম হলো, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর-রাজি। বর্তমান ইরানের তেহরানের নিকটে রায় নামক স্থানে নবম শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রায় ও বাগদাদে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। ৯২৩ বা ৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো- বলতে গেলে এ শাস্ত্রের জনক ছিলেন এ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন, এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি হলো- "কিতাব আল-হাউই", "কিতাব আল-মানসুরী" ও "কিতাব আল-জাদারি ওয়াল হাসবা"। কিতাব আল-হাউই ছিলো এক বিরাট আকারের জ্ঞানপঞ্জী যেখানে গ্রীক ও হিন্দুদের জ্ঞানের অনেককিছু সংগ্রহিত করা হয়, বইটিতে রাজির নিজস্ব বৈজ্ঞানিক চিন্তাদ্বারাও প্রকাশ পায়। কিতাব আল-মানসুরীর মধ্যে বিশেষ করে গ্রীক বিজ্ঞানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ বইটি ১০ খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছিলো। কিতাব আল-জাদারি ওয়াল হাসবা বইয়ে আর-রাজি বসন্ত ও হাম রোগের কারণ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই বইটিকে "মুসলিম মেডিসিনের সর্বাপেক্ষা পুরাতন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ধাত্রীবিদ্যা, গাইনিকোলজি, চক্ষু চিকিৎসা প্রভৃতি মেডিসিনের বহু শাখার জনক ছিলেন, আর-রাজি। রসায়ন শাস্ত্রের উপর অনেক বই তিনি লিখেছিলেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে রসায়নিক পরিমাপ ও পরীক্ষার যন্ত্রপাতির একটা তালিকা আছে যেখানে মোট ২৫টি ভিন্ন যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে।

হুনাইন ইবনে ইসহাক

তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবু জায়েদ হুনাইন ইবনে ইসহাক আল-ইবাদি। ৮০৯ থেকে ৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিলো বলে ধারণা করা হয়েছে। প্রথমে জুনদিশপুর ও পরে বাগদাদে তিনি কাজ করেন। ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হুনাইন ইবনে ইসহাক একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ইবনে মাসাওয়ার নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন, এবং বনী মুসা নামক আরব বংশদ্ভুত একব্যক্তি গ্রীক লেখাকে আরবিতে তরজমা করার জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেয়। মেডিক্যাল বইয়ের অনুবাদের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন। তাঁর অনুবাদের মধ্যে হিপোক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল, ডাইওসকরাটিস এবং টলেমি প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানীদের বই-পুস্তক অন্তর্গত ছিলো। হুনাইনের এসব অনুবাদের গুরুত্ত্ব এতো বেশী ছিলো যে, এসব কার্যের ফলেই মুসলিম জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

কুস্তা ইবনে লুকা আল-বালাবাক্বি

সিরিয়া দেশের বালাবেক বা হিলিওপলিস নামক স্থানে এই গ্রীক বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর জন্ম হয়। ৯১২ খ্রিস্টাব্দে রমেনিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। সিরিয়াক ভাষায় গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বহু পুস্তক তিনি অনুবাদ করেন, এঁদের মধ্যে ডাইওফানটস, থিওডসিওস, অটোলাইকস, হিপসাইকলস, রিষ্টারকস এবং হিরন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইউক্লিডের উপর অভিমত ও বৃত্তাকার আষ্ট্রলেবের উপর বই প্রকাশ করেন।

জাবির ইবনে সিনান

জাবির ইবনে সিনান আল-হারানি নামক এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যায়নি। তবে এ ব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারক ছিলেন। এবং তিনিই হয়ত সর্বপ্রথম বৃত্তাকারের আষ্ট্রলেব তৈরী করেছিলেন।

আল-বাতানি

এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম বেশ লম্বা- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল-বাতানি আল-হারানি আস-সাবি। ৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে হারান নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। ফোরাতের নিকটবর্তী আল-রাক্কা নামক জায়গায় তিনি কাজ

করেন এবং ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সামারায় মারা যান। তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রধান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ইসলামের একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন আল-বাতানি। তিনি বিজ্ঞানের উপর বহু লেখালেখি করেন তবে তাঁর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে গ্রন্থ ছিলো, সেটির লেটিন নাম হলো "ডি সাইনটিয়া"। এতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অসংখ্য তথ্যাবলী সংগ্রহিত করা হয়েছিলো। এ বইটি রেঁনেসার পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন। ৮৭৭ এর পর থেকে তিনি মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেন অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে। ৮৮০-৮৮১, এই বছরে তারকাদের অবস্থানের একটি টেবিল তিনি তৈরী করেন।

আবু বকর

লেটিনে তাঁর নামকে "আলবুবাতার"-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে, তবে তাঁর আসল নাম হলো, আবু বকর আল-হাসান ইবনে আল-খাসিব। এই মুসলিম বিজ্ঞানী পারস্য দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং আরবি ও ফার্সী ভাষায় লেখালেখি করেন। মধ্যযুগে তাঁর লেখা একটি বই যার লেটিন নাম হলো, "ডি নেটিভিটাটিবাস", অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বইটির বিষয়বস্তু ছিলো জ্যোতিষ শাস্ত্র।

(ঘ) আল-মাসুদের সময়

সমগ্র দশম শতাব্দি ধরে মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চা চলতে থাকে পূর্বের মতোই। বস্তুত এ সময়ে বিজ্ঞান চেতনা মুসলমানদের মধ্যে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র বিশিষ্ট একটি বিজ্ঞানমহলে সীমাবদ্ধ ছিলো না; সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিজ্ঞানের চেতনা একটি স্বাভাবিক মুসলিম ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। এ সময় পাশ্চাত্য জগতেও একটা ধারণা জন্মে যে, মুসলমানদের নিকট বিজ্ঞানের সবকিছু জমা আছে, সুতরাং তাদের নিকট থেকে পশ্চিমা দেশসমূহকে বিজ্ঞান-শিক্ষা করতে হবে। তাছাড়া নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও নতুন ধারণা এখন থেকে শুধুমাত্র আরবি ভাষায় প্রকাশ করা হয়। সুতরাং বিজ্ঞান শিখতে হলে আরবি ভাষা শিখে একমাত্র আরবদের নিকটই শিখতে হবে; এমন একটা ধারণা সমগ্র পশ্চিমে জাগ্রত হয়ে ওঠে দশম শতাব্দির শুরু থেকেই।

বিজ্ঞানের ভাষা তখন কুরআনের ভাষা- আরবি ছিলো। আর বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। পশ্চিমে মুসলিম স্পেনে উমাইয়্যা খলিফা আব্দুর রাহমান-২য় বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট হন। যার ফলে বিজ্ঞানের চেতনা পশ্চিমে বিস্তার লাভ করতে সহায়তা করে। তবে তখনও ইসলামী বিজ্ঞানের অগ্রগতি মূলত প্রচ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

ইবনে আল-আদমী

এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী দশম শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞানচর্চা করেন। তিনি মহাকাশে তারকাদের অবস্থান, দূরত্ব ও ঔজ্জ্বল্যতা সম্বলিত ডাটা টেবিল তৈরী করতে শুরু করেন যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ছাত্র হিসাম আল-মাদানি সম্পূর্ণ করেন। এ টেবিল ৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'নুজুম আল-ইক্দ' নামে।

ইবনে মাজুর

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবুল কাশিম আব্দুল্লাহ ইবনে মাজুর আল-তারিক। তাঁর জন্মস্থান ছিলো তুর্কীর ফারগানা নামক জায়গায় এবং ৮৮৫-৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান চর্চায় জড়িত ছিলেন।

মুসলমান মহাকাশ পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ইবনে মাজুর প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি, তাঁর পুত্র ও একজন ক্রীতদাস (নাম; মুফলিহ) মিলে বিজ্ঞানের গবেষণা করতেন। তাঁর লেখা বই-পুস্তক ইবনে ইউনুস নামে আরেকজন বিজ্ঞানী সংগ্রহ করেছিলেন।

আবু কামিল

এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম পড়তে অনেক সময় লাগবে! আবু কামিল সুজা ইবনে আসলাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুজা আল-হাসিব আল-মিসরী, এই হলো তাঁর পূর্ণ নাম। তাঁর নামের শেষোক্ত অর্থ হলো "মিশরীয় হিসাবকারক"। আল-খোওয়ারিজমীর পরে তিনি কর্মরত ছিলে, এবং ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এ গাণিতিক আল-খোওয়ারিজমীর বীজগণিতের সংস্কার করেন।

এ্যালজেবরার ক্ষেত্রে গুণ ও ভাগ অঙ্ক করার পদ্ধতি তিনি দেখিয়ে দেন। তাঁর এসব গাণিতিক উপায় ও থিওরী পরবর্তীতে আল-কাকী ও লেনারডো ডি পিসা নামক প্রমুখ বিজ্ঞানী ব্যবহার করেন।

আবু উসমান

এই গণিতজ্ঞের পূর্ণ নাম হলো, আবু উসমান সাঈদ ইবনে ইয়াকুব আল-দামেস্কি। তাঁর জন্ম সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কতে। খলিফা আল-মুকতাদিরের সময় বাগদাদে তিনি কর্মরত ছিলেন। এ্যারিষ্টটল, ইউক্লিড ও গ্যালেনের বই-পুস্তক তিনি তরজমা করেন।

গ্যালেনের যে দু'টি বই তিনি অনুবাদ করেন এগুলো ছিলো, মানুষের মেজাজের উপর লেখা একটি আর অপরটি নাড়ির স্পন্দনের উপর লেখা। এতে বুঝা যায় যে, মেডিক্যাল বিজ্ঞানেও আল-উসমানের বিশেষ জ্ঞান ছিলো যার ফলে বাগদান, মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা শরীফের হাসপাতালগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিলো।

আল-বলখী

এই গাণিতিক ও ভৌগোলিকের জন্ম হয়, বলখের সালিস্থান নামক স্থানে। তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবু জায়েদ হামিদ ইবনে সাহল আল-বলখী, এবং ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি আল-কিন্দির শিষ্য ছিলেন। এই বিজ্ঞানী বহু পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন। তাঁর লেখা ভৌগোলিক ম্যাপের বইগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইব্রাহিম ইবনে সিনান

তিনি ছিলেন তাবিত ইবনে-কুররার নাতি। এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো, আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে সিনান ইবনে তাবিত ইবনে কুররা। তাঁর পিতার নাম সিনান, তিনিও একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। ইব্রাহিম ইবনে সিনান জ্যামিতি শাস্ত্রের "কনিক সেকশন" ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর লিখিত "আলমাজেষ্ট" এর উপর অভিমত ও সমালোচনা করেন।

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতির উপরও বহু গবেষণামূলক বই লিখেন। গণিতের "কোয়াড্রেচার অব দ্যা পারাবলা" এর সমাধান তিনি উপস্থাপন করেছিলেন যা ছিলো আরকিমিডিসের সমাধানের তুলনায় অনেক সহজ। বস্তুত এ গুরুত্বপূর্ণ সমাধানটি গণিতের উচ্চতর শাখা কালকুলাস আবিষ্কৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য ছিলো।

আল-ইমরানী

আলী ইবনে হামিদ আল-ইমরানীর জন্ম হয় ইরাকের মসুল নামক স্থানে। ৯৫৫-৯৫৬ তে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলে জানা যায়।

আবু কামিলের লেখা বীজগণিতের উপর তিনি মতামত প্রকাশ করেন এবং আরও অনেক বই লিখেন। তাঁর একটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই- 'ভাল দিন সাব্যস্ত করার পদ্ধতি', সাবাসোরডা নমক একজন স্পেনিস, ১১৩১ খ্রিস্টাব্দে বারসিলনায় অনুবাদ করেছিলেন যা পরবর্তীতে ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইবনে ওয়াসিয়া

এই গবেষকের পূর্ণ নাম হলো আবু বকর হামিদ ইবনে আলী ইবনে আল-ওয়াসিয়া আল-কালদানি। তাঁর জন্ম হয় ইরাকে ৯১২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে। তাঁর গবেষণা ছিলো আলকেমী ও অজ্ঞাত (প্রত্যক্ষিত আশ্চর্য ঘটনাবলী) বিষয়বস্তুর উপর। ৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা এ বই, "কিতাব আল-ফালাহাল নাবাতিয়া" নামে প্রকাশিত হয়। এ বইটিতে তিনি প্রাক-ইসলামী সভ্যতার উপর আলোচনা করেন। এছাড়া এ পুস্তকে কৃষিব্যবস্থা ও অন্ধবিশ্বাসের উপর মূল্যবান তত্ত্ব সম্বলিত করা হয়।

ইসহাক আল-ইসরাঈলী

এই ইহুদি বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো, আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে সুলাইমান। তাঁর জন্ম হয় মিশরে এবং টুনিসিয়ার কুয়াইরাওয়ান নামক স্থানে কর্মজীবন অতিবাহিত করে সেখানেই ৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এ বিজ্ঞানী পেশাগত দিক দিয়ে দার্শনিক ও ডাক্তার ছিলেন। ইহুদিদেরে গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্য তিনিই প্রথমে সচেষ্ট হন।

আল-ইসরাঈলী, উমাইয়্যা খলিফা, উবাইদুল্লাহ আল-মাহদী-এঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন। খলিফার নির্দেশে তিনি একাধিক বই লিখেন মেডিক্যাল বিজ্ঞানের উপর। তাঁর লেখা প্রধান প্রধান বইগুলো হলোঃ "কিতাব আল-হুম্মায়াত"- জ্বরের উপর লেখা, "কিতাব আল-বাউল"- প্রস্রাব বা ইউরিন্যাল সিষ্টেমের উপর লেখা এবং "কিতাব আল-ইসতিকসাত"- পদার্থের উপর লেখা।

আল-ইসরাঈলী ছিলেন প্রথম ইহুদি দার্শনিক যিনি বিজ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করে অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এ পদ্ধতি মূলত এ্যারিষ্টটেলিয়ান ছিলো, যা মুসলমানদের দ্বারা সংস্কার করা হয়।

(ঙ) আবু-ই-ওয়াফার যুগ

দশম শতাব্দির এ দ্বিতীয়ার্ধের যুগে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বিজ্ঞানের চেতনা ছিলো আরও উন্নততর ও সুদূরপ্রসারী। এ সময়ের পূর্বেই খোওয়ারিজমি "বিজ্ঞানের চাবিকাঠি" বইটি প্রকাশ করে বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথকে প্রশস্ত করে দেন। এখন বিজ্ঞানের উপর গবেষণা বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র মুসলমানদের হাতেই হচ্ছিল। অঙ্ক শাস্ত্রে মুসলমানরা তখন একচ্ছত্রভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এটা বেশ প্রয়োজনীয়ও ছিলো, কারণ অঙ্কই হচ্ছে যাবতীয় বিজ্ঞানের "জননী"।

অঙ্ক ছাড়া বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাবে। মুসলমানরা অঙ্ক শাস্ত্রের গুরুত্ব ভাল করে জানতেন, তাই আমরা দেখতে পাই যে, এ শাস্ত্রের উন্নয়নে তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্ব করে অগ্রসর হয়েছেন। গণিতকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করে তাঁরা গবেষণা করেছেন। তিন ধরনের গাণিতিকরা আলাদাভাবে এ শাস্ত্রের উপর ষ্ট্যাডি করেনঃ পাটীগণিত বিশেষজ্ঞ, বীজগণিত বিশেষজ্ঞ ও জ্যামিতি বিশেষজ্ঞ।

মুতাহহার ইবনে তাহির

মক্কা নগরীতে মুতাহহার ইবনে তাহির আল-মুকাদ্দিসির জন্ম হয়। সিজিস্থানের বাস্ত নামক স্থানে তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনি বিশ্বকোষ লেখক ছিলেন, "কিতাব আল-বাদওয়াত তারিখ" অর্থাৎ সৃষ্টি ও ইতিহাসের পুস্তক, বইটি তাঁরই লেখা। এ বইটিতে লেখক সমসাময়িক পৃথিবীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হিন্দুদের দ্বারা প্রকাশিত একটি নাম্বারঃ ৪৩২,০০,০০,০০০ নিয়ে তিনি গবেষণা করেন, যা ছিলো পৃথিবীর বয়েসের একটি হিসাব।

আবু জাফর আল-খাজিম

এই ব্যক্তির নামের (আল-খাজিম) অর্থ হলো, কোষাধ্যক্ষ। তাঁর জন্ম হয় ইরানের খোরাসামে এবং ৯৬১ থেকে ৯৭১ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে মৃত্যু হয়।

পেশাগত দিক দিয়ে তিনি গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। আল-খাজিম ইউক্লিডের দশম পুস্তকের উপর অভিমত প্রকাশ করেন এবং গণিতের উপর আরও বহু বই-পুস্তক লিখেন। তিনি গাণিতিক বহু সমীকরণেরও সমাধান করেন।

নাফিজ ইবনে ইয়েমনী

এই বিজ্ঞানী একজন খ্রিস্টান পাদ্রী ছিলেন তবে তিনি বুয়াহি সুলতান আদ-দৌলার জন্য কাজ করেন। ৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ইবনে ইয়েমনের মৃত্যু হয়। তিনি একজন অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন এবং ইউক্লিডের ইলেমেন্টের দশম বই তিনি আরবিতে ভাষান্তর করেন।

আবুল ফাতহা

ইসফাহানে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দের দিকে আবুল ফাতহা মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ইবনে ফাজল আল-ইসফাহানি কর্মরত ছিলেন। পারস্য মুসলিম এই গাণিতিক অঙ্ক শাস্ত্রের উপর বহু গবেষণা করেন। "কনিক্স" নামে গণিতের শাখায় তাঁর অবদান ছিলো উল্লেখযোগ্য।

আল-কুহী

এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো, আবু সহল উইজান ইবনে রুস্তুম আল-কুহী। তাঁর জন্ম হয় তাবারিস্তানে এবং ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে কাজ করেন বলে জানা যায়। একজন গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বহু বই-পুস্তক লিখেন। সুলতান শরাফ উদ-দৌলা একটি মানমন্দির তৈরী করেছিলেন। তিনি এ মানমন্দিরের দায়িত্ব আল-কুহীকে দিয়েছিলেন।

গণিতে তিনি আরকিমিডিস ও এ্যাপোলনের সমীকরণ সমস্যার সমাধান করেন যার ফলে দ্বিতীয় ডিগ্রি থেকে উচ্চতর ডিগ্রি সমীকরণের সূত্রপাত ঘটে। তিনি এসবের কিছুটা সমাধানসহ আরও বেশী সমাধানের পথ উন্মোচন করেন।

আল-সিজ্জি

আবু সাঈদ হামিদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল জলিল আল-সিজ্জি ছিলেন সিজিস্থানের অধিবাসী। তিনি ৯৫১ থেকে ১০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই বিশিষ্ট গাণিতিক, "কনিক সেকসন" ও বৃত্তের উপর গবেষণা করেন। তিনি এ ক্ষেত্রে আগেকার দিনের পদ্ধতি পরিবর্তন করে শুধুমাত্র জ্যামিতির মাধ্যমে সমাধান করতে সচেষ্ট হন, যা পরবর্তীতে সবাই গ্রহণ করেন।

আব্দুর রাহমান আস-সূফী আর-রাজি

মুসলিম বিশ্বের এই প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো- আবুল হাসান আব্দুর রাহমান ইবনে উমর আস-সুফী আর-রাজি। রায় নামক স্থানে ৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় ও ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

আস-সুফী সুলতান শরাফ উদ-দৌলার বন্ধু ও মাষ্টার ছিলেন। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থের নাম হলো "স্থির তারকাদের পুস্তক", যা ছিলো মুসলিম বিশ্বে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের তিনটি প্রধান গ্রন্থের একটি। বাকি দু'টির লেখক ছিলেন যথাক্রমে, ইবনে ইউনুস (একাদশ শতাব্দির প্রথমার্ধে লিখিত) ও উলুগ বেগ (পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথমার্ধে লিখিত)।

ইবনে আল-আলম

সুলতান শরাফ উদ-দৌলার দরবারে এই মুসলমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কাজ করেন। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে তাঁর মৃত্যু হয়। এ বিজ্ঞানী অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মহাকাশ পর্যবেক্ষণে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত তারকাদের ডাটা টেবিল পরবর্তী দুই শতাব্দি পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

আস-সাগানি

তাঁর প্রকৃত নাম হলো, আবু হামিদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাগানি আল-আস্তুরলাবি। তিনি মার্ভ এর নিকটে সাগান নামক স্থানে "আষ্ট্রলেব" তৈরী করতেন বলে তাঁর নামের শেষে "আল-আস্তুরলাবি" কথাটা সংযুক্ত হয়। ৯৯০-তে তাঁর মৃত্যু হয় বাগদাদে। তিনি একজন গাণিতিক ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক ছিলেন। তিনি শরাফ উদ-দৌলার পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে কাজ করেন, এবং হয়ত এ পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারকও ছিলেন।

আবুল ওয়াফা

কুহিস্তানের বুজঝান নামক স্থানে এই প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে বিজ্ঞানচর্চা করেন ও এখানেই ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আবুল ওয়াফা ছিলেন গ্রীক থেকে আরবিতে বৈজ্ঞানিক বই-পুস্তক অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লিখিত অনেক বই এখন হারিয়ে গেছে, তবে "কিতাব আল-কামিল" (সম্পূর্ণ পুস্তক), "জিঝ আল-ওয়াদি" (একটি ব্যবহারিক পাটীগণিত) ও "কিতাব আল-হানডাসা" (ব্যবহারিক জ্যামিতি) প্রভৃতি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গণিতের ট্রিগোনোমেট্রি শাখায়ও তাঁর অনেক অবদান আছে।

আল-খুজানদি

এই বিজ্ঞানীর প্রকৃত নাম হলো, আবু মুহাম্মদ হামিদ ইবনে আল-খিজির আল-খুজানদি। তিনি মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর কাজ করেন। ১০০০ ইংরেজিতে তাঁর মৃত্যু হয়। গণিত শাস্ত্রের উপরও এ বিজ্ঞানী কাজ করেন এবং দু-চারটা নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন।

আবু নাসির

তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবু নাসির মনসুর ইবনে আলী ইবনে ইরাক। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আল-বিরুনীর মাষ্টার ছিলেন এই মুসলিম গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। গণিত শাস্ত্রে তিনি অনেক কাজ করেন। এই বিজ্ঞানীর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ঠিক জানা যায়নি, তবে ১০০৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি কর্মরত ছিলেন।

মাসলামা ইবনে হামিদ

মুসলিম স্পেইনের রাজধানী কুর্দোভা শহরে দশম শতাব্দির শেষার্ধে এই গাণিতিক জীবিত ছিলেন। ১০০৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। স্পেনীয় মুসলমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম।

তিনি আল-খোওয়ারিজমির মহাকাশ টেবিলের সংস্কার করেন। এ টেবিলটি মাসলামা ফার্সী থেকে আরবিতেও অনুবাদ করেন। তিনি আষ্ট্রলেব যন্ত্রের উপরও লেখালেখি করেন যা পরবর্তীতে লেটিনে ভাষান্তরিত হয়। আলকেমী শাস্ত্রের উপর “রুবাত আল-হাকিম” ও “গাইয়াত আল-হাকিম” নামে তিনি দু’টি বই লিখেন।

আল-ক্বাবিছি

অবুল ছাকার আব্দুল আজিজ ইবনে উসমান ইবনে আলী আল-ক্বাবিছি নামক এই বিজ্ঞানী আল-ইমরানির একজন ছাত্র ছিলেন ও মসুল নামক স্থানে কাজ করেন। ৯৫৫-তে তাঁর মৃত্যু হয়। সুলতান সয়েফুদ-দৌলার দরবারেও তিনি বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেন। আল-ক্বাবিছি একজন প্রখ্যাত মুসলিম জ্যোতিষি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর লেখা পুস্তক; “আল-মাদকাল ইলা সিনাতান নুজুম” বা “জ্যোতিষ শাস্ত্রের কলাকৌশলের উপর একটি উপক্রমণিকা” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বইটি লেটিনে অনুদিত হয়েছিলো। রংধনুর উপর একটি সুন্দর কবিতাও এই বিজ্ঞানী লিখেছিলেন বলে জানা যায়।

রাবি ইবনে জায়িদ আল-উসকোফ

আল-উসকোফ অর্থ হলো বিশপ। তিনি স্পেনের কুর্দোভা শহরে একজন খ্রিস্টান বিশপ ছিলেন। ৯৬১ ইংরেজিতে আল-হাকাম দ্বিতীয়-এঁর দরবারে বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনি আরবি ভাষায় লিখে গেছেন। কিতাব আন-নওয়া বা "সময়ের বিভাজ্য এবং বস্তুর উপকার" নামে একটি ক্যালেণ্ডার আল-হাকামের প্রতি তিনি উৎসর্গ করেন।

হামিদ আত-তাবারি

তাবারিস্তানের আবুল হাসান হামিদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তাবারি সুলতান রুকন-উদ-দৌলার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন ৯৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি ১০ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিরাট পুস্তক লিখেন। এ পুস্তকটির আরবি নাম হলো- "কিতাব আল-মুয়াল্লাজা আল-বুকরাতিয়া"।

আলী ইবনে আব্বাস আল-মাজুসি (ম্যাজিয়ান)

এ প্রখ্যাত চিকিৎসকের নাম থেকে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি জোরোস্তার ধর্মাবলম্বী ছিলেন- আল-মাজুসি অর্থ এটাই। পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত হওয়াজ নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ সময়ের তিনজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মধ্যে আল-মাজুসি একজন ছিলেন। খলিফা আব্দুদ-দৌলার জন্য "কিতাব আল-মালিকি" বা "বাদশাহী পুস্তক" নামে চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি বিশ্বকোষ লিখেছিলেন। এ পুস্তকটি আর-রাজির "হাওই" থেকে অনেকটা ছোট আকারের ছিলো, তবে আলী ইবনে সিনার "কানুন" থেকে উন্নতমানের ও আরও ব্যবহারিক ছিলো। কিতাব আল মালিকি সর্বমোট ২০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিলো। পুস্তকের প্রথমার্ধে চিকিৎসা শাস্ত্রের থিওরী নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ার্ধে ঔষধের ব্যবহারিক উপায়-অবলম্বনের উপর বিস্তারিত লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দেহের সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা প্রণালীর মৌলিক ধারণা, চিত্তাকর্ষক ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণ, সন্তান-প্রসবের সময় যে জরায়ুতে গতির সঞ্চার হয় তার প্রমাণ (সন্তান নিজে বের হয় না; সন্তানকে জরায়ু ধাক্কা দিয়ে বাইর করে) প্রভৃতি বিষয়বস্তু কিতাব আল-মালিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল-কুমরী

এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো- আবু মাসুর আল-হাসান ইবনে আল-কুমরী, এবং জাবাল নামক স্থানের কুম এলাকায় তাঁর জন্ম হয়। তবে তিনি বাগদাদে দশম শতাব্দির শেষের দিকে কর্মরত ছিলেন। একজন মুসলমান চিকিৎসক হিসাবে তিনি কাজ করেন। আল-কুমরী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলী ইবনে সিনা (আবিসিনা) এঁর শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাজীর চিন্তাদ্বারার উপর ভিত্তি করে "কিতাব জিহনা ওয়া মানা" বা "জীবন ও মরণের পুস্তক" নামে ঔষধ-বিজ্ঞানের উপর একখানা বই লিখেন। বইটি তিন খন্ডে বিভক্ত করে লিখা হয় (ভেতরের রোগ, বাহিরের রোগ, জ্বর)।

আবু সাহল আল-মাসিহি

আবু সাহল ঈসা ইবনে ইয়াহইয়া আল-মাসিহি আল-জুরজানি (অর্থাৎ খ্রিস্টান), নামে এ চিকিৎসক কেপসিয়ান সাগরের পূর্বে অবস্থিত জুরজান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৪০ বছর বয়েসে ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। খ্রিস্টান হলেও তিনি আরবিতে লেখালেখী করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে "আল-কুতুব আল-মিয়া ফিস ছানাল তিব্বিয়া" নামে ঔষধ-বিজ্ঞানের একটি বিরাট পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ পুস্তক'টি সুদীর্ঘ ১০০ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করা হয় এবং আরবিতে এ ধরনের লেখা এটাই প্রথম ছিলো।

আবু সাহল আল-মাসিহি আরও কয়েকটি পুস্তক লিখেন। এর মধ্যে; হাম রোগ, সংক্রামক রোগ, নাড়ীর স্পন্দন, মানবসৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রকাশ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবু মনসুর মুওয়াফফাক ইবনে আলী আল-হারাই

হেরাত নামক স্থানে শাহজাদা মনসুর ইবনে নুহ এর দরবারে এই বিজ্ঞানী কর্মরত ছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি পারস্যদেশীয়। এ ঔষধবিৎ ফারসী ভাষায় অনেক বই-পুস্তক লিখেন। তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভারতসহ সমগ্র মুসলিম জাহান ভ্রমণ করেন। তাঁর লেখা বই-পুস্তকের মধ্যে "কিতাব আল-বনিয়ান হাক্কাইক্ব আদ-দিয়া" বা "রোগ-প্রতিকারের পুস্তক" সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলো। এই বইটিতে ৫৮৫টি রোগের প্রতিকার নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে লেখক ৪৬৬টি রোগের প্রতিকারক হিসেবে উদ্ভিদ থেকে নিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা, ৭৫টি রোগের জন্য খনিজদ্রব্য (মিনারেল) ব্যবহার এবং ৪৪টি রোগের জন্য জীব-জন্তু থেকে নিষ্কৃত ঔষধ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি ঔষধ প্রস্তুত করার বিদ্যা বা ভেষদবিদ্যার প্রবর্তক ছিলেন। আবু মনসুর সডিয়াম-কারবোনেট ও পটাসিয়াম-কারবোনেট এর মধ্যে ব্যবধান আবিষ্কার করেন ও অন্যান্য বহু রসায়ন দ্রব্যাদির উপর জ্ঞাত ছিলেন।

আল-তামিমি

এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হামিদ ইবনে সাঈদ আল-তামিমি আল-মুক্বাদ্দাসি। তাঁর জন্ম হয় জেরুজালেমে তবে ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশরে চলে যান এবং ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেথায় কর্মরত ছিলেন।

ফিলিস্তিনের চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত এ বিজ্ঞানী ভেষদবিদ্যা বা ফ্যার্মাসিউটিক্যাল বিষয়ে অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি ঔষধের উপর বহু বই-পুস্তক রচনা করেন। তবে "কিতাব আল-মুরসিদ" নামে তাঁর একটি প্রধান বই ছিলো, যেটিতে তিনি উদ্ভিদ, মিনারেল (খনিজ) প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আল-বালাদি

মিশরে কর্মরত এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ৯৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জীবিত ছিলেন। তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ বইটির নাম হলো- "কিতাব তাদবির আল-হাবালা ওয়াল আফলাল"। এ বইয়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেন। একমাত্র এ বইটির কারণেই এ প্রসঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

হাসদাই ইবনে সাপরুত

এ বিজ্ঞানী সাফরাত, বাসরাত প্রভৃতি উপনামেও পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর প্রকৃত নাম হলো, আবু ইউসুফ ইসহাক ইবনে ইজরা। ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আন্দালুসিয়ার (স্পেন) জায়েন নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়।

স্পেনের কুর্দোভায় সুলতান আব্দুররাহমান-৩য় এর দরবারে তিনি কাজ করেন। ৯৭০ অথবা ৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। হাসদাই ইবনে সাপরুত বাস্তবে স্পেনীয় একজন ইহুদি ডাক্তার ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং গ্রীক থেকে বিজ্ঞানের বহু বই-পুস্তক আরবিতে অনুবাদ করেন। খলিফার একজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে, তিনি সর্বরোগ-নিবারক একটি ঔষধ আবিষ্কার করেন, যার নাম ছিলো, "আল-ফারুক" বা সর্বোৎকৃষ্ট। ৯৪৮ থেকে ৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খলিফা আব্দুর রাহমানকে সম্রাট কন্‌টানটিন্‌স-৭তম গ্রীক বিজ্ঞানী ডিওসকরাইডিসের একটি লেখা উপহার দেন। হাসদাই ইবনে সাপরুত তখন খলিফার নির্দেশে এ লেখাটা আরবিতে ভাষান্তর করেন। অনুবাদে তাঁকে সাহায্য করেন, নিকুলাস নামে একজন গ্রীক পাদ্রী। এ পাদ্রীকে কনস্‌টানটি কুর্দোভায় প্রেরণ করেছিলেন ৯৫১ খ্রিস্টাব্দে, খলিফার অনুরোধে।

বিজ্ঞানী হাসদাই ইবনে সাপরুত হিবরু ভাষায় খাজরাজের বাদশাহর নিকট অনেক চিঠি দেন, এগুলোতে তিনি আন্দালুসিয়ার সমসাময়িক অবস্থা বর্ণনা করেন।

আরিব ইবনে সাদ আল-কাতিব আল-কুরতুবি

কুর্দোভার খলিফা আব্দুর রাহমান-৩য় ও আল-হাকিমের সময় এই বিজ্ঞানী কাজ করেন। ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই বিজ্ঞানী একজন স্পেনীয়-মুসলিম ইতিহাসবিদ ও চিকিৎসক ছিলেন, যদিও প্রাথমিক জীবনে তিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ৯৬১-৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলিম স্পেন ও আফ্রিকার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখেন। এ বইটি পরবর্তীতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে তখনকার সময়ে। এটা ইবনুল-ইদরানি ত্রয়োদশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবহার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইবনে সাদ ধাত্রীবিদ্যা (গাইনোকলোজী), স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (হাইজিন) এবং ভ্রূণ-বিজ্ঞান (এমব্রিয়লজী) প্রভৃতি বিষয়ের উপর বহু লেখালেখি করেন। তাঁর লেখা "খালক আল-জানিন" বা "ভ্রূণ-সৃষ্টির পুস্তক" ও "কিতাব আন-নওয়াহ" বা "পঞ্জিকার বই" অত্যন্ত সুপরিচিত।

(চ) আল-বিরুনির সময়

এ সময়ে এসে ইসলামী বিজ্ঞান পূর্ণতাপ্রাপ্ত লাভ করে। আমরা তাই এ যুগে কয়েকজন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের নাম খুঁজে পাই, যাঁরা সত্যিকার অর্থে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন। আল বিরুনির যুগ ও পরবর্তীতে উমর খৈয়ামের যুগের মধ্যে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি সাধিত হয়, পঞ্চদশ শতাব্দিতে ইউরোপীয় রেঁনেসা ছিলো এর ফলাফল। এ দু'যুগে মুসলমান বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারকে হাতিয়ার করেই কোপারনিকাস, লেনারডো ডা-ভিন্সি, গ্যালিলিও গ্যালেলাই ও আইজাক নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ইউরোপে বিজ্ঞানের নব-জাগরণের জন্ম দেন।

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান নিয়ে ইতোমধ্যে যা আলোচনা হয়েছে, তাতে আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবন ও কার্য নিয়ে লিখেছি। তবে এ দুযুগের ক'জন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে আলোচনা হবে অনেকটা ব্যাপকভাবে। এ প্রসঙ্গে এটা প্রযোজ্য বলে মনে করি।

আবুল কাসিম আল-জাহরাবি (৯৩৬ - ১০১৩ খ্রিঃ)

নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হচ্ছেন এই ব্যক্তি, যিনি পশ্চিমে আলবুকাসিস নামে পরিচিত। তাঁর আবিষ্কৃত বহু সার্জিক্যাল অপারেশনের পদ্ধতি আজো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি অস্ত্রপাচারের জন্য ব্যবহৃত অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। তবে আল-জাহরাবি তাঁর লেখা মেডিক্যাল বিশ্বকোষের জন্য সুপরিচিত। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই মুসলিম চিকিৎসককে সার্জারির জনক বলা হয়ে থাকে।

আল-জাহরাবির পূর্ণ নাম হলো, আবুল কাসিম খালাফ ইবনে আল-আব্বাস আল-জাহরাবি। স্পেনের কুর্দোভার নিকটে জাহরা নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। জাহরা তখন স্পেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর হিসেবে মুসলিম জাহানে পরিচিত ছিলো, যার তুলনা বাগদাদ ও ইস্তাম্বুলের (কন্সটান্টিনোপল) সাথে করা হতো। স্পেনের

খলিফা আল-হাকিম-২য়- এর দরবারে, আল- জাহরাবি ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন। এ পেশায় তিনি দীর্ঘকাল কর্মরত থাকার পর ১০১৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

আল- জাহরাবি একজন প্রভাবশালী চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্যে মেডিক্যালের ছাত্ররা সমগ্র ইউরোপ থেকে আসতো। এ সময় অবশ্য কুর্দোভা ছিলো মেডিক্যাল বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল। আল-জাহরাবির মেডিক্যালের জ্ঞান গ্যালেনের তুলনায় অনেক উন্নতমানের ছিলো।

ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট মেডিক্যাল বিশ্বকোষের রচয়িতা হিসেবে আল-জাহরাবি বেশী পরিচিত ছিলেন। এ জ্ঞানকোষের আরবি নাম হলো, "আল-তাছরিফ মান আযাজ আল্লিল তা-লিফ", বা "বড় পুস্তক পড়তে অপারগ ব্যক্তির জন্য সাহায্য"। এ বিশ্বকোষের তিনটি খন্ড সার্জারির ওপর লিখিত। এতে আল- জাহরাবি তাঁর নিজস্ব আবিষ্কারসহ চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে দু'শ সার্জারির যন্ত্রপাতি নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। অপারেশন পদ্ধতির ব্যাপারেও এই তিন খণ্ডে তিনি আলোচনা করেছেন। এতে ব্লাডার থেকে পাথর বের করা, কান-নাক-চক্ষে অস্ত্রোপচার, ধাত্রীবিদ্যা, উদর থেকে মৃত শিশুদের বের করা, প্রয়োজনে হাত বা পা কেটে দেওয়া ও জীব-জন্তুকে কেটে মেডিক্যাল রিসার্চ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা ও আলোচনা করেন।

একজন আবিষ্কারক হিসেবে আল-জাহরাবি, তাঁর তৈরী কানের ভেতর পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, উদর দেখার যন্ত্র ও গলা থেকে কাটা বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক বস্তু বের করার যন্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আল-জাহরাবিই ছিলেন প্রথম ডাক্তার যিনি অপারেশনের পর কাটা চামড়া বা দুর্ঘটনায় ফেটে যাওয়া চামড়া সেলাই করতে মশ্রিন সূতা ব্যবহার করেছিলেন। মুখের অভ্যন্তরে সার্জারি করা ও দন্তচিকিৎসার ক্ষেত্রেও আল-জাহরাবি সুদক্ষ ছিলেন। এছাড়াও জীব-জন্তুর মাড়ি ব্যবহার করে তিনি প্রাকৃতিক দন্ত প্রস্তুত করতেন।

আল-জাহরাবির মেডিক্যাল বিশ্বকোষ জেরার্ড অব ক্রেমোনা নামক এক ব্যক্তি মধ্যযুগে লেটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তারপর এটা হিবরু, ফরাসী ও ইংরেজিতে ক্রমান্বয়ে ভাষান্তর করা হয়। ইউরোপের মেডিক্যাল বিদ্যালয়গুলোতে আত-তাছরিফ সর্বাপেক্ষা জরুরী একটি পাঠ্য পুস্তক হিসেবে কয়েক শত বছর ব্যবহৃত হয়েছিলো।

আবু রায়হান মুহাম্মদ আল-বিরুনি (৯৭৩ -১০৪৮ খ্রিঃ)

বিজ্ঞান তথা ইসলামের ইতিহাসে আল-বিরুনি নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিৎ, চিকিৎসক, ভৌগোলিক এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন। এই বহু-গুণসম্পন্ন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সম্পর্কে ইউরোপীয় লেখক, মেক্স মিয়েরহফ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে ইসলামী বিজ্ঞানের সোনালী যুগের হয়তোবা সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল-বিরুনি। মানবেতিহাসে তাঁর বহুবিধ অবধানের জন্য তাঁকে "আল-উস্তাজুল উস্তাদ" বা অধ্যাপকদের শিক্ষক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

আবু রায়হান মুহাম্মদ আল-বিরুনির জন্ম হয় ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান উজবেকিস্তানের কারা-কালপাস্কিয়া নামক স্থানে। তাঁর জন্মের সময় এ জায়গার নাম ছিলো, খোয়ারিজ্‌ম। তিনি প্রথমে আররী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। পরে তিনি গ্রীক, সিরিয়াক এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তখনকার দিনে জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে যে চারটি ভাষার ব্যবহার ছিলো- অর্থাৎ, আরবি, গ্রীক, সিরিয়াক ও সংস্কৃত-, এগুলোতে আল-বিরুনির পূর্ণ আয়ত্ব থাকায় তাঁর নিজস্ব কার্যে মৌলিকত্ব বা অরিজিন্যালিটি প্রকাশ পায়। আল-বিরুনি মনে করতেন; যে বিষয় নিয়েই কেউ কিছু গবেষণা করুক না কেন, তার উচিত এ ব্যাপারে জানা প্রতিটি তথ্য প্রথমে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা। তারপর এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নতুন আবিষ্কারে অগ্রসর হতে হবে।

আল-বিরুনি প্রখ্যাত চিকিৎসক ইবনে-সিনার সময়ে জীবিত ছিলেন, এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতেন বলে জানা যায়। বিজ্ঞান তথা মানব-জ্ঞান প্রসারে আল-বিরুনির অবদান এত বেশী ছিল যে, তাঁর লেখার সূচীপত্র লেখতে ষাটেরও বেশী পৃষ্ঠার একখানা বইয়ের প্রয়োজন হবে। তাঁর এবং আল-হাইতামের

বৈজ্ঞানিক অবদানের ফলেই অধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে ওঠে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর জ্ঞান-চর্চা করার পর এ স্বনামধন্য মুসলিম বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয় ১০৪৮ সনে আফগানিস্তানের গাজনা নামক স্থানে।

বিজ্ঞানে আল-বিরুনী মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক অবদান রাখেন। দিক-নির্ণয়ের ৭টি আলাদা উপায় তিনি আবিষ্কার করেন। সূর্য ও চন্দ্রের গতিবিধি এবং চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ নিয়ে গবেষণা করেন। এছাড়াও তিনি একাধিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি আবিস্কার করেন।

পৃথিবীর মধ্যশলাকার গতি (আহ্নিক গতি) সম্পর্কে আল-বিরুনিই প্রথম আলোচনা করেন এবং লেটিচিউড ও লঙ্গিচিউড সঠিকভাবে অঙ্কর মাধ্যমে বের করতে সক্ষম হন। তাঁর এসব তথ্যাবলী স্বলিখিত পুস্তক, "আল-আতার আল-বাক্বিয়া" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়। ঘড়ির ওপর ১০০০ সনে তিনি একটি মূল্যবান বই রচনা করেন।

আল-বিরুনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে, আলোর গতি শব্দের গতি থেকে বহুগুণ বেশী। মহাকাশে ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলো হলো অগণিত তারাপুঞ্জ। ১০১৯ সনের ৮ এপ্রিল একটি সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল। আল-বিরুনি এ সম্পর্কে তাঁর লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একই বছরের ১৭ সেপ্টেম্বরে সংঘটিত একটি চন্দ্রগ্রহণ নিয়েও তিনি লিখেছেন। তাঁর বই, "আল-তাফহিম লি-আওয়াইল সিনাতাল তানজিম" গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপর লেখা। বইটি ১৯৩৪ সনে রামজি রাইট নামক একব্যক্তি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

আল-বিরুনি পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর বেশ অবদান রেখে যান। তিনি সঠিকভাবে স্প্রিং এর কার্যকারিতার উপর গবেষণা, ১৮টি পদার্থের বিশেষ ওজন (স্পেসিফিক ওয়েট) প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর বই "কিতাব আল-জামাহির"-এ অনেক ধরনের মূল্যবান পাথর নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আল-বিরুনি গণিতের শাখাদ্বয়- ত্রিভূজ ও ট্রিগোনোমেট্রির ওপর মৌলিক অনেক তথ্য উদঘাটন করেন। ভারতে ব্যবহৃত নাম্বার সিষ্টেম নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

জ্যামিতি শাস্ত্রের উপরও আল-বিরুনির অবদান আছে। তিনি ভৌগোলিক আগ্নেয়গিরি ও ধাতুবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন। লঙ্গিচিউড ও লেটিচিউড ব্যবহার করে তিনি এক জায়গা থেকে অপর আরেক জায়গার দূরত্ব বের করতে সক্ষম হন। আল-বিরুনি প্রাচীন সভ্যতা ও ভূগোলের ওপর একখানা পুস্তক লিখেন, যার নাম ছিলো, "আল-আতার আল-বাক্বিয়া ফী ক্বানুন আল খালীয়"।

গজনীর সুলতান মাহমুদের সাথে আল-বিরুনির ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর নামদাম ও প্রতিভা দেখে সুলতান মাহমুদ মুগ্ধ হয়ে যান এবং কয়েকবার তিনি আল-বিরুনিকে ভারতে সফরসঙ্গী হিসেবে নিয়ে যান। এর ফলে আল-বিরুনি ভারত সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ও সুদীর্ঘ ২০ বছর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে তিনি দর্শন, অঙ্ক, ভূগোল ও ধর্ম বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি নিজে এর বদলে পণ্ডিতদেরকে গ্রীক ও মুসলিম বিজ্ঞান এবং দর্শন শিক্ষা দেন।

আল-বিরুনির বই "কিতাবুল হিন্দ" এর মধ্যে তখনকার ভারতীয় ধর্ম, মানবজীবন, ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি বহুযুগ পরে আবিষ্কৃত সিন্ধু সভ্যতার লীলাভূমি হারাপ্পা ও মোহেঞ্জোদারুর অঞ্চলকে পুরাতন যুগে একটি প্রাচীন সাগর এলাকা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। দু'টি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ- "পাতাল" ও "সাকেয়া", আল-বিরুনি আরবিতে অনুবাদ করেন। প্রথম বইটি মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা ও দ্বিতীয়টি সৃষ্ট বস্তু এবং এদের ধরন নিয়ে লেখা। আল-বিরুনির সময়ের ৬০০ বছর পর সম্রাট আকবরের শাসনামলে লেখা আবুল ফজলের বই, "আইন-ই আকবর" আল-বিরুনির বই কিতাব আল-হিন্দের অনুসরণেই লেখা হয়েছিল।

আল-বিরুনির সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম হলো, "আল-কানুন আল-মাসুদি ফীল হায়া ওয়ান নুজুম"। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে এ বইটি লিখা হয়েছিল। আল-বিরুনি এটা সুলতান মাহমুদের পুত্র সুলতান মাসুদের নামে উৎসর্গ করেন। এ পুস্তকে তিনি অঙ্ক শাস্ত্রের কয়েকটি নতুন থিওরী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু তথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখা অন্য আরো দু'টি প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম হলো, "আল-আতার আল-বাক্বিয়া" ও "কিতাব আস-সায়্যিদিনা"। প্রথম বইটিতে আল-বিরুনি, প্রাচীন দেশসমূহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন ও দ্বিতীয়

বইয়ে আরবি ও ভারতীয় ঔষধ-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। সিয়ামিজ টুইনস (একত্রে জোড়া লাগানো জময) ও আষ্ট্রলেব যন্ত্রের উপরও তাঁর বেশ আগ্রহ ছিলো।

আল-বিরুনি সত্যিকার অর্থে একজন মুসলিম বিজ্ঞানী ছিলেন, যাঁর প্রেরণার উৎস ছিলো কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহ। আল্লাহপাক যে মানুষকে জগৎ নিয়ে গবেষণা করার তাগিদ দিয়েছেন বার বার, আল-বিরুনি তা পালন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও পদার্থবিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করে এটা আমি স্পষ্টই অনুধাবন করতে পারছি যে, এ সবকিছুর পেছনে একটি অসীম শক্তিধর সত্তা আছেন, যিনি পরিকল্পনা করে এগুলো সৃষ্টি করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর আমার আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, এ বিশ্বে বহু অত্যাশ্চর্য বস্তু রয়েছে যা থেকে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, এর পেছনে একটা সৃষ্টিশীল পরিকল্পনা কাজ করছে। যাবতীয় কিছু শুধুমাত্র বস্তুবাদী চিন্তাদ্বারা দিয়ে কখনও বুঝানো সম্ভব নয়।"

আল-বিরুনি তাঁর কার্যাবলীকে কখনও সুনাম, ধন বা ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেননি। কিতাব আল-কানুন আল-মাসুদি প্রকাশ হবার পর সুলতান মাসুদ যখন তাঁকে উপহার স্বরূপ তিনটি উট বোঝাই করে রৌপ্যমূদ্রা পেরণ করেন তখন, তিনি ভদ্রতা বজায় রেখে এ মাল ফেরৎ পাঠিয়ে বলেছিলেনঃ "হজুর! বেআদবী মাফ করবেন! আমি জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানের চর্চা করি, ধন-সম্পদ বা সুনাম অর্জনের জন্য নয়।"

আবু আলী আল-হুসেইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা (৯৮১ - ১০৩৭ খ্রিঃ)

পশ্চিমে আজো আবিসিনা নামে পরিচিত এই প্রসিদ্ধ মুসলমান বিজ্ঞানী তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও দূরদর্শী চিন্তাবিদ ছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান ছিলো অতুলনীয়। বিশেষ করে মেডিক্যাল বিজ্ঞানে সে সময়ে তাঁর সমতুল্য কোন চিন্তাশীল কেউ ছিলেন না। এ বিষয়ে ইবনে সিনার সর্বপ্রধান অবদান হলো তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-কানুন ফীত্বিব"। সাধারণত এটাকে পশ্চিমে "কানুন"

বলা হয়। একমাত্র এ বইটির কারণেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম না থাকলে সমগ্র বিষয়টিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বুখারার নিকটে আফসানা নামক স্থানে ৯৮১ সালে আবু আলী আল-হুসেইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনার জন্ম হয়। মাত্র ১০ বছর বয়সেই তিনি কুরআন অধ্যয়ন করতে সক্ষম হন। তারপর তখনকার দিনে জানা সাধারণ বিজ্ঞানকে তিনি আয়ত্ব করে ফেলেন। আবু আব্দুল্লাহ নাতালী নামক একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের কাছে তিনি "লজিক", গ্রীক এবং মুসলিম দর্শনের বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প বয়সেই মেডিসিনের উপর তাঁর দক্ষতা ও আসক্তি পরিলক্ষিত হয় এবং নিজ এলাকায় পরিচিত হয়ে উঠেন।

ইবনে সিনা মাত্র ১৭ বছর বয়সে বুখারার বাদশাহ নূহ ইবনে মনসুরের চিকিৎসা করেন ও তাঁকে সুস্থ করে তুলেন। বাদশাহকে এর পূর্বে বহু চিকিৎসক রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাদশাহ আরোগ্যলাভ করে নওজোয়ান ডাক্তারকে প্রতিদান দিতে আগ্রহী হলেন। ইবনে সিনা বললেন, আমাকে যদি আপনার বিরল পাঠাগারটি ব্যবহার করার অনুমতি দান করেন, তবেই আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

ইবনে সিনা পরিণত বয়েসে জুরজানে যান এবং তাঁর সময়ের আরেক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, আল-বিরুনির সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি রায় নামক জায়গায় কিছুদিন অবস্থান করে হামদানে চলে যান। সেথায় থাকাকালেই তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক কানুন রচনা করেন। এখানে তিনি হামদানের বাদশাহ শামসুদ্দৌলার চিকিৎসাও করেন।

হামদান থেকে ইবনে সিনা বর্তমান ইরানের ইসফাহানে চলে আসেন এবং এখানে থাকাবস্থায় বহু পুস্থক রচনা করেন। ইবনে সিনা ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন। ইসফাহানেও তাই তিনি বেশীদিন অবস্থান না করে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াবার পর শেষ পর্যন্ত হামদানে ফিরে আসেন ও ১০৩৭ সালে এখনেই মৃত্যুবরণ করেণ।

আবু আলী আল-হুসেইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনার "আল-কানুন ফীত্বিব" বা "মেডিসিনের আইন" গ্রন্থটি হচ্ছে ১০ কোটিরও বেশী শব্দে লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি বিশ্বকোষ। অত্যন্ত পরিষ্কার ও ধারাবাহিক পন্থা অবলম্বনে লিখিত এ বিশ্বকোষে লেখক প্রাচীন মেডিক্যাল বিজ্ঞান থেকে তাঁর সময়ের মুসলিম চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।

কানুনের বিষয়বস্তু ও লেখার পদ্ধতি সুদূরপ্রসারী ছিলো। বইটি তাই পরবর্তী ৬০০ বছর পর্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি রিসার্চ বিশ্বকোষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইবনে সিনা এতে শুধু জানা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করেননি, তাঁর নিজের আবিষ্কৃত বহু নতুন তথ্য নিয়েও বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কানুনের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাধারণ ঔষধ, বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ্‌স (মোট সাতশত ষাটটি), মানব শরীর যেসব রোগে আক্রান্ত হয়, প্যাথোলজী, এ্যানাটমী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মেডিক্যাল বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য কানুন ছিলো অধ্যয়নের আসল গ্রন্থ।

ইবনে সিনার আবিষ্কৃত বহু তথ্য আজো পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে আছে। বিষেশ করে, এ্যানাটমীর বেলায় এটা সর্বজনস্বীকৃত কথা। অন্যদিকে চক্ষু বিজ্ঞান বা অপটিক্‌সে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তনিই সর্বপ্রথম চক্ষুর বিভিন্ন অঙ্কর সঠিক বর্ণনা দেন। এগুলোর মধ্যে কনজাকটিভ ফ্লোরা, কর্নিয়া, করোইড, আইরিস, রেটিনা, লেয়ার লেনস, একুয়াস হিউমার, অপটিক নার্ভ এবং অপটিক কিয়াজমা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে সিনাই সর্বপ্রথম ডাক্তার ও চিকিৎসকদেরকে মানবদেহকে সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষণা করার জন্য উপদেশ দেন। এ ব্যাপারে ধারণা ও অন্ধভাবে থিওরী সৃষ্টির পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। মানব হৃদযন্ত্রে যে বালব আছে এবং এগুলোর কারণে যে শরীরে ব্যবহৃত রক্ত আবার হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না, একথা ইবনে সিনাই প্রথমে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, মাসুল বা মাংসপেশীতে নার্ভের অবস্থান থাকায় এগুলো নড়াচড়া করে এবং এসব নার্ভের ফলেই বেদনা অনুভব করা যায়। লিভার ও কিডনীর ব্যপারে তাঁর ধারণা হলো, এগুলোর মধ্যে কোন নার্ভ নাই তবে, এসব আভ্যন্তরীণ ওরগ্যান বা যন্ত্র নার্ভ দ্বারা আবৃত (বাইরে নার্ভ) আছে।

ইবনে সিনার কানুন জেরার্ড অব ক্রেমোনা নামক একব্যক্তি দ্বাদশ শতাব্দিতে লেটিনে অনুবাদ করেন। এর পর থেকে এটা ইউরোপের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। কানুনের জনপ্রিয়তা এতো বেশী হয়েছিলো যে, পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ত্রিশ বছরের মধ্যে এটার ষোলটি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে ১৫টি লেটিন ও একটি ছিলো হিবরু ভাষায় প্রকাশিত। এর পরে ষষ্ঠদশ শতাব্দিতে আরও ১৬ বার বইটি প্রকাশ করা হয়। ১৯৩০ সালে ক্যামেরুন গ্রনার নামক এক ব্যক্তি "এ ট্রিটিজ অন দ্যা কানুন অব মেডিসিন অব আবিসিনা" নামে পুস্তকটি ইংরেজিতে আংশিক ভাষান্তর করেন। পশ্চিমে দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দি পর্যন্ত কানুন মেডিক্যাল বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান পাঠ্য পুস্তক হিসেবে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইভোলোশন অব মডার্ন সাইন্স'র লেখক ডঃ উইলিয়াম অসলারের মন্তব্য হলোঃ "কানুন মেডিক্যালের বাইবেল হিসেবে যে দীর্ঘ সময় স্থায়ী ছিলো, তা অন্য কোন লেখা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি।"

কানুন ছাড়াও ইবনে সিনা "কিতাব আস-শিফা" বা "নিরাময়ের পুস্তক" নামে একটি দর্শনের বিশ্বকোষের রচয়িতা ছিলেন। এ বৃহৎ গ্রন্থে দার্শনিক জ্ঞান থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে লেখক এ্যারিস্টটেলিয়ান ঐতিহ্য, নিও-প্লেটোনিক প্রভাব ও মুসলিম ধর্মজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য সন্ধান করেছেন। কিতাব আস-শিফা ছাড়াও ইবনে সিনার লেখা, "আন-নাযাত" ও "ইশারাত" নামে দর্শনের আরও দু'টি পুস্তক প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি দর্শনের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে দু'টি ভিন্ন ধারায় আলাদা করে দেখেছেন; ধার্মিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান। এর প্রথমটির মধ্যে যেসব বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে তা হলো নীতিবিজ্ঞান (ধর্মজ্ঞান), অর্থনীতি ও রাজনীতি, আর দ্বিতীয়টির মাঝে আছে পাদার্থ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র ও অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স)।

আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহইয়া আয-জারক্বালী (১০২৮ - ১০৮৭ খ্রিঃ)

এই বিজ্ঞানী পাশ্চাত্য জগতে আরজাকেল নামে সুপরিচিত। মুসলিম স্পেনে তিনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। টলেডো নামক জায়গায় আল-জারক্বালী

কিছু মূল্যবান মহাকাশ-পর্যবেক্ষণ করেন এবং এ তথ্যগুলো তাঁর সুখ্যাত 'টলেডান টেবিল' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। আল-খোওয়ারিজমী ও টলেমীর প্রকাশিত অনেক ভূগৌলিক তথ্য তিনি সংগ্রহ ও সংস্কার করে নিজে প্রচার করেন। আল-জারক্বালীর টলেডান টেবিল দ্বাদশ শতাব্দিতে লেটিন ভাষায় তরজমা করা হয়।

আল-জারক্বালীই ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি সৌরজগৎ ও তারার মধ্যে যে আপেক্ষিক গতি নিহিত আছে তা প্রমাণ করেন। তিনি অঙ্ক কষে এ গতির রেইট ১২.০৪ সেকেন্ড (ডিগ্রীর অঙ্ক) প্রতি বছর বলে সাব্যস্ত করেন যা ছিল বর্তমান রেইট ১১.৮ সেকেন্ড এর কাছাকাছি। সাফিহা নামে একটি পাতলা সমতল আষ্ট্রলেব আল-জারক্বালী আবিষ্কার করেন। এ যন্ত্রটি পরবর্তীকালে ইউরোপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস তাঁর লেখা, "ডি রিভোলুশোনিবাস অরবিয়াম সেলেসটিয়াম" গ্রন্থে আল-জারক্বালী ও আল-বাতানী (আরেকজন বড় মুসলিম বিজ্ঞানী)- এদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। আল-জারক্বালী পশ্চিমে এতো বেশী জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর সম্মানে উনিশ শতকের কিছু বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের একটি জায়গার নাম তাঁরই নামানুসারে নামকরণ করেন আরজাকেল এলাকা।

(ছ) উমর খৈয়ামের যুগ

উমর খৈয়াম (১০৪৪ - ১১২৩ খ্রিঃ)

‘রুবাইয়াত’ এর লেখক উমর খৈয়ামকে যদিও আমরা একজন প্রসিদ্ধ কবি হিসেবেই জানি, তথাপি উমর খৈয়াম প্রকৃত প্রস্তাবে একজন বিজ্ঞানীও ছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাদ্বারা আসলে এতো সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এর ফলে বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদরা মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার একটি যুগকে তাঁর নামানুসারে নামকরণ করেছেন। এ যুগ তাঁর জন্মকাল থেকে উলুগ বেগ (পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথমার্ধ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ যুগে মুসলিম জাহানে যেসব প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের অবির্ভাব ঘটে এদের মধ্যে ইমাম আল-গাযযালী, ইবনে জহুর, আল-ইদ্রিসি, ইবনে রুশদ, আল-বিরতুজী, নাফিজ দামেস্কী, ইবলে খালদুন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনশাআল্লাহ! এ শেষ যুগের উল্লেখিত সব বিজ্ঞানীদের নিয়ে একে একে আলোচনা হবে।

উমর খৈয়ামের পূর্ণ নাম হলো, গিয়াস উদ্দীন আবুল ফাতেহ উমর ইবনে ইব্রাহীম আল-খৈয়াম। বর্তমান ইরানের খোরাশান প্রদেশের রাজধানী নিশাপুরে ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। উমর খৈয়াম একাধারে একজন গাণিতিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ ও কবি ছিলেন। তাঁর নামের অর্থ (খৈয়াম) হচ্ছে, তাঁবু নির্মাতা। সাধারণত উমর খৈয়ামকে একজন পারস্য ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তথাপি তিনি আরবের খৈয়ামী বংশোদ্ভুত হতে পারেন বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে অল্পই জানা যায়। তবে তিনি নিশাপুরেই লেখাপড়া করেন এবং এখানে ও পরে সমরকন্দে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি নিজাম আল-মুলক তূসী- এর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উমর খৈয়াম বাদশাহ্‌র দরবারে থেকে শান্তিময় জীবন-যাপন করেননি। তিনি তখনকার দিনের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র সমরকন্দ, বুখারা, বলখ ও ইসফাহানে ভ্রমণ করেন। তাঁর এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের অন্বেষা ও নামকরা চিন্তাবিদদের সাথে সাক্ষাৎলাভ করা। উমর খৈয়াম ১১২৩ বা ১১২৪ সনে জন্মস্থান নিশাপুরেই মৃত্যুবরণ করেন।

উমর খৈয়াম বীজগণিতে বেশ অবদান করে গেছেন। এ বিষয়ের সমীকরণগুলোকে তিনি তালিতাভূক্ত করেন এবং সমাধান বের করার চেষ্টা চালান। কিউবিক বা তৃতীয় ডিগ্রী বীজগণিতের সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান তিনি করেছেন ও অন্যান্য আরোও সমাধান-কল্পে কাজ করেন। তাঁর পুস্তক, "মাক্বালাত ফীল জাবুর ওয়াল মুক্বাবিলা" ছিলো বীজগণিতের একটি মূল্যবান বই, যার ফলে পরবর্তীতে এ্যালজেবরা বা বীজগণিতের উন্নতি সাধন হয়। উমর খৈয়াম ১৩টি ভিন্ন ৩য় ডিগ্রী সমীকরণ আবিষ্কার করেন। তিনি শুধু বীজগণিতের উপরই কাজ করেননি, গণিতের অপর প্রধান শাখা জ্যামিতি নিয়েও তিনি মূল্যবান গবেষণা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ইউক্লিডের থিওরীবলী অধ্যয়ন করেন ও সমান্তরাল রেখা সম্পর্কে গাণিতিক মূল্যবান অবদান রাখেন।

১০৭৪ সালে সুলতান মালিক শাহ জালাল উদ্দীন উমর খৈয়ামকে "রায়" অবজারভেটরীর (মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র) দায়িত্ব দেন। একটি নির্ভুল সূর্য-পঞ্জিকা (সলার-ক্যালেন্ডার) তৈরীর জন্য তাঁকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উমর খৈয়াম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর এ দায়িত্ব পালন করেন ও "তারিখাল জালীল" নামে একটি সূক্ষ্ম পঞ্জিকা তৈরী করেন। এটির মধ্যে ৩,৭৭০ বছরে একদিনের ব্যবধান হয় মাত্র। এ পঞ্জিকা বর্তমানে ব্যবহৃত "গ্রেগোরিয়ান" (খ্রিস্টান পউপ গ্রেগোরি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) ক্যালেন্ডার থেকেও উন্নতমানের ছিলো। গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকায় ৩,৩৩০ বছরে একদিনের ব্যবধান হয়।

উমর খৈয়াম বিজ্ঞানী হিসেবে মূলত একজন গাণিতিক ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর আগ্রহ ছিল। তবে অধিবিদ্যার (মেটাফিজিক্স) উপর তাঁর অবদান আছে। এ বিষয়ের উপর তাঁর লেখা দু'টি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়; "রিসালা দার উজুদ" ও সম্প্রতি আবিষ্কৃত "নওরোজনামা।"

একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ছাড়াও উমর খৈয়াম কবিও ছিলেন। এ ব্যপারে পাঠকরা অবশ্যই অবগত আছেন। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে উমর খৈয়ামের নাম, ১৮৩৯ সনে যখন এডওয়ার্ড ফিযজারেল্ড "রুবাইয়াত" এর ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করেন তখন থেকে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থ পৃথিবীর একটি অন্যতম ক্লাসিক সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছে।

উমর খৈয়াম কবিতা ও বিজ্ঞানের উপর অনেক বই লিখেছন। এর মধ্যে ১০টি পুস্তকের খবর সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে। এগুলোর মধ্যে চারটি অঙ্ক শাস্ত্রের উপর, তিনটি ফিজিক্স বা পদার্থ বিজ্ঞানের উপর, তিনটি অধিবিদ্যা নিয়ে, একটি বীজগণিতের উপর ও একটি জ্যামিতির উপর লেখা।

রেনি ডেসকার্টের পূর্ব পর্যন্ত উমর খৈয়ামের গণিত অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলো। বাস্তবে গাণিতিক হিসেবে তাঁর সুনামকে কবি হওয়ার মহাত্ম্য আড়াল করে রেখেছে। তবে এ দু'টি বিষয়েই উমর খৈয়াম দক্ষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। একই সময়ে কোন এক ব্যক্তি সফল কবি ও বিজ্ঞানী হওয়া ইতিহাসে খুবই বিরল।

ইমাম আবু হামিদ আল-গায্যালী [রহঃ] (১০৫৮-১১১১ খ্রিঃ)

ইরানের খোরাসান প্রদেশে ইমাম আবু হামিদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তূসী আস-শাফিয়ী আল-গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত ছোট থাকতেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। নিশাপুর ও পরে বাগদাদে তাঁর লেখাপড়া হয়েছিল। এ প্রসিদ্ধ জ্ঞান তাপস অল্প দিনের মধ্যেই সুপরিচিত হয়ে ওঠেন ও বাগদাদের নিযামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এ বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের জ্ঞানচর্চার সোনালী যুগে একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আল-গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে ধর্ম ও দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কিছুদিন পরে কিন্তু তিনি এ একাডেমিক জীবন ছেড়ে জ্ঞানের আরও অন্বেষায় জাগতিক সংসার ত্যাগ করে যাযাবর সন্যাসীর মত বেরিয়ে পড়লেন। এ সময়ে তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। আধ্যাত্মিকতায় তিনি উচ্চ মার্গে অধিষ্ঠিত হলেন। এরপর আবার শিক্ষাজীবনে ফিরে এসেও ঠিকে থাকতে পারলেন না, বরং একাকী জীবন কাটাতে লাগলেন ও লেখালেখির উপর মনোনিবেশ করলেন। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বহু প্রসিদ্ধ পুস্তকের প্রণেতা। ১১১১ সালে বাগদাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইমাম গায্যালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় অবদান ছিল ধর্ম, দর্শন ও সুফী তত্ত্বের উপর। এ সময়ে একাধিক মুসলিম দার্শনিক খুব বেশী করে নিও-প্লেটোনিকসহ গ্রীক দর্শনের অনুসরণ করছিলেন। এর ফলে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে একটা সংঘাতের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। একই সময় সুফীদের ভাবধারা ও কার্যাবলীর উপর ভীষণ চাপের সৃষ্টি হয়। তাঁদের ব্যাপক প্রচারণা ও জনপ্রিয়তা হেতু বিভিন্ন সুলতান ও কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতি ক্ষেপে গেলেন ও তাঁদের পদ্ধতি অবলম্বনে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষতি হবে বলে প্রচারণা শুরু করে দিলেন। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব সমস্যা অবলোকন করে ধর্ম, দর্শন ও সুফিতত্ত্বের মধ্যে যে একটি সামঞ্জস্য নিহিত আছে তা বুঝিয়ে দিতে ব্রত হলেন। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেও একজন উচ্চ মার্গের সুফী ছিলেন।

দর্শনের ক্ষেত্রে ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গণিত ও বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। তবে এ্যারিস্টটেলিয়ান ও নিও-প্লেটোনিক দর্শনের ফলে ইসলামের উপর যে সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছিল তা তিনি দক্ষতার সাথে নির্মূল করতে সক্ষম হন। অন্যান্য সমকালীন মুসলিম দার্শনিক- যেমন ফারাবী ও ইবনে সিনা, এদের চিন্তাদ্বারায় যেসব ভুল ছিল তা তিনি সংস্কার করেন। ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কার্য-কারণ দ্বারা অসীমত্ব ও পরম সত্তাকে প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এগুলোর বাস্তবতা উপলব্ধি সম্ভব, যা হলো সুফীদের রাস্তা। ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কার্য-কারণ ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যতা সন্ধান করেছেন, এবং কার্য-কারণ নীতির সীমাবদ্ধতা সমীমে ও ধর্মের বিস্তৃতি অসীম পর্যন্ত বিদ্যমান আছে বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হন।

ধর্মের ব্যাপারে সুফীতত্ত্বের সীমালংঘনকে তিনি বন্ধ করেন ও ইসলামের মৌলিকত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ, আধ্যাত্মিকতা তথা প্রকৃত হক্বপন্থী সুফীতত্ত্বের গুরুত্ব যে আছে তা তিনি উপলব্ধি করেন। ইমাম গাযযালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মতে আধ্যাত্মিকতা ছাড়া ধার্মিকতা পূর্ণতা লাভ করে না। ধর্মের করণীয় হুকুম-আহকাম হচ্ছে গাছের খোলসের মত আর সত্যিকার হক্বপন্থী সীমালংঘনহীন আধ্যাত্মিকতা তথা সুফী তরীকা হলো ঐ গাছের ভেতর বা আভ্যন্তরীণ অঙ্ক স্বরূপ। সুতরাং ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী

শরিয়তের ভেতরই যে সুফীদের স্থান তা তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ-প্রচার করে গিয়েছেন।

বাস্তবে একমাত্র সুফীদের রাস্তায়ই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বয়ং নিজেও এ পথের পথিক ছিলেন। বিজ্ঞান ও কার্য-কারণ নীতির মাধ্যমে এ সত্যকে আবিষ্কার সম্ভব নয়, কারণ প্রকৃত সত্য অসীমের সাথে সংপৃক্ত আর কার্য-কারণ সসীমে সীমাবদ্ধ।

ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। প্রায় হাজার বছর পূর্বে লিখিত তাঁর বহু গ্রন্থাবলী আজো সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হচ্ছে। তাঁর কালজয়ী পুস্তকগুলোর মধ্যে, "তাহাফুতুল ফালাসিফা" বা "দার্শনিকদের অসংলগ্নতা", "ইহইয়াউ উলুমুদীন" বা "ধর্মবিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ" প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর তাঁর লেখা একটি বই আছে।

ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রভাব আজো বিদ্যমান আছে। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রধান চিন্তাবিদ- ধর্ম ও দর্শন এ উভয় ক্ষেত্রে। তাঁর চিন্তাদ্বারা ইউরোপে ব্যাপকভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অর্থডক্স (মৌলবাদী) খ্রিস্টবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা থমাস একুয়ইনাস ইমাম গাযযালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ধর্মের পক্ষে তাঁর যুক্তি এতই শক্তিশালী ছিল যে, কোন কোন চিন্তাবিদ বলেছেন, এর ফলে দর্শনের উপর বিরাট ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, যা থেকে দর্শন আজো মুক্তি পায়নি। ইমাম গাযযালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চিন্তাদ্বারা ও বর্তমান দর্শনের উপর গভীর অধ্যয়ন করলে এ সত্য সহজে বুঝতে পারা যায়। বাস্তবে আজ পর্যন্ত তাঁর ধর্মের ব্যাপারে হাক্বিকাতের যুক্তির সম্মুখে কোন দর্শন ও বিজ্ঞান চ্যালেঞ্জ করতে অসমর্থ হয়েছে।

আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবনে জোহর (১০৯১ - ১১৬১ খ্রিঃ)

পশ্চিমে ইবনে জোহরকে আবেনজোর নামে অভিহিত করা হয়। মধ্যযুগে এ মুসলমান মনীষী একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হিসেবে সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। মুসলমান চিকিৎসকদের মধ্যে তাঁর অবস্থান বাগদাদের আল-রাজীর পরেই আসে বলে ইতিহাসবিদরা বলেছেন। তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

ইবনে জোহর মুসলিম স্পেনের সেভিলে ১০৯১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুর্দোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন ও এর পরে কিছুদিন বাগদাদ ও মিশরের কায়রোতে অবস্থান করে স্পেনে ফিরে আসেন। সুলতান আব্দুল মুমিনের দরবারে তিনি রাজ-চিকিৎসক ও মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। সেভিল শহরে থেকেই তাঁর কর্মময় জীবন অতিবাহিত করে, ১১৬১ সালে এখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

এ সময়ের অন্যান্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের মত বিভিন্ন শাখায় জড়িত না হয়ে শুধুমাত্র মেডিসিনের উপরই ইবনে জোহর গবেষণা করেন। তবে একটিমাত্র বিষয়ে মনোনিবেশ করায় তিনি এমন কিছু মৌলিক অবদান করেছিলেন যা মানবকল্যাণে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছিল। হিস্টোরী অব মেডিসিনের লেখক ডঃ নিউবার্গার ইবনে জোহর সম্পর্কে বলেছেন, "এ্যানাটমীর উপর ইবনে জোহরের গভীর জ্ঞান ছিল। তাছাড়া তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল চমৎকার।"

চিকিৎসক হিসেবে ইবনে জোহর অনেক নতুন উপায়-উপকরণ উদঘাটন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মানুষকে ওষুধ সেবন করার পূর্বে জীব-জন্তুকে তা সেবন করে পরীক্ষা করে দেখার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা আজো এ উপায় অবলম্বন করে থাকেন।

ইবনে জোহর বহু মূল্যবান বই-পুস্তক লিখেছেন। ডাক্তার ও চিকিৎসকদের জন্য যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি সাধারণ লোকদের ব্যবহারের জন্যও লিখেছেন।

তাঁর অনেক গ্রন্থ লেটিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত এগুলো ইউরোপের সর্বত্র জনপ্রিয় ছিল। তবে এখন মাত্র তিনটি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। "কিতাব আত-তাইছির ফীল মুদাওয়াত ওয়াত তদবীর" বা "ডায়েট ও থেরাপীর উপর সাধারণ পুস্তক" নামে একটি বই ইবনে জোহর, ইবনে রুশদ এর অনুরোধে লিখেন। তাঁর লেখা দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম হলো, "কিতাব আল-ইকিসাদ ফী ইসলাল আনফুস ওয়াল আছজাদ" বা "দেহ ও আত্মার সংস্কারের জন্য মধ্যম পথ অবলম্বনের গ্রন্থ"। মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে অত্যন্ত সরল ভাষায় ইবনে জোহর এ পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইবনে জোহরের লেখা তৃতীয় বইটির নাম হচ্ছে, "কিতাব আল-আগযিয়া" বা "আহার-দ্রব্যাদির পুস্তক"। এ বইয়ে তিনি বহু ড্রাগস ও সঠিক খাবার সামগ্রী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে জোহরের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ প্রভাব সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তারলাভ করে।

আল-ইদ্রিসী (১০৯৯ - ১১৬৬ খ্রিঃ)

আল-ইদ্রিসী পশ্চিমে "ড্রেজেজ" নামে পরিচিত। মুসলিম স্পেনের সিউটা নামক স্থানে ১০৯৯ সনে আল-ইদ্রিসীর জন্ম হয়।

আল-ইদ্রিসীর পূর্ণ নাম বেশ লম্বা- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস আশ-শরীফ। তাঁর অন্য আরেকটি ছোট নাম আছে; আশ-শরীফ আল-ইদ্রিসী আল-কুরতুবী। তবে আমরা তাঁকে আল-ইদ্রিসী বলেই সম্ভোধন করবো।

আল-ইদ্রিসী স্পেনের কুর্দোভায় লেখাপড়া করেন। তিনি ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ইউরোপসহ বহু দেশে ভ্রমণ করেন। তাঁর সময়ের পূর্বেই অনেক মুসলিম বিজ্ঞানী পৃথিবীর আয়তন সুক্ষ্মভাবে পরিমাপ করেন। তখন সমগ্র পৃথিবীর একাধিক ম্যাপও পাওয়া যেত। আল-ইদ্রিসী এসব জানা তথ্য ও নিজের থেকে আবিষ্কৃত আরও তথ্য নিয়ে ভূগোল বিষয়ে বিশেষ উন্নতিসাধন করেন।

তখনকার দিনে পৃথিরীর জানা ভূখণ্ডাবলী ও সাগরসমূহের উপর আল-ইদ্রিসীর জ্ঞান থাকায়, তাঁর কার্যের প্রতি সমুদ্র নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। এর ফলে অচিরেই তিনি সর্বত্র পরিচিত হয়ে উঠেন। তবে আল-ইদ্রিসীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কীর্তি হলো তাঁর সৃষ্ট ৪০০ কেজি ওজনের রূপার একটি ভূ-গোলক। এ গোলকে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ৭টি মহাদেশের বাণিজ্য-পথ, বড় বড় হ্রদ ও নদ-নদী, প্রধান শহরসমূহ, বড় বড় সমতলভূমি, সাগর-মহাসাগর ও পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি অঙ্কন করেন। গোলকের মধ্যে তিনি এসব এলাকার আপেক্ষিক দূরত্বও লিখে দেন। আল-ইদ্রিসী তাঁর এ গোলকের সাথে "কিতাব আর-রুজারী" নামে একখানা বইও প্রকাশ করেন।

আল-ইদ্রিসী "নুযাত আল-মুসতাক ফী ইকতিরাক আল-আফাক" বা "যে আবহাওয়ার উপর দিয়ে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক তার জন্য পরমানন্দ" নামে একটি ভূগোলের বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। তাঁর আরেকটি এরূপ বিশ্বকোষের নাম হলো, "রাওদুন্নাস ওয়া নুযাতান্নাফ্স" বা "মানুষের আনন্দ ও আত্মার পরমানন্দ"। এ বিশ্বকোষদ্বয়ে আল-ইদ্রিসী তাঁর সময় পর্যন্ত ভূগোলের যাবতীয় জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন।

ঔষধী বৃক্ষ-তরু-লতার উপর আল-ইদ্রিসী উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এ বিষয়ে তিনি একাধিক পুস্তক রচনা করেন। তছাড়া তাঁর সময়ে জানা মুসলিম চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাপ্ত জাবতীয় ঔষধ-পত্রের উপর তিনি গবেষণা করেন ও নিজ থেকে আবিষ্কৃত আরও বহু ঔষধ সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষকে জানান। আল-ইদ্রিসী এসব ড্রাগসের কথা তখনকার পৃথিবীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত করেন। আরবি, সিরিয়াক, ফার্সী, সংস্কৃত, গ্রীক ও লেটিন ভাষায় এসব ড্রাগসের নামগুলো তিনি উল্লেখ করেন।

আল-ইদ্রিসী একজন ভৌগোলিক হিসেবে ইউরোপে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁর আগে বা পরে কোন মুসলিম ভৌগোলিকের সেরূপ পরিচিতি ঘটেনি। তাঁর একাধিক পুস্তক লেটিন ভাষায় অনুদিত হয়, এবং এগুলো কয়েক শতবছর ইউরোপীয় নাবিকরা সমূদ্রপথে চলার জন্য ব্যবহার করেন। আমেরিকার কথিত আবিষ্কারক ক্রিষ্টোফার কলোম্বাস আল-ইদ্রিসীর তৈরী মানচিত্র ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানে উল্লেখ্য, আল-ইদ্রীসি আমেরিকা সম্পর্কে না

জানলে তাঁর মানচিত্রে আমেরিকার নক্সা এল কোত্থেকে? সুতরাং একথা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকার আবিষ্কাকর মুসলমানরা ছিলেন। কলোম্বাস অনেক পরে সেখানে সমুদ্রপথে গিয়ে পৌঁছেছিলেন মাত্র। ১১১৬ সালে এ প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা আন্দালুচিয়ার উপর লিখিত আলাদা পরিচ্ছেদে স্পেনের মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার উপর আরও আলোকপাত করেছি। আল-ইদ্রীসিসহ আরও কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানীর কথা সেখানেও বর্ণিত হয়েছে।

আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ (১১২৮ - ১১৯৮ খ্রিঃ)

"মহান মন্তব্যদাতা" নামে খ্যাত এ মুসলমান বিজ্ঞানীকে পশ্চিমে 'আভেরস' বলে ডাকা হয়। বিজ্ঞান ও দর্শনে ইবনে রুশদের প্রভাব আজো স্থায়ী আছে। তাঁর সুন্দর জীবন একজন আদালতের সম্মানিত জজ হিসেবে কাটে। তবে তিনি ডাক্তার হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ্যারিষ্টটলের দর্শনের উপর আলোচনা-সমালোচনা ও মন্তব্য ছিল সুদূরপ্রসারী এবং বিশেষ করে ইউরোপে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ইবনে রুশদের দার্শনিক চিন্তাধারা মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা কট্টরপন্থী রক্ষণশীল পাদ্রীদের মনকে পর্যন্ত কম্পিত করতে সক্ষম হয়। খ্রিস্টান মৌলবাদী দার্শনিক সেন্ট থমাস এ্যাকুনাসের মত ব্যক্তিও এ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। একই সময়ে মানুষ ইবনে রুশদ এর নিকট মেডিসিনের জন্য এবং আইনের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে যেত।

হিজরী ৫২০ সনে (১১২৮ খ্রিস্টাব্দ) স্পেনের কুর্দোভায় একটি সভ্রান্ত সুশিক্ষিত মুসলিম পরিবারে ইবনে রুশদ এর জন্ম হয়। তিনি ধর্ম, মেডিসিন, গণিত ও দর্শন শাস্ত্রের উপর লেখাপড়া করেন। ইবনে বাজা ও আবু জাফর হারুন নামে দু'জন পন্ডিতের নিকট ইবনে রুশদ দর্শন অধ্যয়ন করেন।

সাতাশ বছর বয়েসে ইবনে রুশদকে মরোক্কোর মারাকাস শহরে ইসলামী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানকার সুলতান ইউসুফের অনুরোধে, ইবনে রুশদ ও আরেক প্রসিদ্ধ দার্শনিক ইবনে তোফায়েল, এ্যারিষ্টটলের দর্শনের উপর গবেষণা আরম্ভ করেন।

৪৪ বছর বয়েসে ইবনে রুশদকে সেভিলে জজ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ বছরই তিনি এ্যারিষ্টটলের "ডি এ্যানিমা" বা "জন্তু" বইটি আরবিতে অনুবাদ করেন। দু'বছর মারাকাসে অবস্থান করে তিনি নিজ জন্মস্থান কুর্দোভায় ফিরে আসেন ও এখানেই পরবর্তী ১০ বছর জজ হিসেবে কাজ করেন। ইবনে রুশদ এ সময়ে এ্যারিষ্টটলের উপর মন্তব্য ও অধিবিদ্যার গবেষণা শুরু করেণ।

ইবনে রুশদ ইসলামের শরীয়ত ও ফেকাহ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যার ফলে তাঁকে প্রধান কাজীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ইবনে রুশদ বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্মজ্ঞানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সন্ধান করেছেন। তাঁর পূর্বে ইবনে সিনাও এ সন্ধানে ব্রত ছিলেন। এ হিসেবে ইবনে সিনার প্রভাব তাঁর মধ্যে বেশ প্রবল ছিল বলা যায়। ইবনে রুশদ বহু পুস্তক রচনা করেছেন। ফ্রান্সের দার্শনিক রেইনার মতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৭৮ খানা পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন।

ইবনে রুশদ সম্পর্কে ভাল করে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর কিছু লেখা একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করা যায়ঃ "যদি কেহ মানবদেহ সম্পর্কে গবেষণা করে, তবে অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহর প্রতি তার ঈমান সহজেই বৃদ্ধি পাবে।" তাঁর মেডিক্যাল ও দর্শনের উপর লেখার মধ্যে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আলোচনায় কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি দিয়েছেন বলে দেখা যায়।

ইবনে রুশদ বলেন, মানুষ সত্যিকার শান্তি অর্জন করে মানসিক অবস্থা ও হৃদয়কে সুস্থ রাখার মাধ্যমে। আর এ সুস্থতা অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর একত্বের প্রতি গভীর ঈমান আনয়ন। ইবনে রুশদ আরও বলেছেন, ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা। এ উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে দু' ধরনের পথ অবলম্বন করতে হবেঃ (১) আইন-বিজ্ঞান, যার আওতাভূক্ত হলো মানবজীবনের ব্যবহারিক বস্তু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি, ও (২) আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান- এতে আছে ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, নৈতিকতা, পারলৌকিক শান্তির অন্বেষা প্রভৃতি বিষয়াদি। আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে তিনি তাক্বওয়া বা ধার্মিকতা ও প্রভুভীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, যা পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।

দর্শনে ইবনে রুশদ এর লেখা বই "তাহাফুতুল তাহাফুত" বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করে। তিনি ইমাম আল-গাযযালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ পুস্তকে তিনি বলেছেন, নিজের ভাগ্যের উপর মানুষের ক্ষমতা সীমিত, আবার তার জীবন সম্পূর্ণরূপে পূর্বে-নির্ধারিতও নয়। বলাই বাহুল্য, ইবনে রুশদের এসব মন্তব্য বহু মুসলিম লেখকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

ইবনে রুশদ এ্যারিষ্টটলের উপর "জামি", "তালকিস" ও "তাফসীর" এ তিনটি বই লিখেন। পাঠক বা শিক্ষার্থীদের যোগ্যতানুসারে এ বইগুলো লেখা হয়েছিল। প্রথমটি ছিলো দর্শনের নভিস ছাত্রদের জন্যে, দ্বিতীয়টি মাধ্যমিক ও তৃতীয়টি উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে লেখা। শেষের বইটি ছিল সর্বাপেক্ষা বড়ো আকারের ও এতে কুরআন শরীফ থেকে বহু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

ইবনে রুশদ এর প্রভাব বিশেষ করে ইউরোপে স্থায়ীভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রফেসার বামেট তাঁর লেখা, "মুসলিম কনট্রিভিউশন টু সিভিলাইজেশন" পুস্তকে বলেছেনঃ "সেন্ট থমাস এ্যাকুইনাস ছিলেন মহান ব্যাখ্যাদাতার (ইবনে রুশদকে পশ্চিমে 'দ্যা গ্রেট কমেন্টেটর' বলে আখ্যায়িত করা হতো) প্রথম শিষ্য। আলবার্ট আলাগনাস ইবনে সিনহার কাছে ঋণী ছিলেন, এবং থমাস এ্যাকুইনাস প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইবনে রুশদ এর নিকট ঋণী আছেন। এটা জোর করেই বলা যায় যে, মুসলিম দার্শনিক বিশেষ করে ইবনে রুশদ এর প্রভাব সর্বপ্রধান ক্যাথলিক ধর্ম-সংস্কারকদের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল।"

ইবনে রুশদ দ্বাদশ শতাব্দির সর্বাপেক্ষা প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর প্রভাব দ্বাদশ থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাঁর বইগুলো কয়েক শত বছর যাবৎ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক যুগে পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তার পূর্ব পর্যন্ত ইবনে রুশদ এর লেখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হতো। ১৮৩১ সাল পর্যন্ত মেক্সিকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইবনে রুশদ এর উপর গবেষণা হয়েছে।

নূরুদ্দিন ইবনে ইসহাক আল-বিরতুজী (মৃত্যুঃ ১২০৪ খ্রিঃ)

আল-বিরতুজীর জন্ম হয় মরোক্কোয়। পরে তিনি স্পেনের সেভিলে চলে আসেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করেন। তাঁর জন্মের তারিখ ঠিক জানা যায়নি, তবে ১২০৪ সনে সেভিলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আল-বিরতুজী তখনকার দিনের একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দিতে তাঁর লেখা পুস্তক, "কিতাব আল-হায়া" ইউরোপে জনপ্রিয় ছিল। বইটি প্রথমে হিবরু ভাষায় অনুবাদ হয় এবং পরে লেটিনে ভাষান্তরিত হয়। এ পুস্তকে আল-বিরতুজী টলেমীর সৌরজগৎ সম্পর্কিত তথ্যকে সংস্কার করতে চেষ্টা করেন কিন্তু, এ্যারিষ্টটলের গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণ পথ নির্ভুল বৃত্তাকার বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এর ফলে তাঁর থিওরী পরবর্তীতে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণ পথ যে বাস্তবে ডিম্বাকৃতি (এলিপটিক্যাল), তা নিকোলাস কোপারনিকাস নামে একজন পোলিস (পোল্যান্ডের) বিজ্ঞানী চতুর্দশ শতাব্দিতে প্রমাণ করেন। তবে আল-বিরতুজীর সময়েই অন্যান্য মুসলমান বিজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছিলেন।

সৌরজগৎ নিয়ে লেখা আল-বিরতুজীর এ পুস্তকে বর্ণিত তথ্যাবলী যদিও নির্ভুল ছিল না, তথাপি তাঁর অবদান বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে বলা যায়। আল-বিরতুজী প্রমুখ মুসলিম বিজ্ঞানী যদি এসব চর্চা অব্যাহত রাখতেন না তবে বিজ্ঞানের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো। আল-বিরতুজীর অবদানকে তাই মানব স্মৃতিতে সংরক্ষিত করার লক্ষ্যে ১৮৩৭ সালে চন্দ্রের উপর স্থাপিত ২৬ মাইল ব্যাস পরিমিত একটি আগ্নেয়গিরির মুখের (ক্রেটার) নামকরণ করা হয়,"আলপেট্রাজিয়াস" [ইউরোপে আল-বিরতুজী এ নামেই পরিচিত]।

ইবনে খালদুন (১৩৩২ - ১৩৯৫ খ্রিঃ)

সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস শাস্ত্রের জনক নামে খ্যাত সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুনের পূর্ণ নাম হলো, আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ। তবে ইবনে

খালদুন নামেই তিনি বেশী পরিচিত। ৭৩২ হিজরীতে (১৩৩২ ইং সনে) তিউনিস (তিউনিসিয়া) শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পরিবার স্পেনের সেভিল থেকে এখানে এসেছিলেন। অষ্টম শতাব্দিতে তাঁর পূর্বপুরুষরা ইয়েমন থেকে স্পেনে আগমণ করেন। তাঁর জীবনের প্রাথমিক বছরগুলোতে নিজ সভ্রান্ত পরিবারের আধিক্য তিউনিস শহরে (তিউনিসিয়া), কিরূপ প্রভাবশালী ছিল তা তিনি অবলোকন করেন। উত্তর আফিকা ও স্পেনের মুসলিম শাসক ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের আগমন হতো তাঁদের পারিবারিক বাড়িতে। অনেকে আশ্রিত হয়েও আসতো। এদের সান্নিধ্যের প্রভাব স্বভাবতই ইবনে খালদুনের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

ইবনে খালদুন তিউনিস ও ফেজ নামক স্থানে লেখাপড়া করেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের উপর গভীর জ্ঞানার্জন করেন। মালিকী মাজহাবে ফিকহ ও শরীয়তের উপরও তিনি অধ্যয়ন করেন। আরবি সাহিত্য, দর্শন, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপরও তাঁর জ্ঞান ছিলো। কৈশোরেই ইবনে খালদুন মিশরের শাসনকর্তা সুলতান বারকুখ এর দরবারে চাকুরী গ্রহণ করেন।

রাজনীতিতে অনেকদিন সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার পর, শেষ পর্যন্ত ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, "মুক্বাদ্দিমা" বা "প্রবর্তন" রচনার কাজে হাত দেন। তিনি মরোক্কোর তিউনিস ও ফেজ শহরে, মুসলিম স্পেনের গ্রেনাডায় এবং উত্তর আফ্রিকার বায়াজা শহরে কাজ করেন। উত্তর আফ্রিকার রাজনীতিক গোলযোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ১৩৭৫ সালে ইবনে খালদুন গ্রেনাডায় চলে আসেন। কিন্তু অতীত জীবনে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকায় এখানকার সুলতান তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেন।

এরপর তিনি আলজেরিয়ার ক্বালাত ইবনে সালামা নামে একটি ছোট্ট গ্রামে প্রায় আত্মগোপন করে, চার বছর কাটান। আর এখানেই তিনি মুক্বাদ্দিমা রচনা করেন। এ ইতিহাসের পুস্তকের কারণেই ইবনে খালদুন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইবনে খালদুনের জীবনে তখনও শান্তি ফিরে আসেনি। কারণ, উত্তর আফ্রিকা আবার রাজনীতিক গোলযোগে সরগরম হয়ে ওঠে। তাই ইবনে খালদুন এখান থেকেও পালিয়ে গেলেন, এবং শেষ পর্যন্ত মিশরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। এখানে আসার পর ইবনে খালদুনের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। কিছুদিনের

মধ্যেই তিনি বিচারক হিসেবে আদালতে কর্মরত হলেন ও একই সময় প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আল-আযহার-এ লেকচারার হিসেবে যোগ দিলেন।

ইবনে খালদুনের লেখা মুক্বাদ্দিমা গ্রন্থটি হচ্ছে, ইতিহাস ও সামাজবিজ্ঞানের দর্শনের উপর একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ পুস্তকের বিষয়স্তুর ফোকাস হচ্ছে, মানবেতিহাসের অগ্রগতির ধারায় মনন, অর্থনীতি, পারিপার্শ্বিক এবং সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করা। ইবনে খালদুনের পূর্বে কেউই এসব সত্য উদঘাটন করতে পারেন নি। তাঁর মতে ইতিহাস ও সভ্যতা এসব বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। তিনি মানব সভ্যতার উত্তান-পত্তন নিয়ে গবেষণা করে, এর কারণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন।

ইবনে খালদুনের এ নতুন আকর্ষণীয় সমাজবিজ্ঞানের চিন্তাদ্বারা মুসলমান ও পশ্চিমা শিক্ষিত সমাজে সাড়া জাগায়। ইবনে খালদুন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে কয়েকটি ব্যাপারে আলোচনা করেন, যেমনঃ (১) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘনটা কিরূপ হয়ে থাকে, (২) অতীত ও বর্তমান নিয়ে গবেষণা, (৩) পারিপার্শ্বিক প্রভাবের গুরুত্ব ও (৪) মানুষের জীবনে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আর্থিক অবস্থা কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রভৃতি।

ইতিহাস অধ্যয়নের সঠিক পন্থা ইবনে খালদুনই আবিষ্কার করেছেন। মানবসভ্যতার উপর ধারাবাহিক অধ্যয়নের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার একটি সুন্দর উপায় তিনি বলে গেছেন। সভ্যতার শুরু, অগ্রগতির কারণ ও উহার পতন কেন হয়, প্রভৃতি ইবনে খালদুন পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তিনি একটি নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দেন, যাকে আজ আমরা সোসিয়োলোজি বা সমাজবিজ্ঞান বলি।

ইতিহাসের দার্শনিক স্বরূপ ব্যক্ত করতে যেয়ে ইবনে খালদুন বলেন, এটা হলো কার্যকারণ ও প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভরশীল। তাঁর এ মতামতের কারণে অনেকে তাঁকে ধর্মজ্ঞানের বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে তিনি যুক্তিবাদের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে ইবনে খালদুনের উপর তাঁদের এ ধারণা ভিত্তিহীন। এর কারণ হলো, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তিহীনতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা হয়ে থাকে, তথাপি এটা ইসলামের ক্ষেত্রে মোটেই

প্রযোজ্য একটি শিক্ষাব্যবস্থা নয়। ইসলাম মানুষকে যুক্তি, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও চিন্তাভাবনার জন্যে তাগিদ দিয়েছে। অবিশ্বাসীদেরকে ইসলাম স্মরণ করে দেয় যে, তারা যুক্তির মাধ্যমে চিন্তা করে না। এ ব্যাপারে কুরআন মানুষকে শত শত আয়াত দ্বারা জগত, মানুষ, সমাজ প্রভৃতি নিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করার কথা বলেছে। বস্তুতঃ প্রভুকে জানতে ও চিনতে পারার উপায়ই হচ্ছে চিন্তা-গবেষণা। ইবনে খালদুন ধর্মবিরোধী মন্তব্য পেশ করেছেন বলে যে গুজব উঠে তা ছিলো, মূলত হিংসাপরায়ণ কিছু অ-মুসলিমদের অপ-তৎপতরতা। আসলে তাঁর চিন্তাদ্বারা কুরআন-হাদীসের আলোকেই পরিস্ফূটিত হয়েছিলো।

ইবনে খালদুন বলেন, মানব সভ্যতার সত্যিকার অগ্রগতি হয় সঠিক ইতিহাসের জ্ঞান থেকে। এ জ্ঞানার্জনে ইতিহাসবিদদের কিছু মৌলিক উপায় অবলম্বন করতে হবে, যথাঃ- তাঁদেরকে শুধুমাত্র শাসক, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দেশ সৃষ্টি ও ধ্বংস এবং সৈন্য সামন্তের ইতিহাস লিখলেই হবে না। সত্যিকার ইতিহাসে যাবতীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনাসহ সাধারণ মানুষের কথাও থাকতে হবে। সর্বোপরি ইতিহাস লেখকদেরকে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হতে হবে। ইতিহাস বিকৃতির মত জঘণ্য অপকর্ম সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। ইতিহাস একটি স্থায়ী স্তম্ভের মতো, যা থেকে মানবজাতি ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতিসাধন করতে উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং বিকৃত ইতিহাস মানুষের দিকনির্দেশনাকে ভ্রষ্ট করে দিতে পারে। রাজনৈতিক, সামাজিক বা আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্যেশ্যে যাঁরা ইতিহাস লিখে তাঁরা মানবতার সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন। ইবনে খালদুন অত্যন্ত জোরালোভাবে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ইবনে খালদুনের জীবদ্দশায়ই মুক্বাদ্দিমা গ্রন্থটির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। তবে তাঁর লেখা এটাই একমাত্র প্রসিদ্ধ পুস্তক নয়। তিনি আরোও বহু পুস্তকের প্রণেতা ছিলেন। এর মধ্যে ইতিহাসের উপর লেখা "কিতাব আল-ইবার" সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এতে আরবদের ইতিহাস, সমকালীন মুসলমান ও ইউরোপিয়ান শাসকবর্গ, আরব, ইহুদি, রোম ও পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, মিশরের ইতিহাস এবং উত্তর আফিকার ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়। ইবনে খালদুন, "আত-তাসরীফ" নামে আত্মজীবনীমূলক একটি বই প্রকাশ করেন। এ পুস্তকটির ফলে আত্মজীবনী লেখার প্রচলনও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গণিত শাস্ত্রের উপরও

তাঁর একটি বই প্রকাশ হয়েছিল। ১৩৯৫ সালে এ মহান মুসলিম জ্ঞান-সাধকের মৃত্যু হয়।

মুহাম্মদ তারগাই উলুগ বেগ (১৩৯৩ - ১৪৪৯ খ্রিঃ)

উলুগ বেগ ছিলেন তুর্কীস্তানের সুলতান তিমুর (পশ্চিমে যাকে তামেরলেইন বলা হয়)-এর নাতী। উলুগ বেগ পঞ্চদশ শতাব্দির একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গাণিতিক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শাহ রুখ, যিনি তিমুর বংশের একজন বাদশাহ ছিলেন। সেন্ট্রাল এশিয়ার সুলতানিয়া নামক স্থানে ১৩৯৩ সালে উলুগ বেগের জন্ম হয়। মুসলিম সভ্যতার একটি প্রসিদ্ধ নগরী সমরকন্দ। এ শহরের খ্যাতি উলুগ বেগ-এর প্রচেষ্টায়ই অর্জিত হয়েছিল। তিনি এখানে ১৪২৪ সালে একটি উচ্চ পর্যায়ের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ শিক্ষাকেন্দ্রে ইসলামী লেখাপড়া ছাড়াও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপর শিক্ষা দেওয়া হতো। বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য এটা প্রসিদ্ধ ছিল।

এরপর ১৪২৮ সালে উলুগ বেগ সমরকন্দে তিন তলাবিশিষ্ট একটি জাঁকজমকপূর্ণ অবজারভেটরী (মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র) তৈরীর কাজে হাত দেন। এ অবজারভেটরীটি সুবৃহৎ ছিলো- যার ব্যস ছিল ২০০ ফুট চওড়া, আর উচ্চতা ১২০ ফুট। আলী কুদসী নামে একজন মুসলমান বিজ্ঞানীকে এ অবজারভেটরীর ডাইরেক্টর করা হয়। আল-কাশী ও খাদিজাদাসহ বেশ কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এ অবজারভেটরীতে গবেষণা করেন।

উলুগ বেগ তখনকার দিনে প্রাপ্য উত্তম জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি এ অবজারভেটরীতে সংগ্রহ করেছিলেন। ১৪৩৭ সালে উলুগ বেগ "ঝিদযী যাদীদ সুলতানী" নামে একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেন। এ পুস্তকে তিনি আকাশের তারকাগুলোর একটি ক্যাটালগ (তালিকা) তৈরী করেন, যা ছিল তারকাদের উপর সুদূর প্রসারী উন্নতমানের একটি ক্যাটালগ। এতে তারাদের নাম, অবস্থান ও উজ্জ্বলতার মান (মেগনিচিউড) প্রভৃতি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়। উলুগ বেগের এ ক্যাটালগটি ১৯১৭ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

উলুগ বেগ বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘা ৪৯ মিনিট ১৫ সেকেন্ড বলেন, যা ছিল অত্যন্ত সঠিক। এছাড়াও তিনি গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণ গতিপথের উপর তালিকা তৈরী করেন। এগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। চারটি উজ্জ্বল গ্রহঃ বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতির মহাশূণ্যে বাৎসরিক ভ্রমণ সম্বন্ধে উলুগ বেগ গবেষণা করেন। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যাবলী আজো গ্রহণযোগ্য বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

১৪৩৭ সালে তিনি আরেকটি তারার ক্যাটালগ তৈরী করেন। এ নতুন ক্যাটালগে সর্বমোট ৯৯২টি তারার অবস্থান ও উজ্জ্বলতার মাত্রা সন্নিবেশিত হয়। একজন সুদক্ষ গাণিতিক হিসেবে তিনি সাইন ও কো-সাইন (গণিতের ট্রিগোনোমেট্রির শাখা) টেবিল সৃষ্টি করেন। এটি আটটা ডেসিমেল পয়েন্ট পর্যন্ত সঠিক ছিল।

তিন বৎসর তুর্কীস্থানের শাসক হিসেবে থাকার পর, ১৪৪৯ সালে উলুগ বেগ এক আততায়ীর হাতে নিহত হন। এ দুঃজনক ঘটনার পর সমরকন্দের অবজারভেটরীর গুরুত্ব হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে এ ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১৯০৮ সালে রাশিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদরা এটির অবস্থান নির্ণয় করেন। বলাই বাহুল্য ইউরোপে ব্যাপক বিজ্ঞান চর্চা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বিজ্ঞানের ইতিহাসে উলুগ বেগের নামই সবশেষে আসে। তাঁকে হত্যা করে যেন ইসলামের বৈজ্ঞানিক যুগকেই হত্যা করা হলো। তাঁর পর থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত আর কোন সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম খুঁজে পাই না। পশ্চিমা বিজ্ঞানের চরম চেতনা যেন মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও গবেষণাকে তখন থেকে একরূপ প্যারালাইজড্ করে ফেলল।

“মহান তিনি, (যিনি) আকাশে তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, এবং তাতে প্রদিপ্ত সূর্য ও উজ্জ্বল চন্দ্র স্থাপন করেছেন। যারা গ্রহণ করতে চায় অভিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা তাদের জন্য দিন ও রাতকে পরস্পর পশ্চাদগামী (করে) সৃজন করেছেন। রাহমানের (আল্লাহর) দাস তারা, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে (আল্লাহর) শুকরিয়া আদায় করে” [সূরা ফুরক্বান ঃ ৬১-৬৪]।

পরিচ্ছেদ- ৩

মুসলিম স্পেনে বিজ্ঞানচর্চা

মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি কিভাবে অনেক মুসলিম বিজ্ঞানী দীর্ঘ ৮০০ বছরব্যাপী বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে পৃথিবীকে উপহার দিয়ে গেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিরাট ভাণ্ডার। তবে বিজ্ঞানের উপর এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় মুসলিম স্পেন একটি আলাদা পরিচ্ছেদের দাবী রাখে। এর দু’টি কারণ বিদ্যমান। একটি হলো, মুসলিম স্পেনে বিজ্ঞানচর্চা ছিলো ব্যাপক ও অপরটি হচ্ছে স্পেনের উন্নত মুসলিম সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে পশ্চিম ইউরোপ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত হয়েছিল। আসলে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান পশ্চিমে মুসলিম স্পেনের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ইউরোপীয় রেঁনেসার জন্ম যে পুরো মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলাফল ও বিশেষকরে আন্দালুচিয়া বা মুসলিম স্পেনের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল, তা পাঠকদেরকে সম্যক জ্ঞাত করতে যেয়ে এ আলাদা পরিচ্ছেদের অবতারণা।

ঐতিহাসিক সত্য

ইসলামী সভ্যতা ছিলো সার্বিকভাবে কিতাবী জ্ঞানের সুফল। অর্থাৎ কুরআন-হাদীস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষণা দ্বারা যে সুফল বেরিয়ে এসেছিল তা সমাজে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় এক উন্নততর সমাজব্যবস্থা। এরূপ উন্নত সভ্যতা ইতোমধ্যে ধরার বুকে কেউ দেখে নি। মুসলিম বুদ্ধিভিত্তিক

পরিমণ্ডলে তাই কিতাব বা গ্রন্থাদি ছিল সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিস। প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নে বর্ণিত ঐতিহাসিক কিছু তথ্যাদি তুলে ধরতে পারি।

নবম শতকে ইউরোপে সেন্ট-গোল এর 'দ্যা লাইব্রেরী অব মনাস্টারী' ছিলো সর্ববৃহৎ পাঠাগার। এতে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল মোট ৩৬টি ভলিয়ম! একই সময় কুর্দোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ে গন্থের সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। তবে শুধু কিতাবই যে আন্দালুসিয়ান মুসলিম সভ্যতার উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিলো তা কিন্তু মোটেই নয়। ইসলামী সভ্যতার মূলে যে জিনিসটি মূখ্য ছিলো এবং আজো আছে তাহলো, পরমতসহিষ্ণুতা। অন্য কালচার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি সর্বদাই ইসলাম শ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অসংখ্য গ্রন্থাদি মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে এসে শুধু সংরক্ষিত হয় নি, এগুলো উন্নততর হয়েছে। মুসলমানরা যদি এ কাজটি আঞ্জাম না দিতেন তাহলে গ্রীকসহ পুরনো সভ্যতার অনেক কিছুই হারিয়ে যেত-সেসাথে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গবেষণার সুফল থেকেও পৃথিবীর মানুষ বঞ্চিত থাকতো- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মুসলিম জ্ঞানচর্চার সাক্ষর বহন করছে আজকে প্রাপ্ত প্রায় ২,৫০,০০০ পাণ্ডুলিপি, যা প্রাচ্য ও প্রতিচীর বিভিন্ন লাইব্রেরী ও ব্যক্তিগত কালেকশনে রক্ষিত আছে। এ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, হয়তো আরোও লক্ষাধিক বই-পুস্তকের খবর আমরা জানি না। এগুলো কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে- এসাথে হারিয়ে গেছে কত অজানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও তথ্যাদি। সুতরাং বাস্তব কথা হলো, ৮০০ বছরের মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার সিংহভাগই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এগুলো থাকলে বিজ্ঞানের ইতিহাস অবশ্যই অন্যরকম লিখতে হতো। যা হউক, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে স্পেনের আন্দালুসিয়ায় মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বরূপ কত ব্যাপক ছিল তার চিত্র এখন সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি।

ইতিহাসের পাতা থেকে

মধ্যযুগীয় স্পেনিশ খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি কিংবদন্তী ছিল। ভিসিগথদের শেষ রাজা রডেরিক মুসলমানদের কর্তৃক আইবেরিয়ান উপদ্বীপ দখল হওয়ার জন্য দায়ী ছিলেন। এর কারণ হিসেবে তারা বলতো, রাজা নিজের ওয়াদা রক্ষা করতে ব্যর্থ

হয়েছিলেন। আর এ ওয়াদা ছিল 'একটি যাদুকরী রাজপ্রাসাদ' এর গেইট তিনি কোনদিন খুলবেন না। অথচ তিনি তা খুলে ফেলেন।

যা হউক, পশ্চিমা জগতের জন্য মুসলমানদের কর্তৃক স্পেন দখল অবশ্যই একটি বিরাট নিয়ামত ছিল। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'যাদুকরী প্রাসাদের' তোরণ খুলে যেয়ে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ আলোকিত ইতিহাসে পদার্পন করে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কুখ্যাত ভেণ্ডেলস্, হান্স ও ভিসিগথরা পুরো আইবেরিয়ান উপদ্বীপে হত্যাযজ্ঞসহ ধ্বংসলীলা ঘটায়। তারা সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে। তারা প্রতিষ্ঠিত করে একটি রাজ্য যা মূলত লুটতরাজের উপর চলতো। তারপর স্পেনের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন হলো। মুসলিম আরবরা ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন দখল করলেন। এখানে স্থায়ীভাবে তাদের নিবাস গড়ে তুললেন।

প্রাথমিক যুগে আন্দালুসিয়া উমাইয়্যা খিলাফতের শাসনাধীন থেকে ধাপে ধাপে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়। এরপর আব্বাসীদের কাছে বাগদাদে খিলাফত হারিয়ে যাওয়ার পর উমাইয়্যারা স্পেনে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমতঃ তারা কুর্দোভা শহরে গড়ে তুলেন মুসলিম স্পেনের শিক্ষাকেন্দ্র। আব্বাসী খিলাফতকালীন সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও স্কলাররা কুর্দোভায় এসে তাঁদের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে থাকেন। এ থেকে কালে কুর্দোভা আন্দালুসিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শহরে পরিণত হয়, যেখানে উন্নত একটি সতেচন, শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে।

ইসলামী সভ্যতা ছিলো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক, জ্ঞানচর্চানির্ভর কৃষ্টি। এর মূলে ছিলো বই-পুস্তরের প্রতি অত্যধিক কদর- যা আরও সতেজ ও গতিশীল হয়ে ওঠে যখন ৭৫১ সালে চীনে কাগজ আবিষ্কৃত হয়ে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কাগজের সদ্যবহার এমন ব্যাপকভাবে শুরু হলো যে, ইতোমধ্যে এরূপ জ্ঞানচর্চা ইতিহাসে কখনও দেখা যায় নি। রোম ও লেটিন পশ্চিমে বই-পুস্তক প্রাপ্তি তখনও ছিলো অনেক কঠিন ও মূল্যসাপেক্ষ। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে গ্রন্থাদি হয়ে ওঠে সবার প্রাপ্য ও অপেক্ষাকৃত সস্তা। বাস্তবে, মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হলেও, অনেকদিন যাবৎ পশ্চিমে এই কাগজের ব্যবহার শুরু হয় নি। এর ফলে দামী চামড়ার (পার্চমেন্ট) মধ্যে লিখিত বই-পুস্তক শুধুমাত্র ধনাঢ্যদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দ্বাদশ শতাব্দিতে কোন এক

ব্যক্তি 'বুক অব আওয়ারস্' নামক একখানা গ্রন্থ ক্রয় করতে যেয়ে ১২০ একর জমি বিক্রি করেছিলেন!

বাস্তবে পশ্চিম ইউরোপ ও প্রাচ্যের মধ্যে সভ্যতা ও কৃষ্টিগত পার্থক্য ব্যাপক হওয়ার একটি প্রধান কারণই ছিলো এই কাগজের ব্যবহার। মুসলিম বিশ্বসহ সমগ্র প্রাচ্য যখন ব্যাপক হারে কাগজের ব্যবহার করছিলো, ঠিক তখন পশ্চিমা জগৎ তা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এর ফলে তাদের সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটতে বিলম্ব হয়। তবে আন্দালুচিয়াসহ পুরো মুসলিম বিশ্বে শুধুমাত্র কাগজের ব্যবহারের ফলে জ্ঞানচর্চার প্রতিটি ফিল্ডে ইতিহাসের চরম উন্নয়ন ঘটেছিল তা বলা মোটেই বাস্তবসম্মত হবে না। কুর্দোভার রাজপ্রাসাদে (আল-হামরাহ) মুসলিম / অমুসলিম সবাইকে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সমভাবে স্বাগত জানানো হতো। ইহুদি-খ্রিস্টানরা খোলামেলাভাবে মুসলমানদের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে পারতেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় একদা এক উচ্চপদস্থ পাদ্রী এই বলে অভিযোগ তুলেন যে, 'খ্রিস্টান নতুন প্রজন্ম আরবি ভাষা শিখতে খুব বেশী আগ্রহশীল হয়ে পড়েছে। অথচ তাদের উচিত, লেটিন ভাষা শিক্ষা করা।' পাদ্রীর এই অভিযোগ থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, তখনকার দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হয়ে ওঠে আরবি- যা আজকের দিনে এসে ইংরেজি হয়ে গেছে।

আন্দালুচিয়ায় মুসলিম জ্ঞানচর্চা

আন্দালুচিয়ান সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হয় যখন আব্দুর রহমান ২য়, কুর্দোভার শাসক নিযুক্ত হন। জ্ঞানচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুরু হয় এক অবিশ্বাস্য বিপ্লব। মুসলিম- ও স্বল্পসংখ্যক ননমুসলিমসহ সবাই এই বিল্পবে সামীল হয়ে আন্দালুচিয়া তথা কুর্দোভা শহরকে ইউরোপের আলোতে রূপান্তরিত করেন। এই আলোর ঔজ্জ্বল্য সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে দান করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূর্যালোক সদৃশ রৌশনী- যা থেকে জন্ম নেয় ইউরোপীয় রেঁনেসা।

আব্দুর রহমান ২য়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কালচারেল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন বাগদাদের সঙ্গে। আন্দালুচিয়াকে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী করতে তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা চালান। চিন্তাশীল মনীষী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানীদের তিনি হায়ার করে নিয়ে আসেন।

জ্ঞানচর্চার বদলে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। আব্দুর রহমানের এই ওফার বিফলে যায় নি। প্রাচ্যের অনেক প্রসিদ্ধ স্কলার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষকরা মুসলিম স্পেনে হিজরত করেন। এর ফলে আন্দালুচিয়ায় গড়ে ওঠে সুদূরপ্রসারী একটি ইন্টেলেকচুয়াল কালচার- যা পরবর্তী ৪০০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

আব্দুর রহমানের প্রচেষ্টার সুফল অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্বায়ী প্রভাব ফেলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগামী মুসলিম স্পেনের সর্বত্র অচীরেই গড়ে ওঠে অসংখ্য লাইব্রেরী, মসজিদ, হাসপাতাল, গবেষণা প্রতিষ্ঠন ইত্যাদি। এতে প্রাচ্যের প্রসিদ্ধ স্কলাররাও ঝাঁকে ঝাঁকে স্পেনে এসে হাজির হন। এদের আগমনের ফলে প্রাচ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী সুদূর আন্দালুচিয়া পাড়ি জমায় প্রসিদ্ধ প্রফেসরদের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার আশায়। সে যুগে প্রসিদ্ধ কোন শিক্ষকের সুহবত ও তার কাছ থেকে শেখার আশায় বিশাল মুসলিম বিশ্বের দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শহরে গমনাগমন স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বস্তুতঃ তখন মুসলিম বিশ্বে শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। শিক্ষার প্রতি সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে ছিলো বিশেষ অনুরাগ- যা দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকের মুসলিম বিশ্বে তেমনটি দেখা যায় না।

আব্বাস ইবনে ফিরনাস (মৃঃ ৮৮৮ খ্রিঃ)

প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের মধ্যে আব্বাস ইবনে ফিরনাসের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি যদি তখনকার মেডিসি অঞ্চলের 'ফ্লরেন্স' শহরের বাসিন্দা হতেন তাহলে তাকেই হয়তো 'রেঁনেসার জনক' বলে ইতিহাসের পাতায় ঘোষণা করা হতো। প্রাথমিক জীবনে তিনি সঙ্গীতের উপর গবেষণা করেন। কিন্তু কুর্দোভার ইন্টেলেকচ্যুয়াল আলো-বাতাস তাকে একটিমাত্র জ্ঞানচর্চায় আবদ্ধ রাখতে পারে নি। অচীরেই তিনি 'আকাশ ভ্রমণের' উপর উচ্চতর গবেষণা শুরু করেন। টেষ্ট ফ্লাইটের জন্য তিনি একটি মডেল তৈরী করেন। কাঠের নির্মিত এই মডেলে ছিলো দু'টি পাখা। তিনি এটা পরিচালনা করে আকাশে উড্ডয়নের চেষ্টা চালান। উল্লেখ্য, লিনার্দো ডাভিনসিও একটি উড়ো দেওয়ার 'মডেল' অঙ্কন করেছিলেন, কিন্তু তার জন্ম হয় ফিরনাসের ৬০০ বছর পরে।

ইবনে ফিরনাস ঐ কাঠের তৈরী মডেলে আরোহণ করে আকাশে উড়ো দেওয়ার টেষ্ট-ফ্লাইট করতে যেয়ে সামান্যের জন্য জীবন হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে তিনি উড়ো দেওয়ার স্বপ্নকে বাদ দিয়ে অন্য আরেকটি আবিষ্কারের প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি একটি নভোথিয়েটার (প্লানেটারিয়াম) তৈরী করেন। এতে সেকালে জানা প্রতিটি গ্রহের মডেল বানিয়ে [কক্ষপথে যেভাবে চলে সেভাবে] চলন্ত রাখার ব্যবস্থা ছিল। কক্ষপথে গ্রহগুলোকে চলন্ত দেখাতে যেয়ে ইবনে ফিরনাস খুব জটিল ও উন্নতমানের 'গিয়ার' সিস্টেম আবিষ্কার করেন। এই নভোথিয়েটারে বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানোও নাটকীয়ভাবে প্রদর্শন করা হতো।

এরপর ইবনে ফিরনাস পদার্থবিদ্যার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি ক্রিস্টেল (স্ফটিক) এর গাণিতিক ব্যাখ্যার উপর গবেষণা করেন। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে ক্রিস্টেল তৈরীর একটি গাণিতিক সমীকরণ আবিষ্কার করেন।

ইবনে ফিরনাসের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি সৌভাগ্যক্রমে। কারণ ১৫০০ সালে খ্রিস্টান স্পেনিশ পাদ্রীরা মুরিশ (মুসলিম স্পেনিশ) কৃষ্টি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য গ্রন্থসহ ১০ লক্ষাধিক বই-পুস্তক পুড়িয়ে ফেলে। ইতিহাসবিদ কারমেন এই তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এরপরও যেসব আবরী ভাষার বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে সেগুলো পুরোপুরিভাবে আজও অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয় নি। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে এগুলো যখন পুরোপুরিভাবে স্ট্যাডি করা হবে তখন আমরা মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার আরও বহু চিত্তাকর্ষক বিষয়াদি জানতে পারবো।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর গবেষণা

আন্দালুচিয়ায় ব্যাপকভাবে নেচারেল সাইন্স বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর গবেষণা হয়েছে। তবে এটা স্বীকার করতে হয়, প্রাচ্যের বিজ্ঞানীদের মতো মৌলিক অবদান তারা তেমন বেশী রাখতে সক্ষম হন নি। কিন্তু যাকিছুই তারা অবদান রেখেছিলেন তা পরবর্তীতে অত্যন্ত বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল- বিশেষ করে ইউরোপে। কারণ, আন্দালুচিয়ার গবেষকদের দ্বারাই সমগ্র ইউরোপ আলোকিত

হয়েছিল। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফল থেকে উপকৃত হয়ে উন্নত সভ্যতার গৌরবে ভূষিত হয়েছিল।

বাগদাদের খলীফা আল-মামুনের 'বাইতুল হিকমাহ' বা জ্ঞানের কক্ষের মতো আন্দালুচিয়ায় তেমন কোন জ্ঞানকক্ষ ছিলো না। কিন্তু সেখান থেকে যখন অসংখ্য কিতাব কুর্দোভায় এসে পৌঁছলু তখন স্থানীয় গবেষকরা নেচারেল সাইন্সের উপর আগ্রহী হয়ে উঠলেন। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর একাধিক গবেষক শুরু করলেন গবেষণা যার ফলাফল পশ্চিম ইউরোপ উপভোগ করেছে।

অপরদিকে অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মেডিসিনে আন্দালুচিয়ানদের গভীর আগ্রহ তো সব সময়ই ছিল। এসব বিষয়ের প্রেকটিক্যাল ব্যবহারও তখন ছিল ব্যাপক। অঙ্ক ছাড়া ইসলামী ফরায়েজ (উত্তরাধিকার) আইনের প্রয়োগ অসম্ভব। এছাড়া যাকাত নির্ণয়, জমির মাপ, ওজন, দূরত্ব নির্ণয় ইত্যাদি দৈনন্দিন অসংখ্য ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের বিকল্প নেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা নামাযের সময়সূচী তৈরী, সমুদ্রপথে চলার জন্য তারকার অবস্থান নির্ণয়, ক্যালেণ্ডার তৈরী ইত্যাদি আঞ্জাম দেওয়া হতো। মেডিসিন যে কতো উপকারী ছিলো তা আর বলার উপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এসব বিষয়ের উপর গবেষণা শুধু অনুসন্ধিৎসু মনে খোরাক যোগানো ছিলো না- এ থেকে গবেষক বৈষয়িক দিক থেকে উপকৃতও হতেন। এসব ছিলো লাভজনক গবেষণা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক কোন সত্য কখনও দীন ইসলামের আক্বীদা বিরোধী হতে পারে না। তবে এ সময় কিছু অমুসলিম সূত্র থেকে অ-বৈজ্ঞানিক দু'টি বিষয় বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় গবেষণার মেইনস্ট্রীম জ্ঞানচর্চায় 'ঢুকে' পড়ে। এগুলো হলো আষ্ট্রলজী ও আল-কেমী।

অনেকের ধারণা আষ্ট্রলজী বা জ্যোতিষশাস্ত্র এসেছে গ্রীক সভ্যতা থেকে। তবে ভারতবর্ষেও এর উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর আল-কেমী শব্দটি যেহেতু আরবি ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই এটাকে মুসলমানদের 'বিজ্ঞান' বলা হয়। কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। আল-কেমী শব্দটি আরবি তা সঠিক। কিন্তু আল-কেমীর উদ্দেশ্য কিন্তু অনেক পুরাতন। সাধারণ কোন ধাতুকে স্বর্ণ কিংবা অন্য কোন মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করার চেষ্টাকেই বলে 'আল-

কেমী'। যা হোক, এ দু'টি বিষয় যে অ-বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি এ ব্যাপারে ইউরোপের অনেক আগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

'জ্যোতির্বিজ্ঞান' ও 'জ্যোতিষশাস্ত্র' যে একই বিষয় নয় এবং 'কেমিষ্ট্রি' আর 'আল-কেমী' যে দু'টি আলাদা সাবজেক্ট এ ব্যাপারে আন্দালুচিয়ার একজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী সোচ্চার ছিলেন। ইবনে হাজম নামক এই বিজ্ঞানী একাদশ শতকে এই ব্যাপারটি বিজ্ঞানমহলে অবহিত করেন। অথচ ইউরোপীয় রেঁনেসা সংঘটিত হওয়ার শতাধিক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও পশ্চিমা জগৎ বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। ইবনে হাজম একজন বিজ্ঞানী হিসেবে 'ম্যাজিক', 'আল-কেমী' ও 'আষ্ট্রলোজি'র ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় বক্তব্য প্রদান করতেন। যারা এসব বিষয় সত্য বলে সমাজে প্রচার করতো তিনি তাদেরকে 'নির্লজ্জ মিথ্যুক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যা

অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর গবেষণা স্পেনেও হয়েছে। বিশেষ করে আল-খোওয়ারিজমীর প্রখ্যাত কিতাব 'দ্যা কালকুলেশন অব ইন্টেগ্রেশন এণ্ড ইক্যুয়েশন' যখন আন্দালুচিয়ায় পৌঁছল, তখন থেকে এটিই পরবর্তী অনেক গবেষণার মৌলিক সূত্রে পরিণত হয়। খোওয়ারিজমী এই বইটিতে বীজগণিতের সমীকরণ, পুরণ ও ভাগ অঙ্ক এবং বস্তুর উপরিভাগের ক্ষেত্রফল নির্ণয়সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর গাণিতিক গবেষণা করেন। খোওয়ারিজমীই সর্বপ্রথম ভারতে আবিস্কৃত তথাকথিত 'আরবি নাম্বার' সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্য জগতে ছড়িয়ে দেন। শূন্যসহ (০) ১ থেকে ৯ পর্যন্ত 'সাংকেতিক' নাম্বার সিস্টেম না থাকলে পুরো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অকেজো হয়ে পড়তো। খোওয়ারিজমির পূর্বে রোমান অক্ষর দ্বারা নাম্বার লেখা হতো। কিন্তু অক্ষর দ্বারা অঙ্ক কষা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাছাড়া শূন্যের ব্যবহার ছিলোই না! সুতরাং ভারত থেকে ধার করে হলেও- খোওয়ারিজমী আরবি নাম্বার সিস্টেম জগতকে শিখিয়ে বিরাট অবদান রেখে গেছেন- যা মানুষ যুগ যুগ ধরে কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণ রাখবে।

খোওয়ারিজমীর বই ও জ্যামিতির উপর লিখিত ইউক্লিডের আরবিতে ভাষান্তরিত প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ইলেমেন্ট' হয়ে ওঠে সে যুগের গণিতশাস্ত্রের মূল সূত্র। এ দু'টি

বইয়ের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী শত শত বছর যাবৎ বিজ্ঞানীরা গণিতের উপর গবেষণা করে গেছেন। আন্দালুচিয়ায়ও এর ব্যতিক্রম ছিলো না।

আন্দালুচিয়ার প্রথম গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন মাসলামা ইবনে মাজরিতি। তিনি দশম শতাব্দির দিকে জীবিত ছিলেন। তবে তার শতাধিক বছর আগেও জীবিত ভেলেন্সিয়ার ইবনে উবাইদা নামক এক বিজ্ঞানী সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। তিনি সে যুগের নেতৃস্থানীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। উবাইদা ছিলেন বহিরাগত। তার জন্মস্থান ছিলো বাগদাদ।

ইবনে মাজরিতি কিন্তু উচ্চপর্যায়ের গবেষক ছিলেন। তিনি অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া টলেমীর ‘আলমাজেস্ট’ এর উপর গবেষণা ও কমেন্টারী লিখেন। তিনি খোওয়ারিজমীর আষ্ট্রনোমিক্যাল টেবিলের বর্ধিতকরণ ও সংশোধন করেন। তিনি ফার্সী ও হিজরী ক্যালেণ্ডারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে একটি টেবিল তৈরী করেন। যা থেকে পারস্য ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সঠিক তারিখ নির্ণয় সম্ভব হয়।

পশ্চিমে যাকে আরজাকেল নামে ডাকা হয়, সেই প্রখ্যাত গাণিতিক আল-জারকালীও কুর্দোভা শহরের অনেক নক্ষত্রের মধ্যে একটি নাম। তিনি একাদশ শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন। তিনি থিওরিটিক্যাল জ্ঞান ও প্রযৌক্তিক দক্ষতার মধ্যে সম্পর্কবিধান সৃষ্টি করেন। এছাড়া তিনি অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক ছিলেন। পানি চালিত তার তৈরী ঘড়ি থেকে দিন-রাতের ঘণ্টার হিসেব ছাড়াও চান্দ্রমাসের ক্যালেণ্ডারের সঠিক তথ্য জানা যেতো। প্রখ্যাত ‘টলেডান টেবিল্স’-এ তার অবদান ছিল অপরিসীম। এই তালিকার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যার সঠিক তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছিল। মহাকাশে তারাগুলোর নাম, অবস্থান, ঔজ্জ্বল্যতা, গতিপথ ইত্যাদি এই টেবিল থেকে জানা যেতো। আল-জারকালী ‘আলমানেক’ এর জন্য নিজে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আলমানেক শব্দের অর্থ হলো আবহাওয়া। তার গ্রন্থ থেকে কপ্টিক, রোমান, চান্দ্র ও পারস্য ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী কোন্ তারিখে মাস, বছর ইত্যাদি শুরু হয় তা জানা যেতো। এছাড়া বইটি থেকে গ্রহগুলোর অবস্থান যে কোনো বিশেষ সময়ে ঠিক কোথায় হবে তা বের করা যেতো। আরও তথ্যাদি ছিল যা থেকে ভবিষ্যতে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সঠিক তারিখ ও সময় নির্ধারধ সম্ভব হতো। তিনি লেটিচিউড ও লঙ্গিচিউডের

উপরও তথ্যপূর্ণ লেখালেখি করেন। তার অনেক বই-পুস্তক পরবর্তীতে স্পেনিস ও লেটিন ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

আল-বিরতুজী ছিলেন আন্দালুচিয়ার আরেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। ইউরোপে তিনি আলপেট্রোগিয়াস নামে পরিচিতি। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর 'বুক অব ফর্ম' নামক একখানা বই লিখেন। এতে গ্রহ-উপগ্রহসহ মহাকাশের তারকাগুলোর গতিবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর উপর্যুক্ত গবেষণাসমূহ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত অনেক শব্দাবলী আজও দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো আরবি থেকে ধারকরা। এখানে রাশিচক্রের কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যায়, যেমন: 'আকরাব' [আরবি- 'আ'ক্বরাব' থেকে যার অর্থ 'বিচ্ছু'], 'আলটেয়ার' [আরবি শব্দ আল-ত্বা'ইর থেকে যার অর্থ 'উড়া'], 'ডেনেব' [আরবি 'যান্‌ব' থেকে যার অর্থ 'লেজ'] এবং 'ফেরকার্ড' [আরবি শব্দ 'ফারখুদ' থেকে যার অর্থ 'বাচ্চা']। এছাড়া অনেক আরবি শব্দ আছে যা আজকাল ইংরেজিসহ ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হচ্ছে [দেখুন, পরিশিষ্ট - ৪]। এ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম স্বর্ণযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ইলমী পরিমণ্ডলে মুসলমানরা কতো এডভান্স ছিলেন।

মেডিসিন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক অবদান

মেডিসিনে মুসলমানদের অবদান ছিলো সর্বাপেক্ষা বেশী। এ বিষয়ের উপর আন্দালুচিয়ায় ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। বাস্তবে এই বিষয়ের উপর মুসলিম জ্ঞান তাপসদের আগ্রহ প্রাথমিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। পবিত্র কুরআন শরীফে মৌমাছি কর্তৃক জমাকৃত মধুকে মানুষের উপকারী বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক রোগের প্রতিকার আছে'। এ ব্যাপারে আরও অনেক হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ হয়েছে [দেখুন পরিশিষ্ট - ৬]। সুতরাং রোগ-ব্যাধী থেকে বাঁচার ও আরোগ্য লাভের স্বাভাবিক প্রবণতা ও এসাথে কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে উৎসাহপ্রদান গবেষকদের আগ্রহকে শতগুণ বৃদ্ধি করে।

ইসলামপূর্ব যুগেও ঔষধবিজ্ঞানের উপর গবেষণা হয়েছে। তবে রোগমুক্তির উপায়-উপকরণের মধ্যে তখনকার দিনে বিভিন্ন ম্যাকিজ ফর্মুলা ও অন্ধবিশ্বাস জড়িত ছিলো। বাস্তবে মুসলমানদের হাতে এসে ঔষধের উপর গবেষণা সত্যিকার অর্থে 'বৈজ্ঞানিক' বিষয়ে রূপলাভ করে। মেডিসিন যে একটি উচ্চপর্যায়ের বিজ্ঞান ও এর উপর দীর্ঘকাল লেখাপড়াসহ ট্রেনিংয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে- এসব ব্যাপার গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। সুতরাং ডাক্তারী পেশাকে গ্রহণযোগ্য করতে যেয়ে গড়ে ওঠে জটিল 'রুল্স অব কন্ডাক্ট'।

শুধুমাত্র ডাক্তারী লেখাপড়া করেই কেউ ডাক্তার হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে পারতো না। তাকে অবশ্যই কিছু নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী বা এগুলো অর্জন করতে হতো। ইবনে হাজম বলেন, একজন ডাক্তারকে অবশ্যই- সদয়, সহমর্মিতাপূর্ণ, বন্ধুসূলভ, ভালো, গালি-গালাজ শ্রবণ করেও ধৈর্যশীল, কঠোর সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। এছাড়া নিজেকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা- যেমন, মাথার চুল খাটো করে কাটা ও অতিরিক্ত নখ কেটে ফেলা; তাকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড় পরিধান এবং নরম-দিলা হতে হবে; তার কথাবার্তায় থাকতে হবে ভদ্রতা ও মাধুর্য ইত্যাদি।

প্রত্যেক ডাক্তারকে প্রেকটিস শুরুর আগে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর উপর একটি বিশেষ পরীক্ষা নিতে হতো। পাশ করার পর তাকে কছম খেয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে হতো। প্রেকটিস করাকালে সঠিক 'কোডকরা' চাল-চলনে কোন হেরফের ধরা পড়লে সাথে সাথে তাকে বহিষ্কার করা হতো।

সরকারী হাসপাতালগুলোতেও অনুরূপ কড়া পরিচালনা-ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল যাতে, রোগীদের চিকিৎসা, সুযোগ-সুবিধা ও অগ্রাধিকারে কোন ত্রুটি না ঘটে। কুর্দোভা শহরে একটি বৃহৎ হাসপাতাল ছিল। এটা আধুনিক হাসপাতালের তুলনায় কোন ক্ষেত্রেই অনুন্নত ছিলো না। এতে টাবের পানি, বাথরুম, বিভিন্ন রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা সেকশন ছিল। প্রত্যেক সেকশনে একেকজন স্পেশালিস্ট ডাক্তার ছিলেন। প্রত্যেক হাসপাতাল ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকতো। জরুরী বিভাগে আগত রোগীদেরকে বিনা চিকিৎসায় কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হতো না। এককথায়, উন্নতমানের চিকিৎসাব্যবস্থা সে যুগে সর্বপ্রথম

মুসলমানদের দ্বারাই শুরু হয়। আর আন্দালুচিয়ার কুর্দোভাসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

মুসলিম ডাক্তাররা মেডিকেল বিজ্ঞানের উপর অসংখ্য মৌলিক অবদান রাখেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রখ্যাত ডাক্তার ইবনে নাফিস এর কথা এখানে তুলে ধরা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম দেহের মধ্যে রক্তের সার্কুলেশন নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। এছাড়া সংক্রামক রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে যেয়ে যে ক্যুয়ারানটিন [রোগীদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা- যাতে রোগজীবাণূ বিস্তারলাভ করতে না পারে] ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তার উদ্ভাবকও ছিলেন ইবনে নাফিস।

কুর্দোভার আরেক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের নাম ছিল ইবনে জুলজুল। তিনি ৯৪৩ সালে কুর্দোভায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি নেতৃস্থানীয় একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি মেডিসিনের উপর ১৪ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন। ইবনে জুলজুল গ্রীক চিকিৎসক ডায়োসকোরাইডিস এর 'ডি মেটেরিয়া মেডিকা'র উপর একটি কমেন্টারী বা মন্তব্য লিখেন। এছাড়া আন্দালুচিয়ায় প্রাপ্ত ঔষধ-পত্রের উপরও তার লিখিত একখানা বই পাওয়া যায়। উমাইয়্যা এক রাজপুত্রের অনুরোধে তিনি 'ক্যাটাগোরিজ অব ফিজিশিয়ান্স' নামক আরও একখানা ইতিহাসের বই লিখেন। এতে গ্রীক ডাক্তার এ্যসকোলাপিয়াস থেকে তার সময় পর্যন্ত মেডিক্যাল বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দশম শতকে আন্দালুচিয়ায় অনেক ডাক্তার কর্মরত ছিলেন। এদের কেউ কেউ বাগদাদ গিয়ে প্রাকটিস করেছেন। এরা সে যুগের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তাবিত ইবনে কুররা ও তাবিত ইবনে সিনান এর সান্নিধ্য লাভ করেন। আন্দালুচিয়ায় এসব ডাক্তার প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে মদীনাতুয যাহরা নামক স্পেনিশ শহরের সরকারী কেয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়। এদের একজনের নাম ছিল আহমদ ইবনে হারান। তাকে সরকারী ডিসপেনসারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখান থেকে গরীব রোগীদেরকে বিনামূল্যে ঔষধপত্র ও খাদ্য প্রদান করা হতো।

ইবনে শুহায়িদ নামক এক ডাক্তার ঔষধব্যবহারের উপর একখানা কিতাব রচনা করেন। সে যুগের অধিকাংশ ডাক্তারদের মতো তিনিও মত প্রকাশ করেন যে, খাদ্যদ্রব্য সঠিকভাবে রোগীকে পরিবেশনের পরও যদি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ

না হয়, তবেই কৃত্রিম ঔষধ সেবন উচিৎ হবে। অর্থাৎ নেচারেল উপায়ে রোগ থেকে আরোগ্যলাভ উত্তম। ঔষধ ব্যবহার হতে হবে শেষ চেষ্টা। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে যুগেও ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ডাক্তাররা ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইবনে শুহায়িদ আরও বলেছেন, একমাত্র সিরিয়াস কেইছ ছাড়া গোগীদেরকে সাধারণ ঔষধ সেবন করানো উচিৎ।

আন্দালুচিয়ার সর্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন জাহরাবী। পশ্চিমে তিনি 'আলবুকাসিস' নামে খ্যাত। ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। জাহরাবী সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে আন্দালুচিয়ার উপর অতিরিক্ত এই পরিচ্ছেদে তার নাম উল্লেখ না করলে পুরো লেখাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম ছিল 'তাছরিফ'। লেটিন ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়ার পর মধ্যযুগে এই গ্রন্থটি, মেডিসিনের মহামূল্যবান একটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সমগ্র ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শত শত বছর যাবৎ পঠিত হয়েছে। সার্জারী বা অস্ত্রোপচারের উপর লিখিত খণ্ডে জাহরাবী যন্ত্রপাতির একাধিক নক্সা অঙ্কন করে দেখিয়েছেন। এছাড়া সার্জারীর বিভিন্ন পন্থা যেমন হাত-পা কাটা [এ্যামপুটেশন], চক্ষুতে অপারেশন ও পেটের মধ্যে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে তাছরিফে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা মেডিসিনের উপর ইতোমধ্যে এমন গভীর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আন্দালুচিয়ার আর কেউ প্রকাশ করেন নি।

ইবনে জোহর [পশ্চিমে 'আভেনজোর' নামে প্রসিদ্ধ] ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইতোমধ্যে এ খণ্ডে আমাদের সঙ্গে তার পরিচিতি ঘটেছে। তিনি সেভিল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও স্পেনে তার খ্যাতি ছিল বিরাট। তিনি টিউমার বলতে আমরা এখন যা বুঝি তার আবিষ্কারক ছিলেন। এছাড়া থেরাপিউটিক্স বা রোগ নিরাময় বিদ্যার উপর তিনি মৌলিক অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তার লিখিত প্রসিদ্ধ একটি বই ছিলো, 'তাইসির'। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে বইটি লেটিনে অনুদিত হওয়ার পর পশ্চিম ইউরোপে মেডিসিনের একটি স্ট্যান্ডার্ড গ্রন্থ হিসেবে তা স্বীকৃত হয়।

মেডিসিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি বিজ্ঞান হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান। অসংখ্য বৃক্ষ-তরু-লতার মধ্যে যে ঔষধী গুণাগুণ বিদ্যমান তা অনেক আগে থেকেই মানুষ জানতো। মুসলিম উদ্ভিদবিদরা এ বিষয়ের উপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন।

আন্দালুচিয়ার জগতখ্যাত উদ্ভিদবিদ ইবনে বাইতার এ বিষয়ের উপর একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির ইংরেজি নাম হচ্ছে 'কালেকশন অব সিম্পল ড্রাগ্স এণ্ড ফুড'। গ্রন্থে তিনি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন ঔষধী উদ্ভিদের গুণাগুণ তুলে ধরেন। এসব বৃক্ষরাজির প্রায় সবগুলোই তখনকার দিনে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় পাওয়া যেতো। তিনি এসব বৃক্ষরাজি সংগ্রহে সারা জীবন কাটিয়েছিলেন। প্রত্যেক বৃক্ষের উপর তিনি আলাদাভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এর মধ্যে ছিল, কিভাবে ঔষধ তৈরী করতে হবে এবং তা সেবনের নিয়ম-কানুন।

আন্দালুচিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরও একজন প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন যার নাম এখানে উল্লেখ না করলে পুরো ব্যাপারটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার নাম ছিল ইবনে খাতিব। তিনি শুধু চিকিৎসক ছিলেন তাই নয়- একজন ইতিহাসবিদ, কবি ও রাজনীতিবিদ হিসেবেও তার সুনাম ছিল। রোগজীবাণূ সংস্পর্শের মাধ্যমে কিভাবে একজন থেকে অপরজনের মধ্যে বিস্তারলাভ করে সে ব্যাপারে তিনি মৌলিক থিওরী উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "ইনফেকশন এর ব্যাপারটি একজন তদন্তকারীর নিকট পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন সে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে থেকে নিজে রোগাক্রান্ত হয়। অথচ যে ব্যক্তি এই সংস্পর্শ থেকে মুক্ত সে রোগ থেকেও রেহাই পায়। এছাড়া রোগজীবাণূ কাপড়-ছোপড়, পান ও খাবার পাত্র এবং কানের দোলনার মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

ইবনে খাতিবই ছিলেন স্পেনে সর্বশেষ মুসলিম মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। তার মৃত্যুর পরই শুরু হয় খ্রিস্টানদের কর্তৃক আইবেরিয়ান উপদ্বীপ পুনর্দখলের সংগ্রাম।

ভূগোল শাস্ত্রের উপর স্পেনিশ মুসলমানদের অবদান

ভূগোলের উপর মুসলমানদের অবদান ছিলো ব্যাপক। আর এ বিষয়ের উপর অনেক উন্নত গবেষণা এই আন্দালুচিয়ায়ই হয়েছিল। যদিও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ এই ফিল্ডে ব্যাপক স্ট্যাডির বিশেষ উপকরণ ছিলো, তথাপি মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসু মনও যে সবাইকে গবেষণায় আগ্রহশীল করে তুলেছিল সে কথাও দৃঢ়ভাবে বলা যায়। কারণ, পৃথিবী নিয়ে গবেষণার ইশারা-

ইঙ্গিত তো মহান ঐশীগ্রন্থ কুরআন শরীফেই একাধিক আয়াতে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি মুসলিম স্বর্ণযুগে হওয়ার কারণ হিসেবে যদি বলা হয়, তা সবই ছিল বৈষয়িক উন্নয়ন সাধনে কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে- তবে তা মারাত্মক ভুল হবে। জানার জন্য জানা, মনের পিপাসা মেটাতে জ্ঞানচর্চা- মুসলিম বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই এই জানার স্পৃহা হেতু গবেষণা করে জীবন কাটিয়েছেন। এদের অনেকে বিখ্যাত হলেও সবাই বিরাট ধনী হয়েছেন- একথা কেউ প্রমাণসহ বলতে পারবেন না।

যা হোক, ভূগোলের উপর প্রাথমিক গবেষণা মুসলিম প্রাচ্যেই শুরু হয়েছিল। আব্বাসী খলীফাদের পিয়নদের জন্য একাধিক 'তরীকার বই' [রাস্তার বই] প্রকাশিত হয়। এরপর শীঘ্রই দূর-দূরান্তের শহরের ম্যাপ ও সেখানকার পণ্য, বাণিজ্য ইত্যাদি তথ্যাদিসহ কিতাবাদি প্রকাশিত হতে থাকে। একই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের উপর অগ্রগতি হওয়ায় ম্যাপ অঙ্কন অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই ম্যাপ অঙ্কনের বিদ্যা 'কারটোগ্রাফী' [মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা] একটি আলাদা প্রফেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভূগোলের উপর আন্দালুচিয়ার গবেষকদের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ ছিলেন তারা হচ্ছেন ইবনে মুহাম্মদ আল-রাজী [ইউরোপে রাজেজ]: তিনি ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আন্দালুচিয়ার ভূগোলের উপর বই-পুস্তক লিখেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ওয়ারাক্ব: তিনি রাজীর সমকালীন ছিলেন। তিনিও আন্দালুচিয়া ও আফ্রিকার ভূগোলের উপর গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক রচনা করেন। তিনি আফ্রিকার টপোগ্রাফীর [প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ] উপর তার বইয়ে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

ইব্রাহীম ইবনে ইয়াকুব: তিনি নবব শতকের শেষের দিকে পুরো ইউরোপ ও বলকানে ভ্রমণ করেন। এই বীরপুরুষ তার ভ্রমণকাহিনী ম্যাপসহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাকে বীরপুরুষ বলার কারণ হলো, তখনকার দিনে খ্রিস্টানশাসিত দেশে একজন মুসলমানের জন্য ভ্রমণ করা সত্যিই সাহসী কাজ ছিল।

আল-বাকরী: তিনি সোলটেজ নামক স্থনে ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। একজন সফল স্কলার হিসেবে প্রসিদ্ধ এই গবেষক ইতিহাস, কবিতা, সাহিত্যের উপর গবেষণা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং ভূগোলের উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। আরব উপদ্বীপের ভূগোলের উপর তার লেখা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেছে। পুস্তক দু'টিতে লেখক বর্ণানুক্রমিকভাবে শহর, গ্রাম, উপত্যকা, পাহাড়-পর্বত ও দর্শনীয় ল্যান্ডমার্কগুলোর পরিচিতি তুলে ধরেন। তার অপর প্রসিদ্ধ রচনা আংশিকভাবে রক্ষিত হয়েছে। এটা ছিলো একটি বিশ্বকোষ। আল-বাকরী এতে গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তথ্যাদি বর্ণনার তার নিজস্ব একটি নিয়ম ছিল। যে কোন দেশের পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি নাগরিকদের পরিচিতি, তাদের ধর্ম-কৃষ্টি-ইতিহাস, দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, রাজধানীসহ প্রসিদ্ধ সকল শহরের পরিচিতি ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রথমে বর্ণনা করেছেন। এরপর অন্যান্য বিষয় লিখেছেন। যে কোন শহরের পরিচিতি তুলে ধরতে যেয়েও তিনি একই নিয়ম ব্যবহার করেছেন। এর ফলে বিশ্বকোষটি সবার কাছে সহজে বুঝা ও পাঠযোগ্য হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তার বর্ণিত 'গ্যালিচিয়া' নামক একটি শহরের কথা তুলে ধরতে পারি। তিনি এই শহরের বাসিন্দাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন: "তারা বিশ্বাসঘাতক, অপরিষ্কার এবং বছরে মাত্র এক বা দু'বার গোসল করে- তা-ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে। তারা কখনও তাদের গায়ের কাপড় ছিড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধৌত করে না কারণ তারা মনে করে, কাপড়ে ধূলো-বালি ও ময়লা জমা হয় ঘর্মের কারণে আর এতে শরীর থাকে নরম।"

আল-ইদ্রিসী: মুসলিম স্পেনের সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত ভৌগোলিক ছিলেন এই জ্ঞানতাপস। ১১০০ খ্রিস্টাব্দে কুর্দোভা শহরে ইদ্রিসীর জন্ম হয়। তাঁর সম্পর্কে অবশ্য ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে অতিরিক্ত যা বলার তা হলো, এই মুসলিম ভৌগোলিক স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, আনাতোলিয়া ইত্যাদি অঞ্চল ভ্রমণ শেষে বর্তমান ইতালীর সিসিলি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তার খ্যাতী তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানীয় নরম্যান রাজা রজার ২য় তাকে পুরো পৃথিবীর সংবিধিবদ্ধ আপ-টু-ডেইট উন্নতমানের একটি ভূগোলের গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব দেন। এই গ্রন্থটির নাম ছিল, 'দ্যা বুক অব রজার'।

আল-ইদ্রিসী এই গ্রন্থে তখনকার দিনে জানা যাবতীয় ভৌগোলিক তথ্য সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তবে এই গ্রন্থে তার বর্ণিত এক মুসলিম নাবিকের ঘটনা হলো সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। তিনি লিখেছেন, মরক্কোর এক সমুদ্রপথের নাবিক তার জাহাজ নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে হারিয়ে যান। দীর্ঘ দিন ভ্রমণশেষে স্বদেশে ফিরে এসে রিপোর্ট করেন, তিনি একটি অপরিচিত সবুজে ঘেরা দেশে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার মানুষ সকলেই ছিলো উলঙ্গ ও ভয়ানক। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, আল-ইদ্রিসী কর্তৃক লিপিবদ্ধ এই নাবিক যে দেশের বর্ণনা দিয়েছেন তা ছিল উত্তর কিংবা দক্ষিণ আমেরিকা। কারণ, সেসময় উভয় মহাদেশের উলঙ্গ বাসিন্দারা ছিলো রেড-ইণ্ডিয়ান জাতি। [এ নামটি এসেছে কলম্বাসের এক্সপিডিশন থেকে। তিনি ভেবেছিলেন ভারতবর্ষে বুঝি পৌঁছেছেন- তাই উলঙ্গ লালচে বর্ণের নেটিভদেরকে তিনি রেড-ইণ্ডিয়ান বলে সম্বোধন করেন। 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' নামকরণের পেছনেও অনুরূপ কারণ নিহিত। কলম্বাস মনে করেছিলেন পশ্চিম ভারতের একটি অজানা সমুদ্র সৈকতে তিনি পৌঁছেছেন- যা এই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল।] সুতরাং কলম্বাসের অনেক আগেই মুসলমানদের কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আন্দালুচিয়া দু'টি চিত্তাকর্ষক ও সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকাহিনীর লেখকদেরকেও জন্ম দিয়েছে। এ দু'টি ভ্রমণকাহিনী ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল এবং এখনও প্রাপ্য আছে। এর প্রথমটির লেখক ছিলেন ইবনে জুবায়ের। তিনি গ্রেনাডা অঞ্চলের গভর্ণর ছিলেন। ১১৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইবনে জুবায়ের পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণের উপর তিনি বইটি রচনা করেন যার নাম ছিলো, "সফর"। ডাইরী আকারে লিখিত এই পুস্তকে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের বর্ণনা পাওয়া যায়। তখন তোড়জুড়ে 'ক্রুসেড' চলছিল। লেখক বইটি পরিষ্কার প্রাণবন্ত ভাষায় রচনা করেন এবং এতে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিসম্মন্ন মন্তব্য স্থান পায়।

ইবনে বতুতা: পৃথিবীবিখ্যাত এই ভ্রমণকারীও ছিলেন আন্দালুচিয়ান। তিনি উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, মক্কা ও মদীনা শরীফ, ইরাক, ইয়েমন, এশিয়া মাইনোর, কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল, লোহিত সাগর অঞ্চল, ক্রাইমিয়া, কন্সটান্টিনোপল, আফগানিস্তান, বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষ ও চীনসহ অনেক দেশে ভ্রমণ করেন। তার জীবনের

পৃথিবীবিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করে ৭৩ বছর বয়সে তিনি গ্রেনাডায় মৃত্যুবরণ করেন।

আন্দালুচিয়ান আরোও একাধিক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের কথা আমরা আগের পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করেছি। এদের মধ্যে ইতিহাসের জনক নামে খ্যাত ইবনে খালদুন, দার্শনিক ইবনে হাজম ও ইবনে রুশদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম স্পেনে প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়। স্পেনের মুসলিম ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্ব সম্পর্কে আজো তেমন গবেষণা হয় নি। তবে তাদের কৃতকর্মের স্থায়ী প্রভাব সমগ্র ইউরোপে প্রতিফলিত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা আশা করবো প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম স্পেনের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিহাসবিদ, লেখক ও গবেষকরা এগিয়ে আসবেন। আমাদের ধারণা মুসলিম স্বর্ণযুগে রচিত আরবি ভাষার হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি যেহেতু এখনও সুরক্ষিত আছে, তাই গবেষণায় অবশ্যই সুফল বেরিয়ে আসবে।

"মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাত্রির আবর্তনে রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০]।

পরিচ্ছেদ - ৪

ইসলামী স্বর্ণযুগের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

ইসলামী বিজ্ঞানের চেতনা যখন মুসলিম জনপদে দিন দিন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিলো ঠিক তখন লেটিন পশ্চিমে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এই জাগরণ অবশ্যই মুসলিম বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। মুসলিম বিজ্ঞানীদের অকল্পনীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থেকেই সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ প্রভাবিত হয়। স্পেনের কুর্দোভা শহরে যে বৈজ্ঞানিক চরম উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছিলো তা থেকে সমগ্র ইউরোপব্যাপী একটি জাগরণ সৃষ্টি হয়।

ইউরোপের শিক্ষিতরা আরবি ভাষা শিখে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আরবি গ্রন্থাদি লেটিনে ভাষান্তরিত করেন। এসব বই-পুস্তক ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে শত শত বছর ব্যবহৃত হয়। তখন সমগ্র ইউরোপব্যাপী একটি কথা সর্বজনস্বীকৃত হয়ে ওঠে, আর তাহলো, "জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য আরবি ভাষা শেখো"।

দর্শনের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটল, টলেমী, উইক্লিড, পিথাগোরাস ও প্লেটো এবং ইবনে সিনা, ইবনে ফারাবী, আল-কিন্দি, আল-গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে রুশদ, ইবনে আরাবি, আল-ইদ্রীসি প্রমুখ জ্ঞানতাপসদের অনুসরণে গড়ে ওঠে নতুন জাগরণ। থমাস এক্যুইনাস দর্শন ও খ্রিস্টবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কার্যকারণ ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক গড়তে তিনি ব্রত হন। তবে এই প্রচেষ্টা কট্টর খ্রিস্টবাদীদের আহত করে। থমাস এক্যুইনাসের মৃত্যুর কদিন পরে ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের আর্চবিশপ (অর্থোডক্স চার্চের স্থানীয় প্রধান) এক্যুইনাস ও এ্যারিস্টটলের ২১৯টি প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি

বলেন, এসব দর্শন ও বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবাবলী ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। অন্যকথায় খ্রিস্টানদের বিজ্ঞানবিরোধী অবস্থান তখনও নিশ্চিহ্ন হয় নি।

উন্নতমানের গ্রীক ও ইসলামী বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে একদিকে খ্রিস্টবাদী ইউরোপে চলছিলো উচ্চ পর্যায়ের তিক্ত সংলাপ-সংঘাত আর অপরদিকে সমগ্র ইউরোপ দিন দিন মুসলিম জনপদ- বিশেষকরে তুর্কীস্থান ও স্পেন থেকে আগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তকে ছেয়ে যাচ্ছিলো। এ সময় প্রিন্টিং প্রেসের আবিষ্কার হওয়ায় এসব বই-পুস্তক সবার জন্য প্রাপ্তিসাধ্য হয়ে ওঠে। এরফলে পশ্চিমে সত্যিকার অর্থে একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লবের ফলেই আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তান ঘটে।

আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তান

ইসলামী বিজ্ঞানচেতনার সত্যিকার সুফল হচ্ছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান। তবে দুঃখের বিষয় হলো, এই ব্যাপক সম্প্রসারণ মুসলিম জনপদে না হয়ে তা হয় পশ্চিম ইউরোপে। ইউরোপের সর্বত্র মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারকে সম্বল করে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক চেতনা জাগ্রত হয়। ইতিহাসবিদরা এই জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে পোলিস জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাসের [১৪৭৩-১৫৪৩] নাম সাব্যস্ত করেছেন।

১৫৪৩ সালে পোলিস এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী সৌরজগতের উপর ‘ডি রিভোলুশনিবাস অরবিয়াম কয়েলেসটিয়াম’ নামক তাঁর প্রসিদ্ধ বইটি প্রকাশ করেন। তিনি মূলত টলেমির আলমাজেস্ট [এ নামটি পুস্তকের আরবি নামকরণ] বইটির উপর গবেষণা করে সৌরজগতের গতিবিধি সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য তুলে ধরেন। টলেমী বলেছিলেন, পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং সূর্যসহ বাকী সব গ্রহ-উপগ্রহ পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করে। এছাড়া তার মতে প্রদক্ষিণপথ হচ্ছে বৃত্তাকার। কিন্তু কোপারনিকাসও সূর্যকে কেন্দ্রে স্থির অবস্থায় থাকার কথা বলেন [যা অবশ্য সঠিক নয়- পরবর্তীতে দেখা গেছে সূর্যেরও গতি আছে, সে তার নিজের মধ্যশলাকার উপর ঘুরছে এবং সমগ্র সৌরজগৎ নিয়ে আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ের চতুর্দিকে হু-হু করে ঘূর্ণমান আছে। এ ব্যাপারে

দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।] এবং তিনি প্রদক্ষিণপথ বৃত্তাকার বলে গ্রহণ করেন [এটাও সঠিক ছিলো না- দ্বিতীয় খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে]।

এছাড়া পৃথিবীসহ সকল গ্রহ-উপগ্রহের বার্ষিক ও আহ্নিক এই দু'টি গতি আছে বলে তিনি অঙ্কের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন। বলাই বাহুল্য কোপারনিকাসের এই সূর্যকেন্দ্রিক থিওরী হাজার বছরের পুরাতন পৃথিবীকেন্দ্রিক থিওরীকে ওলট-পালট করে দেয়। তার এই ধারণা থেকেই পৃথিবীও যে একটি গ্রহ তা পরিষ্কার হয়। কিন্তু কট্টর খ্রিস্টানদের নিকট এ নতুন থিওরী ছিলো কুটারাঘাতের মতো। তারা এর ব্যাপক বিরোধিতা শুরু করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে, কোপারনিকাসের থিওরীর সিংহভাগ বিষয়বস্তু মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত ছিলো না। বাস্তবে কোপারনিকাস যে তাঁদের ধারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা একটি ঐতিহাসিক সত্য। উপরে বর্ণিত তার গ্রন্থে মুসলিম একাধিক বিজ্ঞানীর কথা তিনি কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং কোপারনিকাসকে এককভাবে রেঁনেসার জন্মদাতা বলা মোটেই বাস্তবসম্মত হবে না। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফলই রেঁনেসার জন্য ডাইরেক্টলী দায়ী- তা আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পশ্চিমা কিছু স্বার্থপর লেখক ইচ্ছে করেই ঐতিহাসিক এ সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা অতীতে চালিয়েছেন, যা সত্যিই দুঃখজনক।

কোপারনিকাসের এই বৈপ্লবিক থিওরীকে আরও উন্নতমানের করে তুলেন জোহান কেপলার [১৫৭১-১৬৩০]। ধার্মিক এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী হলি রোমান সম্রাট রুডলফ-২য় এর ব্যক্তিগত গণিতবিদ ছিলেন। তিনি সৌরজগতের উপর তিনটি নতুন আইন উপস্থাপন করেন। এগুলো হলো: ১. সব গ্রহ এককেটি ডিম্বাকৃতি [এলিপটিক্যাল] প্রদক্ষিণপথে ঘূর্নমান আছে এবং সূর্য এই এলিপসের একটি ফোকাসে অবস্থান করে। ২. সূর্য থেকে যতো দূরে গ্রহ সরে যায় সে তুলনায় তার গতিও কমে। ৩. যে কোন দু'টি গ্রহের প্রদক্ষিণ করার সময়ের পরিমাণের গুণফল তাদের মধ্যকার সূর্য থেকে গড় দূরত্বের তিনগুণ ফল আনুপাতিক। বলাই বাহুল্য কোপারনিকাসের এইসব তথ্য বিশ্বতত্ত্বের উপর গবেষণায় বিরাট অগ্রগতি সাধন করে।

কোপারনিকাস আর কেপলারের পরে ইটালীর গ্যালিলিও গ্যালেলাই [১৫৬৪-১৬৪২] বিজ্ঞানের আরও উৎকর্ষ সাধন করেন। গ্যালিলিও কেপলারের থিওরীর মধ্যে দু'টি জরুরী তথ্য সংযোগ করেন। এগুলো হলো: সৌরজগতের গবেষণায় নতুন গতিবিজ্ঞানের ব্যবহার এবং মাহাকাশ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আরও নতুন উপায়-অবলম্বনের উদ্ভাবন। এসময় হল্যান্ডে সর্বপ্রথম টেলিস্কোপ (দূরবীক্ষণযন্ত্র) আবিষ্কৃত হয়। গ্যালিলিও নিজে এই যন্ত্রটি কোনদিন স্বচক্ষে না দেখেই নিজে আরেকটি উন্নতমানের দূরবীক্ষণযন্ত্র তৈরী করেন। ১৬১০ সালে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল 'দ্যা স্টারী মেসোর' নামক একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গ্যালিলিও চন্দ্রের মধ্যে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, শুষ্ক সাগর দেখতে পান। তিনি সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ জুপিটারের চারটি বড় উপগ্রহ (চন্দ্র) আবিষ্কার করেন। তিনি শনিগ্রহের রিং সিস্টেমও দেখতে পান। গ্যালিলিও সৌরজগতের এসব আবিষ্কার সম্পাদন করে একটি বিশ্বতত্ত্ব উপস্থাপন করতে ব্রত হোন এবং ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ "ডায়োলগ কনসার্নিং দ্যা টু চীফ ওয়ার্লড সিস্টেম্স" প্রকাশ করেন। এরপর ১৬৩৮ সালে প্রকাশ করেন তাঁর অপর বৈপ্লবিক গ্রন্থ "ডিসকোর্সেস এন্ড ডেমোস্ট্রেশন কনসার্নিং টু নিউ সাইন্সেস"।

গ্যালিলিও এসব গ্রন্থে স্বভাবের আইন-কানুন ও গাণিতিক পদ্ধতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। গ্যালিলিওর এসব বৈপ্লবিক আবিষ্কার ও থিওরী কিন্তু প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান রোমান ক্যাথলিক চার্চকে রাগান্বিত করে তুলে। কোপারনিকাসের থিওরীকে গ্রহণ করার ফলে তাঁকে শেষ জীবন ঘরবন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। চার্চ ১৬১৬ সালে কোপারনিকাসের সকল পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

গ্যালালিওকে নির্দেশ দেওয়া হয়: কোপারনিকাসের থিওরী প্রচার করবে না। এছাড়া এই থিওরী ভুল বলে স্বীকারোক্তি দিতে তাকে বাধ্য করা হয়। যারা ভাবেন বিজ্ঞান খ্রিস্টবাদের মাধ্যমে উৎকর্ষিত হয়েছে তারা আরেকবার ভাবুন। বাস্তবে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত কট্টর খ্রিস্টানরা বৈজ্ঞানিক চেতনার ঘোর বিরোধী ছিলো। আর এর প্রতিক্রিয়ায়ই শেষ পর্যন্ত ইউরোপে ধর্মবৈরিতার জন্ম হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় তথাকথিত কট্টর যুক্তিবাদ বা রেশনালিজম।

এক্ষেত্রে ইসলামধর্ম স্বতন্ত্র। ইসলাম ও বিজ্ঞান এবং ক্ষেত্রবিশেষে দর্শন যুগ যুগব্যাপী সামঞ্জস্যতা বজায় রেখেছে। বাস্তবে কোনদিনই বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে

ইসলামের কোন সংঘাত ঘটেনি। আর যারা মনে করে এতে সংঘাত আছে তারা না আছে অবগত ইসলাম সম্পর্কে না আছে বিজ্ঞান সম্পর্কে। ধর্মকে মানবজীবনের কোন কোন দিক যেমন রাজনীতি ও বিজ্ঞান থেকে আলাদাকরণের প্রয়োজন দাঁড়িয়েছিল খ্রিস্টবাদের ক্ষেত্রে। ইসলামের ক্ষেত্রে এ প্রয়োজনীয়তা কখনও দেখা দেয়নি। অথচ আজ যারা এ প্রয়োজনীতা আছে বলে মনে করেন এরা বাস্তবে ইহুদি-খ্রিস্টবাদিতা ও তাদের প্রণিত ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের প্রভাবেই এরূপ কথা বলেন।

রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ইসলামের আওতাভুক্ত। ইসলামকে এসব বস্তু থেকে আলাদা করার কোন যুক্তিও নেই এবং প্রয়োজনও নেই। তাছাড়া এরূপ করার প্রয়াস ইসলামের জন্য এবং এই দীনে বিশ্বাসীদের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। আধুনিক সুধী-শিক্ষিত মুসলিম সমাজ এ সত্য যতো তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন ততোই সবার জন্য মঙ্গলময়।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগের সূচনা মুসলমানদের হাতেই হয়েছিল। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের জ্ঞানের উপর বিজ্ঞ একটি মুসলিম সমাজ আজ সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণময় হবে। এ সত্যকে উপলব্ধি করে নতুন বিশ্ব-ওয়ার্ডার গড়ে তুলতে হবে।

গ্যালিলিওর মৃত্যুর কিছুদিন পর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের [১৬৪৩-১৭২৭] জন্ম হয়। তিনি ১৬৮৭ সালে মেথেমেটিক্যাল প্রিন্সিপালস অব নেচারেল ফিলোসফি [সংক্ষেপে প্রন্সিপিয়া] নামক তাঁর জগতখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে নিউটনের তিনটি প্রাকৃতিক গতির আইনের কথা তুলে ধরা হয়।

এগুলো হলো: ১. যে কোন বস্তু স্থির অথবা পরিবর্তনশীল সরলরেখায় চলমান গতির মধ্যে থাকে যদি না অপর কোন ফোর্স (শক্তি) একে অন্য অবস্থায় না ফেলে [এটাকে ইনার্শা (জড়তা) আইন বলে]। ২. যে কোন বস্তুর গতি পরিবর্তন এর উপর যে ফোর্স ক্রিয়াশীল আছে তার সঙ্গে আনুপাতিক (প্রপোরশন্যাল) এবং তা সে দিকে চলে যে দিকে ফোর্স বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল [এটাকে একসেলেরেশন (ত্বরণ) আইন বলে]। ৩. প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে একটি বিপরিত এবং সমান প্রতিক্রিয়া নিহিত [এটাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আইন বলে]। এই আইনগুলো

পৃথিবীর উপর সত্য বলে প্রমাণ করার পর নিউটন এগুলোকে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের ক্ষেত্রেও সত্য বলে প্রমাণ করার প্রয়াস পান।

এরপর তিনি তার সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত মহাকর্ষ আইনটি প্রকাশ করেন। এতে বলা হয়েছে: জগতের প্রতিটি বস্তুই একে অন্যকে একটি ফোর্সের মাধ্যমে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ শক্তি বস্তুগুলোর ওজনের গুণফলের সঙ্গে সরাসরি আনুপাতিক ও এই ফোর্স বিপরিতভাবে তাদের মধ্যে দূরত্বের গুণফলের সঙ্গে আনুপাতিক।

নিউটন শুধু গাণিতিক কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি একজন দক্ষ আলোকবিজ্ঞানীও ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রিজম নামক কাঁচের যন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণ সূর্যালোকে যে সাতটি রং আছে তা প্রমাণ করেন। এই সাতটি রংকে বিজ্ঞানের ভাষায় স্পেকট্রাম বলে। বিজ্ঞানজগতে নিউটনের প্রভাব অনস্বীকার্য। নিউটনের পর বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ পর্যন্ত তার ব্যাখ্যায়িত বিশ্বতত্ত্ব সমগ্র বৈজ্ঞানিক সমাজকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। কিন্তু নিউটনেরও তথ্যাবলী নির্ভুল ছিলো না। একটু পরই এর প্রমাণ আমরা উপস্থাপন করবো।

"আল্লাহর আধিপত্য রয়েছে আসমান ও জমিনে এবং এতদুভয়ের মধ্যে সবকিছুতে; তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান" [সূরা আন্‌নিসা ঃ ১২০]।

পরিচ্ছেদ ৫

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দি

উনবিংশ শতকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও টেকনোজিক্যাল উন্নয়ন পশ্চিম ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রায় সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে স্যার জগদিশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ -উদ্ভিদ বিজ্ঞান), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪ -পদার্থবিজ্ঞান), পদার্থবিজ্ঞানে নবেল পুরষ্কার লাভকারী চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৫ -অ্যাস্ট্রফিজিক্স) এবং বিংশ শতকের শেষের দিকে প্রফেসর আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৫ -নিউক্লিয়ার ফিজিক্স) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অনস্বীকার্য অবদান রেখেছিলেন। তবে বিজ্ঞানের সিংহভাগ অগ্রগতি মূলত পশ্চিমেই সাধিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইমানুয়্যাল কান্ট [১৭২৪-১৮০৪], থমাস রাইট [১৭১১ -১৭৮৬] এবং লাপলেস [১৭৪৯-১৮২৭] প্রমুখ বুঝতে সক্ষম হন যে, বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বের ৬ হাজার বছর বয়স মোটেই সঠিক হতে পারে না। বাস্তবে এই মহাবিশ্ব মিলিয়ন মিয়িলন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। এই সত্য উদঘাটিত হওয়ার পর সমগ্র সৌরজগৎ নিয়ে গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়ে পড়ে। পৃথিবীটাও যে একটি বিবর্তনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরে রদবদল হয়ে আসছে এ সত্যটিও বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়ে। আর এটার জের ধরেই বৃটিশ ইহুদি প্রকৃতিবাদী চার্লস ডারইউন [১৮০৯-১৮৮২] তাঁর প্রখ্যাত বিবর্তনবাদের জন্ম দেন। এই থিওরীটি কিন্তু এখনও বিতর্কিত। অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা এতে বিশ্বাস করেন না। তবে এ থিওরী মিথ্যা বলে অনেকের ধারণা থাকলেও এ থেকে একটি প্রভাব বিজ্ঞানজগতসহ পুরো মানবসমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

এই প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক ফলাফল হলো বস্তুবাদিতা ও শেষ পর্যন্ত নাস্তিকতা। ডারউইনের ধারণাভিত্তিক এই থিওরী মানুষকে বানর বানিয়ে ছাড়ে।

কিন্তু আধুনিক যুগে এসে তাঁর এ ধারণা যে সঠিক ছিলো না তা বিজ্ঞানমহলে দিন দিন পরিস্ফুটিত হয়ে উঠছে।

উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের অপর একটি শাখা- পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানমহলে এক নতুন সাড়া জাগে। এই শাখার উপর গবেষণা ও নতুন নতুন আবিষ্কার ক্ল্যাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের উপর চরম চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব নতুন থিওরীও বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভ করেনি। বিংশ শতাব্দির শুরুতেই বিরাট পরিবর্তন শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দির শুরুতে প্রথমতঃ নিউটনের আলোকবিজ্ঞানের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। থমাস ইয়াং [১৭৭৭-১৮২৯], অগাস্টিন ফেসনেল [১৭৮৮-১৮২৭] প্রমুখ আলোকের স্বরূপ সম্পর্কে নতুন থিওরী উপস্থাপন করেন। যেখানে নিউটন বলেছিলেন, আলোক সাধারণতঃ প্যাকেট প্যাকেট হিসেবে বিকিরণ হয় সেখানে তারা বললেন, আসলে আলোক হচ্ছে একটি এনার্জি যা মূলত ওয়েভ বা ঢেউ তুলে চলে। অপরদিকে তাপ ও উষ্ণতার উপর মৌলিক থিওরী গড়ে উঠলো। এক্ষেত্রে হারম্যান হেলমোট্‌জ [১৮২১-১৮৯৪] এর কনজারভেশন অব এনার্জি বা শক্তির অপরিবর্তনীয়তা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "এনার্জি মানুষ সৃষ্টিও করতে পারে না এবং তা ধ্বংস করাও যায় না। শুধুমাত্র প্রযৌক্তিকভাবে তা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রদবদল সম্ভব"। উদাহরণস্বরূপ পানি থেকে প্রাপ্ত এনার্জির কথা তুলে ধরা যায়। একটি হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশনে প্রথমে পানিকে নদীতে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখে পটেনশিয়্যাল (সম্ভাব্য) এনার্জি তৈরী করা হয়। এই এনার্জি মূলত- মধ্যাকার্ষণের কারণে সৃষ্ট এনার্জি। পানি মধ্যাকার্ষণের ফলেই উপরের স্তর থেকে নীচের স্তরে গড়িয়ে পড়ে। নদীর বাঁধের মাধ্যমে পানিকে আটকিয়ে রাখার পর এটাকে বিশেষ গেটের মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়ার পর পটেনশিয়্যাল এনার্জিকে পরিবর্তন করে কিনেটিক (চলার কারণে সৃষ্ট) এনার্জিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই এনার্জি দ্বারা ইলেকট্রিক টারবাইন চালু করে তা আবার মেকানিক্যাল এনার্জিতে পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ টারবাইনকে ঘুরানো হয়। এখানেই শেষ নয়- মেকানিক্যাল এই এনার্জিকে টারবাইনের মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হিসেবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। ঘরে পৌঁছার পর এই এনার্জিকে বৈদ্যুতিক লাইট বালব দিয়ে আলোক এনার্জি, প্লাগ দিয়ে

মেকানিক্যাল এনার্জি কিংবা অন্য কোন এনার্জিতে রূপান্তর করা হয়ে থাকে। তাহলে দেখা গেল এনার্জি সৃষ্টি করা হয়নি- বরং পানিতে জামাকৃত স্বাভাবিক পটেনশিয়াল এনার্জি থেকে কৌশলে এসব রদবদল করা হয়েছে। এছাড়া এনার্জি কখনও নষ্ট হয় না। প্রত্যেক এনার্জি দ্বারা কাজ করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমেও এনার্জি রদবদল হয়। কাজ করার পর যা থাকে তা বায়ূমণ্ডলে চলে যায়। এনার্জির এই বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো, কনজারভেশন অব এনার্জি মানে কি।

তাপ ও উষ্ণতার উপর গবেষণা ছাড়াও মাইকেল ফারাডে [১৭৯১-১৮৬৭] এবং জেমস ক্লার্ক মেক্সওয়েল [১৮৩১-১৮৭৯] প্রমুখ বিজ্ঞানী ইলেকট্রোমেগনেটিজম (বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়) এর উপর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান রাখেন। ১৮৯৫ সালে এক্স-রে আবিষ্কারও একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। এটা আবিষ্কার করেন উইলহেম রয়েজেন [১৮৪৫-১৯২৩]। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে জসেফ জন থমসন [১৮৫৬ -১৯৪০] ইলেকট্রন আবিষ্কার করে আনবিক বিজ্ঞানের সূচনা করেন। এসব মৌলিক আবিষ্কারের ফলেই পরবর্তী বছরগুলোতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সাধন শুরু হয়।

প্রাণীবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রে উন্নয়ন

উনবিংশ শতকে শুধুমাত্র পূর্বোল্লিখিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-গবেষণাই চলছিলো না। প্রাণীবিজ্ঞান (বায়োলজি) এবং রসায়ন (কেমিস্ট্রি) শাস্ত্রের উপরও তখন ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন হচ্ছিলো। এসময় উন্নতমানের ও শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ বা অণুবিক্ষণযন্ত্রের উন্নয়ন এসব শাস্ত্রে গবেষণায় নতুন উদ্যম যোগান দেয়। এ সময়কার হয়তো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে আবিষ্কারটি ছিলো তাহলো, জৈবিক মৌলিক উপাদান কোষ (সেল) এর পরিচিতি লাভ।

কোষের উপর নতুন বৈপ্লবিক একটি থিওরী থিওডোর শোয়ান [১৮১০-১৮৮২] নামক এক বিজ্ঞানী ১৮৩৯ সালে প্রকাশ করেন। এরপরই খুব দ্রুত কোষের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশ বিজ্ঞানীরা সনাক্ত করেন। এছাড়া কোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রস্থলে ক্রমোজাম নামক জৈবিক পদার্থ আবিষ্কার করা হয়। প্রাণীবিজ্ঞানীরা গর্ভাশয়ে মানবশিশুর উন্নয়ন নিয়েও গভীর গবেষণা শুরু করেন। বিশেষ করে মহিলাদের ডিম্বকোষ যে পুরুষদের শুক্রের মাধ্যমে ফারটিলাইজ হওয়ার পরই গর্ভাশয়ে ভ্রূণের জন্ম হয়- এ

তথ্যটি সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে। যদিও মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনেকেই এই থিওরী শত শত বছর পূর্বেই উপস্থাপন করেছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকের শুরুতে স্কুল শিক্ষক জন ডালটন [১৭৬৬-১৮৪৪] কর্তৃক প্রকাশিত এটম থিওরী এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই থিওরীর ফলেই কেমিস্টরা এটমের রিলেটিভ (আপেক্ষিক) ওজন কী তা জানতে সক্ষম হন। একই সময় আমেডিও এভোগার্ডো [১৭৭৬-১৮৫৬] নামক এক কেমিস্ট মলিকিউল থিওরী প্রকাশ করেন। এ থিওরীতে বলা হয় একাধিক এটম একসঙ্গে অবস্থান করে একেকটি শক্তিশালী অংশ হিসেবে পদার্থে অবস্থান করে। এসব অংশ হচ্ছে একেকটি মলিকিউল। তবে কেমিক্যাল শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার ছিলো পিরিওডিক টেবিল।

রাশিয়ান কেমিস্ট ডিমিট্রি মেনডেলিয়েভ [১৮৩৪-১৯০৭] হচ্ছেন এর আবিষ্কারক। এই টেবিলের মাধ্যমে একটি সিস্টেমেটিক বা প্রণালীবদ্ধ উপায়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ তাদের এটমিক ওজনের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই টেবিল থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যাবতীয় পদার্থ বাস্তবে একই উপাদান- এটম থেকে সৃষ্ট। এটমের ওজন [বা এর ভেতরের পরমাণুর (সাব-এটমিক পার্টিকল) সংখ্যা প্রভৃতির] ও অন্যান্য ভিন্নতার ফলে একেকটি একেক ধরণের অবস্থায় অস্তিত্বশীল আছে। জগতের প্রতিটি বস্তুই হয় মৌলিক পদার্থ যাকে বলে ইলেমেন্ট না হয় একাধিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত ধাতু, গ্যাস প্রভৃতি যাকে বলে কমপাউণ্ড। পিরিওডিক টেবিল দ্বারা জানা সব পদার্থের এটমিক অবস্থা বুঝা অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে।

উনবিংশ এবং বিশেষকরে বিংশ শতকে অপর যে উন্নয়ন ঘটে তাহলো, বিজ্ঞানকে একটি প্রফেশন্যাল চেহারায় উপস্থাপন। আগেকার দিনে বিজ্ঞানীরা ছিলেন মূলত পার্টটাইম গবেষক। অনেকেই এ কাজ ছাড়াও অপর কোন কাজে জড়িত থাকতেন। কিন্তু চরম উন্নতি শুরু হওয়ার পর একমাত্র বিজ্ঞান গবেষণার জন্য অনেকে এই কাজকে নিজেদের জিবীকা নির্বাহের উপায় হিসেবে বেছে নেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান নিজেই একটি সম্মানিত প্রফেশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই পদক্ষেপের ফলে এক বিরাট দল সৃষ্টি হয় যারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একমনে গবেষণা শুরু করেন। এতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি দ্রুত থেকে দ্রততর হয়ে ওঠে।

এসময় থেকেই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের কর্মতৎপরতা এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান (অর্থাৎ প্রযুক্তি) সবার জন্য গৌরবের বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাছাড়া বিজ্ঞান তখন থেকে কমার্শিয়াল একটি লাভজনক বিষয়ে পরিণত হয়। যে দেশ বা জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতো বেশী উন্নত ছিলো সে দেশ বা জাতি ছিলো অর্থনৈতিক দিক থেকে সমুন্নত ও প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী। এই অবস্থা আজও বিদ্যমান। সমগ্র পশ্চিমে এ সময় থেকেই শুরু হয় বৈজ্ঞানিক চরম প্রতিযোগিতা।

বলাই বাহুল্য, এই একই সময় প্রাচ্যের অবস্থা ছিলো এর বিপরিত। যে সময় সমগ্র পশ্চিমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে শিল্পবিপ্লব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই পশ্চিমাদের উপনিবেশে জর্জরিত প্রাচ্য আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে যুদ্ধে-বিগ্রহে নিমগ্ন ছিলো। অবশ্য উপনিবেশবাদী পশ্চিমা শক্তি ইচ্ছে করেই সমগ্র প্রাচ্যকে ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল রিভুলুশনের প্রভাব থেকে দূরে রাখে। ইচ্ছে করে তাদের শাসিত দেশে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলে নি। কারণ, তারা জানতো প্রাচ্যেও যদি এই বিপ্লব শুরু হয়ে যায় তাহলে নেটিভরা উপনিবেশবাদীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং আর্থ-সামাজিকভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবে। পাশ্চাত্য তখন আর সুপেরিয়ার শক্তি হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর অতীতে যেসব মুসলিম জনগোষ্ঠির পূর্বপুরুষরা শত শত বছর চিন্তা-গবেষণা করে গেলেন, সেসব মুসলিম অঞ্চলের মানুষও বৈজ্ঞানিক চেতনা থেকে এ সময় সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে গেল। তবে এই চেতনা যাতে সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে তাদের পশ্চিমা দখলদার শাসকরা সর্বাত্মক শক্তি তাদের উপর আরোপ করেছিল।

বলাই বাহুল্য আজ উপনিবেশ শেষ হওয়ার প্রায় অর্ধশতক পরেও কিন্তু ঐসব মুসলিম জনপদে বৈজ্ঞানিক চরম চেতনা এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কেরানী সৃষ্টির ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যন্ত এখনও উৎখাত করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা চালু হয়নি সেসব দেশে। বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া যে এই পৃথিবীতে মর্যাদাসহকারে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়- এই সত্যটি এখনও পোস্ট-উপনিবেশিক স্বাধীন দেশসমূহের হর্তাকর্তারা অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। পূর্ব যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন ছিলো, ইসলামী মহান শরীয়তভিত্তিক সমাজ একটি আদর্শ সমাজ হবে- যদি এর রাজনৈতিক কাঠামো

কুরআন-সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থনৈতিক কাঠামো বিজ্ঞানভিত্তিক গড়ে ওঠে। বাস্তবে তাদের সময়ে এ স্বপ্নের আংশিক বাস্তবতা সমাজে প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই ইসলাম ইতিহাসে একাধিক স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিশেষকরে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিলো। আধুনিক যুগে এর চরম উন্নতি ইসলামভিত্তিক আরেকটি স্বর্ণযুগ সৃষ্টির পথ উন্মোচন করে দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ এ সত্য যতো তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবে ততো দ্রুত সবার জন্য তা হবে মঙ্গলময়।

বিংশ শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞান গবেষণার নতুন নতুন দিঘন্ত উন্মোচন হতে থাকে। বিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠে। একেক দল বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানের একেকটি বিষয় নিয়েই গবেষণা শুরু করেন। সুতরাং এ সময় থেকেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট, বায়োলজিস্ট, পদার্থবিদ প্রভৃতি প্রফেশন পশ্চিমা সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এরা একেকজন নিজেদের বিশেষ বিষয়ের উপরই অধ্যয়ন করে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন। এতে সার্বিকভাবে বিজ্ঞানের এক অভাবনীয় চরম উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়ে ওঠে। বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রফেশনের সংখ্যা শতাধিক হয়েছে। ভবিষ্যতে তা আরও বাড়তে পারে বলে ধরণা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির শুরু থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। থিওরিটিক্যাল বিজ্ঞান ও প্রেকটিক্যাল বিজ্ঞান তথা টেকনোলজির মধ্যে এই বিবাহবন্ধন ছিলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিজ্ঞানের এই প্রধান দু'টি শাখা হয়ে ওঠে একে অন্যের সম্পূরক। বিজ্ঞানের থিওরীকে কাজে লাগায় টেকনোলজি, অপরদিকে টেকনোলজি বিজ্ঞানের গবেষণা উন্নতর করতে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির যোগান দেয়। বিংশ শতাব্দির শুরুতে এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক এতো গভীর হয় যে, একটা অপরটির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানীদের অর্থিকভাবে সহযোগিতা করে, যার ফলে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও মেশিন আসতে থাকে বাজারে সাধারণ্যের জন্য। মেডিক্যাল সাইন্সের ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট ফার্মিসিউটিক্যাল কোম্পানীর আবির্ভাব ঘটে। এসব কোম্পানী ঔষধ তৈরীর জন্য মেডিক্যাল

বিজ্ঞানীদের বিরাট অঙ্কের টাকা দিতে থাকে। এভাবে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব দ্রুত টেকনোলজিক্যালী বা প্রযৌক্তিকভাবে উন্নততর সমাজে রূপান্তরিত হয়।

বিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান

গেল শতক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দির বৈজ্ঞানিক চরম উন্নতির যুগকে আমরা কিভাবে অনুধাবন করতে পারি- তা একটি জটিল প্রশ্ন বটে। একটু ব্যাপকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এসময় বাস্তবে সমগ্র বিজ্ঞানজগৎ একটি শিল্পে পরিণত হয়েছিল। এই শিল্পে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য মানুষ জড়িত হয়ে এমন একটি আর্থ-সামাজিক-বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু করে, যা অতীতে মানবেতিহাসে আমরা কোন সময়ই দেখি নি। বৈষয়িক দিক থেকে এই বিপ্লবের প্রভাব ছিলো অপরিসীম। আর বাস্তবে এই বিপ্লব এখনও চলছে। একবিংশ শতকে এটা আরও গতিশীল হচ্ছে বলেই প্রাথমিক বছরগুলো প্রমাণ করেছে। অনেকে বিংশ শতককে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এক তথ্যানুযায়ী গত শতকের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাত্রা প্রতি ১৫ বছরে দিগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এছাড়া বিংশ শতাব্দির গবেষণাও ছিলো আগের সব শতাব্দির তুলনায় অনেকটা ভিন্ন ধরণের। শতাব্দির শুরুতে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বাস্তবে এক নবতর বিপ্লব শুরু করেন। এদের মধ্যে প্রথমেই আমাদেরকে ম্যাক্স প্লাংকের কথা স্মরণ করতে হয়।

১৯০০ সালে ম্যাক্স প্লাংক [১৮৫৮-১৯৪৭] তাঁর বৈপ্লবিক থিওরী 'কুয়ান্টাম মেকানিক্স' প্রকাশ করে বিজ্ঞানজগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এর মূলে হচ্ছে বস্তু থেকে এনার্জি বিকিরণের স্বরূপ। ইতোমধ্যে সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে, এনার্জি বিরিকণ হয় একটানাভাবে (কন্টিনিউয়াসলি)। কিন্তু প্লাংক বললেন, বাস্তবে তা এককেটি প্যাকেট বা কোয়ান্টা-এর মাধ্যমে বিকিরণ হয়। এ মুহূর্তে এই থিওরীর গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করতে না পারলেও এটা যে আনবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিরূপ প্রবাভশালী ছিলো তা দ্বিতীয় খন্ডে আমরা জানতে পারবো।

কেয়ান্টাম মেকানিস্ক থিওরী আসে জে জে থমসন [১৮৫৬-১৯৪০] কর্তৃক ইলেকট্রন আবিষ্কারের মাত্র তিন বছর পর। প্লাংকের থিওরী যেরূপ বিপ্লবী ছিলো তার চেয়েও বৃহৎ এবং সুদূরপ্রসারী আরেকটি বিপ্লব মাত্র ক'বছরে মধ্যেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছিলো। সে বিপ্লবটি ছিলো আলবার্ট আইনস্টাইনের [১৮৭৯-১৯৫৫] আপেক্ষিকতাবাদ।

দু'টি ভিন্ন থিওরীর মাধ্যমে তিনি আপেক্ষিকতাবাদের উপস্থাপন করেন। ১৯০৫ সালে প্রথমে প্রকাশ করেন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। এতে বলা হয়: সব ফিজিক্যাল আইন পর্যবেক্ষক ব্যক্তির জন্য আপেক্ষিক এবং সকল পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেই- সে স্থির অবস্থায় থাকুক কিংবা চলন্ত থাকুক, আলোকের গতি সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে। সুতারাং এই একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে নিউটনের 'মোশন্স অব এবস্যুলুট স্পেইস এন্ড টাইম' [চুড়ান্ত স্থান-কালের গতিবিধি] থিওরী উড়ে যায়।

সময় ও স্থান আইনস্টাইনের মতে আপেক্ষিক এবং একটা আরেকটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোন চূড়ান্ত ঘড়ি বা স্থান এ মহাবিশ্বে নেই। পর্যবেক্ষক হিসেবে সময় ও স্থান আমাদের অবস্থান ও গতির উপর ভিত্তিকরে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। একই ঘটনা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে দেখবে। এছাড়া আইনস্টাইন তাঁর প্রখ্যাত সমীকরণ ই=এমসিস্কোয়ার্ড দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, ওজন (মেস) ও এনার্জির (উদ্যম) মধ্যে এটাই সম্পর্ক।

এই থিওরীর ১০ বছর পর ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় থিওরী প্রকাশ করেন। এটাকে তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নামকরণ করেছেন। আইনস্টাইনের এই থিওরীদ্বয় সম্পর্কে পরবর্তী খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা হবে। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক দিক আলোচনায় এগুলোর কথা এখানে সংগত করণেই উল্লেখ করা হল।

বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে অপর যে বৈপ্লবিক থিওরী প্রকাশিত হয় তা শুধু বিজ্ঞানজগতকে নয় দর্শন শস্ত্রের উপরও বিরাট প্রভাব ফেলে। এ থিওরীর নাম হলো অনিশ্চয়তাবাদ। হেইজেনবার্গ [] নামক এক বিজ্ঞানী এই থিওরীর উদ্ভাবক। ১৯২৭ সালে তিনি এই থিওরী প্রকাশ করেন। বস্তুজগতের মৌলিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ অণু-পরমাণুর জগতে প্রাকৃতিক আইন যেন খামখেয়ালীভাবে কাজ করে। এই

থিওরীর এটাই বৈশিষ্ট্য। এ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অণু-পরমাণু বাস্তবে কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তাদের নিজের আইনকে ভঙ্গ করে ফেলে। তবে এই থিওরী প্রথমতঃ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে পারেননি বা চাননি। কারণ, তখন প্রায় সকলেই চরম বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে পড়ে নাস্তিক্যবাদী হয়ে গিয়েছিলেন। এই থিওরীর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদের উপর কুঠারাঘাত পড়ে। অনেক বিজ্ঞানী হেইজেনবার্গের থিওরীকে উড়িয়ে দিলেন। প্রভুবিশ্বাসী বলে খ্যাত স্বয়ং আইনষ্টাইনও তা গ্রহণ করতে না পেরে একদা বলেছিলেন, "ইশ্বর স্বভাবকে নিয়ে পাশা খেলেন না!" কিন্তু গণিতশাস্ত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হেইজেনবার্গের শক্তিশালী এই থিওরীকে উড়িয়ে দিতে কেউই সমর্থ হননি। আইনষ্টাইন হেইজেনবার্গের থিওরীকে ভুল প্রমাণিত করতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বিংশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্ব

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্বে শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডইউন হাবলের [১৮৮৯-১৯৫৩] গবেষণা বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইতোপূর্বে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যেসব ধারণা ছিলো হাবল তা পাল্টে দেন। তিনি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, এ মহাবিশ্বে শুধু অসংখ্য তারাজগৎ তথা গ্যালাক্সি বিদ্যমান নয় বরং এসব সর্বদাই চতুর্দিকে বিস্তারলাভ করছে। হাবল অঙ্ক কষে আবিষ্কার করেন, গ্যালাক্সির দূরত্বের সঙ্গে এর দূরে সরে যাওয়ার গতি সম্পর্কিত আছে। এই আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞান মহলে জগতকে আরও সঠিকভাবে জানার এক নবতর সাড়া জাগে। বিশেষকরে হাবলের সমীকরণের গতিটি যদি বিপরিত দিকে চালানো হয় তাহলে বিশ্বের বয়স সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে বলে অনেক বিজ্ঞানী মতামত পোষণ করেন। এই উপায়ে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, এ মহাবিশ্ব আজ থেকে ১৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাংলায় এ সংখ্যাটি হচ্ছে ১৪ হাজার কোটি বছর। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের উপর লিখিত পরবর্তী খণ্ডে বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। সুতরাং এ প্রসঙ্গে এতটুকু বলাই যথেষ্ট।

পৃথিবী নিয়ে গবেষণা

বিংশ শতাব্দির শরুতে পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণায় আলফ্রেড লোথার ওয়েগনার [১৮৮০-১৯৩০] নামক এক ভূতত্ত্ববিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ থিওরী প্রকাশ করেন। ১৯১০ সালে প্রকাশিত এই থিওরীর নাম হচ্ছে কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্‌ট বা চলমান মহাদেশ। এই থিওরী অনুযায়ী, ২০০ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর ভূখণ্ড একত্রে ছিলো। এই মহা-মহাদেশ পরে ভেঙ্গে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি খণ্ড ধীরে ধীরে একে অন্যের নিকট থেকে দূরে সরে গিয়ে আজকের একাধিক ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। ওয়েগনারের এই থিওরী গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এর পরীক্ষিত কোন প্রমাণ উপস্থান করতে ব্যর্থ হন। তবে ৩০ এর দশকে পরীক্ষাভিত্তিক প্লেট টেকটনিক্স নামক অপর একটি থিওরী গড়ে ওঠে। এই থিওরীর মাধ্যমে ওয়েগনারের থিওরীর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

চলমান তথ্যবিপ্লব

বিংশ শতকের শেষার্ধে 'ইনফরমেশন রিভোলুশন' বা তথ্যবিপ্লব শুরু হয় এবং তা আজো দ্রুত গতিতে চলমান আছে। এ বিপ্লবের সঙ্গে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি জড়িত।

প্রিন্টেড ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে পুরো বিশ্বব্যাপী ঘরে ঘরে ইনফরমেশন পৌঁছে দেওয়ার বৈপ্লবিক এই পদক্ষেপ থেকে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ বিশ্বসমাজ সম্পর্কে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল হবে- এটাই এর সফলতা। ইতোমধ্যে 'কম্পিউটার' প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য উন্নয়নের ফলে জগতব্যাপী 'শিক্ষাবিপ্লব' বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। আধুনিক তথ্যবিনিময় প্রযুক্তি 'ইন্টারনেট' এর মাধ্যমে একটি 'মাউসক্লিক' দ্বারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যোগাগোগ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। ইন্টারনেট নামক এই অভিনব তথ্যবিনিময় নেটওয়ার্কটি মানবসভ্যতার জন্য সার্বিকভাবে উপকার না অপকার বয়ে আনবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলে দিতে পারে। তাবে, চিন্তার কারণ আছে অবশ্যই।

ইন্টারনেটে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-সমাজ পিরিচিতি, ইতিহাস, প্রিন্টেড মিডিয়াসহ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাকার অসংখ্য শিক্ষামূলক তথ্যাদি বিদ্যমান, তেমনি এতে কিছু অসাধু, বেতমিজ, শয়তানচক্র একদল লোক অসংখ্য অশ্লীল উলঙ্গ ছবি, ফিল্ম, গল্প ইত্যাদি প্রচার করছে। এর ফলে নিয়ন্ত্রণহীন ইন্টারনেট নতুন প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। সহজে প্রাপ্য এসব অশ্লীলতার প্রভাব থেকে এরা মুক্ত থাকতে পারছে না।

সুতরাং তথ্যবিপ্লবের এই আধুনিক যুগ নীতি-নৈতিকতা, লজ্জাশীলতা, একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ইত্যাদি মানবিক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীকে সমূলে ধ্বংসের এক মারাত্মক প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এ থেকে বাঁচার উপায়-অবলম্বন যে কোন মূল্যে খুঁজে বের করতে হবে।

আজকাল ইন্টারনেট আর কারো ব্যক্তিগত প্রযুক্তি বা সম্পদও নয়। এতে যেসব তথ্যাদি 'আপলোড' [তুলে দেওয়া] হচ্ছে তা কে কোন্ দেশ থেকে কিভাবে দিচ্ছে তা চিহ্নিত করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর ফলে 'নেটদস্যুদের'-কে সমুচিত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং, বিশ্বের সকল মানুষের সম্পদ ও প্রযুক্তি এই ইন্টারনেটকে আন্তর্জাতিকভাবে সরকারসমূহের যৌথ উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। অবশ্য সফট্ওয়ার [কম্পিউটার ও ইন্টারনেট চালু রাখার টেকনিক্যাল প্রোগ্রামকে বলে সফটওয়ার।] কোম্পানীগুলো ইতোমধ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বটে। কিন্তু শুধুমাত্র টেকনিক্যাল উপায়ে এই সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়।

সুতরাং আন্তর্জাতিকভাবে সরকারসমূহের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট থেকে 'অশ্লীলতা' নির্মূল করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ বংশধরদের মন-মানসিকতায় মারাত্মক প্রভাব পড়বে যা থেকে পুরো বিশ্ব অভাবনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিশ্বের প্রতিটি শহরে আকজাল গজিয়ে উঠছে 'ইন্টারনেট ক্যাফে'। এসব দোকানে শিশু-কিশোররা পর্যন্ত নিয়মিত কাস্টমার। অভিভাবকদেরকে সচেতন করাও সবার দায়িত্ব। হোমওয়ার্ক করার ভান করে ছেলে-মেয়েরা ইন্টারনেট ক্যাফেতে গিয়ে কি করছে তার একটু খোঁজ-খবর রাখা

দরকার। আর এসব 'ক্যাফে' সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ- এমনকি প্রয়োজনে এ ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণার কথাও বিবেচনা করতে হবে।

এ খণ্ডের শেষ কথা

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস গবেষণায় আমরা এখানে এসেই থেমে যাচ্ছি। তবে বিংশ শতাব্দিব্যাপী এবং একবিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ অব্যাহত ছিলো। আর তা ভবিষ্যতেও থাকবে। গেল শতাব্দিতে বস্তুবিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্ষেত্রেও অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে। এটমিক এনার্জি ও এটম বোমা থেকে হাইটেক কম্পিউটার হচ্ছে এর উদাহরণ। এসব দিক নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান খণ্ডে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং এগুলোর ইতিহাস ও উন্নয়ন সম্পর্কে আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। তবে একটা জিনিষ মনে রাখা উচিত, আজকাল বিজ্ঞানের উন্নয়ন এতো দ্রুত ঘটছে যে, একটি বইয়ে আপ-টু-ডেট সবকিছু লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

সুতরাং পরবর্তী খণ্ডে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি 'আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের' পুরো উপস্থাপন নয়। এ সত্যটির স্বীকারোক্তির মাধ্যমে পাঠকদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ, পুরো তথ্যাদি তুলে ধরা সম্ভাবনার বাইরে। শুধুমাত্র মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপরই সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপনের চেষ্টা চালিয়েছি।

ইসলাম ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড
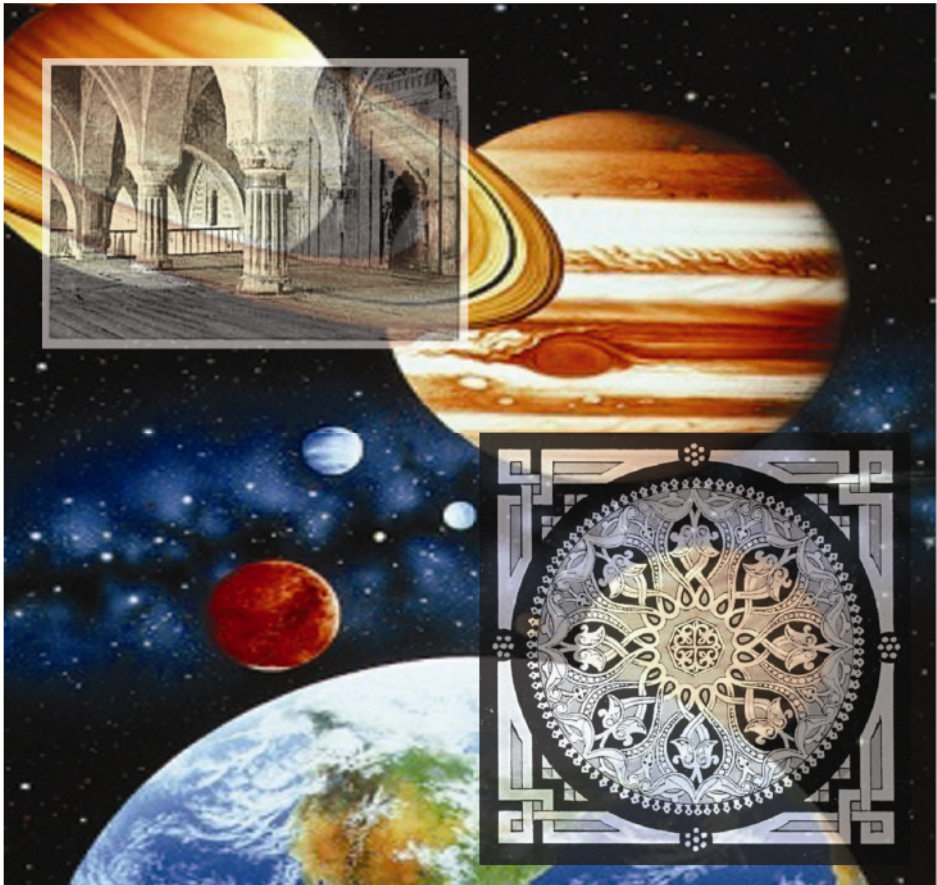
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইসলাম ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

রচনাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ।
engineerazizulbari@gmail.com

❊❊❊❊ বিষয়সূচী ❊❊❊❊

ইসলাম ও বিজ্ঞান (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

রচনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

গবেষণা বিভাগ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

দু'আ ও বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমার প্রিয় মুরীদ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী এই গ্রন্থটি বেশ পরিশ্রমের বিনিময়ে রচনা করেছেন। এতে ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাস ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

আধুনিক যুগে মানুষ বিজ্ঞানকে খুব বেশি আকড়ে ধরেছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কেউ কিছু বুঝতে বা বিশ্বাস করতে চায় না। লেখক বইটিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা চালিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের কোনো হক্ব তথ্য ইসলামের সঙ্গে মোটেই সংঘাতময় নয়- বরং এসব ক্ষেত্রে শুধু মিল আর মিল বিদ্যমান। আমি মনে করি সকলেই এই কিতাব পাঠ করে উপকৃত হবেন। আমি দু'আ করি এটা পাঠকদের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হোক।

আমি লেখকের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। সবশেষে বইটির বহুল প্রচার কামনা করে শেষ করছি।

মুহাম্মদ আমীনুদ্দীন

মোহাম্মদ আমীনুদ্দীন

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামীম
দারুল উলূম জামিয়া ইসলামিয়া অলৈতলী ও কাতিয়া
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
২৩ জুন, ২০০৬ ঈসায়ী।

দ্বিতীয় খণ্ড
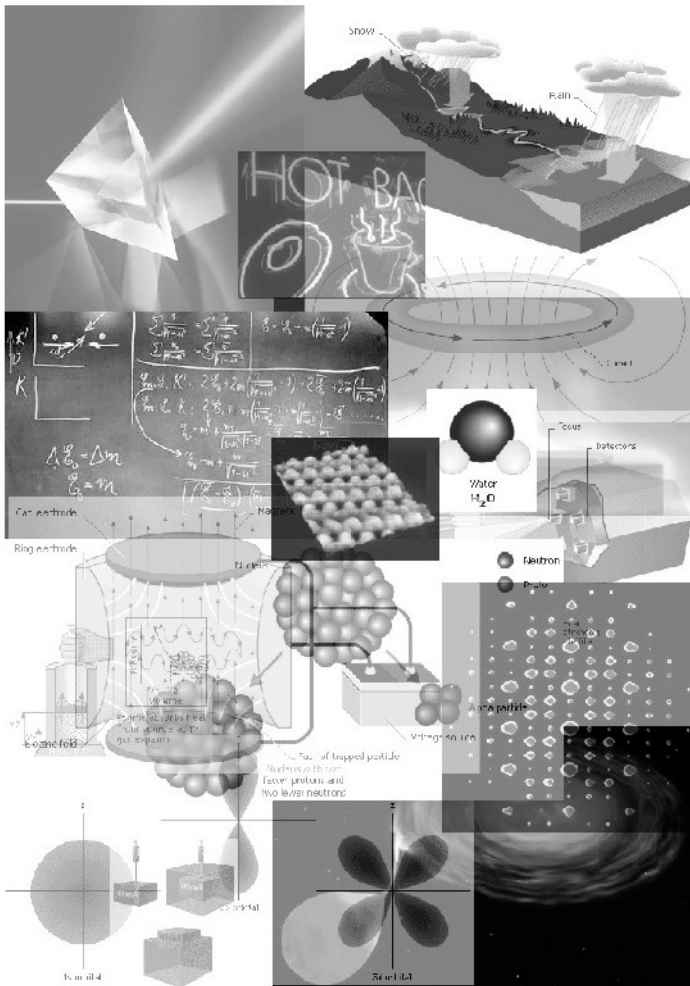
আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

"তিনি পূর্বদ্বয়ের প্রতিপালক (মালিক) এবং পশ্চিমদ্বয়ের প্রতিপালক (মালিক), অতএব তোমারা (হে মানুষ ও জ্বিন জাতি!) স্বীয় প্রভূর কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে অসত্যারূপ করবে?" [সূরা আর-রাহমান ঃ ১৭-১৮]

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ভূমিকা

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিধি ব্যাপক। বর্তমান বিশ্বে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করছে যে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে আলাদা একটি বিশ্বকোষ লিখতে হবে। এছাড়া প্রতিটি আবিষ্কার ও বিশেষকরে প্রযৌক্তিক অসংখ্য উন্নয়ন সম্পর্কে সহজ-সরল বাংলা ভাষায় পুংখানুপুংখ ব্যাখ্যা উপস্থান করা এরূপ একটি পুস্তকে আদৌ সম্ভব নয়। তবে এ খণ্ডে পাঠকদেরকে বিরাট এই বিষয়ের উপর সাধারণ একটি পরিচিতি তুলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান বিষয়ে এটা কোন টেক্স বুক নয়। সাধারণ্যের নিকট ইসলামের আলোকে বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা, এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছুটা অবদান রাখাই এই পুস্তক রচনার আসল উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য হসিলে শেষ খণ্ডে ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যতার উপর বিশদ আলোচনা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস প্রথম খণ্ডে বর্ণিত বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক আলোচনা এবং এ খণ্ডে আলোচিত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপার-স্যাপার পাঠকদের মানসিকভাবে এবং যৌক্তিকভাবে শেষ খণ্ডটি পড়ে আসল মেসেজটি অনুধাবন করার প্রস্তুতি যোগান দেবে। সুতরাং এই খণ্ডে আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রধান প্রধান দিক ও এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন জটিল বিষয়ের গভীর গবেষণায় না গিয়ে সাধারণ্যের বোধগম্য মূল বক্তব্য তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তবে যেহেতু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মৌলিকভাবেই তেমন সহজ বিষয় নয়, সুতরাং অনেকে

হয়তো বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপিত বক্তব্য পুরোদমে অনুধাবন করতে পারবেন না। বিজ্ঞানের উপর যাদের ন্যূনতম জ্ঞান আছে তারা কিন্তু সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি অনুরোধ করবো, যারা বিজ্ঞানের ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞাত তারাও সবকিছু পাঠ করে অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন। এতে আর কিছু না হলেও বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও জানার স্পৃহা জাগ্রত হবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়া একটি কথা এখানে বলে রাখা জরুরী। আজকাল বিজ্ঞানের মূলতঃ ইংরেজিভিত্তিক একটি আলাদা ভাষা আছে। সুতরাং এটাকে বাংলায় সরল করে বলাও সহজ ব্যাপার নয়। আমি যতটুকু সম্ভব ইংরেজি বা নন-বাংলা শব্দব্যবহার এড়িয়ে গেছি- কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দ যেহেতু বাংলা ভাষাভাষীদের জন্যও বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ তাই বিদেশী শব্দটিই রেখে দিয়েছি।

বিজ্ঞানের মূল শাখা মাত্র দু'টি। এর প্রথমটি হলো বস্তুজগত ও অপরটি প্রাণীজগত। বস্তুজগতের অনেকগুলো প্রতিশাখা আছে। যেমন: জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, আনবিক বিজ্ঞান, মহাকর্ষ, পরমাণূ বিজ্ঞান, ইলেকট্রিসিটি ও চুম্বক, মেকানিক্যাল সাইন্স ইত্যাদি। একইভাবে প্রাণীজগতেরও অনেক প্রতিশাখা আছে। যেমন: উদ্ভিদ বিজ্ঞান, বায়োলজী, ভেষদবিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি।

অণু-পরমাণু থেকেই পুরো বস্তুজগত সৃষ্ট। সুতরাং ছোট থেকে বড়- অণু থেকে মহাবিশ্ব, এ তরতীবে আমি বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছি। শেষের দিকে প্রযুক্তির মৌলিক বিভিন্ন দিক আলোচনা হয়েছে। তবে আবারও স্বীকার করে নিচ্ছি যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরাট ফিল্ডের সর্বত্র বিচরণ এ গ্রন্থে সম্ভব হয় নি। বলা চলে বিরাট এই বিষয়ের উপর কিছুটা ভাসাভাসা আলোচনা মাত্র এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। যদি আল্লাহ পাক তাওফিক দেন এবং বর্তমান গ্রন্থখানা পাঠকদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে তাহলে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর আলাদা করে বই-পুস্তক লিখে প্রকাশের আশা রাখি।

"ইয়া-সীন, বিজ্ঞানপূর্ণ কুরআনের শপথ" [সূরা ইয়াসীন ঃ ১-২]।

পরিচ্ছেদ ১

অণু থেকে মহাবিশ্ব ঃ বস্তুজগত

বস্তুজগত নিয়ে গবেষণার নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। এই বস্তুজগতের স্বরূপ জানার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আমরা অণু-পরমাণু থেকে মহাবিশ্বের অসংখ্য তারকাজগত নিয়ে আলোচনা করবো। জগতের মৌলিক বিল্ডিং ব্লক- অণুর স্বরূপ, এর সম্পর্কে বিভিন্ন থিওরী ও মডেল, এর ভেতরের মৌলিক শক্তি প্রভৃতি আমরা প্রথমে বর্ণনা করবো। এরপর এই অণু থেকেই কিভাবে সমগ্র মহাবিশ্বটি গড়ে উঠেছে এবং অস্তিত্ব বজায় রাখছে সেসব ব্যাপারে আলোচনা হবে। আমরা বিষয়টিকে সরলকরণে এ খণ্ডের বর্ণনাভঙ্গি কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করেছি। পাঠকদের সঙ্গে সংলাপভিত্তিক এই উপস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানের জগতকে জানার এই পদ্ধতি পাঠকদের সরাসরি অংশগ্রহণ করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাছাড়া এরূপ বর্ণনাভঙ্গি ভাষাগত দিক থেকেও বেশ চিত্তাকর্ষক বলে মনে করি। তবে সবক্ষেত্রেই যে এভাবে বর্ণনা দেয়া হবে- তা নয়, একমাত্র প্রয়োজনবোধে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

অণু বা এটম

একটি পাকা বিল্ডিং তৈরীর জন্য মৌলিক কিছু উপাদান জরুরী। যেমন, ইট, বালু, পাথর, রড-সিমেন্ট ইত্যাদি। এসব মূল বস্তু যোগাড় হয়ে গেলে এগুলোকে কিছু বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তার আগে রাজমিস্ত্রীর হাতে থাকতে হবে বিল্ডিং আর্কিটেকের একটি সুপরিকল্পিত প্ল্যান বা নক্সা। এই নক্সাকেই নির্মাণ-কৌশলীরা মৌলিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবে রূপান্তর করেন। তারা গড়ে তুলেন অট্টালিকার ফাউণ্ডেশন, ফ্লোর, দেয়াল, ছাদ, কক্ষ, দরজা, জানালা, ইত্যাদি। সুতরাং মৌলিক উপদান থেকে শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠে একটি পূর্ণাঙ্গ

অট্টালিকা। বস্তু জগতটাও এরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ মাষ্টার প্ল্যানের বাস্তবতা। এর আর্কিটেক প্রথমে কিছু মৌলিক বিল্ডিং ব্লক তৈরী করে এগুলোকে একটি বিরাট পরিকল্পনা মুতাবিক বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন। স্বভাবের এই মৌলিক বিল্ডিং ব্লকের নামই হচ্ছে এটম বা অণু। তবে যেভাবে ইটকেও বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রথমে তৈরী করতে হয় সেভাবে অণুকেও প্রথমে একাধিক আরও মৌলিক বস্তু দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এসব বস্তুর নাম হলো সাব-এটমিক পার্টিকেল বা পরমাণু।

বিভিন্ন পরমাণুর তৈরী অণু বা এটম।
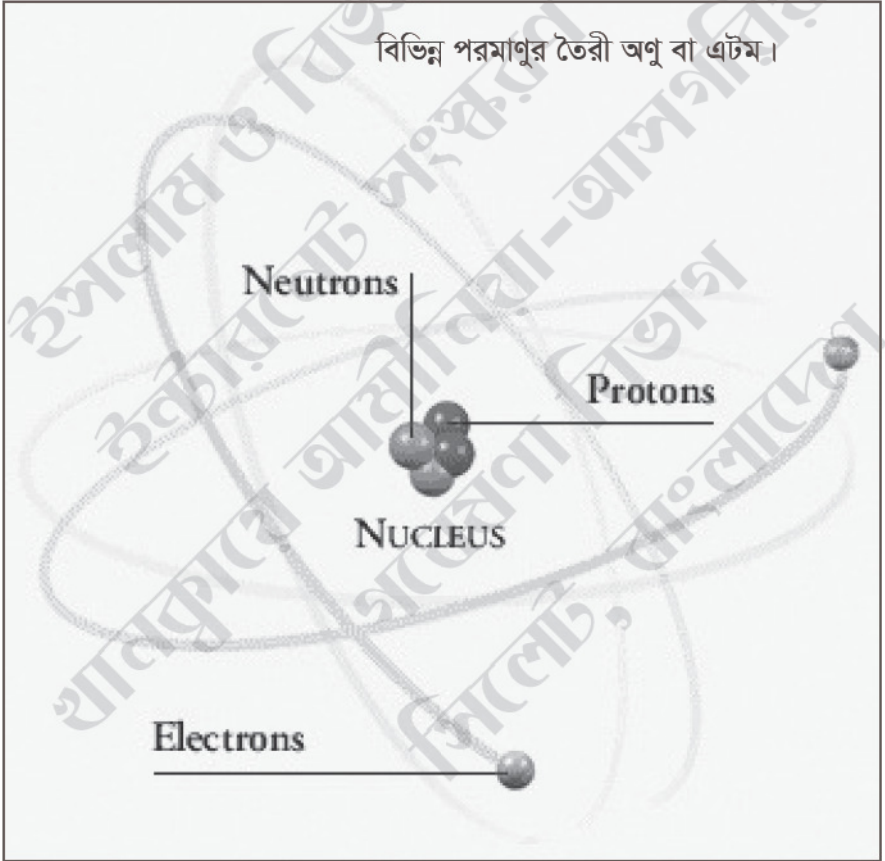
এ মহাবিশ্বের সবকিছু পরমাণু থেকে সৃষ্ট এটম দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। আপনার দেহ, মাটি, আগুন, পানি, বাতাস, বৃক্ষ-তরু-লতা, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারকা প্রভৃতি বস্তু জগতের যা কিছুই বিদ্যমান সবই সৃষ্টি হয়েছে এই অণু দিয়ে। সুতরাং স্বভাবের এই মৌলিক বস্তু অণু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে বিজ্ঞান বিষয়ের আসল জিনিষটিই আমরা জানতে পারবো না। তাহলে, এবার এই অণু সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে তা ভালো করে তলিয়ে দেখা যাক। তবে এখানে একটি কথা পাঠকদের আগেই জানিয়ে দেওয়া জরুরী মনে করছি- আর তাহলো, অণু কিংবা এমনকি বিজ্ঞানের যাবতীয় জ্ঞানই কিন্তু ফাইনেল বা চূড়ান্ত জ্ঞান নয়।

আজ অণু সম্পর্কে বিজ্ঞান যা বলছে তা ১০০% সত্য বলে দাবী করার কোন উপায় নেই। কারণ, কাল হয়তো বিজ্ঞানই আবিষ্কার করবে যে, সেই ধারণা বা থিওরীটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিলো না। কিংবা এমনও হতে পারে যে, আজ বিজ্ঞান যা জানে না, কাল তা আবিষ্কার হবে। সুতরাং এই খণ্ডে বর্ণিত যাবতীয় তথ্যই যে, চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য তা ভাবার কোন পথ নেই। এ ব্যাপারে পাঠকরা শতর্ক থাকবেন আশাকরি। যা হউক, অণু সম্পর্কে জানা তথ্য এখন একে একে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

অণুর আধুনিক মডেল

অণু খুব ছোট্ট বস্তু। খালি চোখে এগুলো দেখা তো দূরের কথা, এমনকি শক্তিশালী মাইক্রস্কোপ দিয়েও দেখা যায় না। একমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ নামক অণুবিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে অণুকে দেখতে পাওয়া যায়। একেকটি অণুর আয়তন হচ্ছে ১০ প-১০ মিটার। এর অর্থ হলো ১ মিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ। ১ সেন্টিমিটার ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (কিউবিক) বস্তুর মধ্যে অন্ততঃ১০ প ২৪ টি অণু আছে। এ সংখ্যাটি হচ্ছে ১০ বাদে ২৪টি শূন্য দিলে যে বিরাট নাম্বার হয় সেই নাম্বার। সুতরাং অণু যে কত ক্ষুদ্র বস্তু তা সহজেই অনুমেয়। বাস্তবে এদের আয়তন সঠিকভাবে ধারণা করাই সম্ভব নয়। আর এ কারণেই এগুলো সম্পর্কে পুরো তথ্য আবিষ্কার করাও কঠিন।
[নোট: ১০ প –১০ অর্থ ১০ পাওয়ার মাইনাস ১০ এবং ১০ প ২৪ অর্থ ১০ পাওয়ার প্লাস ১০]

আধুনিক এটমিক থিওরীর ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ

অণুকে ভালো করে বুঝতে হলে আধুনিক যুগে এ সম্পর্কে কিভাবে বিভিন্ন থিওরী উপস্থাপিত হয়েছে তার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

উনবিংশ শতাব্দিতে সর্বপ্রথম এটমের উপর গবেষণার গুরুত্ব বিজ্ঞানীরা অনুধাবন করেন। তখন থেকে এই ফিল্ডে কিছু লোক বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এটম গবেষণা একটি ইজম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকেই এটমিজম শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। সে সময় দুটি এটমিক মডেল গড়ে উঠে- এর একটি ছিলো জন ডালটনের আর অপরটি রুডলফ কোসিয়াস ও জেমস ক্লার্ক মেস্কওয়েল উপস্থাপন করেন।
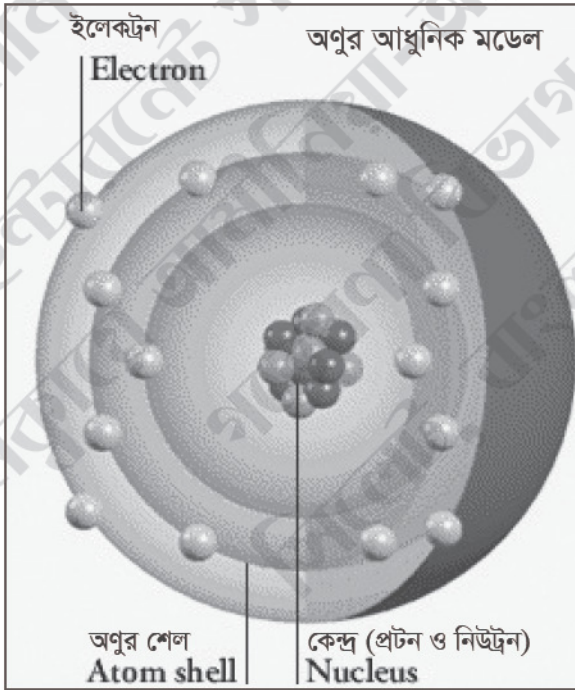
ডালটনের মডেলের মৌলিক বিষয় হচ্ছে অণুর ওজন নিয়ে গবেষণা। অপরদিকে কোসিয়াস ও মেস্কওয়েলের মডেলের মৌলিক দিক ছিলো গ্যাস অবস্থায় অণুর ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়া নিয়ে। তবে অণুর প্রকৃত স্বরূপ তখন থেকেই উন্মোচন হতে থাকে, যখন জে জে থমসন ১৮৯৭ সালে ইলেকট্রন নামক পরমাণু আবিষ্কার করেন। এ থেকেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে সক্ষম হন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ আসলে অণু নয় বরং এসব পরমাণু। এছাড়া বিংশ শতকের শুরুতে আরেক মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে আসে। মেরী কিউরী, হেনরী বেকুরেল প্রমুখ লক্ষ্য করেন যে, কোন কোন মৌলিক পদার্থের অণুগুলো স্থায়ীভাবে একই অবস্থায় থাকে না। যেমন ইউরেনিয়ামের (একটি পদার্থ) অণু ধীরে ধীরে থরিয়াম (আরেকটি পদার্থ) নামক বস্তুর অণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং এরপর এ অবস্থা থেকেও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত লেড বা সীসায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর ক্রিয়াটি রেডিওএকটিভিটি বা তেজষ্ক্রিয়তা নামে পরিচিত। এর কারণ হলো, পরিবর্তনের সময় অণু থেকে রেডিয়েশন বা তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ হয়। এই তেজষ্ক্রিয়া মূলত একটি শক্তিশালী এনার্জি (উদ্যম)।

অণু সাধারণতঃ ইলেকট্রিক্যাল দিক থেকে নিউট্রেল বা ব্যালান্স অবস্থায় আছে। অণুর চতুর্দিকে ঘুর্ণমান ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে একটি ঋণাত্মক (নেগিটিভ) চার্জ বিদ্যমান। কিন্তু এগুলোকে ব্যালান্স করে রাখতে অপর একটি ধণাত্মক (পজিটিভ) চার্জের প্রয়োজন দাঁড়ায়। এছাড়া অণুর ওজনের এক ক্ষুদ্রাংশ আছে ইলেকট্রনের মধ্যে- সুতরাং বৃহত্তর ওয়েট বা ওজন অন্য কোথাও অবস্থান করছে। এসব চিন্তা থেকেই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, অণুর কেন্দ্রে বিরাট শক্তিশালী একটি ধণাত্মক অংশ আছে যাকে বলা হয়, নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র সবগুলো ইলেকট্রনকে ধরে রেখেছে। কিন্তু যেহেতু তারা ঘুর্নমান তাই নিউক্লিয়াসের উপরে যেয়ে পতিত হয় না। ব্যাপারটা অনেকটা সৌরজগতের মতো। সূর্যের বিরাট মহাকর্ষ প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহকে আটকে রেখেছে কিন্তু কোনটাই তার উপরে যেয়ে পতিত হচ্ছে না। তার কারণ হলো, গ্রহগুলোর বার্ষিক গতি বা প্রদক্ষিণ। সুতরাং সূর্য যেভাবে সৌরজগতের সেন্টারে অবস্থান করে গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে ঠিক তদ্রুপ নিউক্লিয়াস নিজের শক্তি দিয়ে ইলেকট্রনকে ধরে রেখেছে। কিন্তু এই নিউক্লিয়াস কি? এবার এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বিজ্ঞানীরা ব্যকুল হয়ে উঠলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একটি মডেল তৈরী হলো।

রাদারফোর্ড মডেল

রাদারফোর্ড নামক বিজ্ঞানী গত শতকের প্রথম দিকে অণুর একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, প্রতিটি অণু একটি ইলেকট্রিক্যাল আকর্ষণের মাধ্যমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যে একটি ফোর্স বিদ্যমান। ঠিক যেভাবে সূর্য ও গ্রহের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে মহাকর্ষ। এই মডেল অনুযায়ী নিউক্লিয়াস থেকে দূরে অবস্থান করে ইলেকট্রন চতুর্দিকে ঘুর্নমান আছে। রাদারফোর্ডের এই মডেলটি প্রাত্যহিক রসায়নিক বিভিন্ন ঘটনা এবং পদার্থের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অনেকটা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই মডেল কিন্তু চূড়ান্ত ছিলো না। অণুর বিভিন্ন অংশ নিয়ে আরও গভীর গবেষণা শুরু হয় এবং অবশেষে বিজ্ঞানের নতুন একটি শাখার জন্ম হয় যাকে আমরা আজ “এটমিক ফিজিক্স” বা আনবিক পদার্থবিজ্ঞান নামে জানি।

বিজ্ঞানীদের গভীর গবেষণা শুরু হওয়ার পরই রাদারফোর্ডের উপরোক্ত মডেলের উপর দুটি ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ তাঁর এ মডেলটির ভিত্তি ছিলো নিউটনের পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, নিউটনের থিওরী অনুযায়ী একই পদার্থের ভিন্ন এটমের মধ্যকার ইলেকট্রনগুলো যে কোন পথে নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল- তা এভাবে হয় না। একই পদার্থের সবগুলো ইলেকট্রনই একটি বিশেষ প্রদক্ষিণপথে ঘুরে। দ্বিতীয়তঃ ঘুরার সময় ইলেকট্রনগুলো সর্বদাই তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ করার কথা- এর ফলে নিজেদের এনার্জি হারিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা নিউক্লিয়াসের উপর পতিত হবে। এ হিসেবে স্বভাবের সর্বাপেক্ষা সাধারণ পদার্থ হাইড্রোজেন অণু (এই অণুর একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে) মাত্র ১০ প-৯ সেকেন্ডের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা-তো হয় না।

সুতরাং যেহেতু রাদারফোর্ডের মডেল সম্পূর্ণ নির্ভুল হলে উপরোক্ত দুটি ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কথা, তাই বিজ্ঞানীরা এই মডেলকে সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। এই সংস্কার কাজে হাত দিলেন নিয়েল্স বোর নামক এক বিজ্ঞানী। ১৯১৩ সালে তিনি তাঁর নতুন মডেল প্রকাশ করলেন।

বোর মডেল

নিয়েল্স বোর অণুর যে মডেল উপস্থাপন করেন তাতে বলা হয়েছে, অণু বাস্তবে বিভিন্ন স্টেজে থাকে। এর মধ্যে একটি মৌলিক অবস্থা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেজ।

সাধারণতঃ অণু এই স্টেজে থাকাকালে সম্পূর্ণ অপরিবর্তন হওয়ার অবস্থায় বিরাজ করে। এটাকে স্থির অবস্থাও বলা যায়। এই অবস্থায় বোর দেখিছেছেন অণু থেকে কোন ধরণের তেজষ্ক্রিয়াও বিকিরণ হয় না। তবে অণুকে এই স্থির অবস্থা থেকে এনার্জির মাধ্যমে এক্সাইটেড বা অস্থির অবস্থায়ও ফেলা যায়। দুটি উপায়ে অণুকে অস্থির করা যায়- একটি হলো রেডিয়েশন ও অপরটি সংঘর্ষ। তিনি বলেন, অণুকে এভাবে অস্থির করার পর সে খুব দ্রুত ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশন- যেমন এক্স-রে, গামা-রে, রেডিও ওয়েভ প্রভৃতি এনার্জি বিকিরণ করে আবার তার স্বাভাবিক গ্রাউন্ড স্টেজে ফিরে যাবে। বোর আরও বলেন, এই যে রেডিয়েশন বের হয়ে আসে এগুলো এককেটি প্যাকেট বা কোয়ান্টা হয়ে আসে। এই কোয়ান্টার নাম হলো ফোটন। বোর এ মডেল সৃষ্টিতে ম্যাক্স প্লাংকের প্রখ্যাত কোয়ান্টাম থিওরী ব্যবহার করেন। বোর এর মডেলকে বিজ্ঞানীরা কিছু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

নিউক্লিয়াস

এ পর্যন্ত আমরা যা জানতে পেরেছি তাহলো, অণুর দুটি মৌলিক অংশ আছে- নিউক্লিয়াস (কেন্দ্র) ও একে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ (ধণাত্মক) ও ইলেকট্রনের চার্জ নেগিটিভ (ঋণাত্মক)। ইলেকট্রন সম্পর্কে কিছুটা ধরাণা আমাদের জন্মেছে। তবে নিউক্লিয়াস আসলে কি? এর মধ্যে আরও পরমাণু থাকতে পারে কি? আসুন তাহলে, নিউক্লিয়াসকে আরও গবেষণা করে দেখা যাক।

পদার্থবিদরা যখন ইলেকট্রন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করলেন তখন তাদের পুরো দৃষ্টি পড়লো নিউক্লিয়াসের উপর। তারা নিউক্লিয়াসকে আরও জানার জন্য গবেষণা শুরু করলেন। রেডিওএকটিভ ক্ষয়ের (তেজষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয়) কারণে কোন কোন

নিউক্লিয়াস যে রদবদল করে তা আগে থেকেই জানা হয়ে গিয়েছিল। রাদারফোর্ড ১৯১৯ সালে দেখিয়েছেন যে, কৃত্রিম উপায়েও এই অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব। এতে দেখা গেছে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস থেকে একটি পরমাণু বেরিয়ে এসেছে যার নাম হলো প্রটোন। সুতরাং নিউক্লিয়াসে যে প্রটোন নামক একটি বস্তু আছে তা জানা হলো। এবার সবাই ধারণা করলো অণুর নিউক্লিয়াসও মূলত একাধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। এটারও বিল্ডিং ব্লকস্ আছে।

তবে কিছুদিন সবার বিশ্বাস জন্মে যে, বিভিন্ন বিল্ডিং ব্লক মূলতঃ এক বা একাধিক প্রটোন থেকে গঠিত। অর্থাৎ এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যক প্রাটোন দ্বারাই নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছে। এ ধারণা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে এটা পরিষ্কার হলো যে, নিউক্লিয়াসে প্রটোন ছাড়াও অন্যান্য আলাদা কিছু পরমাণু নিশ্চয়ই বিদ্যমান। ১৯৩২ সালে এ ব্যাপারে আরও জানা গেল। এ বছর জেমস চাদউইক নামক এক বিজ্ঞানী নিউট্রন নামের আরেকটি পরমাণু আবিষ্কার করেন। এটিও নিউক্লিয়াসের বাসিন্দা। এই নতুন পরমাণুর নিজস্ব কোন চার্জ নেই- তবে তার ওজন প্রটোন থেকেও বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ নিউক্লিয়াসের বাসিন্দাগণ হচ্ছে প্রটোন ও নিউট্রন নামক পরমাণু। যেমন হিলিয়াম পদার্থের নিউক্লিয়াসে আছে দুটি প্রটোন এবং দুটি নিউট্রন।

এই আবিষ্কারের পর আরও নতুন সমস্যার জন্ম দিল। কারণ, এই দুটি পরমাণুকে এত ক্ষুদ্র একটি স্থানে কোন্ শক্তিটি একে অন্যকে ধরে রেখেছে? বিজ্ঞানীরা স্বভাবের মৌলিক ফোর্স সম্পর্কে যা জানতেন তা থেকে এই ফোর্সটি ছিলো ভিন্ন। কোন নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনকে টেনে বের করে আনতে যে ইলেকট্রিক ফোর্সের প্রয়োজন তা থেকেও এই অজানা শক্তি ছিলো অনেকগুণ বড়। অপরদিকে একটি নিউক্লিয়াস থেকে অপরটির মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান আছে তা ছিলো অনেক দুর্বল। সুতরাং এই বিরাট শক্তিশালী ফোর্সটি কি হতে পারে? ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বিজ্ঞানীরা এই নিউক্লিয়াস ফোর্স নিয়ে তাই ব্যাপক গবেষণা শুরু করলেন। এই নেচারেল শক্তি কি এবং এটাকে কাজে লাগানোর উপায় কি? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালালেন। আর এ থেকেই আবিষ্কার হলো আনবিক বোমা। এছাড়া এই গবেষণা থেকে বিজ্ঞানের আরেকটি নতুন শাখাও গজে উঠলো যাকে বলে, পার্টিকেল বা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

নিউক্লিয়ার ফোর্স এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেল যে, নিউক্লিয়াসের মধ্যকার ফোর্স হচ্ছে একটি বাইণ্ডিং (একত্রিত হওয়ার) ফোর্স বা এনার্জি। বাংলায় বলা যায় একত্রে জড়িত রাখার শক্তি। এছাড়া দেখা গেল নিউক্লিয়াসের ওজন যা হওয়ার তার চেয়ে সর্বদাই কিছুটা কম। এই কম হওয়ার কারণই হচ্ছে উপরোক্ত বাইণ্ডিং এনার্জি। সুতরাং এই বাইণ্ডিং এনার্জি মেপে বিভিন্ন নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোন ক্রিয়া সংঘটিত হবে কি না কিংবা সংঘটিত করতে অতিরিক্ত এনার্জির প্রয়োজন কি-না তা জানার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন হলো।

এই রিয়েকশন সৃষ্টিকে বলে ফিউশন। এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন নিউক্লিয়াসকে একত্রিকরণ। তবে সাধারণতঃ এটা সম্ভব নয় কারণ নিউক্লিয়াস এটকা আরেকটা থেকে দূরত্ব বজায় রাখে একটি ফোর্সের মাধ্যমে। যেভাবে দুটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু কিংবা উত্তর মেরু একত্রিত হয় না। এই ফিউশন তখনই সম্ভব যখন নিউক্লিয়াসগুলো খুব দ্রুত অস্থির হয়ে চলতে থাকে। এই উচ্চতর অস্থিরতা বা ফিউশন শক্তিই হচ্ছে তারার এনার্জি সূত্র।

আমাদের সূর্যের ভেতরে এই ফিউশন রিকেশন অনবরত চলছে। এই রিকেয়শনের মাধ্যমে পদার্থ (মূলতঃ হাউড্রোজেন) বদলে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যেমন সূর্যের ভেতরের ফিউশন রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রিয়েকশন থেকে হিট এনার্জি (তাপশক্তি), আলো প্রভৃতি সূর্য থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ফিউশন হচ্ছে এক ধরণের আনবিক রিয়েকশন। এই রিয়েকশনের জন্য যে কণ্ডিশন প্রয়োজন তা এই পৃথিবীতে নেই। তবে অপর আরেকটি নিউক্লিয়ার রিয়েকশন আছে। এর নাম হলো ফিশন।

ফিশন রিয়েকশন

ভারী নিউক্লিয়াস (এটমের কেন্দ্র) কোন কোন সময় ভেঙ্গে দুই বা ততোধিক নিউক্লিয়াসে পরিণত হতে পারে। তবে এই প্রসেসের সময় এটম থেকে এনার্জি (উদ্যম) বিকিরণ হয়। সাধারণতঃ যেসব নিউক্লিয়াসে ২১০ বা ততোধিক ভিন্ন পরমাণু আছে সেগুলো অত্যন্ত অস্থির থাকে। এর কারণ হলো, এসব ভারী নিউক্লিয়াস থেকে তেজস্ক্রিয়া বিকিরণ হয়। ১৯৩৮ সালে ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ থেকে এরূপ তেজস্ক্রিয়া বিকিরণ আবিষ্কার করেন ওটো হান নামক এক বিজ্ঞানী। যে উপায়ে নিউক্লিয়াস এভাবে ভেঙ্গে পড়ে তার নাম হচ্ছে "নিউক্লিয়ার ফিশন"।
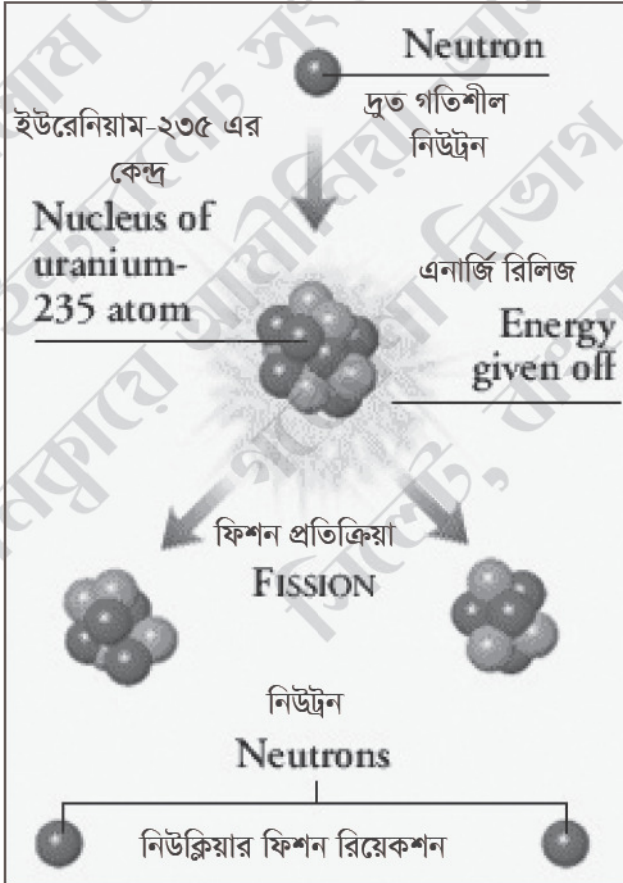
নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়েকশন

ফিশন রিয়েকশের মাধ্যমে নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে নতুন দু'টি নিউক্লিয়াস ও কয়েকটি নিউট্রন (পরমাণু) সৃষ্টি হয়। ফিশন রিয়েকশন দু'টি উপায়ে সম্ভব: ১. প্রাকৃতিক উপায়ে ও ২. কৃত্রিমভাবে। ফিশন রিয়েকশনের মাধ্যমে কোটি কোটি ভল্ট (ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি) উদ্যম বিকিরণ হয়। বিশেষকরে ইউরেনিয়াম থেকে মোটা অংকের এনার্জি বেরিয়ে আসে। এছাড়া যেহেতু এই ফিশনের মাধ্যমে কিছু নিউট্রন বেরিয়ে পড়ে তাই এগুলো অন্যান্য নিউক্লিয়াসে পতিত হয়ে আরও রিয়েকশন ঘটাতে পারে। এভাবে একটি চেইন রিয়েকশন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই চেইন রিয়েকশনই আনবিক চুল্লি ও আনবিক বোমার (এটম বোমার) ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

সংক্ষেপে অণু

এবার সংক্ষেপে অণুর একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আমরা এখন তুলে ধরতে পারি।
অণু হচ্ছে স্বভাবের ক্ষুদ্র একেকটি সৌরজগত। এর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস নামক একটি বিরাট শক্তিশালী অংশ। নিউক্লিয়াসও কিন্তু একক কোন পরমাণু নয়। একেকটি নিউক্লিয়াসে নিউট্রন ও পজিট্রন নামক পরমাণু থাকে।

নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে দিয়ে একাধিক নিউক্লিয়াস তৈরী সম্ভব যাকে বলে নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়েকশন। ফিশনের সময় নিউক্লিয়াস বিরাট অংকের এনার্জি বিরিকণ করে। এই রিয়েকশনই আনবিক চুল্লি ও আনবিক বোমায় ব্যবহৃত হয়।

নিউক্লিয়াসকে এক বা ততোধিক কিছু পরমাণু অনবরত প্রদক্ষিণ করে- এগুলোর নাম হচ্ছে ইলেকট্রন। অণুর একাধিক নিউক্লিয়াসকে জোর করে একত্রে আনাও সম্ভব। আর যে রিয়েকশনের মাধ্যমে তা হয়ে থাকে তার নাম হলো, ফিউশন রিয়েকশন। আমাদের সূর্যসহ বিভিন্ন তারার ভেতরে এই রিয়েকশনই সংঘটিত হচ্ছে। এই রিয়েকশনের মাধ্যমে পদার্থ একটা থেকে অপরটিতে পরিণত হয়। যেমন হাইড্রোজ বদলে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়া।

তাহলে দেখা গেল অণু দ্বারাই সব বস্তু সৃষ্টি হয়েছে। অনুর নিউক্লিয়াসে কি আছে বা কটি নিউট্রন, প্রটোন, প্রভৃতি বিদ্যমান তা থেকেই বস্তুটি কোন্ পদার্থ তা নির্ণিত হয়। অণু সম্পর্কে এই সাধারণ জ্ঞানার্জনের পর একাধিক অণু থেকে পাদার্থ ও একাধিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন বস্তু কিভাবে গঠিত হলো, এবার সেদিকে লক্ষ করে দেখা যাক।
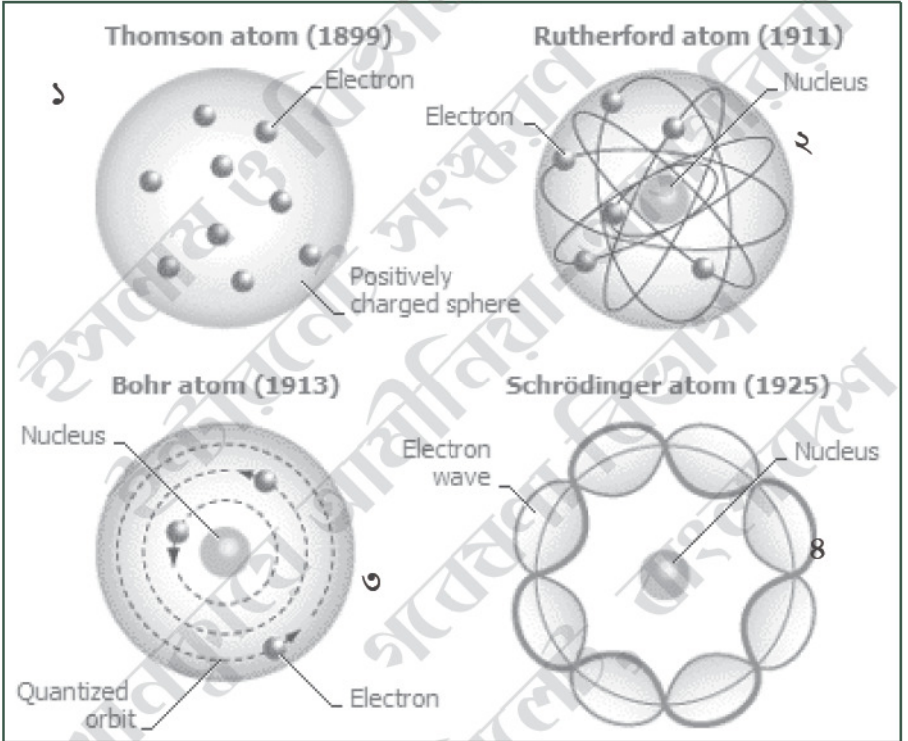
বিভিন্ন এটমিক মডেলঃ ১. থমসন এটম; ২. রাদারফোর্ড এটম; ৩. বহ্‌র এটম; ৪. স্রোডিঙ্গার এটম।

"তিনিই সৃজন করেছেন আকাশ ও ভূমণ্ডল সূচারুরূপে... [সূরা আনআম ঃ ৭৩]।

পরিচ্ছেদ ২

অণু থেকে বস্তু

একই নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন সম্বলিত একাধিক এটম মিলে প্রথমে তৈরী হয় কেমিক্যাল বন্ড বা রসায়নিক সংযুক্তি। এই বন্ডের মাধ্যমে একাধিক এটম যুক্ত হয়। আর যুক্ত বন্ডের নাম হচ্ছে মলিকিউল। সুতরাং মলিকিউল একাধিক অণুর মাধ্যমে সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র বস্তু। এই বন্ড থাকায়ই বস্তু স্থির থাকে। বস্তুর মধ্যে তাই কোটি কোটি মলিকিউল বিদ্যমান।

মলিকিউল কিভাবে গড়ে উঠে

মলিকিউল কিভাবে তৈরী হয় তা বুঝার জন্য অতি সাধারণ একটি গ্যাস হাউড্রোজেন নিয়ে আলোচনা করাই যথেষ্ট। এই গ্যাসের মধ্যে দুটি এটম কেমিক্যাল বন্ডের মাধ্যমে জড়িত হয়ে একটি মলিকিউল তৈরী হয়। আমরা জানি হাইড্রোজেনের এটমে আছে একটি ইলেকট্রন (নেগিটিভ চার্জসম্পন্ন), নিউক্লিয়াসে আছে একটি নিউট্রন (চার্জ নাই) ও একটি প্রটোন (চার্জ পজিটিভ)। যখন ঘুর্নমান দুটি হাইড্রোজেন এটমের ইলেকট্রন একটা আরেকটির কাছাকাছি আসে তখন একাধিক শক্তি বা ফোর্স সক্রিয় হয়ে উঠে। আর এর ফলেই দুটি এটমের মধ্যে বন্ড সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন আরেকটিকে আকর্ষণ করে যা থেকে নিউক্লিয়াসগুলোও একে অন্যের প্রতি আকর্ষিত হয়। সুতরাং দুটি এটম মিলে একটি মলিকিউল সৃষ্টি হলো। তবে মলিকিউলার বন্ডের মাধ্যমে একটি নিউক্লিয়াস আরেকটির উপরে যেয়ে পতিত হয় না। তাদের নেগিটিভ ফোর্স একটা আরেকটাকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে দেয়। অর্থাৎ মলিকিউলে একটি ব্যালান্স তৈরী হয়।

সুতরাং মলিকিউল হচ্ছে ইলেকট্রন মেঘ [ইলেকট্রন এতো দ্রুত প্রদক্ষিণ করে যে এটাকে ক্লাউড দ্বারা সম্বোধন করা হয়ে থাকে] দ্বারা সৃষ্ট একাধিক এটমের তৈরী একেকটি বন্ড। কোন কোন মলিকিউলে শত শত পর্যন্ত এটম থাকতে পারে। আর এই মলিকিউলে কোন্ ধরণের এটম, বন্ডের স্বরূপ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন বস্তু নিজেদের আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে কার্বন মলিকিউল। কার্বন মলিকিউলের এটমগুলো কিভাবে সৃষ্ট এর উপর ভিত্তি করেই বস্তুটি হয় সাধারণ লেড না হয় ডায়মণ্ড বা হীরা। অর্থাৎ লেডের দুর্বলতার কারণ মলিকিউলের গঠনপ্রণালী, আর ডায়মণ্ডের সবলতা ও কাঁচের মতো রং মলিকিউলের অন্য ধরণের গঠনপ্রণালী। কিন্তু দুটিই মৌলিকভাবে কার্বন এটম দ্বারা তৈরী। সুতরাং মলিকিউল কোন্ উপায়ে সৃষ্ট সেটা থেকেই পদার্থ ও একাধিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুর আলাদা বৈশিষ্ট্য বিরাজ করছে।
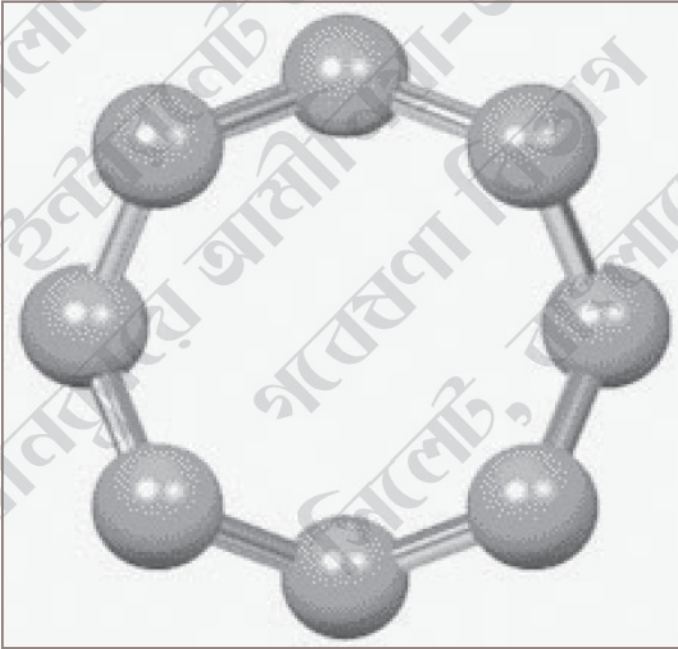
মলিকিউলঃ একাধিক এটমের মধ্যে শক্তিশালী ‘বন্ড’ (যুক্ততা) তৈরী করে সৃষ্টি হয় একেকটি মলিকিউল।

ইলেমেন্ট (মৌলিক পদার্থ) ও কম্পাউন্ড (যুক্ত পদার্থ)

বস্তু সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্ত যা জেনেছি তার সারমর্ম হলো: স্বভাবের ক্ষুদ্র একটি অংশ হচ্ছে অণু। অণুর মধ্যে আছে একটি কেন্দ্র আর সেখানে বিদ্যমান দুটি পরমাণু- নিউট্রন ও প্রটোন। এই কেন্দ্রকে এক বা একাধিক একটি পরমাণু যার নাম হলো ইলেকট্রন, সর্বদা প্রদক্ষিণ করে। একাধিক এটম মিলে একেকটি মলিকিউল তৈরী হয়। আর মলিকিউল থেকেই তৈরী হয় বস্তু। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য এটমের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এটমের মধ্যে ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রটোন প্রভৃতি কটি করে আছে সেটাই বিভিন্ন পদার্থের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। এবার আমরা বস্তু সম্পর্কে আরও কিছু মৌলিক বিষয় শিখে নেব। এর মাধ্যমে বস্তু যে আসলে কি তা জানা যাবে।

ইলেমেন্ট

ইলেমেন্ট হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট মৌলিক পদার্থ। ইলেমেন্টের অণু-পরমাণুকে রসয়ানিক উপায়ে কিংবা শক্তির মাধ্যমে রদবদল করা যায় না। একমাত্র নিউক্লিয়ার রিয়েকশনের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে। ইলেমেন্টের এটমগুলো সবই একই ধরণের- অর্থাৎ এতে কোন ভিন্নতা নেই। এটমগুলো কেমিক্যাল বন্ডের মাধ্যমে মলিকিউল হিসেবে থেকে সমগ্র পদার্থটি তৈরী করেছে। ইলেমেন্ট একটা আরেকটা থেকে আলাদা হয় তার এটমে কটি প্রটোন আছে তার উপর ভিত্তি করে। এই সংখ্যাকেই বলে এটমিক নাম্বার। যেমন হাউড্রোজ এটমে আছে একটি ইলেকট্রন, নিউক্লিয়াসে একটি প্রটোন ও একটি নিউট্রন। জানা থাকা দরকার এটমের মধ্যে যে সংখ্যক প্রটোন থাকে তার সমপরিমাণ ইলেকট্রনও থাকে। নীচের পিরিওডিক টেবিল-টি দেখলেই বিভিন্ন ইলেমেন্টের স্বরূপ কি তা সহজে বুঝা যাবে।
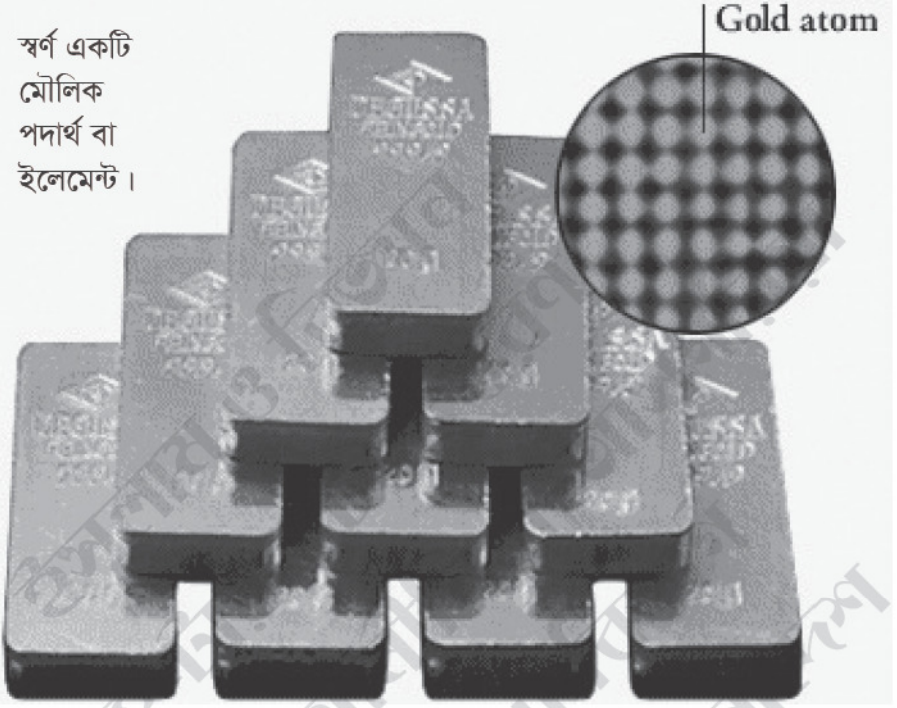
ইলেমেন্টের পিরিওডিক টেবিল

ইলেমেন্টের প্রখ্যাত 'পিরিওডিক টেবিল অব ইলেমেন্ট' রুশ বিজ্ঞানী ডিমিট্রি মেন্ডেলিয়েভ ১৮৬৯ সালে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি ইলেমেন্টের একটা আরেকটার মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি ইলেমেন্ট পরিবার বিশেষ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেন। পিরিওডিক টেবিলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটার দিকে ভালো করে তাকালে অতি সহজেই স্বভাবের জানা সকল ইলেমেন্টের বিভিন্ন দিক বুঝা যায়। মেন্ডেলিয়েভ এটমিক ওজন (এটমিক নাম্বার) দিয়ে তাঁর এই টেবিল তৈরী করেন। টেবিলের প্রতিটি ইলেমেন্টকে তাদের সাংকেতিক নাম দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে। পাশের নাম্বারগুলোই তাদের এটমিক ওজন বা নাম্বার।

পিরিওডিক টেবিলের গ্রুপ

উপর থেকে নীচে টেবিলের প্রতিটি ইলেমেন্ট হচ্ছে একই গ্রুপের বা পরিবারভুক্ত। অপরদিকে পাশাপাশি ইলেমেন্টগুলো এটমিক নাম্বারের সঙ্গে সর্ম্পকিত করে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ ১ থেকে ২, ৩, ৪ প্রভৃতি একটার পর আরেকটা ইলেমেন্টকে পাশাপাশি স্থাপিত করে এটমিক নাম্বারের সঙ্গে ইলেমেন্টের ভিন্নতার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

টেবিলে মোট ১৬টি গ্রুপ আছে। এগুলোকে আবার সাতটি প্রধান গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো, ১. আলকালি মেটাল (১এ), ২. আলকালিন আর্থ মেটাল (২এ), ৩. ট্রানজিশন মেটাল (১বি, ২বি, ৩এ... ...৮এ), ৪. রেপ্রেজেন্টেটিভ গ্রুপ (৩বি...৬বি), ৬. হালোজেন (৭বি) এবং ৭. নবোল গ্যাস (গ্রুপ ৮)।

টেবিলের উপরে সব গ্রুপের নাম আছে। এই নামের নীচের সবগুলো ইলেমেন্টই এই একই গ্রুপের। যেমন ১এ গ্রুপের মধ্যে আছে, হাউড্রোজেন (এইচ), লিথিয়াম (এলআই), সডিয়াম (এনএ), পটাসিয়াম (কে), রুবিডিয়াম (আরবি), সিজিয়াম (সিএস) এবং ফ্রান্সিয়াম (এফআর)। এসব ইলেমেন্ট হচ্ছে আলকালি মেটাল গ্রুপের।

এ পর্যন্ত ১১২টি ইলেমেন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে ১১০, ১১১ এবং ১১২ নাম্বারের নাম কিংবা সংকেত এখনও দেয়া হয়নি। পিরিওডিক টেবিলে প্রতিটি ইলেমেন্টের মৌলিক তথ্যও দেয়া আছে। যেমন হাইড্রোজেনের তথ্যাবলি হচ্ছে: ১. সংকেত: এইচ, ২. গ্রুপ: ১এ, ৩. এটমিক ওয়েট (ওজন): ১.০০০৭৯৪, ৪. এটমিক নাম্বার: ১, ৫. ডেনসিটি (ঘনত্ব): ০.০৮৯৯, ৬. আবিষ্কার: হেনরি কেভেন্ডিশ (ইংরেজ), বছর: ১৭৬৬ সাল, ৭. গলনাঙ্ক (মেল্টিং পয়েন্ট- যে তাপ পেলে এই ইলেমেন্ট গলে তরল পদার্থে পরিণত হয়): -২৫৯.৩৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, ৮. স্ফুটনাঙ্ক (যে তাপে বাস্পিভূত হয়): -২৫২.৮৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ৯. অক্সিডেশন অবস্থা (যে অবস্থায় ইলেমেন্ট অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়েকশন করে মরিচাযুক্ত হয়): ১।

এই নয়টি তথ্য অপর একটি মূল্যবান ইলেমেন্টের ক্ষেত্রে কি তা দেখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। ইলেমন্টটি হচ্ছে স্বর্ণ: ১. সংকেত: এইউ, ২. গ্রুপ: ১বি, ৩. এটমিক ওয়েট (ওজন): ১৯৬.৯৬৬৫, ৪. এটমিক নাম্বার: ৭৯, ৫. ডেনসিটি (ঘনত্ব): ১৯.৩ (পানি থেকে এতগুণ বেশী ঘন), ৬. আবিষ্কার: প্রাচীন যুগ, বছর: প্রাচীনকাল থেকেই এই ইলেমেন্ট সম্পর্কে মানুষ জানতো, ৭. গলনাঙ্ক (মেল্টিং পয়েন্ট- যে তাপ পেলে এই ইলেমেন্ট গলে তরল পদার্থে পরিণত হয়): ১০৬৪.৪৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, ৮. স্ফূটনাঙ্ক (যে তাপে বাস্পিভূত হয়): ২৮৫৬.৮৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ৯. অক্সিডেশন অবস্থা (যে অবস্থায় ইলেমেন্ট অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়েকশন করে মরিচাযুক্ত হয়): ৩, ১।

এখানে স্বর্ণ সম্পর্কে যে কটি মূল্যবান তথ্য আমরা পেলাম তাহলো, স্বর্ণের ঘনত্ব বেশী থাকায় এটা অত্যন্ত ভারী, এর এটমে মোট ৭৯টি প্রটোন ও ইলেকট্রন আছে, এর স্ফুটনাঙ্ক অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রাসম্পন্ন। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে পিরিওডিক টেবিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর মাধ্যমে স্বভাবের জানা সকল ইলেমেন্ট সম্পর্কে

অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যায়। এছাড়া যেহেতু সব কম্পাউন্ড বা বস্তু একাধিক ইলেমেন্টের মিশ্রণে তৈরী তাই ওগুলো সম্পর্কে তথ্যাবলীও এই পিরিওডিক টেবিল থেকে জানা সম্ভব। এককথায় বস্তু জগতকে জানার একটি সুন্দর ও সহজ উপায় হচ্ছে এই পিরিওডিক টেবিল।

কম্পাউন্ড বা যুক্ত পদার্থ

জগতের মধ্যে ১১২টি জানা ইলেমেন্ট থাকলেও এগুলো অমিশ্রিত অবস্থায় অল্পই আছে। বস্তুজগতরের বেশীরভাগ জিনিষ হচ্ছে একাধিক ইলেমেন্ট দ্বারা গঠিত। আর এই অবস্থায় যেসব বস্তু আছে এগুলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় কম্পাউ বা যুক্ত পদার্থ বলে। যেমন সাধারণ লবণ। লবণের মধ্যে সোডিয়াম ও ক্লোরিন নামক দুটি ইলেমেন্ট বিদ্যমান। এর কেমিক্যাল নাম হচ্ছে সোডিয়াম-ক্লোরাইড। উল্লেখ্য ক্লোরিন বাস্তবে একটি বিষাক্ত বস্তু। অথচ সোডিয়ামের সঙ্গে তা মিশ্রিত হয়ে খাবার যোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অপর আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে পানি। পানির কেমিক্যাল ফর্মুলা হলোঃ এইচ২অ (H_2O), অর্থাৎ হাউড্রোজেন (দুটি এটম) ও অক্সিজেন (একটি এটম) মিলে পানি হয়েছে। এভাবে জগতের অসংখ্য বস্তু আছে যা মূলত একাধিক ইলেমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত।

Making salt
In the laboratory, sodium chloride is made by mixing hydrochloric acid with sodium hydroxide (an alkali).
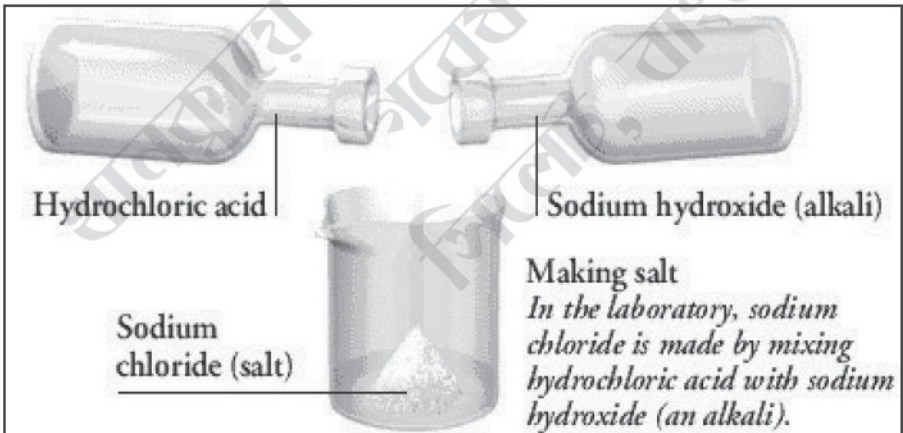
সাধারণ লবণঃ লবণের কেমিক্যাল নাম সোডিয়াম ক্লোরিন (NaCl)। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশিয়ে লবণ তৈরী করা যায়। এটি একটি যুক্ত পদার্থ।

স্বভাবে বস্তুর ৪টি অবস্থা

প্রাকৃতিকভাবে সব বস্তু চারটি অবস্থায় বিদ্যমান রেয়েছে। এগুলো হলো: ১. তরল, ২. কঠিন, ৩. গ্যাস ও ৪. প্লাজমা।

তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করেই বস্তুর অবস্থা নির্ণিত হয়। যেমন পানি সাধারণত তরল বস্তু হিসেবে অস্তিত্বশীল। কিন্তু এর ভেতরের তাপমাত্রা কমিয়ে ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে আনলে তা হয়ে যায় বরফ। এই বরফ তখন একটি কঠিন পদার্থ। অন্যদিকে তাপমাত্রা ১০০ ডি.সে. হলে তা বাষ্পে পরিণত হয়। তখন পানির অবস্থা হলো একটি গ্যাস।

বস্তুর প্লাজমা অবস্থাটি স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর মাটিতে বিদ্যমান নেই। কারণ এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য যে তাপমাত্রার প্রয়োজন তা পৃথিবীর মাটিতে সাধারণতঃ হয় না। কৃত্রিম উপায়ে প্লাজমা গ্যাস তৈরী সম্ভব। প্লাজমা অবস্থা সূর্যের মধ্যে বিদ্যমান। কারণ, সূর্যের ভেতরের তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন ডি.সে.। এই উচ্চ তাপে বস্তু প্লাজমা অবস্থায় বিরাজ করে।

বস্তুর সারসংক্ষেপ

বস্তু সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলো: ১. বস্তুজগত অণু-পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। প্রাকৃতিকভাবে অস্তিত্বশীল ১১২টি মৌলিক পদার্থের কথা এ পর্যন্ত জানা গেছে। একই ধরণের এটম দ্বারা সৃষ্ট মৌলিক বস্তুকে বলে ইলেমেন্ট। বস্তুর মধ্যে এটমগুলো একে অন্যকে একটি শক্তি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে একেকটি ইউনিট হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই ইউনিটের নাম হলো মলিকিউল। একাধিক ইলেমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুকে বলে কম্পাউন্ড। সুতরাং জগতব্যাপী দুধরনের বস্তু

বিদ্যমান- এর একটি ইলেমেন্ট আর অপরটি কম্পাউন্ড। ইলেমেন্টকে কোন কেমিক্যাল কিংবা সাধারণ শক্তির মাধ্যমে আলাদা করা বা বদলানো যায় না- একমাত্র আনবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রদবদল সম্ভব। তবে কম্পাউন্ডকে রসায়নিক উপায়ে কিংবা মিশ্রণের মাধ্যমে বদলানো সম্ভব।

বস্তু স্বাভাবিকভাবে চারটি অবস্থার যে কোন একটির উপর বজায় থেকে অস্তিত্বশীল আছে। এই চার অবস্থার কোনটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান তা তার তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

Plasma ball
A powerful electric current at the center of this ball of gas creates plasma.
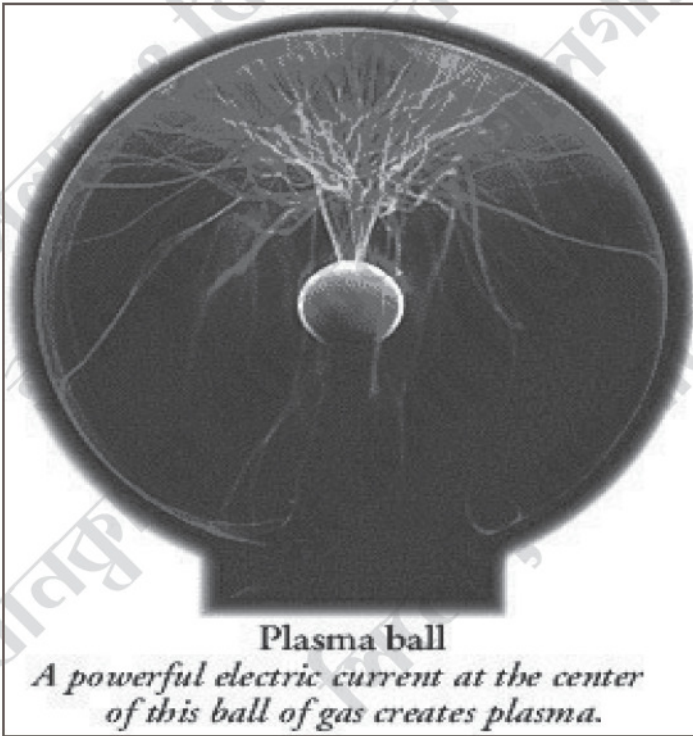
প্লাজমা অবস্থাঃ স্বভাবে বস্তুর চতুর্থতম অবস্থা প্লাজমা। পৃথিবীর বুকে স্বাভাবিকভাবে প্লাজমা অবস্থায় বস্তু নেই। তবে মহাবিশ্বের অধিকাংশ বস্তু তথা হাইড্রেজেন গ্যাস প্লাজমা অবস্থায় বিরাজ করছে। প্রতিটি তারার মৌলিক উপাদান হলো প্লাজমা অবস্থায় থাকা হাইড্রেজেন গ্যাস। এই গ্যাসটি হলো তারার আনবিক জ্বালানি।

"আলিফ-লাম-রা; এগুলো বিজ্ঞানপূর্ণ কিতাবের আয়াত" [সূরা ইউনুস ঃ ১-২]।

পরিচ্ছেদ ৩

বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত মহাবিশ্ব

গেল পরিচ্ছেদে আমরা বস্তুর মৌলিক গঠনপ্রণালী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এবার এই বস্তু দ্বারা যেভাবে এ মহাবিশ্ব গঠিত হয়েছে তার স্বরূপ কি তা জানবো।

বাস্তবে সমগ্র মহাবিশ্বের ফিজিক্স বা গঠনপ্রণালী কয়েকটি মৌলিক ফোর্সের উপর নির্ভরশীল। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা চারটি এরূপ নেচারেল ফোর্স আবিষ্কার করেছেন। এই চারটি ফোর্সকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফান্ডামেন্ট্যাল ফোর্সেস অব নেচার বা স্বভাবের মৌলিক শক্তিবলী। আমরা একে একে এসব ফোর্সের উপর অল্প-বিস্তর আলেচনা করবো।

প্রাকৃতিক চারটি ফোর্স

যে চারটি ফোর্স এই মহাবিশ্বকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করছে তাহলো: ১. মহাকর্ষ (গ্র্যাভিটি), ২. দুর্বল আনবিক শক্তি (উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স), ৩. সবল আনবিক শক্তি (স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স) এবং ৪. বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি (ইলেকট্রমেগন্যাটিক ফোর্স)। এ চার শক্তিই সমগ্র বিশ্বের গঠনপ্রণালী এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী। এবার একে একে এই ফোর্সগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যাক।

মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ

বস্তুর মধ্যে এই শক্তিটি সর্বত্র বিদ্যমান। আপনার আমার দেহের ভেতর, পৃথিবীর উপর বিচরণের কারণ, সৌরজতে পৃথিবীর অবস্থান ও গতিশীলতা থেকে শুরু করে একটি তারাজগত থেকে অপরটি পর্যন্ত সর্বত্র যে শক্তিটি ক্রিয়াশীল আছে তার নাম হচ্ছে গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ।

অন্যান্য নেচারেল শক্তির তুলনায় মহাকর্ষের কিছু মৌলিক স্বাতন্ত্র্য আছে।

প্রথমতঃ এটি সার্বজনিন ও সর্বত্র ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ জগতের এমন একটি স্থান ও বস্তু নেই যেখানে এই ফোর্সটি ক্রিয়া করছে না। এমনকি লাখ লাখ আলোক বৎসর (**আলোক বৎসর:** এক বছরে আলোক রশ্মি ভ্রমণ করে যে দূরত্ব পর্যন্ত পৌছে তাকে বলে এক আলোক বৎসর। ইংরেজিতে একে বলে লাইট ইয়ার।) দূরত্বে অবস্থানরত গ্যালাক্সির (তারাজগত) মধ্যেও এই ফোর্স বিদ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ গ্র্যাভিটি সর্বদাই পজিটিভ ফোর্স- অর্থাৎ এটি বস্তুর মধ্যে সর্বদাই আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এতে কোন বিপরীত আকর্ষণ বা নেগিটিভ ক্রিয়া নেই। অর্থাৎ গ্র্যাভিটি কোন সময়ই কোন বস্তুকে দূরে সরে দেয় না, বরং সব সময় আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেয়।

তৃতীয়তঃ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মহাকর্ষ ক্রিয়াশীল আছে। একটি বস্তু থেকে অপরটির দূরত্ব যেটাই হোক- এর মধ্যে একটি মাধ্যাকার্ষণ শক্তি অতি অল্প হলেও সর্বদাই বিদ্যমান থাকে।

চতুর্থতঃ মহাকর্ষ চারটি মৌলিক ফোর্সের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল শক্তি। অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে এই ফোর্স এত কম যে তা মাপাই কঠিন। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বভাবের অপর একটি ফোর্স ইলেকট্রমেগন্যাটিক এর কথা বলা যায় (এই ফোর্সের কথা একটু পরই বর্ণিত হয়েছে)। অণুর নিউক্লিয়াসের প্রটোন ও ইলেকট্রনের মধ্যে এই ফোর্সের ক্রিয়া একই

দূরত্বে স্থাপিত বস্তুর মধ্যকার মহাকর্ষের তুলনায় ১০ এর সঙ্গে ৪০টি শূন্য মিলিয়ে যে বিরাট সংখ্যা হয় সে পরিমাণ বেশী। কিন্তু এত দুর্বল হলেও এই শক্তিটি যেহেতু সর্বত্র বিদ্যমান তাই এটা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী একটি ফোর্স।

গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ আসলে কি, এ প্রশ্নের জবাব দিতে ঐতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ চেষ্টা করে আসছে। গ্রীক বিজ্ঞানীরা প্রথমে এই ফোর্স নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। এরপর ইসলামিক বৈজ্ঞানিক যুগেও বহু চেষ্টা হয়েছে। আধুনিক যুগের শুরুতে গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরাও মহাকর্ষের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। নিউটনের থিওরী প্রায় ৪০০ বছর পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিলো। বিংশ শতাব্দির শুরুতে আলবার্ট আইনস্টাইন নতুন মহাকর্ষের থিওরী প্রকাশ করেন। বর্তমানে তাঁর এই থিওরীই হচ্ছে মডার্ণ থিওরী।

মহাকর্ষের আধুনিক থিওরী

আইনস্টাইনের থিওরীর মূলে আপেক্ষিকতাবাদ বিদ্যমান। এই মতবাদের মাধ্যমে তিনি দেখিছেছেন যে, মহাকর্ষ মূলত স্পেইস-টাইম কন্টিনিউয়াম (স্থান-কাল ধারাবাহিকতা)-এর একটি অংশ। এর মাধ্যমে তিনি জ্যামিতিক উপায়ে মহাকর্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এই থিওরী মতে মহাকর্ষ সকল বস্তু ও এনার্জির উপর ক্রিয়াশীল হয় যা স্থান-কালের উপর গতিশীল। অর্থাৎ বাস্তবে মহাকর্ষ এমন একটি শক্তি যার প্রভাবে বস্তুর চতুর্পার্শ্বের স্থান ও কাল ঘোমরা হয়ে যায়। তবে এর প্রতিক্রিয়া সাধরণভাবে বুঝা যায় না। একটি বড় বস্তু যেমন সূর্যের চতুর্পার্শ্বের উপর এর ক্রিয়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এই বক্রকরণ প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। আইনস্টাইন তাঁর থিওরী দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সূর্যের নিকট দিয়ে ভ্রমণকারী আলোক রশ্মি বক্র হবে। এই ধারণা ১৯১৯ সালে সংঘটিত একটি সূর্যগ্রহণের সময় প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন, যে অবস্থানে একটি দূরের তারা মহাকাশে থাকার কথা তা এই ঘোমরাকরণের ফলে অপর একটি অবস্থানে দেখা গেছে। অর্থাৎ তারা থেকে আগত আলোক রশ্মিটি বাঁকা হয়ে গেছে। আইনস্টাইন আরও বলেছেন, শক্তিশালী

মহাকর্ষের ফিল্ড সময়কেও ধীরগতিসম্পন্ন করে দেয়। এটাও ১৯৬৪ সালে পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। দেখাগেছে, সূর্যের নিকটে যেয়ে একটি সিগন্যাল ধীরগতিসম্পন্ন হয়েছে।

সুতরাং আইনস্টাইনের থিওরী অনুযায়ী মহাকর্ষ হচ্ছে স্থান-কালেরই একটি অঙ্গ। বস্তুর ওজন বা ম্যাস যতো বেশী হবে সে তার চতুর্দিকের স্থান কালের গতিকে ততবেশী বাঁকা (বেন্ড) করে দেবে। এই বাঁকাকরণের ফলেই বস্তুর দিকে ছোট ছোট বস্তু আকর্ষিত হয়। যেমন সূর্য তার মাহকর্ষের ফিল্ডের মধ্যে সবকটি গ্রহ-উপগ্রহকে ধরে রেখেছে। এগুলো বাস্তবে সূর্যের দিকে পতিত হচ্ছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঘুর্ননের ফলে আরেকটি ফোর্স (আঙ্গুলার মমেন্টাম) সৃষ্টি করে নিজেদেরকে রক্ষা করছে। অর্থাৎ মহাকর্ষের আকর্ষণ ও বাইরের দিকের আঙ্গুলার ফোর্সের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে একটি ব্যালান্স। সুতরাং গ্রহগুলোর মধ্যে প্রদক্ষিণ গতি না থাকলে এগুলো কিছুতেই টিকে থাকতে পারতো না, সূর্যের উপর পতিত হয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

মাধ্যাকর্ষণের গুরুত্ব শুধু এই সৌরজগতেই বিদ্যমান নয়- বাস্তবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই শক্তিটি সবকিছুকে ধরে রেখেছে। বস্তুগুলো নিজস্ব গতির মাধ্যমে ব্যালান্স তৈরী করে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে। আমাদের সৌরজগতসহ কোটি কোটি সৌরজগত ও তারা নিয়ে একটি বিরাট তারকাজগত আছে। এটিকে বলে গ্যালাক্সি। এই গ্যালাক্সির অস্তিত্বও মহাকর্ষ ও তারাগুলোর প্রদক্ষিণের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি তারা ও তার সৌরজগত নিয়ে গ্যালাক্সির বিরাট কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। যদি করতো না তবে কেন্দ্রে পতিত হয়ে সমগ্র তারাজগতটিই ধ্বংস হয়ে যেত। আমাদের সূর্যও তার পরিবার-পরিবর্গ (আমাদের পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহগুলো) নিয়ে গ্যালাক্সির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে।

এই মহাকর্ষের ও বস্তুর মধ্যে ঘুর্নন গতির কারণে বাস্তবে সমগ্র বিশ্বটাই একটি ব্যালান্সের মধ্যে থেকে অস্তিত্বশীল বজায় রাখছে। এই ব্যালান্স না থাকলে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত।

দুর্বল আনবিক শক্তি (উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স)

বস্তু জগতে এটমিক পর্যায়ে দ্বিতীয় মৌলিক শক্তিটি ক্রিয়াশীল আছে- যাকে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স বা দুর্বল আনবিক শক্তি বলে। মূলত বস্তুর ক্ষয় হওয়ার জন্য এ শক্তিটি দায়ী। এটমের কেন্দ্রে যে নিউট্রন নামে একটি পার্টিকেল আছে, এটি দুর্বল আনবিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয় হয়ে যায়। এ শক্তি, ষ্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ও বৈদ্যুতিক-আনবিক শক্তির সমন্বয়ে কিছু এনার্জির সৃষ্টি করে। এসব এনার্জিকে রেডিওএ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা বলে।

প্রাকৃতিক চার শক্তি: এ চিত্রে স্বভাবের মৌলিক চার শক্তির ক্রিয়া চিত্রিত হয়েছে।

সবল আনবিক শক্তি (ষ্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স)

প্রাকৃতিক তৃতীয় মৌলিক শক্তিটি হচ্ছে সবল আনবিক শক্তি বা ষ্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স। এ শক্তিটি প্রতিটি বস্তুতে আনবিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল আছে। প্রতিটি এটমের কেন্দ্রকে এ শক্তিই বেধে রাখে। কেন্দ্রের মধ্যে যে নিউট্রন ও প্রটোন নামক দুটি কণা আছে, এগুলো এ শক্তি থাকার ফলে একে অন্যকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে রাখে। আনবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে যে বিশাল এনার্জি বা উদ্যম বেরিয়ে এসে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ধ্বংসলীলা ঘটায়, তা এই প্রভাবশালী আনবিক শক্তির ফলেই হয়। মানুষ এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে আনবিক চুল্লীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করছে। নিউক্লিয়ার এনার্জির মূলে এ মৌলিক শক্তিই ক্রিয়াশীল আছে। এ শক্তির ফলে যেমনি বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষা পাচ্ছে, তেমনি এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের বিরাট উপকারও হচ্ছে।

এ শক্তির ফলেই সূর্য ও তারাগুলো জ্বলন্ত আছে। সূর্যের কেন্দ্রে আনবিক স্কেলে বিস্ফোরণ হচ্ছে। সূর্যের কেন্দ্র একটি জ্যান্ত হাইড্রোজেন বোমা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভীষণ তাপমাত্রার ফলে হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং এ রিয়েকশনের ফলস্বরূপ সূর্য আলো ও তাপসহ অনেক ধরনের এনার্জি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ এনার্জি থেকে পৃথিবী ও এর অধিবাসীরা উপকৃত হচ্ছে। সূর্যের তাপ ও আলো ছাড়া এ গ্রহে প্রচলিত প্রাকৃতিক আইনের আওতাভূক্ত থেকে কোন প্রাণী জ্যান্ত থাকতে পারতো না।

বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি (ইলেকট্রমেগন্যাটিক ফোর্স)

এ শক্তিটিও বিশ্বজগতের সর্বত্র ক্রিয়াশীল আছে। প্রতিটি বস্তুতে ইলেকট্রিক ও চুম্বকীয় শক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে। কেমিষ্ট্রি ও বায়েলোজলিতে যেসব প্রতিক্রিয়া বা রিয়েকশন হয় তা এ শক্তির ফলেই হয়। ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশন যেমন টিভি, রেডিও, এক্স-রে, ইনফ্রারেড, আলট্রাভাইলোট প্রভৃতি সিগন্যালও এ শক্তির ফলে সংঘটিত হয়। আলোও এ শক্তির ফলাফল। বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় ক্রিয়ার

মাধ্যমে এনার্জি, বিকিরণ (রেডিয়েশন) ও আলো নির্গত হয়ে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। যদিও মহাকর্ষ সম্পর্কে মানুষ অনেক আগে থেকেই জানতো, কিন্তু ইলেকট্রোমেগন্যাটিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র শতাধিক বছর আগে।

মহাবিশ্ব

উপরোক্ত চারটি মৌলিক শক্তি বা স্বাবাভিক আইনের আওতাভূক্ত থেকে সমগ্র মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল আছে। দৃশ্যমান এই জগত যেভাতে আছে ঠিক সেভাবে থাকার কারণও হচ্ছে এই চারটি ফোর্স। মহাকর্ষের একটি বড় গুণ হচ্ছে সব বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করা। এর ফলে জগতের প্রতিটি বড় আয়তনের মাহশূন্যে ভাসমান বস্তুই মূলত গোলক আকারে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রহ, উপগ্রহ থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান অসংখ্য তারা সবই মৌলিকভাবে একেকটি গোলক।

মহাকর্ষ ছোট বড় সব বস্তু-খণ্ডকেও তার প্রভাবে নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতিতে ছাটাই করে রেখেছে। অর্থাৎ কিছু বিশেষ উপায়ে ব্যালান্স তৈরী করে করেছে। অণু-পরমাণু যেভাবে একেকটি সৌরজগত তেমনি একেকটি তারকাজগত এবং ক্লাস্টার (এ ব্যাপারে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে) সম্বলিত তারাজগতকেও সৌরজগতের মতো সিস্টেমের মাধ্যমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

স্বভাবের উপরোক্ত চারটি মৌলিক শক্তি না থাকলে এ বস্তুজগত টিকে থাকতে পারতো না। এই চার শক্তিই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমানে এই চার ফোর্স সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অবগত হয়েছেন যেগুলোর বিশেষ গুণাবলী দ্বারা বস্তুজগত পরিচালিত হচ্ছে। আর এই পরিচালনা একটি পদ্ধতি মাত্র- এরূপ না হয়ে অন্যভাবেও হতে পারতো। কিন্তু যেহেতু তা হয় নি তাই আর অতিরিক্ত বলার প্রয়োজন নেই। দ্বীন ও বিজ্ঞান খণ্ডে আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

"আল্লাহর মহিমায় এরূপই রয়েছে কতো নিদর্শন পৃথিবী ও মহাকাশে যার উপর দিয়ে গত হয়ে যাচ্ছে (অবিশ্বাসীরা) অথচ তারা কিছুই পরওয়া করে না"
[সূরা ইউসূফ ঃ ১০৫]।

পরিচ্ছেদ ৪

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্ব

এ পর্যন্ত আমরা বস্তুজগত সম্পর্কে যাকিছু জানতে পেরেছি তার সারমর্ম হলো- বস্তু মূলত অণুর সমন্বয়ে গঠিত মলিকিউল থেকে সৃষ্ট। মৌলিক চারটি শক্তির মাধ্যমে সবকিছু নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক অস্তিত্বশীল আছে। এবার আষ্ট্রনোমি বা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে জগতের গঠনপ্রণালী ও ষ্ট্রাকচার সম্পর্কে জানবো। এরপর জগত কিভাবে (বিজ্ঞানের মতে) অস্বিত্বশীল হয়েছে, এর বর্তমান মতিগতি ও ভবিষ্যৎ কি সেসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হবে। জগত সর্ম্পকে এসব মৌলিক প্রশ্নাবলী নিয়ে যে বিজ্ঞান গবেষণা চালাচ্ছে তার নাম হলো কজমোলজি বা বিশ্বতত্ত্ব।

বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা পুরাতন শাখা। এর পেছনে একটা বিশেষ কারণ নিহিত আছে- আর তা হলো, মানুষের স্বভাবতঃ অনুসন্ধিৎসু মন। আপনি যদি একটি মেঘশূন্য রাতে শহরের বাতিগুলো থেকে দূরে কোন গ্রামে থেকে একবার আকাশের দিকে মনোযোগ সহকারে তাকান তাহলে এটা অনিবার্য যে, সমগ্র আকাশজুড়ে লাখ লাখ তারাগুলো আসলে কি, এগুলো কত দূরে, কিভাবে এগুলোর জন্ম হয়েছে প্রভৃতি প্রশ্নাবলী আপনার মনে জাগ্রত হবে। মানুষের এই "জগৎ সম্বন্ধে জানার স্পৃহা" থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞানের এই শাখা সর্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক। আমি অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে এখানে আলোচনা করবো না। বর্তমানে এ বিজ্ঞান মানুষকে কি বলছে এবং শিক্ষা দিচ্ছে এগুলোই হবে এ পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তু। পাঠকরা একথা জেনে রাখুন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি বিষয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে জ্যোতিষীরা

আকাশের তারা ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করে মানুষের ভাগ্য বা রাশিফল বলে থাকেন। আকাশের তারার সাথে মানুষের ভাগ্যের কোন মিল যদি থেকে থাকে তবে তা বিজ্ঞানের আওতাভূক্ত নয়। প্রচীনকালে মানুষ মহাকাশে তারার মধ্যে একটা আরেকটার সাথে সামঞ্জস্য গড়ে তুলতে কাল্পনিক রেখা টেনে জীব-জন্তু প্রভৃতির ছবি এঁকেছে। সৃষ্টি করেছে তথাকথিত কন্সটেলেশন বা রাশিচক্র। অথচ যেসকল তারার সমন্নয়ে এসব রাশিচক্র হয়েছে এগুলোর মধ্যে বাস্তবে কোন মিল নেই। এমনকি একটা থেকে আরেকটার দূরত্বও কোন কোন ক্ষেত্রে হাজার হাজার থেকে লাখো-কোটি আলোক বৎসরের তফাৎ।

আমাদের সৌরজগৎ

মহাবিশ্বের যে অংশে আমাদের নিবাস, তা হলো এই সৌরজগৎ, তবে মহাকাশে আরও অগণিত তারকাপুঞ্জ ও গ্রহ-উপগ্রহ আছে। আমাদের নিকটতম তারা হলো সূর্য। নয়টি গ্রহ (এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত- ভবিষ্যতে আরও একাধিক গ্রহের সন্ধান মিলতে পারে), অনেকগুলো উপগ্রহ, এ্যাস্টারয়েড ও অসংখ্য উল্কার সমন্নয়ে এ সৌরজগৎ গঠিত হয়েছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রতিটি বস্তু মহাশূন্যে ঘূর্ণমান অবস্থায় আছে। নয়টি গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীই প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন একটি গ্রহ। কোন না কোন ধরণের জীবি এ পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর যাবৎ জীবিত থাকলেও, এখানের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবী- মানুষ, মাত্র কটি সাল পূর্বে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৫৭ সালে রাশিয়া স্ফুটনিক নামক একটি স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে সর্বপ্রথম প্রেরণ করে। এরপর ১৯৬২ সালে শুরু হয় মানুষসহ পৃথিবীর নিকঠ-মহাশূন্যে ভ্রমণ।

আমাদের সৌরজগৎ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি নামক একটি বিরাট তারকাপুঞ্জের একটি বিশেষ অংশে অবস্থান করছে। এ তারকাপুঞ্জে আনুমানিক একশত কোটি সূর্যের মতো ছোট-বড়ো তারা আছে। গ্যালাক্সির আয়তন প্রায় এক লক্ষ আলোক-বৎসর। অনেকের ধারণা আমাদের সৌরজগতের মত বহুসংখ্যক তারার সাথে এরকম গ্রহ উপগ্রহবিশিষ্ট সৌরজগৎ আছে। ইতোমধ্যে এরূপ দু'একটা সিস্টেমের সন্ধানও পাওয়া গেছে বলে কেউ কেউ দাবী করেছেন। আমাদের সৌরজগতের মধ্যে কয়েক ধরণের

বস্তু আছে। তুষার দ্বারা গঠিত ছোট্ট গ্রহ থেকে বিরাট বয়ূবীয় গ্রহ যার আয়তন পৃথিবীর ১১ গুণ বেশী, এমনও বস্তু এ সৌরজগতে বাস করে। প্রতিটি গ্রহই সূর্যকে একই দিকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্রহগুলোর কক্ষপথও প্রায় একই সমপৃষ্ঠে বর্তমান। মোটামুটিভাবে এই ভ্রাম্যমাণ সমপৃষ্ঠ সূর্যের আহ্নিক গতির সাথে (ইকুইটরিয়্যাল প্লেইন) সামঞ্জস্য হয়ে আছে। সূর্যের আহ্নিক গতির সমপৃষ্ঠের সাথে গ্রহগুলোর আহ্নিক গতিও প্রায় একই প্লেইনে অবস্থান করছে, তবে ইউরেনাস ও প্লুটোর আহ্নিক গতি কিছুটা ভিন্ন প্লেইনে আছে।

আমাদের সৌরজগৎ
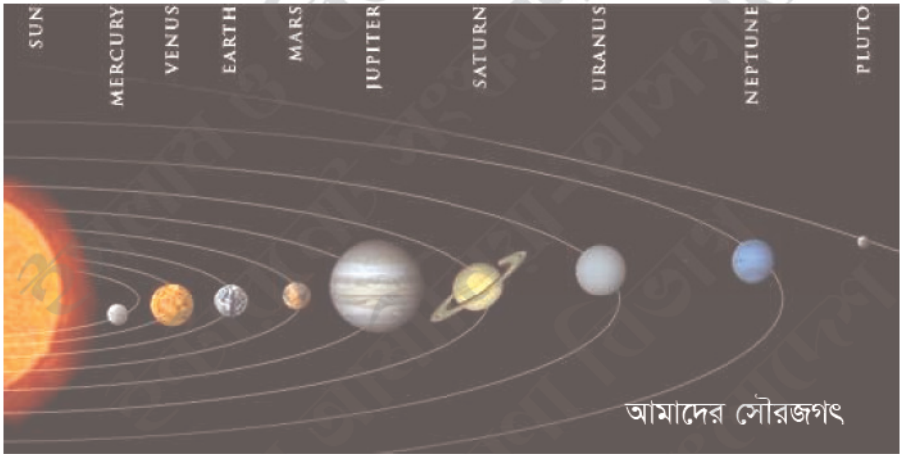
সূর্য

আমাদের সূর্য হলো মধ্যম বয়সী একটি হলুদ নক্ষত্র, যার বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর। এটা বাস্তবে একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড, যেখানে প্রতিনিয়ত হাইড্রোজেন বিস্ফোরণ ঘটছে আনবিক ক্ষেত্রে। এই আনবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে সূর্যের মধ্যবর্তী সর্বাপেক্ষা বেশী পদার্থ- হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে, যার ফলে সূর্য মোটা অংকের উত্তপ্ত উদ্যম (এনার্জি) চতুর্দিকে মহাশূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে। এই উদ্যম বা এনার্জি আলো ও তাপ আকারে বিকিরণ হয়। আমরা পৃথিবীতে বসে এই এনার্জিই উপভোগ করি। সূর্যের এই এনার্জি ক্ষয়ের কারণে তা একদা নিস্প্রভ হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভাবনার কোন কারণ নেই, সূর্যের মধ্যে এতো বেশী হাইড্রোজেন আছে যে, তা জ্বলে শেষ হতে অন্তত আরও ৫০০ কোটি বছর সময় লাগবে।

সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল হলো সূর্য। যাবতীয় বস্তুই তাকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের মধ্যে জড়ের পরিমাণ (বস্তুর ওজন) হলো ১৯৯২৮ কেজি। অর্থাৎ- ১৯৯ পরে ২৮টি শূন্য লিখলে যে সংখ্যা হয়- তাই। বলাই বাহুল্য সমগ্র সৌরজগতের মোট জড় পদার্থের শতকরা ৯৯ অংশই সূর্যের মধ্যে নিহিত। এ কারণেই সবকিছু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। সূর্যের আয়তন হলো ১৩,৯২,০০০ কিলোমিটার। আমরা যদি ১০৯টা পৃথিবী কাতার করে সূর্যের নিকটে খাড়া করি তবেই সূর্যের আয়তনের সমান হবে। গ্রহগুলোর তুলনায় সূর্যের আয়তন ও জড় এতো বেশী হওয়ায় তার মাধ্যাকার্ষণ ফিল্ডে সবাই আটকে আছে। এ মহাকর্ষ এতো শক্তিশালী যে প্রায় ৫৯১ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নবম গ্রহ প্লুটোও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সূর্যের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তার বহির্ভাগের তাপমাত্রা সাড়ে পাঁচ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সূর্যের উপর থেকে মুক্ত হতে হলে ৬১৭.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড- এরূপ উচ্চ গতির প্রয়োজন হবে। এ গতিকে 'এস্কেপ ভেলোসিটি' বা মুক্তগতি বলা হয়। মুক্তগতি বস্তুর মধ্যবর্তী জড়ের উপর নির্ভরশীল। জড় পদার্থ যতো বেশী হবে মুক্তগতির মাত্রাও ততো বেশী হবে।

কাল্পনিক স্পেইসশীপে মহাবিশ্ব ভ্রমণে

পাঠকরা এবার সূর্য সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা করতে পারছেন নিশ্চয়ই। এবার আসুন আমরা একটা কাল্পনিক মহাশূন্য যান বা স্পেইসশীপে চড়ে সমগ্র সৌরজগৎটা ঘুরে দেখি। এভাবে লিখলে বুঝতে বেশ সহজ হবে বলে মনে করি। এ কাল্পনিক ভ্রমণে আমাদের আরম্ভস্থল হবে সূর্যের উপরিভাগ। অবশ্য সাধারণতঃ ওখানে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়, উচ্চ তাপে যে কোন বস্তুই সাথে সাথে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তবে আমাদের ভাবনা নেই, কারণ আমাদের নভোযানটি ঠাণ্ডা-গরম সবকিছুর ঊর্ধ্বে, এবং এটা শক্ত ও অবিনশ্বর।

প্রথমেই আমরা সূর্য থেকে অন্তত ১০ কোটি মাইল দূরে এসে সূর্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে এর আহ্নিক গতি আমাদের যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করে দেখলাম যে, উহার মাত্রা প্রায় ৬৫৫ ঘণ্টা। অর্থাৎ ২৭ দিনে সূর্যটি নিজ মেরুরেখার উপর ভিত্তি করে একবার

ঘুরে আসে। আমাদের যন্ত্রপাতি আরও বলে দিলো যে, সূর্য তার পরিবারবর্গ- অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহসহ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির চতুর্দিকে বাইশ কোটি পঁচিশ লক্ষ বৎসরে একবার ঘুরে আসে। সূর্যের উপর মাধ্যাকার্ষণও পৃথিবীর তুলনায় ২৮ গুণ বেশী; যার ফলে পৃথিবীতে ১ কেজি ওজনের একটি বস্তু সূর্যের উপর ২৮ কেজি ওজনবিশিষ্ট হবে।

সূর্য সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য হলো: সূর্যের আয়তন হচ্ছে, ৮ লক্ষ ৬০ হাজার মাইল। পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব ৯ কোটি ২৯ লক্ষ ৬০ হাজার মাইল। এটা মূলত হাইড্রোজেন গ্যাসের তৈরী (৯৫%), এছাড়া আছে ৫% হিলিয়াম ও অন্যান্য বস্তু- যা এটম হিসেবে অস্থিত্বশীল। সূর্যের ম্যাস বা বস্তুর পরিমাণ হলো, ১৯৯ ঢ ১০৩৪ গ্রাম (১৯৯ এর সঙ্গে ৩৪টি শূন্য থাকলে যে বিরাট নাম্বার হয়)। এর ভেতরে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। কোটি কোটি বছর যাবৎ সূর্যটি এভাবে জ্বলন্ত আছে। এই বিরাট তারাটি কিন্তু বিশ্বের কিছু সত্যিকার জায়ান্ট তারার তুলনায় বেশ ছোট্ট। বিজ্ঞানীরা সূর্যকে একটি মধ্যম সাইজের 'জি-২ ডোয়ার্ফ' [তরা ক্যাটালগের একটি হিসেব] তারা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূর্যের বয়স ৫ বিলিয়ন (৫০০ কোটি) বছর বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্যের মধ্যে কয়েকটি আলাদা নির্দিষ্ট স্তর আছে। এগুলো হলো: ভেতরের কোর বা কেন্দ্রগোলক, কনভেকশন জোন ও ফটোস্ফিয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার ও করোনা (বাইরের গোলক)।

ভেতরের কোরঃ সূর্যের বাইরের স্তরের বিরাট ওজনসম্পন্ন গ্যাস ভেতরের কোরের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। এর ফলে ভেতরের স্তরের ঘনত্ব পানি থেকে ১০০ গুণ বেশী হয়েছে। এছাড়া এই চাপ থেকে সেখানের তাপমাত্রা হয়েছে ২৭ মিলিয়ন ডিগ্রী ফারেনহাইট। এই মহা তাপমাত্রায় বাস্তবে ভেতরের অংশটির বস্তু প্লাজমা অবস্থায় বিরাজ করছে। এই ভেতরের স্তরটিই হচ্ছে সূর্যের এনার্জি সৃষ্টির কারখানা। এখানে নিউক্লিয়ার রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হচ্ছে, আর এ পরিবর্তনের সময় এটমগুলো ছেড়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ধরণের এনার্জি বা উদ্যম। তবে প্রশ্ন জাগতে পারে এই রিয়েকশন কতদিন চলবে? কোন

একদিন নিশ্চয়ই হাইড্রোজেন গ্যাস শেষ হবে। তবে আগেই বলেছি, আমাদেরকে এব্যাপারে এখনই দুর্ভাবনার সময় আসে নি কারণ, সূর্যের মধ্যে এত বিরটা পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে যে, বর্তমান রেইটে তা জ্বলতে থাকলে আরও ৫ বিলিয়ন বছর পুড়ার পর শেষ হবে।

সূর্যের এক্স-রে ছবি

কনভেকশন জোন ও ফটোস্ফিয়ারঃ সূর্যের দৃশ্যমান উপরিভাগের কাছে বস্তুর ওজনের চাপ অনেকটা কম। এরফলে তাপমাত্রাও ভেতরের তুলনায় অল্প। কেন্দ্র থেকে বাইর পর্যন্ত মোট দূরত্বের দুই-তৃতীয়াংশ বাইরের দিকের দূরত্বে এসে তাপমাত্র ১ মিলিয়ন কেলভিনে নেমে এসেছে। এই অংশে এটমগুলো আর প্লাজমা অবস্থায় নেই। এই জোনটি তাই বেশ ক্রিয়াশীল। ভেতরের তাপ ও অন্যান্য এনার্জি এই জোন বাইরের দিকে নিয়ে আসে। সুতরাং এই জোন বা স্তরটি সূর্যের ভেতরের এনার্জি ট্রান্সপোর্ট করার দায়িত্ব পালন করছে।

ক্রোমোস্ফিয়ার: ফটোস্ফিয়ারের উপরে এ গোলকটি স্থাপিত। এখানের তাপমাত্রা ৪,৫০০ কেলভিন থেকে উপরের দিকে ১৫,০০০ কেলভিন পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

করোনা: পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় কয়েক মিলিয়ন মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত একটি উজ্জ্বল গোলক দেখাতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন করোনা। সূর্যের মূল গোলকের তুলনায় এই করোনার ঔজ্জ্বল্য এক মিলিয়ন গুণ কম। এই করোনা সম্পর্কে অনেক তথ্য এখনও জানা যায়নি। তবে এটা যে একটি গরম গ্যাস দ্বারা তৈরী তা জানা গেছে।

সূর্যের মধ্য থেকে আরেক ধরণের এনার্জি চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়ছে যাকে বলে সোলার উইন্ড বা 'সৌরবাতাস'। এই বাতাস সমগ্র সৌরজগতের সর্বত্র বিদ্যমান। পাইওনিয়ার-১০ নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যখন সৌরজগত ছেড়ে তারকাজগতের দিকে পাড়ি জমায়, তখন এই উইন্ড সেই বাইর সৌরজগতেও বিদ্যমান আছে বলে প্রমাণ মিলে। সোলার উইন্ডের গতি হচ্ছে ১৮৫ থেকে ৪৩৫ মাইল প্রতি সেকেন্ড। তবে এই উইন্ডের মধ্যে বস্তুর মাত্রা বা ঘনত্ব অত্যল্প। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও পরিলক্ষিত হয়। অরোরা নামক যে আলোর খেলা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর আকাশে দেখতে পাওয়া যায়, তা এই উইন্ডের কারণে হয়।

সূর্য সম্পর্কে মানুষ এখও অনেককিছু জানতে পারেনি। যেহেতু সূর্যের কাছে যাওয়া অসম্ভব তাই এটাকে নিয়ে গভীর গবেষণাও কঠিন ব্যাপার। তবে বিজ্ঞানীরা থেমে নেই। সর্বদাই সূর্য সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে আমাদের নিকটতম এই তারাটি সম্পর্কে আরও বহু তথ্য আমরা জানতে পারবো।

বুধ

আমাদের নভোযানটি এবার সূর্যের নিকঠতম গ্রহ বুধের দিকে অগ্রসর হলো। এর কাছে পৌছে আমরা এই গ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে সক্ষম হলাম।

বুধ বা মারকারী সূর্য থেকে গড়ে ৪,৩২,৮৩,০০০ (চার কোটি বত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার) মাইল দূরে অবস্থান করে কক্ষপথে ঘূর্ণমান আছে। সূর্যের এতো নিকটে হওয়ার ফলে বুধের কক্ষপথে চলার গতিও বেশী, একবার প্রদক্ষিণ করতে মাত্র ৮৮ দিন লাগে। এর দিবাভাগের তাপমাত্রা হলো ৪৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর রাতের তাপমাত্রা মাইনাস ১৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বুধের আয়তন হলো ৪,৮৭৮ কিলোমিটার। তার মুক্তগতি (এস্কেপ ভেলোসিটি: যে কোন আষ্ট্রনোমিক্যাল বডির উপর থেকে মহাকর্ষের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে মহাশূন্যে উঠে যেতে যে গতির প্রয়োজন, তার নাম এস্কেপ ভেলোসিটি বা মুক্তগতি।) ৪.২৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। এক কেজি ওজনের বস্তু বুধের উপর মাত্র ০.৩৮ কেজি হবে। এ গ্রহটি সম্পর্কে আমরা আরও জানতে পারলাম যে, এটা একটি শক্ত মাটির তৈরী গ্রহ তবে আয়তনে ছোট ও ওজনে কম হওয়ায় তার চতুর্দিকে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। সুতরাং বুধের মধ্যে কোন ধরনের প্রাণী যে নেই তা প্রায় নিশ্চিত।

বুধের একাংশ

বুধের উপরিভাগ বা সারফেসে অসংখ্য ইমপেক্ট ক্রেটার বা বস্তু পতিত হওয়া থেকে সৃষ্ট গর্ত দেখতে পাওয়া যায়। বুধ সম্পর্কে আরও যা কিছু জানা গেছে তাহলো: বুধের বার্ষিক গতি হচ্ছে ৮৮ দিন, অর্থাৎ ৮৮ দিনে একবার সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসে। এর আহ্নিক গতি ৫৮.৬ দিন। পৃথিবীর তুলনায় বুধের ব্যাস (ডায়ামিটার: এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব) হলো ৪০% মাত্র। এর ওজন পৃথিবীর তুলনায় ৬%। ধারণা করা হয় গ্রহটির ভেতরে একটি বড় আয়তনের লোহার তৈরী কেন্দ্র আছে।

শুক্র

সূর্য থেকে ৬,০৭,০০,০০০ (ছয় কোটি ৭ লক্ষ) মাইল দূরে অবস্থান করে, শুক্র বা ভিনাস গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এর ব্যাস হচ্ছে ৭,৫২০ মাইল এবং ওজন (ম্যাস) পৃথিবীর ৮১ শতাংশ। ভিনাসের ঘনত্ব পৃথিবীর ৯০ শতাংশ। এর বার্ষিক গতি হলো ২২৪.৭ দিন। শুক্রের ব্যাপারে একটি অদ্ভুত কথা হলো, তার আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি প্রায় সমান, যার ফলে এক অংশ সর্বদা সূর্যের দিকে থাকে। শুক্রের তাই অর্ধাংশ স্থায়ীভাবে দিবালোকে ভাসমান আর অন্য অর্ধাংশ সর্বদা রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এছাড়া এর আহ্নিক গতিপথ বা চলার ডাইরেকশনও আলাদা। অন্যান্য গ্রহের গতিপথ যেদিকে শুক্রের গতিপথ এর ঠিক উল্টোদিকে।
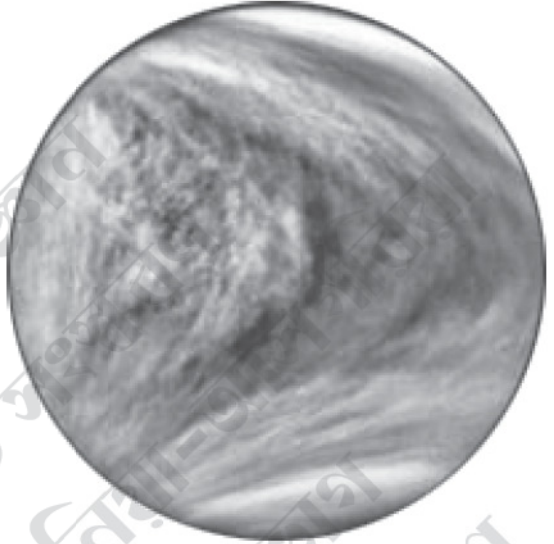
শুক্র গ্রহকে পৃথিবীর সহোদরা বলা হয়ে থাকে, কারণ এর আয়তন ও স্বভাব অনেকটা পৃথিবীর মতোই। তার চতুর্দিকে বেশ বড়ো ঘন বায়ুমণ্ডল আছে। শুক্র গ্রহ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে আসতে পারে অন্যান্য গ্রহের তুলনায়। রাতের আকাশে এটা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। যার কারণে এটাকে সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। শুক্র গ্রহের ঘন বায়ুমণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণরূপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্বারা গঠিত। গ্রীন হাউসের প্রভাবে এর উপরিভাগের তাপমাত্রা ৪৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই উচ্চ তাপমাত্রা থাকায় শুক্র গ্রহে কোন প্রাণী থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায় না।

শুক্র গ্রহের উপরিভাগ বা ভূমি অনেকটা পৃথিবীর মতোই। বড় বড় পাহাড়, পর্বত, সাগর, সমতলভূমি, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি সবই আছে। আফ্রিকা মহাদেশের সমান একটি উঁচু ভূখণ্ড আছে। বিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন, "আফ্রদিতি টেরা।" সর্বোচ্চ পাহাড়ের নাম ম্যাক্সওয়েল, এর উচ্চতা হচ্ছে ৭ মাইল। উল্লেখ্য, ম্যাক্সওয়েল নামকরণ স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল-এর নামানুসারে করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা এই বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

পৃথিবী ও চন্দ্র

আমাদের কাল্পনিক নভোযানটি সূর্য থেকে তৃতীয় স্থানে অবস্থিত সুন্দর নীল গ্রহ পৃথিবীতে পৌঁছুল। সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেটিতে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী বেঁচে থাকতে সমর্থ। আমাদের এ পৃথিবীতে আছে বড়ো বড়ো কয়েকটি মহাদেশ, চার ভাগের তিন ভাগে পানি- আর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সম্বলিত বায়ুমণ্ডল।

সূর্য থেকে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে পৃথিবী ১ বৎসরে একবার একে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি হলো ২৪ ঘণ্টা বা একদিন। এর ব্যাস হলো ১২,৪০০ কিলোমিটার (৭,৯০০ মাইল)। পৃথিবী থেকে মুক্ত হতে হলে ১১.১৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড- এ মুক্তগতির প্রয়োজন। এখানে দিনেরবেলা গড়ে ২২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হয়ে থাকে। নিম্নতম তাপমাত্রা মাইনাস ৮৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে আসতে পারে দুটি মেরুতে। পৃথিবীর একটিমাত্র স্বাভাবিক উপগ্রহ আছে, যেটি হলো চাঁদ। পৃথিবী থেকে গড়ে ৩৮৪,৪০০ কিলোমিটার (২,৩৮,৯০০ মাইল) দূরে অবস্থান করে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের উপর তাপমাত্রা পৃথিবীর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর বিশেষ কারণ হলো বায়ুমণ্ডল না থাকা। রাতের বেলা অর্থাৎ অন্ধকার সাইডে তাপমাত্রা মাইনাস ১৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। কিন্তু দিনের বেলা তা বেড়ে ১৩০ ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছে।

চন্দ্রের দুধরণের আহ্নিক (মাসিক) গতি আছে। প্রথমত: যে সময়ের মধ্যে সে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আকাশের একই অবস্থানে ফিরে আসে তাকে বলে, "সাইডারিয়েল মাস"। সাইডারিয়েল মাসের পরিমাণ হলো, ২৭ দিন, ৭ ঘণ্টা, ৪৩

মিনিট ও ১১.৬ সেকেন্ড। দ্বিতীয়ত: যেহেতু পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে চন্দ্রকে নিয়ে একই দিকে প্রদক্ষিণ করছে তাই চন্দ্রকে তার ফেইজে (দৃশ্যমান পর্যায়ে) ফিরে আসতে যে সময় লাগে তাকে বলে, "সাইনোডিক মাস"। এক সাইনোডিক মাস হচ্ছে, ২৯ দিন, ১২ ঘণ্টা, ৪৪ মিনিট ও ২.৮ সেকেন্ড। উল্লেখ্য, এই সাইনোডিক মাসই ইসলামী ক্যালেণ্ডারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। চন্দ্রের আহ্নিক গতি (নিজস্ব মধ্যশলার উপর ভিত্তিকরে ঘুর্নন গতি) সাইডারিয়েল গতির প্রায় সমান থাকায় এর অর্ধাংশ সর্বদাই পৃথিবীর দিকে থাকে। চন্দ্রের ব্যাস হলো ৩,৪৭৬ কিলোমিটার (২,১৬০ মাইল) এবং মুক্তগতি ২.৩৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। চন্দ্রের মাধ্যাকার্ষণ ক্ষমতা পৃথিবীর ০.১৬৫৩ গুণ মাত্র। চন্দ্রের মধ্যে বস্তুর (ম্যাসের) স্বল্পতার কারণে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। কারণ বায়ুমণ্ডল ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন দাঁড়ায় পর্যাপ্ত মহাকর্ষ। ১৯৬৯ সনে মানুষ প্রথমে চন্দ্রের উপর অবতরণ করতে সক্ষম হয়। কিছুদিন পূর্বে চন্দ্রের অভ্যন্তরে বরফ আকারে পানি আছে বলে সন্ধান পাওয়া গেছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর ছবি

চন্দ্রের শুষ্ক পৃষ্ঠভাগের স্বরূপ মূলতঃ দুধরনের। এর একাংশ হচ্ছে পহাড়, পর্বত ও মিটিওরাইট (মহাকাশের প্রস্তরখ) পতনের গর্তে পরিপূর্ণ আর অপর অংশ অনেকটা সমতলভূমি। মিটিওরাইট গর্তের আয়তন বিভিন্ন মাপের দেখতে পাওয়া যায়। চন্দ্রের অপর দিকে (অন্ধকার সাইডে) একটি গর্ত আছে যার ব্যাস ১,৫৫০ মাইলের অধিক। ধারণা করা হয় মিটিওরাইট মহাকাশ থেকে সুদূর অতীতে চন্দ্রের উপর পতিত হয়ে এসব গর্ত তৈরী করেছে।

মঙ্গল

মঙ্গল হলো সৌরজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রোমান্টিক একটি গ্রহ। এখানে প্রাচীনকাল থেকে প্রাণী আছে বলে মানুষ ধারণা করে আসছে। অনেকে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী থাকার কল্পনাও করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক লেখকদের জন্য এ গ্রহ ও এর মধ্যে জীবিত প্রাণীরা ছিলো তাঁদের কল্পনার খোরাক। প্রখ্যাত লেখক এইচ. জি. ওয়েল্স তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাস, ওয়ার অব দ্যা ওয়ার্লডস্ বইয়ে, মার্স বা মঙ্গল থেকে আগত প্রাণীদের সাথে পৃথিবীবাসিদের যুদ্ধের কাহিনী লিখেছিলেন। যাহোক, মঙ্গলে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের বাস দূরে থাক, বেকটেরিয়া জাতীয় ক্ষুদ্রকায় কোন প্রাণী আছে কি না সে ব্যাপারেই নিশ্চিত কিছু বলা যায় নি। আমেরিকার মহাশূন্য সংস্থা নাসা, এ পর্যন্ত একাদিক কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গল গ্রহে প্রেরণ করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোন ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। যদিও কিছুদিন পূর্বে মঙ্গলে প্রাণী আছে বলে যে প্রচার করা হয়েছিলো, তা শেষ পর্যন্ত ভুলের ছিলো বলে আবার ঘোষণা করা হয়েছে। এবার দেখা যাক মঙ্গল সম্পর্কে আমাদের নভোযানের যন্ত্রপাতি কি কি তথ্য দিয়েছে।

মঙ্গল গড়ে ১৪ কোটি মাইল দূরে থেকে প্রতি ১.৮৮ (৬৮৭ দিন) বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। সে প্রতি সেকেন্ডে ২৪ কিলোমিটার (১৫ মাইল) বেগে সূর্যকে কেন্দ্র করে তার প্রদক্ষিণপথে ছুটে চলছে। মঙ্গলের আহ্নিক গতি প্রায় পৃথিবীর সমান

গতিসম্পন্ন (২৪ ঘণ্টা, ৩৭ মিনিট, ২৩ সেকেন্ড), এর ব্যাস কিন্তু অনেক কম- প্রায় ৬,৭৯৪ কিলোমিটার (৪,২২২ মাইল)। গ্রহটির উপরিভাগের তাপমাত্রা মাইনাস ২৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী হয়না। এর মুক্তগতি ৫.০৩ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের মাধ্যাকার্ষণ ০.৩৮ গুণ। মঙ্গলের মাটির রং লাল, এবং তার চতুর্দিকে পাতলা বায়ুমণ্ডলও আছে। মঙ্গল গ্রহের ফোবস ও ডেইমস নামে নিজস্ব দুটি উপগ্রহ (চাঁদ) আছে। মঙ্গলে তাই রাতের বেলা একই সাথে দুটি চাঁদ দেখতে পাওয়া যাবে। এই চাঁদগুলো আয়তনে বেশ ছোট। ফোবসের ব্যাস হলো ২২ কিলোমিটার, আর ডেইমসের ১২ কিলোমিটার। এ উপগ্রহগুলো মঙ্গলকে চন্দ্রের মতো প্রদক্ষিণ করে।

মঙ্গলের বায়ূমণ্ডল মূলত কার্বন-ডাইঅক্সাইড (৯৫.৩%) দ্বারাই গঠিত। এছাড়া এতে আছে নাইট্রোজেন (২.৭%) এবং আরগোন (১.৬%)। বাদবাকী অত্যল্প অক্সিজেন, কার্বন মনোক্সাইড, ওটার ভেপার (জলীয় বাষ্প) প্রভৃতি গ্যাসও আছে বলে জানা যায়।

লাল গ্রহ নামে খ্যাত মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের রং সত্যিই গাঢ় লাল থেকে বাদামী রংয়ের বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। মনুষ্যবিহীন কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ছবি এ তথ্যটি প্রমাণ করেছে। এছাড়া সমতল ভূমিতে সর্বত্র ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়।

মঙ্গলে অত্যন্ত উঁচু আগ্নেয়গিরি থেকে সৃষ্ট পাহাড় আছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি হচ্ছে, ওলিমপাস মনস (মাউন্ট ওলিমপাস - ওলিমপাস পর্বত) যার উচ্চতা ৫২,০০০ হাজার ফুট (এভারেষ্ট পর্বতের প্রায় দ্বিগুণ)। এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব ৩৭০ মাইল।

মঙ্গল গ্রহের উপর গবেষণা পুরোদমে চলছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, মানুষ এই গ্রহেই কোন একদিন কলোনী তৈরী করে বসবাস করবে। তবে প্রথমে সেখানে মানুষ পাঠানোর চিন্তাভাবনা নিয়েই বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত আছেন। হয়তো ১০-১৫ বছরের মধ্যে প্রথম মানুষ মঙ্গলে অবতরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

এ্যাস্টারয়েড বেল্ট বা গ্রহাণুপুঞ্জ

আমাদের স্পেইস শীপটি মঙ্গল থেকে দ্রুতবেগে বৃহস্পতি গ্রহের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু অর্ধপথে পৌছার পরই যানটি গতিরোধ করে রিপোর্ট করলো যে, সামনেই অসংখ্য ছোট-বড় শিলাবৎ শক্ত বস্তু মহাশূণ্যে ভাসমান আছে। আমরা বাস্তবে এ্যাস্টারয়েড বেল্টে এসে পৌছেছি।

এ্যাস্টারয়েডগুলো হলো সৌরজগতে ভাসমান ছোট আকারের শিলাবৎ অসংখ্য শক্ত বস্তু বা গ্রহাণু। সর্বাপেক্ষা বড় এ্যাস্টারয়েড এর নাম হচ্ছে সেরেস, যার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত প্রায় ৬০০ মাইলের পথ। কয়েক হাজার এ্যাস্টারয়েড আলাদাভাবে সনাক্ত করা হয়েছে, তবে ১ মাইল অথবা বেশী আয়তনবিশিষ্ট এ্যাস্টারয়েডের সংখ্যা অন্তত ৫ লক্ষ হবে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু সবগুলো মিলেও পৃথিবীর জড়ের তুলনায় মাত্র ১০০০ ভাগের ১ ভাগ হবে। বেশীরভাগ এ্যাস্টারয়েড মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে অবস্থান করছে। এগুলো সূর্য থেকে ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল হতে ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে মহাকাশে অবস্থান করে প্রদক্ষিণ করছে। এ্যাস্টারয়েড সাধারণতঃ শতকরা ৭৫ ভাগ কার্বনের তৈরী কৃষ্ণকায়, ১৫ ভাগ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট সিলিকনে তৈরী (পাথরের মত) এবং ১০ ভাগ ধাতুর তৈরী বলে জানা গেছে। বার্ষিক ছাড়াও প্রতিটি এ্যাস্টারয়েডেরই আহ্নিক গতি আছে। এ্যাস্টারয়েড আয়তনে যতো ছোট হবে, এর আহ্নিক গতিও ততো বেশী হবে। বেশীরভাগ এ্যাস্টারয়েড দেখতে অনেকটা আলুর মতো।

এ্যাস্টারইড ব্রেইলির নিকট কৃত্রিম মহাকাশযান

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ্যাস্টারয়েড সৌরজগৎ সৃষ্টির সময়েই সৃষ্ট হয়, তবে এগুলো কোন গ্রহ ভেঙ্গেও হতে পারে, এরূপ মন্তব্যও কেউ কেউ করে থাকেন।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমাদের নভোযানটি এ্যাস্টারয়েড বেল্ট পেরিয়ে আন্তগ্রহ মহাশূন্যে দ্রুতগতিতে সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ, বৃহস্পতি বা জুপিটারের দিকে অগ্রসর হলো।

বৃহস্পতি

বৃহস্পতি হচ্ছে বিরাট গ্যাসীয় একটি গ্রহ যার আয়তন পৃথিবীর দশগুণ বেশী। এর ওজন (ম্যাস) পৃথিবী থেকে ৩১৮ গুণ বেশী হলেও সূর্যের তুলনায় এর মধ্যে জড়বস্তু হলো মাত্র ০.১ ভাগ। বৃহস্পতির মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এই দুই ধরনের গ্যাস বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এর উপরিভাগে কোন শক্ত মাটি বা শিলাবৎ জড় নেই তবে তরল পদার্থ আছে যা গ্রহের ভেতরে গিয়ে ধাতুর আকার ধারণ করেছে। বৃহস্পতির কেন্দ্রে হয়ত ছোট আয়তনবিশিষ্ট শিলাবৎ বা কঠিন বরফের তৈরী অন্তস্থল (কৌর) থাকতে পারে। বৃহস্পতি প্রতি ১১.৯ বৎসরে সূর্যের চতুর্দিকে একবার ঘূরে আসে এবং তার দূরত্ব সূর্য থেকে প্রায় ৪৯ কোটি মাইল (পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ৫.২ গুণ)। বৃহস্পতির ব্যাস ১,৪২,৮০০ কিলোমিটার (৮৮,৭০০ মাইল)। ১ কেজি কোন বস্তুর ওজন বৃহস্পতির উপরে ২.৬৪ কেজি হবে এবং তার মুক্তগতির পরিমাণ হলো ৬০.২২ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। বৃহস্পতির আহ্নিক গতি মাত্র ০.৪১৪ দিন (৯ ঘণ্টা ৫৫.৫ সেকেন্ডে সে একবার তার মধ্যশলাকার উপর ঘুরে আসে)। এই উচ্চ আহ্নিক গতির ফলে তার উপরিভাগে নানা রংগের উজ্জ্বল ও অন্ধকার বেল্ট এর সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা পৃথিবী থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। তবে বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যে যে বস্তু প্রখ্যাত, তা হলো তার লাল দাগ। এ দাগের আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান। বিগত ৩০০ বছর যাবৎ এ লাল দাগটি পরিলক্ষিত হয়ে আসছে, তবে এটির কারণ এখনো জানা যায়নি।

বৃহস্পতি গ্রহের সর্বমোট ১৬টি নিজস্ব উপগ্রহ (চন্দ্র) আছে। বলা যায় বৃহস্পতি সিস্টেম সৌরজগতের মধ্যে আরেকটি সৌরজগৎ, কারণ এই প্রতিটি উপগ্রহই বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে যেমনটি করে সূর্যকে সৌরজগতের নয়টি গ্রহ। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোকে চারটি আলাদা ভাগে বিভক্ত করে দেখা হয়ে থাকে।
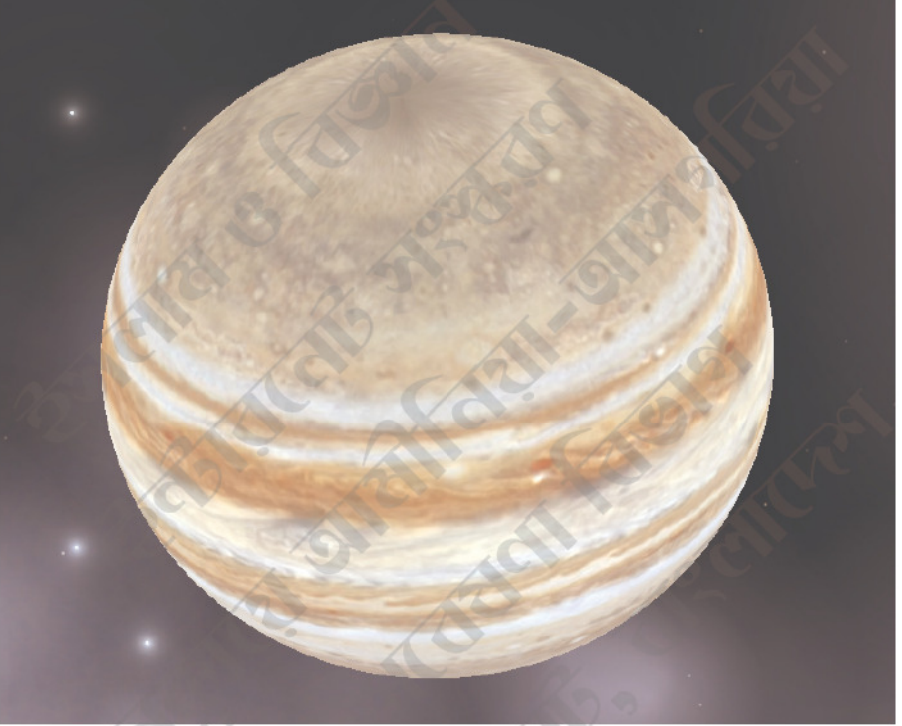
প্রথমতঃ ছোট আয়তনের চারটি আভ্যন্তরীণ উপগ্রহ আছে যাদের নাম হলো যথাক্রমে, মিটিস, এড্রাসট্রিয়া, মালথিয়া ও থিবী। দ্বিতীয়তঃ বড় আকারের চারটি গ্যালিলিয়ান (বিজ্ঞানী গ্যালিলীও দ্বারা আবিষ্কৃত) উপগ্রহ আছে, যেগুলোর নাম হলো, ইও, ইউরোপা, জানেমিড ও ইলারা। এ দুই দলের আটটি উপগ্রহ বৃহস্পতির অরবিট্যাল প্লেইনের (অরবিট্যাল প্লেইন: গ্রহগুলো মহাকাশে যে অবস্থানে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তার নাম হচ্ছে অরবিট্যাল প্লেইন। কে বা কারা এটিকে বাংলায় অনুবাদ করতে যেয়ে 'নিরক্ষবৃত্তের সমপৃষ্ঠ' লিখেছে। এতো কঠিন শব্দব্যবহার কি কারো কাম্য হতে

পারে? আমার মতে 'প্রদক্ষিণপথ' বলাই যথেষ্ট অর্থবোধক।) উপর ভিত্তি করে, প্রায় বৃত্তাকারে গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। তৃতীয় দলে লিদা, হিমালিয়া, লাইসিতিয়া ও আইলারা নামে চারটি ছোট্ট উপগ্রহ আছে, যাদের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকারের ও এগুলোর অবস্থান বৃহস্পতি থেকে ১.১ কোটি থেকে ১.২ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। এগুলো বৃহস্পতির প্রদক্ষিণপথ থেকে ২৫ হতে ২৯ ডিগ্রি পর্যন্ত উপরে বা নীচে স্থাপিত আছে। বাইরের দিকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করছে চতুর্থ দলের নানকি, কারমি, পাসিপায়ি ও সাইনোপি নামে আরও চারটি উপগ্রহ। এগুলো অন্যদের তুলনায় উল্টো দিকে বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে, এবং এদের দূরত্ব বৃহস্পতি থেকে ২.১ কোটি হতে ২.৪ কোটি মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এ চার দলের মধ্যে প্রথমটির চারটি উপগ্রহই পৃথিবী থেকে ছোট টেলিস্কোপ বা দূর্বিক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমেই দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের কাল্পনিক স্পেইস শীপটি আমাদেরকে সূর্য থেকে ৫২ কোটি মাইল দূরে বৃহস্পতির নিকটে পৌছে দিয়েছে, কিন্তু সৌরজগতের বাইরের দিকে আরও বহু কোটি মাইলের পথ বাকী আছে। এবার আমরা আরও দ্রুত গতিতে সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা সুন্দর রিং-সংযুক্ত ষষ্ঠ গ্রহ শনির দিকে যাত্রা করবো।

শনিগ্রহ

শনিগ্রহ বা সোটার্ন সৌরজগতের চারটি গ্যাসীয় দৈত্যদের মধ্যে একটি, যার আয়তন দ্বিতীয় স্থানে; বৃহস্পতির পরই। এর নিরক্ষবৃত্তের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় ৯.৪ গুণ বেশী আর জড় পদার্থের পরিমাণ ৯৫ গুণ অধিক। তবে শনির ঘনত্ব গড়ে পানির তুলনায় মাত্র ০.৭ গুণ। বৃহস্পতির মতো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসই শনিতে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এর কেন্দ্রস্থলে পৃথিবীর জড়ের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ গুণ বেশী জড় সম্বলিত একটি আভ্যন্তরিণ কৌর বা অন্তস্থল আছে। এ অন্তস্থল শিলাবৎ বা শক্ত তুষারের তৈরী হতে পারে। শনির সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বস্তু হলো তার রিং সিস্টেম। এ রিং গ্রহটির অরবিট্যাল প্লেইন থেকে কিছু দূরে অবস্থান করে শনিকে প্রদক্ষিণ করে।

ভয়েজার নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ শনিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ভয়েজার থেকে পাঠানো ছবি থেকে বুঝা যায় যে, বাস্তবে কয়েক হাজার ছোট ছোট রিং এর সমন্বয়ে রিং সিস্টেম গঠিত হয়েছে। এসব রিং এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মাত্র এক কিলোমিটার বিস্তৃত। এবং এগুলো আলাদা শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত।

১৯৮০ সালের পূর্ব পর্যন্ত শনি গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা দশটি পর্যন্ত জানা ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে আরও কয়েকটা উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। এ পর্যন্ত মোট ১৮টা উপগ্রহের সন্ধান মিলেছে, ভবিষ্যতে আরও আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শনি ৮৭ কোটি মাইল দূরে অবস্থান করে সূর্যকে প্রতি ২৯.৭৫ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। সে নিজ মেরুরেখার উপর ভিত্তি করে প্রতি ১০ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে একবার ঘুরে আসে। অর্থাৎ- মাত্র ১০ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে শনির একদিন হয়। পৃথিবীর তুলনায় এর মহাকর্ষ হলো ১.১৬ গুণ বেশী। শনির মুক্তগতি ৩২.২৬ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। রিং ছাড়াও তার ব্যাস হলো ১,২০,৫৩৬ কিলোমিটার।

ইউরেনাস

পাঠকরা! আমরা সূর্য থেকে বহু দূরে এসে পড়েছি। শনি থেকে সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে এটাকে বেশ ছোট্ট দেখাচ্ছে। যখন সৌরজগতের সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের নিকটে আসলাম তখন, আমরা সূর্য থেকে প্রায় ১৭৯ কোটি মাইল দূরে এসে পড়েছি।

ইউরেনাসের একটি ছবি
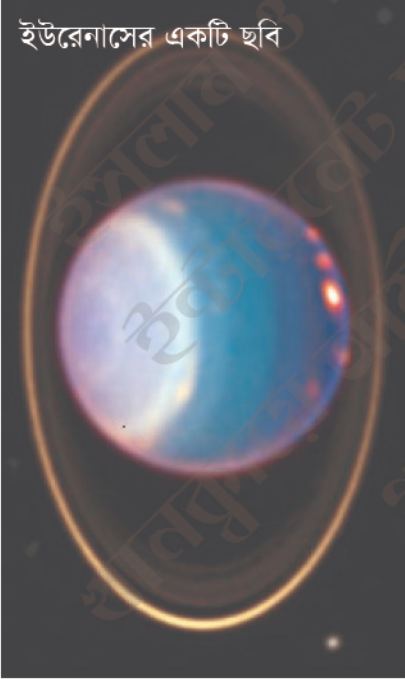
ইউরেনাসও একটি বিরাট আকারের গ্রহ। উইলিয়াম হার্সেল নামক একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হলেন এ গ্রহের আবিষ্কারক। তিনি ১৭৮১ সালের ১৩ মার্চ এটি তাঁর টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখতে পান। পৃথিবীর উপর থেকে সর্বাপেক্ষা বড় টেলিস্কোপের মাধ্যমেও ইউরেনাসকে ঈষৎ সবুজ বর্ণের একটা বৃত্তের মতো দেখতে পাওয়া যায় মাত্র। ১৯৮৬ সালে ভয়েজার-২ নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ইউরেনাসের নিকটে আসে, এতে এ গ্রহটি ও তার উপগ্রহগুলো সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে সক্ষম হয়েছি। ভয়েজার-২ দশটা অজানা উপগ্রহ আবিষ্কার করে, যদিও ইতোমধ্যে আরও পাঁচটির খবর জানা ছিলো। এই পাঁচটির নাম হলো: মিরাণ্ডা (জেরার্ড কাইপার নাকম একব্যক্তি ১৯৪৮ সালে এটি আবিষ্কার করেন), এরিয়েল, আমেব্রল (এ দুটি ১৮৫১ সালে উইলিয়াম রাসেল আবিষ্কার করেছিলেন), টিটানিয়া এবং অবেরন (এগুলো উইলিয়াম হার্সেল ১৭৮৭ সালে আবিষ্কার করেন)।

ইউরেনাসও একটি মোটা আয়তনের গ্যাসীয় গ্রহ, যার ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় চারগুণ বেশী ও ম্যাস পনেরগুণ বেশী জড়বিশিষ্ট। এটি হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসে তৈরী। বিজ্ঞানীদের ধারণা ইউরেনাসের কেন্দ্রস্থলে ছোট্ট আয়তনের শিলাবৎ একটি কৌর আছে যার চতুর্দিকে কঠিন বরফ, মিথেইন ও এ্যামোনিয়ার তৈরী গাঢ় আরেকটি গোলক নিহিত আছে।

ইউরেনাস সূর্য থেকে প্রায় ১৭৯ কোটি মাইল দূরে মহাশূন্যে অবস্থান করে প্রতি ৮৪.০১৩ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। তার আহ্নিক গতি হলো মাত্র ১৭ ঘণ্টা ২৪ মিনিট। ইউরেনাসের ব্যাস (মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত) ৫১,১০০ কিলোমিটার (৩১,৭৫০ মাইল)। এর ওজন পৃথিবীর তুলনায় ১৫ গুণ বেশী। তার মহাকর্ষ পৃথিবীর ১.১৭ গুণ বেশী এবং মুক্তগতি ২২.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড।

ভয়েজার-২ কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ইনফ্রা-রেড (ইনফ্রো-রেড রেডিয়েশন: একটি বিশেষ ওয়েভলেন্থ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা বস্তু থেকে বিকিরণ হয়ে থাকে। আলো যেভাবে দেখা যায় সাধারণত এ তরঙ্গ খালি চোখে দেখা যায় না। বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে ইনফ্রা-রেড ক্যামেরা যা দিয়ে ছবি তোলা যায়।) ছবি থেকে ইউরেনাসের উপরিভাগের তাপমাত্রা মাইনাস ২১৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বলে বিজ্ঞানীরা সাব্যস্ত করেছেন। এই গ্রহেরও চতুর্দিকে শনির মতো রিং সিস্টেম আছে। উল্লেখ্য এই রিং সিস্টেম সম্পর্কে আগে কারো জানা ছিলো না। ভয়েজার-২, ১৯৭৭ সালের ১০ মার্চ এটা আবিষ্কার করে।

নেপচুন

আমাদের সৌরজগতের মধ্যে নেপচুনের স্থান অষ্টম পর্যায়ে, যদিও সময় সময় প্লুটো নেপচুন থেকেও নিকটে থাকে। নেপচুনকে পৃথিবী থেকে খালি চক্ষে দেখতে পাওয়া যায়না। বড় টেলিস্কোপের মাধ্যমে একে একটা অনুজ্জ্বল ঈষৎ নীল বর্ণের বৃত্তের মত দেখতে পাওয়া যায়। এ নীল রংয়ের কারণ হলো তার চতুর্দিকে উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলে মিথেইন গ্যাস আছে।

ভয়েজার-২ নভোযানের মাধ্যমে ১৯৮৯ সালে নেপচুনের কিছু ছবি তুলা হয়। এতে দেখা গেছে, এ গ্রহটি অনেকটা ইউরেনাসের মতোই। যদিও নেপচুনে একটি বৃহৎ অন্ধকার দাগ আছে যা অনেকটা বৃহস্পতি গ্রহের বৃহৎ লাল দাগের মতোই। নেপচুনের সর্বমোট ৮টা উপগ্রহ আছে।

সূর্য থেকে ২৮০ কোটি মাইল দূরে নেপচুনের অবস্থান। প্রতি ১৬৪.৭৯৩ বৎসরে এটা সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। নেপচুনের নিজস্ব আহ্নিক গতির পরিমাণ হলো ১৬ ঘণ্টা ৮ মিনিট। নেপচুনের ব্যাস ৪৯,৫০০ কিলোমিটার (৩০,৭৫০ মাইল), এর মুক্তগতি ২৩.৯ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড ও তার উপরে ১ কেজি ওজনের বস্তু ১.২ কেজি ওজনবিশিষ্ট হবে। নেপচুনের উপরিভাগের তাপমাত্রা মাত্র মাইনাস ২১৮ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়ে থাকে। গ্রহটির সর্বাপেক্ষা বড় উপগ্রহের নাম হলো ট্রাইটন। এটার ব্যাস ১৬৮০ মাইল যা চন্দ্রের থেকে সামান্য ছোট। এছাড়া নিরেইড নামক এর আরেকটি উপগ্রহ আছে যার ব্যাস ২১৩ মাইল। ভয়েজার-২ কৃত্রিম উপগ্রহ আরও ছয়টি নতুন উপগ্রহ আবিষ্কার করে। ভয়েজার-২ থেকে প্রাপ্ত ছবি থেকে এই গ্রহেরও রিং থাকার প্রমাণ মিলেছে। নেপচুনের মোট ৫টি রিং আছে।

প্লুটো

আমাদের কাল্পনিক স্পেইস শীপটা অনেক দূরে সৌরজগতের শেষ ও নবম গ্রহ প্লুটোর কাছে এসে পৌঁছেছে। এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রহটিকে পরীক্ষা করেই আমরা সৌরজগৎ ছেড়ে আন্তঃতারা মহাশূন্যে চলে যাবো। পাঠকরা! ধৈর্য সহকারে নভোযানটিতে বসে থাকুন!

১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কৃত হয়। সূর্য থেকে এ গ্রহের দূরত্ব ২৭৯ কোটি হতে ৪৬৫ কোটি মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোন কোন সময় প্লুটো নেপচুন গ্রহ থেকে কাছে আসতে পারে। প্লুটোর ক্যারন নামক একটি উপগ্রহও আছে, যার ফলে প্লুটো সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে।
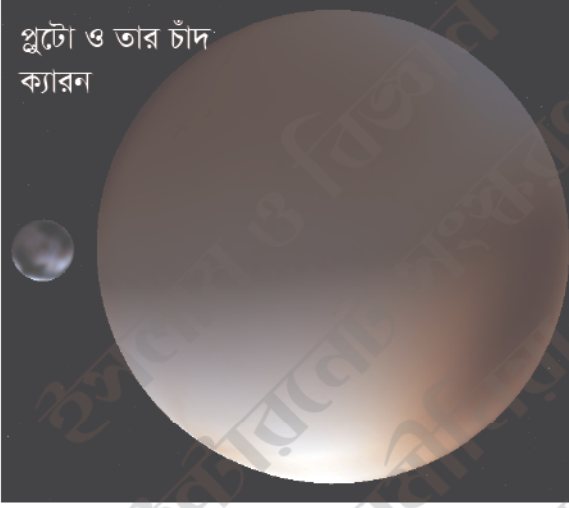
প্লুটোর ব্যাস হলো ২,২৮৪ কিলোমিটার (১,৪১৪ মাইল), এটা প্রতি ২৪৮.৪ বছরে সূর্যের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। প্লুটোর নিজস্ব আহ্নিক গতি হলো ১৫৩ ঘণ্টা। এ গ্রহের উপর ১ কেজি ওজনের কোন বস্তুর ওজন হবে ২.০৩ কেজি, আর তার মুক্তগতি হলো ১.১৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। বলাই বাহুল্য, সূর্য থেকে এতো দূরে হওয়ার ফলে প্লুটো অত্যন্ত ঠাণ্ডা একটি গ্রহ হিসেবে অস্তিত্বশীল আছে। এর তাপমাত্রা মাইনাস ২২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশী হয়না।

ধূমকেতু বা কমেট

সৌরজগতের মধ্যে আমাদের এ সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ শেষ হয়েছে। আমরা এবার তারকাজগতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবো। প্রথমেই আমরা নিকটতম তারা প্রক্সিমা সেনসরীর দিকে ছুটে যাবো।

প্লুটোর কক্ষপথ থেকে আমাদের এ আন্তঃতারা ভ্রমণের শুরু হচ্ছে। কিছুদূর চলার পরই কিন্তু মহাশূণ্যে এক অদ্ভুত লেজযুক্ত একটি বস্তুর সম্মুখীন হলাম আমরা। এ বস্তুটি কিন্তু আমাদের সৌরজগতেই বাস করে, যার নাম হলো ধূমকেতু বা কমেট। প্প্লু

সূর্যকে অসংখ্য ধূমকেতু প্রদক্ষিণ করে থাকে। সাধারণতঃ ধূমকেতুরা হলো বরফের তৈরী ক্ষুদ্রকায় বস্তু। এগুলো সূর্যের নিকটবর্তী হলে তাপমাত্রার তীব্রতায় এর কিছু অংশ গলে বাষ্পে পরিণত হয়, যার ফলে বস্তুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং ধূমকেতুটির পেছনে কোটি কোটি মাইল লম্বা লেজ এর সৃষ্টি হয়। নিশ্চয়ই অনেকে লেজবিশিষ্ট এরূপ কমেট রাতের আকাশে দেখে থাকবেন। ধূমকেতুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত যেটি, তার নাম হলো 'হ্যালিজ কমেট'। এ ধূমকেতু প্রতি ৭৬ বৎসর পরপর আমাদের আকাশে ফিরে আসে। ২,২০০ বছর ধরে এটি পৃথিবীর মানুষ অবলোকন করে আসছে। ১৯৮৬ ইংরেজীতে এ ধূমকেতু ফিরে এসেছিলো এবং ২০৬২ সালে আবার আসবে।

একটি ধূমকেতুর ছবি

কোন কোন সময় ধূমকেতু ও এ্যাস্টারইড বিভিন্ন গ্রহের বেশ কাছে এসে এর মহাকর্ষে আটকা পড়ে অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে পতিত হয়ে বিস্ফোরিত হয়। এরূপ বিস্ফোরণের ফলে গ্রহের মধ্যবর্তী যাবতীয় জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জীবন নির্মূল হয়ে যেতে পারে।

আজ থেকে ৬ কোটি বছর পূর্বে ডাইনাসোররা এরূপ একটি বিস্ফোরণ হেতু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো বলে অনেক বিজ্ঞানী ধারণা করেন।

কমেটগুলো যেহেতু সৌরজগতেরই সদস্য তাই তাদেরও অন্যান্য গ্রহের মতো প্রদক্ষিণপথ আছে। তবে এগুলোর প্রদক্ষিণপথ খুব বেশী ডিম্বাকৃতির (এলিপটিক্যাল) বলে জানা যায়। অর্থাৎ এগুলো সূর্যের বহু বহু দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে। কিন্তু সূর্যের কাছে এসে খুব দ্রুত তাকে প্রদক্ষিণ করে আবার দীর্ঘ ভ্রমণে চয়ে যায়। কিছু কিছু স্বল্প প্রদক্ষিণসম্পন্ন কমেট আছে যারা প্রতি ২০০ বছরে একবার সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসে। অপরদিকে দীর্ঘমেয়াদী কোন কোনটি কয়েক হাজার বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, এমনও কিছু কমেট আছে যেগুলো একবার মাত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সুযোগ পায়। এসব কমেট আসলে সৌরজগতের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। এরা হচ্ছে তারায় তারায় ভ্রমণকারী বস্তু। তবে এরূপ যাযাবর কমেটের সন্ধান এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি।

আন্তঃতারা মহাশূন্য

আমাদের নভোযানটির কম্পিউটার চালক- নাভিগেটর, শীপটিকে সৌরজগতের মহাকর্ষ থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিল। এর ফলে নভোযানের গতি ৬১৭.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে গিয়ে দাঁড়ালো। যানটি এবার ধীরে ধীরে আলোকের কাছাকাছি গতিতে সৌরজগতের মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে অন্ধকার আন্তঃতারা মহাশূন্যের উপর দ্রুত ছুটে চলছে। আমরা একবার সূর্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে একে সত্যিকার একটি ছোট্ট আকারের তারা হিসেবে মহাকাশে মিটুমিটু করছে দেখতে পেলাম। নয়টা গ্রহ যে এটাকে প্রদক্ষিণ করছে তা নগ্নচোখে দেখা মোটেই আর সম্ভব ছিলো না।

৪.২ আলোক বৎসরের পথ অতিক্রম করার পর নাভিগেটর এলান করলো, "আমরা সূর্যের নিকটতম তারকা প্রক্সিমা সেন্টরীর কাছে এসে পৌছেছি"। এ তারাটা আসলে দুটি তারা সিস্টেমের মধ্যে একটি, যাকে সাধারণতঃ বাইনারী বা জোড়া-তারা বলা হয়ে থাকে। বিশ্বের মধ্যে এরূপ জোড়া-তারা বেশী দেখতে পাওয়া যায়। প্রক্সিমা

সেন্টরীর সাথী অন্য তারাটির নাম হলো আলফা সেন্টরী। এদের মধ্যে একে অন্যের দূরত্ব ০.১১ আলোক বৎসর।

প্রক্সিমা সেন্টরী আলফা সেন্টরীকে প্রতি ১০ লক্ষ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। এ বাইনারী তারা সিস্টেম সেনটোরাস নামক একটি কন্সটেলেশন বা রাশিচক্রের অংশ।

প্রক্সিমা সেন্টরী এবং আরও দু-চারটা তারা সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা আমাদের এ মিল্কিওয়ে তারাজগৎ নিয়ে কথা বলবো।

কাছের তারা প্রক্সিমা সেন্টরী

টোরাস রাশিচক্রের একটি তারা হচ্ছে যার নাম হলো আলদেবারান। এ তারাটা পৃথিবী থেকে ৬৭.৯ আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত। তারাটি টোরাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল একটি তারা। তবে আলদেবারানের ৬টা সাথী-তারাও আছে।

এরপর আমরা সিরিয়াস নামে আরেকটি তারার কথা বলবো। এ তারাটি পৃথিবী থেকে ৮.৭ আলোক বৎসর দূরে অবস্থান করে। রাতের আকাশে সিরিয়াস হলো সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারা। সিরিয়াসের চারটা সাথী আছে। দূরত্বের দিক থেকে এ তারা সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে। অবশেষে যে তারার কথা বলবো সেটির নাম হলো ভেগা। পৃথিবী থেকে ২৬.৫ আলোক বৎসর দূরে ভেগার অবস্থান। সৌরজগৎ ছেড়ে মানব তৈরী প্রথম আন্তঃতারা উপগ্রহ ভয়েজার-১ এই ভেগা তারার দিকেই ছুটে চলছে। তবে ঘণ্টায় মাত্র ৪০,০০০ মাইল গতিসম্পন্ন এ উপগ্রহ ৪০,০০০ বছর ভ্রমণ করার পরই ভেগার নিকটে পৌঁছবে!

আন্তঃগ্যালাকটিক মহাশূন্য

আন্তঃতারা মহাশূন্য অতিক্রম করে আমাদের স্পেইস শীপ এবার আন্তঃগ্যালাকটিক (এক গ্যালাক্সি হতে অন্য গ্যালাক্সি) মহাশূণ্যে ছুটে চললো। নাভিগেটর রিপোর্ট করলো, আমাদের গ্যালাক্সির দুটি স্যাটেলাইট বা উপগ্যালাক্সি আছে। এগুলোর উদ্দেশ্যে আমরা এবার ভ্রমণ করছি। তবে আমাদেরকে যেহেতু বহুদূর যেতে হবে, তাই আমরা আমাদের নিজস্ব তারাজগত 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'র দিকে ফিরে তাকিয়ে এটা সম্পর্কে যা কিছু জানা গেছে, সে ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করবো।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

আমাদের এ গ্যালাক্সি হলো একটি বিশেষ ধরনের তারকাজগত, যাকে বিজ্ঞানীরা স্পাইরেল (পেঁচানো) বলে খ্যায়ীত করেছেন। এর অর্থ হলো গ্যালাক্সির মধ্যে চক্রাকার একাধিক শাখা (আর্মস্) নিহিত আছে। গ্যালাক্সির আয়তন হলো ১ লক্ষ আলোক বৎসর ও এর মধ্যে অন্তত ২,০০০ কোটি তারা আছে। প্রতিটি আর্মসের মধ্যেই বেশী তারা অবস্থান করছে, আর এখানে আন্তঃতারা বস্তুও আছে যার মাধ্যমে নতুন তারা জন্মলাভ করে। গ্যালাক্সির নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রায় বৃত্তাকার যে এলাকা আছে, তার ব্যাস হলো ৫০,০০০ আলোক বৎসর। এই কেন্দ্রীয় এলাকায় সাধারণতঃ গ্যালাক্সির পুরাতন তারকাদের নিবাস।

আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একাংশ
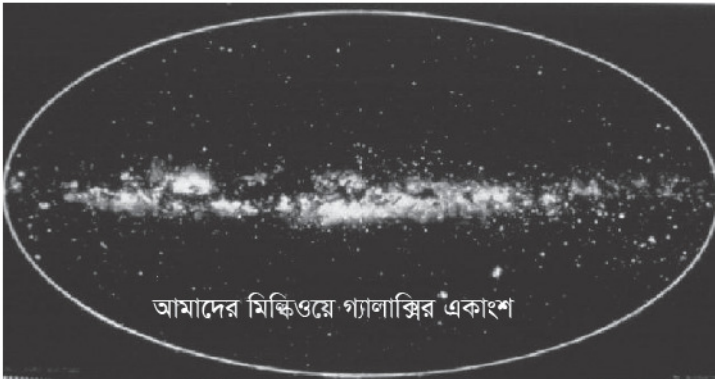
সাগিটারিয়াস রাশিচক্রের দিকে অবস্থান করছে আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থল। কেন্দ্রের মধ্যে সূর্যের একশত গুণ ওজনবিশিষ্ট একটি ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ-ছিদ্র আছে বলে অনেকে ধারণা করছেন। মহাকাশে কৃষ্ণ-ছিদ্র বলতে যা বুঝায় তা-হলো, কোন কোন বিরাট আকারের তারা যখন বিস্ফোরিত হয় তাদের জীবন শেষে, তখন নিজ মহাকর্ষে এটা কলাপ্স হয়ে আয়তনে ছোট হতে থাকে। আয়তনে যতো বেশী ছোট হয়, এর মধ্যকার মহাকর্ষের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তারকাটি আরও কলাপ্স হতে থাকে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে শেষ পর্যন্ত তারাটির ওজন এবং মহাকর্ষ এতো বেশী হয়ে যায় যে, এর উপর থেকে আর কোন বস্তুই মুক্ত হতে পারে না, এমনকি আলোও না। এ কারণেই এরূপ বস্তুকে ব্ল্যাক হোল বলা হয়। এসব বস্তুকে মহাকাশের শ্মশানক্ষেত্র বলা চলে। কোন বস্তু- এমনকি একটি তারা ব্ল্যাক হোলের নিকটবর্তী হলে আর রক্ষা নেই, বস্তুটিকে তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। অনেকের মতে প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এ ধরনের একেকটি ব্ল্যাক হোল আছে।

যা হোক, আমাদের সূর্য আপাতত এ শ্মশান থেকে বহুদূরে নিরাপদে আছে! বাস্তবে সূর্য গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে ২৮,০০০ আলোক বৎসর দূরে অবস্থান করছে। সমগ্র গ্যালাক্সি স্বভাবের সচরাচর নিয়মানুযায়ী মহাশূন্যে ঘূর্ণমান অবস্থায় আ'ছে, তবে একটা শক্ত অখণ্ডিত বস্তু হিসেবে নয়, অর্থাৎ গ্যালাক্সির কেন্দ্রের নিকটতম তারাগুলো বাইরের দিকে অবস্থিত তারাদের তুলনায় দ্রুত প্রদক্ষিণ করে। আমাদের সূর্য ও সৌরজগতের যাবতীয় বস্তু ২২৫ কোটি বছরে গ্যালাক্সির চতুর্দিকে একবার ঘূরে আসে।

প্রিয় নভোচারী পাঠক! আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর এ কাহিনীর শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আমাদের গ্যালাক্সির দুটি উপগ্যালাক্সি বা স্যাটেলাইট (চাঁদ-গ্যালাক্সি), তারা কাষ্টার প্রভৃতি নিয়ে এবার সামান্য আলাপ করে বর্তমানে এ বিশ্ব সম্পর্কে মানুষ যেটুকু জানতে পেরেছে, আমরা সে ব্যাপারে কথা বলবো।

মেজেলানিক ক্লাউড্‌স

বড় ও ছোট মেজেলানিক ক্লাউড নামে দুটি উপগ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সির চতুর্দিকে ঘূর্ণমান অবস্থায় আছে। ফারদিন্যান্দ মেজেলান নামে এক-ব্যক্তি এগুলো আবিষ্কার করেছিলেন বলে তাঁর নামানুসারে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। বড় মেজেলানিক ক্লাউডের অবস্থান হলো টিউকানা নামক রাশিচক্রে। এর দূরত্ব ১,৫০,০০০ আলোক বৎসর। ছোট মেজেলানিক ক্লাউড ডরেডো নামক রাশিচক্রে অবস্থান করছে এবং পৃথিবী থেকে এটির দূরত্ব প্রায় ১,৭৩,০০০ আলোক বৎসর।

বড় মেজেলানিক ক্লাউড

এ দুটিকে ক্লাউড বললেও এগুলো মোটেই আকাশের মেঘ নয়- বাস্তবে একেকটি তারাজগত। বড় ক্লাউডের ব্যাস ৩১,০০০ আলোক বৎসর। অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলো যেতেই ৩১ হাজার বছর অতিবাহিত হয়। ছোট্ট ক্লাউডের ব্যাস (ডায়ামিটার) হলো ২৪,০০০ আলোক বৎসর। দুটি তারা সিস্টেমই আমাদের লকেল গ্রুপের সদস্য।

লকেল গ্রুপ বা আমাদের নিজস্ব স্থানীয় গুচ্ছ

আমাদের গ্যালাক্সিসহ কয়েকটি ছোট বড় গ্যালাক্সি নিয়ে একটি বিরাট তারাজগত আছে যাকে বলে লকেল গ্রুপ। এ গ্রুপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গ্যালাক্সির নাম হলো, আন্‌দ্রমেডা গ্যালাক্সি। তবে দ্বিতীয় স্থানে আছে আমাদের নিজস্ব মিল্কিওয়ে সিস্টেম। আমাদের এ লকেল গ্রুপে মোট কয়টি গ্যালাক্সি আছে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি, তবে এটা যেটুকু মহাশূণ্য দখল করে আছে তার ব্যাসার্ধ হলো প্রায় ত্রিশ কোটি দুই লক্ষ ষাট হাজার আলোক বৎসর। এই গ্রুপে এ পর্যন্ত ২৯টি সদস্য আবিষ্কৃত (গ্যালাক্সি) হয়েছে। লকেল গ্রুপের ভেতর আবার দুটি সাব-গ্রুপ আছে। এর একটি হচ্ছে মিল্কিওয়ে ও অপরটি এম-৩১ (আন্‌দ্রমেডা) সাব-গ্রুপ। মিল্কিওয়ে সাব-গ্রুপের সদস্যসংখ্যা ১৪ এবং এম-৩১-এর সদস্যসংখ্যা আছে ৯টি। আমাদের এ গ্রুপের পরের গ্রুপ প্রায় দুই থেকে তিন গুণ দূরে অবস্থান করছে।

ভারগো গ্রুপ

এ গ্রুপের দূরত্ব ৫০ থেকে ৬০ কোটি আলোক বৎসর হবে। এটা একটি বিরাট আয়তনের গ্যালাক্সি-দল, এবং এতে হাজার হাজার আলাদা সদস্য আছে। ২,৫০০ সদস্য এ পর্যন্ত সনাক্ত করা হয়েছে। ভারগো গ্রুপ আসলে আমাদের লকেল সুপারগ্রুপের কেন্দ্রস্থল। গ্যালাক্সিগুলো শুধু গ্রুপ হিসেবে অবস্থান করছে না, এগুলো সুপারগ্রুপের অন্তর্গতও আছে। এ ব্যাপারে পরে আরও আলোচনা হবে। ভারগো গ্রুপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সদস্যের নাম হলো এম-৮৭। এখানে এম এর অর্থ হলো “মেসিয়ার”, মেসিয়ার নামে একজন বিজ্ঞানী গ্যালাক্সিগুলোকে তালিকাভুক্ত

করেছিলেন, তাই তাঁর নামের প্রথম অক্ষর প্রতিটি গ্যালাক্সির নাম্বারের পূর্বে দেওয়া হয়ে থাকে।

ভারগো গ্যালাক্সি গ্রুপ

মেসিয়ার ক্যাটালগের ১৬টি উজ্জ্বল সদস্য ভারগো গ্রুপে অবস্থান করছে। এই গ্রুপকে কেন্দ্র করে আমাদের লকেল গ্রুপ প্রদক্ষিণ করছে। বর্তমানে প্রতি সেকেন্ডে ২০০ কিলোমিটার বেগে আমাদের গ্রুপ এটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কমা গ্রুপ

কমা বেরেনিসেস নামে নক্ষত্রপুঞ্জে এ গ্রুপের অবস্থান, এবং এতে হাজারেরও বেশী গ্যালাক্সি আছে। এটাও আমাদের কাছাকাছি একটি গ্রুপ, যার দূরত্ব প্রায় ত্রিশ কোটি আলোক বৎসর। এটা মূলতঃ আকারে গোলকের মতো, এবং বেশীরভাগ গ্যালাক্সি কেন্দ্রের নিকটে অবস্থান করছে।

আশাকরি পাঠকরা এ তিনটি গ্রুপ সম্পর্কে জানার পর মহাকাশে গ্যালাক্সি-গ্রুপ সম্বন্ধে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্বের সর্বত্র এরূপ গ্রুপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তবে একাধিক গ্রুপের সমন্বয়ে আরও কতকগুলো বিরাট আয়তনের সুপারগ্রুপ বা সুপারক্লাস্টার আছে, যে ব্যাপারে ইতোমধ্যে বলা হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি সুপারক্লাস্টারের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রতিটি সুপারক্লাস্টারে গড়ে বারোটা করে গালাক্সি গ্রুপ বা ক্লাসটার আছে, যদিও কোন কোনটাতে বহু বেশী দেখা যায়। এক একটা সুপারক্লাস্টারের আয়তন কোটি কোটি আলোক বৎসরের পথ।

তারা ক্লাস্টার

গ্যালাক্সির আভ্যন্তরে হাজার হাজার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোটি কোটি তারা মিলে সৃষ্টি হয়েছে একেকটি তারা কাষ্টার। দুধরণের তারা কাষ্টার দেখতে পাওয়া যায়। এর একটি হলো অপেন বা খোলা ও অপরটি গ্লোবুলার বা বৃত্তাকার।

অপেন তারা ক্লাস্টার বা গ্যালাক্টিক ক্লাস্টারের তারাগুলোর বেশিরভাগই অল্পবয়সী বলে ধারণা করা হয়। প্রায়ই দেখা যায় এদের জন্ম ১০ বিলিয়ন বছরের ভেতরে হয়েছে। এসব ক্লাস্টারের আয়তনও কম, গড়ে ১৫ আলোক বৎসর। সদস্যসংখ্যা ১ হাজার থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত হয়ে থাকে।
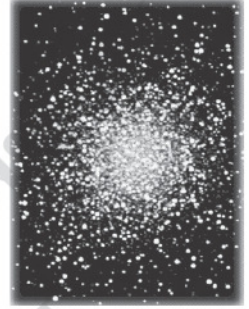
বৃত্তাকার ক্লাস্টারে লাখ লাখ বা কোটি কোটি পর্যন্ত তারা আছে। এদের প্রায় সবাই বেশ বুড়ো। কোন কোন তারা ১৫ হাজার মিলিয়ন বছর পুরাতন। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে এদের অবস্থান। আমাদের গ্যালাক্সি ছাড়াও অন্যান্য গ্যালাক্সিতে তারা ক্লাস্টার দেখতে পাওয়া যায়।

নেব্যুলা

মহাকাশে কিছু তারা ও আন্তঃগ্যালাক্টিক গুড়া পদার্থ (ডাস্ট) দেখতে পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় এসব এলাকায় নতুন তারা ও সৌরজগতের জন্ম হচ্ছে। এগুলোকে নেব্যুলা বলে। এসব নেব্যুলার মধ্যে প্রখ্যাত ক'টি হলো, হর্স-হেড নেব্যুলা (অশ্ব-মাথা নেব্যুলা), ক্যাটস-আই নেব্যুলা (বিড়াল-চোখা নেব্যুলা), অরায়ন নেব্যুলা ও ক্রাব নেব্যুলা (কাঁকড়া নেব্যুলা)।
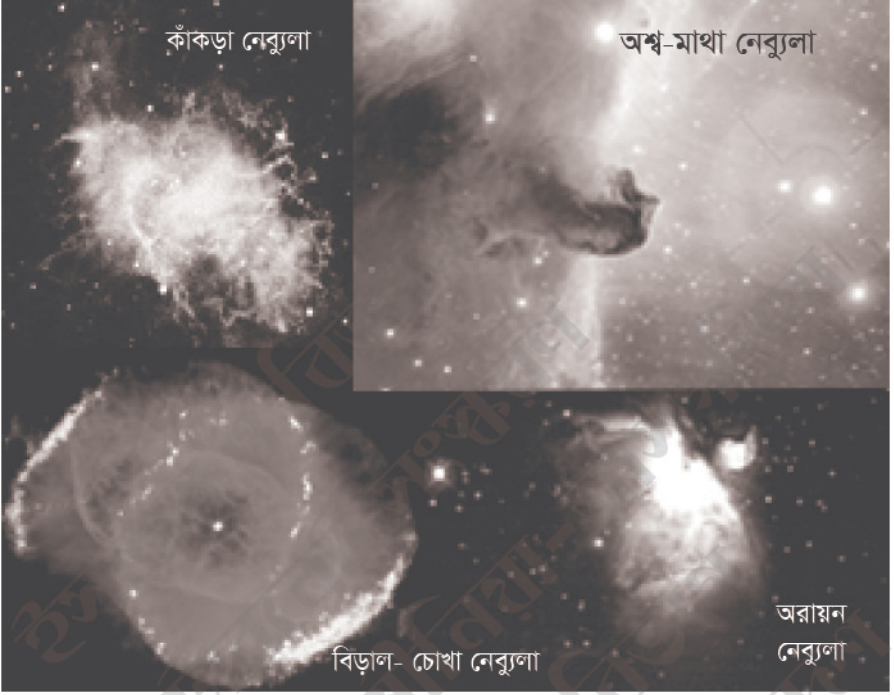
কাল্পনিক মহাকাশ যানে বিশ্বজুড়ে আমাদের এই ভ্রমণ-কাহিনী এখানেই শেষ হতে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আশাকরি পাঠকদের জ্ঞানের পরিধি সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ আজ সত্যিই বিশ্বজগৎ ঘুরে বেড়াবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তবে এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা পূর্ণতা অর্জন থেকে বহুদূরে অবস্থান করছি। বাস্তবে জ্ঞানের সূর্য শুধুমাত্র পূর্বাকাশে উদয় হয়েছে। মানুষ যেদিন মহাবিশ্বের সর্বত্র ঘুরে জ্ঞান আহরণ করবে, সৃষ্টির রহস্যকে অবলোকন করবে, সেদিনই পূর্ণতার নিকটে পৌঁছবে। সার্থক হবে স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্য।
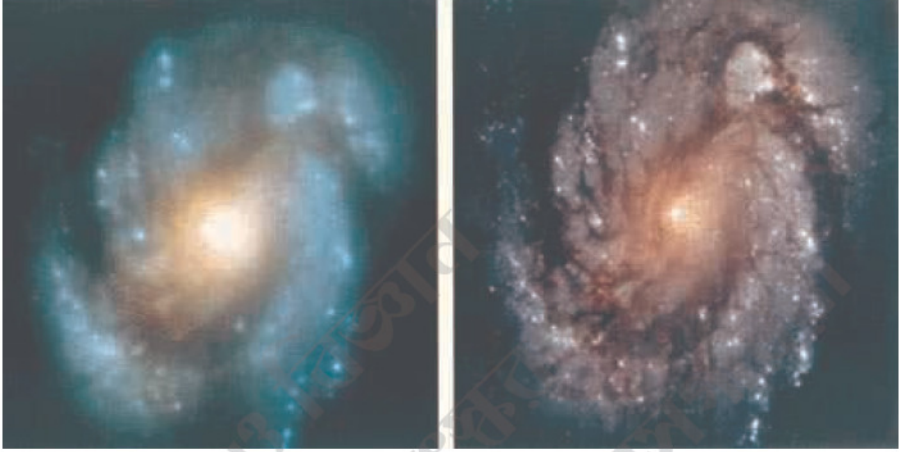
হাব্‌ল মহাকাশ টেলিস্কোপঃ মহাকাশে স্থাপিত হয়েছে এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল টেলিস্কোপ 'হাব্‌ল'। দীর্ঘদিন যাবৎ এই টেলিস্কোপ পৃথিবীতে অসংখ্য ছবি প্রেরণ করে আসছে। একবার এটি মেরামতের প্রয়োজন দাঁড়ায়। উপরের বায়ের ছবি মেরামতের পূর্বের এবং ডানেরটি পরের। কয়েক লক্ষ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত একটি সুদৃশ্য গ্যালাক্সির ছবি এটি।

"আমিই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি শক্তিসহ এবং আমিই এটিকে ধীরে ধীরে বর্ধিত করছি" [কুরআন: ৫১ ঃ ৪৭]।

পরিচ্ছেদ ৫

বিশ্বের গঠনপ্রণালী, আয়তন ও জন্মবৃত্তান্ত

আজ থেকে ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে এ মহাবিশ্বের জন্ম হয় একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। এ থিওরীটি বিশেষ কিছু তথ্যনির্ভর কারণে বর্তমানে বিজ্ঞানমহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। প্রথমতঃ এটা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে সমগ্র মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত চতুর্দিকে আয়তনে বৃদ্ধি হচ্ছে। আর দ্বিতীয়তঃ বিশ্বের সর্বত্র একটা সমমাপের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ (কজমিক মাইক্রোওয়েভ বেকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন) আবিষ্কার করা হয়েছে, যা বিজ্ঞানীদের মতে ঐ প্রথম মহাবিস্ফোরণেরই একটা প্রতিধ্বনি মাত্র।

প্রতিষ্ঠিত পদার্থ বিজ্ঞানের তথ্য ও আইন-কানুন ব্যবহারের মাধ্যমে মহাবিস্ফোরণের ক্ষণকাল পর পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। সৃষ্টির ১০ লক্ষ বছর পরে জগতটা মূলতঃ উদ্যমে পূর্ণ অণু-পরমাণুর তৈরী একটি বল আকারের অগ্নিকাণ্ড ছিলো, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় "প্লাজমা" বলা হয়। এ সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্বের তাপমাত্রা কোটি কোটি ডিগ্রী থেকে ৩,০০০ ডিগ্রী কেলভিনে নেমে আসে। এর ফলে প্রটোন ও ইলেকট্রন কণা মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এ সময়ে জগতের বিকিরণ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। বস্তুর ঘণত্ব তখন বিকিরণ থেকে বেশী হয়, যা ইতোমধ্যে এর উল্টো অবস্থায় ছিলো। এতে বিশ্বের বিস্তৃতি নিয়মমতো হতে থাকে। বর্তমানে যে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ দেখা যায় তা হলো ঐ প্রাথমিক অবস্থার একটি ঠাণ্ডা অবস্থা, অর্থাৎ ঐ বিকিরণ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, যার মাত্রা এখন ৩ ডিগ্রী কেলভিন।

প্রথম গ্যালাক্সিগুলো একশত থেকে দুইশত কোটি বছর পরে সৃষ্টি হওয়া শুরু করে, এবং মহাবিস্ফোরণের গতিতে চতুর্দিকে ছিটকে পড়ে। এ "ছিটকে পড়া" অবস্থাটি এখনও অব্যাহত আছে, তবে এর গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা সুদূর ভবিষ্যতে একদা এ গতি সম্পূর্ণরূপে শূন্যের কোটায় পৌঁছে যাবে এবং মহাকর্ষের ফলে বিশ্বটা উল্টো গতিতে (ভেতরের দিকে) ছুটে চলবে। এর ফলে মহাবিশ্ব দিন দিন আয়তনে ছোট হতে থাকবে ও একদা আরো একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে শূন্যতে পরিণত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাব্‌ল ডীপ স্পেইস: উপরের ছবিটি মহাকাশে স্থাপিত স্পেইস টেলিস্কোপ 'হাব্‌ল' ধারণ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার জায়গার প্রতি টেলিস্কোপের ফোকাস দীর্ঘ সময় স্থির রেখে এই ছবি তোলা হয়। এতে পরিষ্কার

দেখাচ্ছে, দূরবর্তী অসংখ্য তারাসিস্টেম বা গ্যালাক্সি। এই ছবি প্রমাণ করে মহাবিশ্বের বিরাটত্ব সত্যিই অত্যাশ্চর্য।

জগতজুড়ে কোটি কোটি তারাজগৎ বা গ্যালাক্সি আছে। তবে গ্যালাক্সিগুলো সাধারণতঃ গুচ্ছবদ্ধভাবে অবস্থান করছে, অর্থাৎ একাধিক গ্যালাক্সি তাদের সম্মিলিত মহাকর্ষের আওতায় থেকে ঘূর্ণমান হয়ে চলছে। বহু গুচ্ছবদ্ধ গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে, তবে এ প্রসঙ্গে তিনটি কাছাকাছিতে অবস্থিত গুচ্ছ বা গ্রুপের কথা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

কজমোলজি

যে বিজ্ঞানের শাখা বিশ্বের সার্বিক গঠনপ্রণালী ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে তাকে বলে কজমোলজি। যেমন: কিভাবে তারা ও গ্যালাক্সিগুলো মহাকাশে গুচ্ছবদ্ধভাবে অবস্থান করছে, তারাগুলোর জন্ম-মৃত্যুর রহস্য কি, জগতের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাস ও শেষ পরিণতিই বা কি- এসব মৌলিক প্রশ্নের সমাধানকল্পে যে বিজ্ঞান গবেষণা চালাচ্ছে সেটাই হলো কজমোলজি। বাস্তবে কজমোলজি শব্দটি কজমোজ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো- মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্র-তারা-গ্যালাক্সি ইত্যাদি। তবে কজমোলজি যদিও মূলত বিশ্বের বড় আয়তনের বস্তু নিয়ে গবেষণা করে তথাপি এর সঙ্গে পার্টিকেল ফিজিক্স বা পরমাণু বিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে। কজমোলজিষ্টরা বিভিন্ন থিওরী প্রস্তুত করতে পরমাণু বিজ্ঞানের তথ্য অহরহ ব্যবহার করেন।

কজমোলজিষ্টরা যে বিষয়টি নিয়ে সর্বদাই চিন্তিত থাকেন তা হলো গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ। সমগ্র জগতব্যাপী বিরাট বিরাট দূরত্বেও এই ফোর্সটি ক্রিয়াশীল আছে। বলতে গেলে এই ফোর্সই জগতকে অস্তিত্বশীল রেখেছে। সুতরাং কজমোলজি হচ্ছে এই মহাকর্ষ ও বস্তু এবং এনার্জির উপর এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা। গত শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দেখিয়েছেন বস্তু ও এনার্জি বাস্তবে একই জিনিষের দুটি রূপ। তিনি তাঁর প্রখ্যাত সমীকরণ [$E=mc^2$] দ্বারা বস্তু থেকে এনার্জি ও এনার্জি থেকে বস্তুতে পরিণত করার পথ উন্মুক্ত করেছেন। যেমন তারাগুলো হচ্ছে,

বাস্তবে একেকটি উচ্চ তাপমাত্রাসম্পন্ন আনবিক চুল্লী যেখানে বস্তু (অণু-পরমাণু) বদলে এনার্জি (উদ্যম) হচ্ছে। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ বিষয়ক থিওরী (জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটি- ১৯১৭ সালে প্রকাশিত) থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, মহাকর্ষ মূলতঃ চতুর্থ বিস্তৃতিসম্বলিত স্থান-কাল ধারাবাহিকতায় ঘোমরা হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বস্তু এই ঘোমরা বা বাঁকাকরণের জন্য দায়ী।

কজমোলজিক্যাল থিওরী

বর্তমানে বিজ্ঞানমহলে জগতসৃষ্টির একটি থিওরী সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এই থিওরীটি হলো, বিগ বেং থিওরী- বাংলায় বলা যায় মহাবিস্ফোরণ থিওরী। ইতোমধ্যে এ নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছি। এই থিওরী সবার কাছে আস্থাবান হওয়ার পেছনে ক'টি কারণ আছে।

১৯৩৮ সালে হেন্‌স বেধ নামক এক পদার্থবিদ বুঝিয়ে দেন, কিভাবে নিউক্লিয়ার ফিউশন (আনবিক ফিউশন রিয়েকশন সম্পর্কে ইতোমধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে) তারাগুলোকে জ্বলন্ত রাখছে। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে পদার্থ তারার ভেতরের অগ্নিকাণ্ডে পাক করা হয় এবং কিসব কারণে তারাদের মধ্যে বিভিন্ন রং ধরে- তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। এছাড়া ইতোমধ্যে এটা জানা হয়ে গিয়েছিল যে, বিশ্বের সকল তারা সৃষ্টির সাথে সাথেই আত্মপ্রকাশ করে নি। বাস্তবে তারার জন্ম ও মৃত্যু ঘটছে এবং নতুন তারা জন্মও নিচ্ছে। পদার্থবিদ জর্জ গামো চল্লিশের দশকে বলেন, কোন এক সময় এই সমগ্র মহাবিশ্ব হয়তো এমন উত্তপ্ত ছিলো যে, এর মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে নতুন ইলেমেন্ট বা মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছিলো। তিনি আরও বলেন, প্রথামিক অবস্থায় নিশ্চয়ই এই মহাবিশ্ব একটি বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারণা থেকে তিনি সেই বিস্ফোরণের কোন সাক্ষর বা রেডিয়েশন এখনও থাকার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানমহলে তাঁর এসব ধারণা অতি অল্পই প্রভাব ফেলে। অনেকে এটাকে বিগ বেং 'অপপ্রলাপ' বলে আখ্যায়িত করেন।

গামোর ধারণা প্রকাশের দুই দশকের মধ্যেই কিন্তু সবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ১৯৬৫ সালে উইলসন ও পেনজিয়াজ নামক দুই যুবক বিজ্ঞানী একটি রেডিও এরিয়েলে কাজ করছিলেন। এটা সর্বপ্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইটে ব্যবহার করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। পরীক্ষা-নীরিক্ষার সময় বিজ্ঞানীদ্বয় হঠাৎ এই এরিয়েলের মাধ্যমে একটি ইতোমধ্যে অজানা ফিঁসফিঁস রেডিও সিগন্যাল আবিষ্কার করেন। এটা সবদিক থেকে আসছিলো। এই সিগন্যালই শেষ পর্যন্ত গামোর ধারণাকৃত সেই বিগ বেং বা মাহবিস্ফোরণের সিগন্যাল বলেই সনাক্ত করা হয়। এর পর থেকেই বিগ বেং থিওরী নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগে। এখন এই থিওরিটিই হচ্ছে আধুনিক কজমোলজির ভিত্তি।

মহাবিস্ফোরণ থিওরী

মহাবিস্ফোরণ বা বিগ বেং থিওরী মূলতঃ অতি সহজ একটি বিশ্বতত্ত্ব। বিংশ শতকের শুরু থেকেই এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য সবার জানা হয়ে যায়। বিশেষকরে জগতের বিভিন্ন দূর-দূরান্তের বস্তু থেকে আগত লাইট সিগন্যাল ছাড়াও এক্স-রে সিগন্যালের মাধ্যমে অনেক অদ্ভুত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কথা বিজ্ঞানীরা জানতে থাকেন। তারা আবিষ্কার করেন পাল্‌সার (যে তারা থেকে খুব দ্রুত স্পন্দন বা পাল্‌স আসতে থাকে), নিউট্রন তারা (সমগ্র তারটি একেকটি নিউট্রন দ্বারা সৃষ্ট), সুপারনোভা (যে তারা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়), কোয়াইজার (কোয়াইজি ষ্টেলার রেডিও অবজেক্ট- অচিন্তনীয় এনার্জিসম্পন্ন দূরতম তারা) ইত্যাদি।

এসব বস্তু নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের এই ধারণা জন্মিল যে, বাস্তবে হয়তো কোন অজানা শক্তির কারণে এই মহাবিশ্ব যিরো থেকে হঠাৎ এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে নতুনভাবে অনুসন্ধান শুরু হলো এবং শেষ পর্যন্ত বিগ বেং থিওরী-কে পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। পাঠকদের জানিয়ে রাখা জরুরী যে, নিম্নে বর্ণিত অত্যাধুনিক এই থিওরিটি আমার মতে ফাইনেল নয়। অর্থাৎ অভিষ্যতে এই থিওরী হয়তো বদলে যেতেও পারে। সুতরাং বিজ্ঞানের সবকথার মতো এটাকেও মহাসত্য হিসেবে বিশ্বাস করার কোন উপায় নেই।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী একমত যে এই মহাবিশ্ব ১২ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর পূর্বে একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিস্ফোরণকে বৃটিশ বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল পঞ্চাশের দশকে বিগ বেং নামকরণ করেছিলেন। সেই থেকে এই ঘটনাকে বিগ বেং থিওরী বলে আখ্যায়িত করা হয়ে আসছে। তবে উল্লেখ্য যে, হয়েল বাস্তবে এই থিওরীতে বিশ্বাসী ছিলেন না- তিনি এই কথাটি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন। হয়েলের নিজস্ব একটি থিওরী ছিলো যা শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানমহলে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কথাটি শেষ পর্যন্ত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ থিওরিতে রূপান্তরিত হলো। কি আশ্চর্য!

বাস্তবে মহাবিস্ফোরণ কোন বিস্ফোরণ ছিলো না- আসলে স্বয়ং স্থান-কালই এসময় জন্ম নেয়। বিস্ফোরণের অতি নিকট-ক্ষণকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা গণিতের মাধ্যমে গবেষণা করতে সক্ষম কিন্তু ঠিক যিরো সময়ে কি হয়েছিল সেটা জানতে অপারগ। সময় = যিরো হলেই সমীকরণ ফেল করে বসে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব কেন বিস্ফোরিত হয়ে জন্ম নিয়েছে সে প্রশ্নের জবাব কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কোন মহাশক্তি এর পেছনে কাজ করেছে তা অবশ্য ঈমানদারদের জানা আছে। যা হউক, এবার আধুনিক বিজ্ঞান এই বিস্ফোরণের ক্ষণকাল পর থেকে আজ পর্যন্ত মহাবিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে কি বলে তা তলিয়ে দেখা যাক।

বিস্ফোরণের $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড (এখানে এই সংখ্যাটি এক সেকেন্ডের কোটি কোটি অংশের এক অংশ বুঝাচ্ছে!) পরই স্থান সবদিকে বিস্তৃত হওয়া শুরু করে। এই সময়ের ভেতর বস্তু বা মেটার বলতে যা বুঝায় তা মূলত নিষ্কলুষ এনার্জি বা উদ্যম ছিলো। এই অবস্থা $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড থেকে $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। এসময়ও স্বভাবের মৌলিক যে চারটি আইন আছে তার আলাদা অস্তিত্ব ছিলো না। এ সময়কে গ্রাণ্ড ইউনিফিকেশন ইপোক (বাংলায় তরজমা করা যায়: মৌলিক শক্তির পুর্ণাঙ্গ একত্রিত কাল।) বলা হয়। অর্থাৎ চারটি ফোর্স মিলে একটি ফোর্স ছিলো। বস্তু ও এনার্জি একত্রে সমভাবে বিরাজ করছিলো। এসময় তাপমাত্রা ছিলো $১০^{২৭}$ কেলভিন (১০ এর পরে ২৭টি শূন্য লিখলে যে বিরাট সংখ্যা হয়)। এই তাপমাত্রা থাকার সময় বিশ্বটির মধ্যে পরিবর্তন আসে। চার ফোর্সের মধ্যে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স (শক্তিশালী আনবিক শক্তি) আত্মপ্রকাশ করে আলাদা হয়ে যায়। এই ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বিরাট অংকের এনার্জি বিরিকণ হয়। এর পরমুহূর্তে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাকে

বিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছেন, ইনফ্লেশন বা স্ফীতিকরণ অবস্থা। এই স্ফীতিকরণের মাধ্যমে খুব দ্রুতগতিতে সমগ্র বিশ্বটি বিস্তারলাভ করে। মাত্র $১০^{-৩৩}$ সেকেন্ডের মধ্যে জগতটা $১০^{৫০}$ (১০ এর পরে ৫০টি শূন্য যোগ দিলে যে বিরাট নাম্বার হয়) গুণ বিস্তৃত হয়। ইনফ্লেশন পিরিওড পরে সবকিছু অনেকটা শান্তময় হয়ে ওঠে। তবে বিস্তৃত হওয়া বন্ধ হয়নি- এখনও তা হচ্ছে।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি মুহূর্ত?

স্থান বাড়ার সাথে সাথে বিশ্বের তাপমাত্রাও কমতে থাকে। বিস্ফোরণের মাত্র এক সেকেন্ড পরই মৌলিক পরমাণূ- প্রটোন, কুয়ার্ক, নিউট্রন, ইলেকট্রন ইত্যাদি

আলাদাভাবে অস্তিত্বলাভ করে। জন্মের এক বিলিয়ন বছর পরে আজকের আয়তনের এক-পঞ্চমাংশ আয়তনবিশিষ্ট ছিলো এই মহাবিশ্ব।

ইনফ্লেশন কাল পরে আসে পার্টিকেল সৃষ্টির কাল। বিজ্ঞানীরা এ সময়কার ১২টি মৌলিক পরমাণুর কথা বলেছেন। এগুলো কুয়ার্ক ও লেপটন জাতীয় বস্তু। কুয়ার্ক হচ্ছে পরমাণু প্রটোন ও নিউট্রন তৈরীর মৌলিক মাল-মসলা। অপরদিকে লেপটন দ্বারা সৃষ্টি হয় ইলেকট্রন। লেপটন থেকে নিউট্রিনো নামক আরেক পার্টিকেল সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন। এই নিউট্রিনো জগতের সর্বত্র বিদ্যমান আছে। বর্তমানে এগুলোকে জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

জগতসৃষ্টির $১০^{-১২}$ সেকেন্ড অতিবাহিত হওয়ার পর ইলেকট্রমেগন্যাটিক (বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয়) ফোর্স ও দুর্বল আনবিক ফোর্স আলাদা হয়ে যায়। এর ফলে বর্তমানে জানা চারটি ফোর্স আলাদাভাবে বিরাজ করতে থাকে। দুর্বল শক্তিটি যা রেডিওএকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়ার জন্য দায়ী এবং তা অত্যন্ত অল্প দূরত্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল। অপরদিকে বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি থেকেই সৃষ্টি হয় বিদ্যুত, চুম্বকের ক্রিয়া, আলো, রেডিও সিগন্যাল, এক্স-রে ইত্যাদি। উল্লেখ্য তখনও এটম সৃষ্টি হয়নি।

চার মৌলিক শক্তি সৃষ্টি
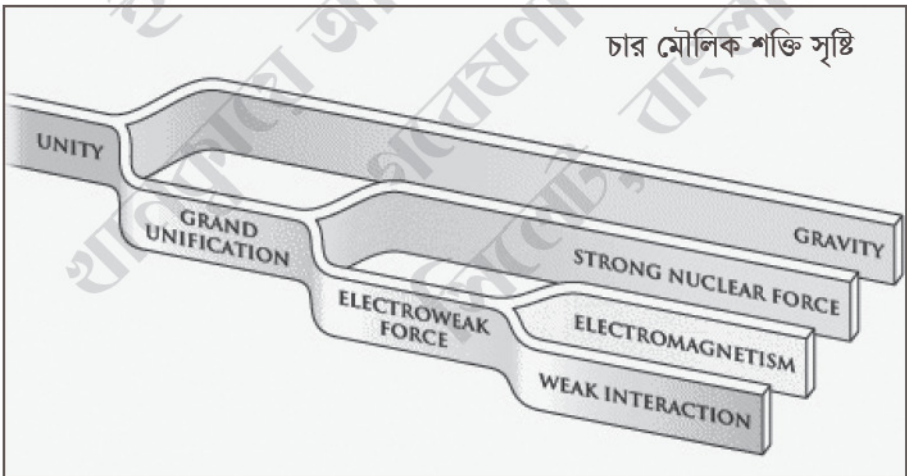
এটম ও তার নিউক্লিয়াস (কেন্দ্র) সৃষ্টি হয় জগতসৃষ্টির ১ সেকেন্ড পর থেকে। তবে প্রথমতঃ শুধুমাত্র ডিউটেরিয়াম (ভারী হাইড্রোজেন), হিলিয়াম এবং লিথিয়াম সৃষ্টি হয়। এই সময়কে বলে নিউক্লিওসিনথেসিস বা নিউক্লিয়াস-সংশ্লেশন কাল। দীর্ঘ ১০০ সেকেন্ড পর্যন্ত এ কালটি স্থায়ী ছিলো। উল্লেখ্য সাধারণ হাইড্রোজেনে নিউক্লিয়াস সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো না- কারণ, এটা আগে থেকেই সৃষ্ট ছিলো!

১০০ সেকেন্ড পরে তাপমাত্রা এ পরিমাণে নেমে আসে যে, নিউক্লিয়াসে প্রটোন ও নিউট্রন একত্রে অবস্থান করতে থাকে। ফটোন নামক পার্টিকেল এদের ছিটিয়ে ফেলতে শেষ পর্যন্ত অক্ষম হয়। এর ফলে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন এটম স্থিতিশীল হয়।

প্রটোন ও নিউট্রন এটম, ৩ লক্ষ বছর পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। বাস্তবে এ সময় পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বটা একত্রে একটি নিউক্লিয়ার পরমাণুর সুপ ছিলো। কিন্তু ৩ লক্ষ বছর পরে তাপমাত্রা ৩,০০০ কেলভিনে নেমে আসে। এই সুযোগে ফটোন নামক পার্টিকেল ফ্রি হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই ফটোন থেকেই সৃষ্টি হয় কজমিক বেকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন- যে বিকিরণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। দুই যুবক বিজ্ঞানী ১৯৬৫ সালে এই রেডিয়েশনই আবিষ্কার করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ৩,০০০ ডিগ্রী থেকে এই রেডিয়েশন মাত্র ২.৭৩ কেলভিনে (মাইনাস ২৭০.৪৩ সেলসিয়াসে) নেমে আসে। তবে কজমোলজিস্টরা এই রেডিয়েশনকেই বিগ বেং বা মহাবিস্ফোরণের স্বাক্ষর হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

এই কাল থেকেই তারা ও গ্যালাক্সি সৃষ্টির সূচনা হয়। এটমগুলোর মধ্যে মহাকর্ষের ফলে সৃষ্টি হয় একত্রে জড়িত অসংখ্য গ্যাস ক্লাউড (মেঘখণ্ড)। একদিকে যেহেতু বিশ্বটা দ্রুত বর্ধিত হচ্ছিলো তাই বস্তুর ঘনত্বও পাতলা থেকে পাতলা হতে থাকে। এর ফলে উক্ত ক্লাউডগুলো পাতলা বস্তুকে নিজের দিকে শক্তভাবে আকর্ষণ করতে থাকে এবং প্রতিটি ক্লাউড বড় থেকে বড়-ও হতে থাকে। এরপর এই ক্লাউড তার নিজের মহাকর্ষের ফলে কলাপ্স হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ও গ্যালাক্সি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সৃষ্টির এক বিলিয়ন (১০০ কোটি বছর) পরে প্রাথমিক তারা ও গ্যালাক্সিগুলোর জন্ম হয়।

আধুনিককালে সেই প্রাথমিক গ্যালাক্সিগুলো দেখার এক অভিনব টেকনিক আবিষ্কৃত হয়েছে। জগত সৃষ্টির ১২ কিংবা ২০ বিলিয়ন বছর পর সেই বেবী গ্যালাক্সিগুলো এখনও দেখা যায় কিভাবে? এটাতো বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়- কারণ, সেই গ্যালাক্সিগুলো তো এখন আর নেই! এগুলো দেখার প্রশ্নই তো অবাস্তব! মোটেই নয়। একটু পরই এ সম্ভাবনার কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সেকালের গ্যালাক্সি দেখার সম্ভাবনার পেছনে যে জিনিসটি কাজ করে সেটা হচ্ছে আলো। কোন বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পতিত হলেই আমরা সে বস্তুটি দেখতে পাই। তাহলে একবছর পূর্বে যদি কোন বস্তু থেকে আলো আসা শুরু করে, আর এই আলো তথা 'আলোর মধ্যে ধারণকৃত বস্তুটির ছবি' আমরা এখন দেখি, তাহলে বাস্তবে এক বছর পূর্বের সেই বস্তুটি যেভাবে ছিলো ঠিক সেভাবেই এটাকে আমরা দেখছি। একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে সূর্য। সূর্য আমরা আকাশের যে স্থানে দেখি আসলে তা সে স্থানে নয়। সূর্য থেকে আলো আসতে ৮ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের পরই যখন আমরা সূর্যকে দেখি তখন কিন্তু সূর্যটি কিছুটা ঊর্ধ্বকাশে পৌছে গেছে। অর্থাৎ আসল অবস্থান সর্বদাই অপর জায়গায়- এই সঠিক জায়গায় সূর্যকে দেখার কোন উপায় নেই। আট মিনিট আগে যেখানে ছিলো সেখানে তাকে আমরা দেখি। ঠিক এভাবে একটি তারা যদি ১০ আলেক বৎসর (আলো আসতে দশ বছর সময় লাগে) দূরে অবস্থান করে, তখন আজ এটাকে যখন আমরা দেখলাম- এর অর্থ দাঁড়ায়, বাস্তবে দশ বছর আগে এটা এই স্থানে ছিলো, সেই ছবি আমাদের চোখে এসে পৌঁছেছে। এই জগতে কোন কোন বস্তু আছে যাদের আলো কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীপানে আসা শুরু করে। এখন এসে পৌছে কোটি কোটি বছর পূর্বের সেই বস্তুটির ছবি আমাদের চোখে কিংবা টেলিস্কোপে ধরা দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে সেই অতীতের বস্তুটিকেই আমরা আজ দেখছি। বস্তু 'এখন' সেখানে তো নেই-ই বরং তার অস্তিত্ব বর্তমান আছে কি-না সেটাও আমাদের জানা নেই!

বস্তু থেকে শুধুমাত্র আলো বিকিরণ হয় না। এসাথে থাকে ইনফ্রারেড, এক্স-রে, গামা-রে ইত্যাদি রেডিয়েশন। এগুলোও আলোকের গতিতে চলে। সুতরাং সঠিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এসব রেডিয়েশন থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সুদূর অতীতের বস্তুগুলো সম্পর্কে অনেককিছু জানা সম্ভব।

কিছুদিন পূর্বে মহাকাশে প্রেরিত হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ দ্বারা আজ থেকে ১২ বিলিয়ন বছর পূর্বের অনেক গ্যালাক্সির বেশ কিছু ছবি ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্যালাক্সিগুলোর এসব ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা জগতসৃষ্টির কিছুকালের পরের প্রাথমিক অবস্থায় গ্যালাক্সির স্বরূপ নিয়ে গবেষণা চালাতে পারছেন। কুয়াইজার নামক একটি বস্তু আবিষ্কার করা হয়েছে যার দূরত্ব বিলিয়ন বিলিয়ন আলোক বৎসর। অনেকের ধারণা এসব বস্তু বাস্তবে অল্পবয়সী জগতের প্রাথমিক গ্যালাক্সি।

জগতের মৃত্যু

আমরা জানি জগতের ধ্বংস হবে আল্লাহর নির্দেশে। যে কোন মহূর্তে এই নির্দেশ আসতে পারে। মূলতঃ শিঙ্গায় ফুঁৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক যদি প্রাকৃতিক চারটি ফোর্স তুলে নেন তবে সব বস্তু তুলার মতো উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মাত্র কয়েক মুহূর্তে। তবে বিজ্ঞানীরাও এ মহাবিশ্বের একদিন যে মৃত্যু বা ধ্বংস হবে তা মেনে নিয়েছেন। তাদের সৃষ্ট সেই বিগ বেং থিওরীই এই মহামৃত্যুর কথা বলেছে। সুতরাং এবার দেখা যাক এ মহাবিশ্ব কিভাবে ধ্বংস হবে সে ব্যাপারে বিজ্ঞান কি বলে।

মহাবিশ্ব ধ্বংসের মুহূর্ত?

বিগ বেং থিওরীর মতে এ মহাবিশ্ব কোন একদিন চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়া থেকে বিরত হয়ে যাবে। এরপর বিশ্বের কেন্দ্রের উপর ভিত্তি করে সবকিছু আবার সেই কেন্দ্রস্থলের দিকে ধাবিত হবে। অর্থাৎ তখন বিশ্বের গ্যালাক্সিগুলো উল্টোদিকে ছুটে সমগ্র বিশ্বকে ছোট থেকে ছোট করতে থাকবে। কালে মহাবিশ্ব একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে আবার শূন্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ সবকিছু আবার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে যেমনটি সৃষ্টির আগে ছিলো। এই ধ্বংস হওয়ার ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা 'বিগ ক্রান্চ' [মহাপ্রলয়] বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ জগত শুরু হয়েছে বিগ বেং এর মাধ্যমে এবং ধ্বংস হবে বিগ ক্রান্চের দ্বারা। ক্রান্চ হচ্ছে বিস্ফোরণের বিপরীত ক্রিয়া।

এভাবে বিশ্বটা ধ্বংস হওয়ার জন্য এ মহাবিশ্বের বস্তুর পরিমাণ পর্যাপ্ত হতে হবে। কারণ জগতের বিস্তৃতিকে থামানো ও একে আবার ভেরতের দিকে ধাবিত করার জন্য যে শক্তিটি ক্রিয়াশীল হবে তা হলো মহাকর্ষ। আর মহাকর্ষের শক্তির পরিমাণ বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বস্তু যতো বেশী হবে এই শক্তিও ততো প্রভাবশালী হবে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মহাকাশে যতোটি গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছেন তা এই ক্রিয়া সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ বর্তমানে জানা সকল বস্তুর সমন্বয়ে যে মহাকর্ষ আছে তা জগতকে থামিয়ে উল্টোদিকে ধাবিত করার জন্য অপর্যাপ্ত। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, বাস্তবে এ বিশ্বের এক বিরাট অংকের বস্তু আমরা এখনও সনাক্ত করতে পারি নি। তাদের ধারণা এই ডার্ক বা অদৃশ্য মেটার এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এগুলো আবিষ্কার হলেই এটা নিশ্চিত হবে যে, এই মহাবিশ্ব সত্যিই একদিন বিগ ক্রান্চের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে বিজ্ঞানের হিসেব মতে এই ঘটনাটি সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে। কেউ কেউ বলেছেন, জগতটি আসলে মধ্যম বয়সে পৌঁছেছে। আরও ১২ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর পরই তা ধ্বংস হবে। কিন্তু এ কথাটি কার্যকারণ নীতি বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল বস্তুজগতের নেচারেল আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বাস্তবে কোন অদৃশ্য শক্তি যদি এই মুহূর্তে মৌলিক চারশক্তির কোন একটিকে কিছুটা হেরফের করে বসে, তাহলে জগতটি ধ্বংস হয়ে যেতে খুব বেশী সময় অতিবাহিত হবে না। কারণ, সব মিলে যে একটি বিরাট ব্যালান্স সৃষ্টি হয়েছে তার উপর আঘাত হানা হবে।

সুতরাং এ মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে আরও ১২-২০ বিলিয়ন বছর পর, এ কথাটি বৈজ্ঞানিক আরেকটি ধারণা মাত্র। তাই ইতিহাসব্যাপী পরিবর্তনশীল 'মতবাদ' বা 'ধারণাভিত্তিক'

তথ্য হিসেবেই এ কথাটিকে গ্রহণ করা হবে আমাদের জন্য অনেকটা নিরাপদ। অর্থাৎ উক্ত মতবাদ চূড়ান্ত মহাসত্য নয়।

ডার্ক মেটার বা বস্তু বলতে যদি কিছু থাকে না, কিংবা জগতকে থামিয়ে মহাকর্ষ যদি এটাকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয় তবে অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে? বিজ্ঞান বলে হয়তো সেক্ষেত্রে এই মহাবিশ্ব অনন্তকালের জন্য বিস্তৃত হতে থাকবে। এছাড়া কেউ কেউ বলেন, হয়তো এক পর্যায়ে জগতের বিস্তৃতি থেমে যাবে কিন্তু ভেতরের দিকে পতিত হয়ে এর আয়তন আর কমে আসবে না। অর্থাৎ একই আয়তনবিশিষ্ট হয়ে তা চিরকাল থেকে যাবে।

আমার ধারণা এসব কথা মূলত ভিত্তিহীন। বিগ ক্রান্চের অবস্থা না হলেও জগতটি যে একদিন ধ্বংস হবে তা অবশ্য নিশ্চিত। এর কারণ হলো স্বভাবের আইন কানুন রদবদল হওয়া সম্ভব। সুতরাং মহাকর্ষ যদি বদলে যায় কিংবা অন্যান্য মৌলিক শক্তি যদি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে তবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনিবার্য হবে। এছাড়া দার্শনিক দিক থেকেও ভাবলে বলতেই হয়, যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যুও অনিবার্য। এটা এ মহাবিশ্বের একটি সচরাচর নিয়ম।

তারার মৃত্যু

সমগ্র জগতের মৃত্যু একদিন হবে- তা যতো সুদূর ভবিষ্যতে হউক কিংবা যে কোন মুহূর্তেই হোক। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক চূড়ান্ত কোন তথ্য এখনও জানা যায় নি। বিভিন্ন থিওরী বা ধারণা তো অবশ্যই আছে। মহাবিশ্বের জন্মমৃত্যুর রহস্য চূড়ান্তভাবে জানা না গেলেও তারাগুলোর যে জন্ম এবং মৃত্যুও আছে তা আজকের বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে জেনে নিতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবে একাধিক তারার মৃত্যুর মুহূর্ত আমরা দেখতে পেরেছি। আমাদের এই গ্যালাক্সিতেই গড়ে প্রতি দশ বছর পর পর একটি করে তারার মৃত্যু ঘটছে। তারা কোনটি কতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। এগুলো হলো আয়তন, ম্যাস (বস্তুর পরিমাণ বা ওজন), কোন কোন কেমিক্যাল দ্বারা তৈরী হয়েছে এবং তার তাপমাত্রা।
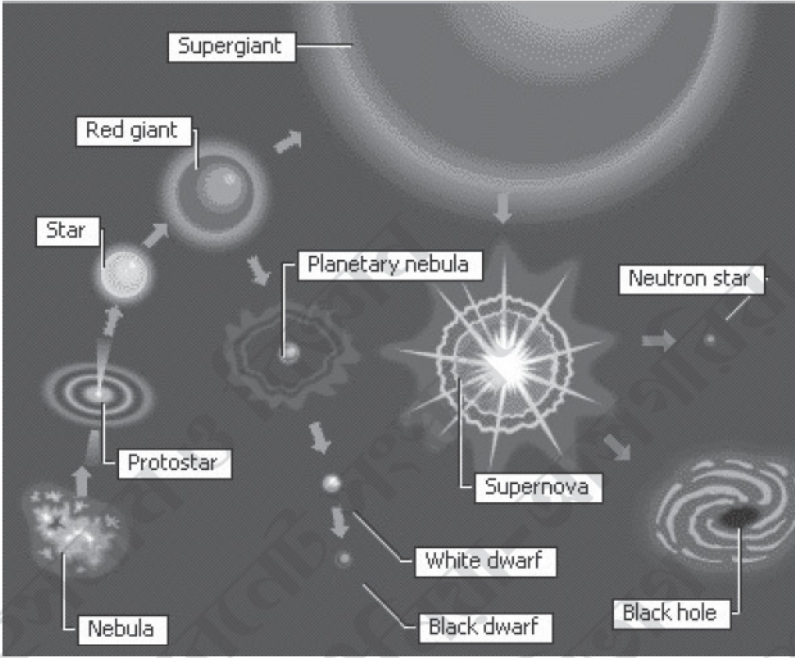
আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তারাজীবনঃ নেব্যুলায় জন্ম; তারাপূর্ব স্তর (প্রটোস্টার); তারা স্তর (স্টার); যদি যথেষ্ট ওজনসম্পন্ন হয়: সুপারবড়ো (সুপারজায়ান্ট) - সুপারবিস্ফোরণ (সুপারনোভা) - নিউট্রন তারা (নিউট্রন স্টার) কিংবা কৃষ্ণ গর্ত (ব্ল্যাক হোল); যথেষ্ট ওজনসম্পন্ন না হলেঃ গ্রহসদৃশ নেব্যুলা (প্লানেটারী নেব্যুলা) - সাদা বামন (হুয়াইট ডর্ফ) - কালো ডর্ফ (ব্ল্যাক ডোর্ফ)।

তারার মৃত্যুর একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে এর জ্বালানী সাপ্লাই। উনুনে লাকড়ী শেষ হয়ে গেলে যেভাবে আগুন নিভে যায় ঠিক তদ্রূপ কোন একদিন তারার ইন্ধন হাইড্রোজেন গ্যাস শেষ হবে। আর তখনই এই তারা নিভে যাবে। এই নিভে যাওয়ার নামই হচ্ছে তারার মৃত্যু। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, সব তারাই একদা নিভে যাবে সত্য কিন্তু কোন কোনটা নিভে যাওয়ার সময় এক প্রচণ্ড তাণ্ডব ঘটায়। পুরো তারাটি এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে চতুর্দিকে তার বস্তু ছড়িয়ে দেয়। এতে সমগ্র গ্যালাক্সিটা আলোকিত হয়ে ওঠে। তারা এভাবে বিস্ফোরিত হওয়াকে বলে সুপারনোভা। আমাদের গ্যালাক্সিতে একাধিক সুপারনোভা দেখা গেছে। এই

বিস্ফোরণের মাধ্যমে তারাটির ৯০% বস্তু চতুর্দিকের মহাকাশে ছিটকে পড়ে। বাকী থাকে একটি ছোট্ট আয়তনবিশিষ্ট তারা যার তাপমাত্রা কমতে কমতে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন আর এই কৃষ্ণপ্রায় বস্তুকে দেখা যায় না। এটা একটি মৃত তারায় রূপান্তরিত হয়।

এবার দেখা যাক আমাদের নিকটতম তারার মৃত্যু কবে কিভাবে হবে। আমাদের এ তারাটি অবশ্য সূর্য। বিজ্ঞানের মতে আজ থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন (পাঁচ হাজার মিলিয়ন বা পাঁচশ কোটি) বছর আগে সূর্যসহ এ সৌরজগতের জন্ম হয়। সূর্যটি হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল। সমগ্র সৌরজগতের ৯৯% ওজন বা বস্তু এই সূর্যের মধ্যেই নিহীত। মহাকর্ষের ফলে পৃথিবীসহ সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহগলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এ উজ্জ্বল জ্বলন্ত বিশাল বস্তুটি আসলে কি?

সূর্য হচ্ছে বিশ্ব জগতের আরোও অগণিত তারাদের মতো একটি হলুদ বর্ণের জ্বলন্ত তারকা। এতে সিংহভাগ হাইড্রোজেন পদার্থ আছে। মহাকর্ষের প্রচণ্ড চাপে ও উচ্চতাপে সূর্যের ভেতরে আনবিক স্কেলে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন বা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সূর্যের ভেতরের তাপমাত্রা ৬ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আনবিক এ রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন ক্ষয় হচ্ছে ইন্ধন হিসেবে। অর্থাৎ সূর্যকে জ্বলন্ত রাখতে যে পদার্থ ব্যবহার হচ্ছে তার মাত্রা দিন দিন কমে আসছে। অবশ্য এ প্রক্রিয়া সূর্যের জন্ম থেকেই সংঘটিত হচ্ছে।

সূদীর্ঘ ৫০০ কোটি বছর ধরে হাইড্রোজেন পুড়ে কিন্তু শেষ হয়নি। আনবিক চুল্লীতে অল্প বস্তুই অনেক এনার্জি বা উদ্যম সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের নিকটতম তারা এ সূর্যটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আনবিক রিকেশনের মাধ্যমে সূর্যটি জ্বলন্ত না থেকে যদি স্বাভাবিকভাবে পুড়তো, তবে মাত্র কয়েক হাজার বছর পরই হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ পাক অপূর্ব কৌশলে সূর্যকে আনবিক রিয়েকশনের মাধ্যমে জ্বলন্ত রেখে এর জীবন সুদীর্ঘ করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ ও অনুগ্রহের বিকাশ।

তবে সূর্যের ইন্ধন বা জ্বালানী হাইড্রোজেন যে চিরকাল স্থায়ী থাকবে না, তা আমাদেরকে আজ বিজ্ঞানই বলে দিচ্ছে। যদিও সূর্যটি সম্ভবত তার জীবনের অর্ধেক

সীমায় পৌঁছেছে মাত্র, তথাপি এটা যে একদা ধ্বংস হবে তা নিশ্চিত। বিজ্ঞান আমাদেরকে ধ্বংস হওয়ার তারিখ সুদূর ভবিষ্যতে বলে, কিছুটা সুস্থির করেছে! আজ থেকে আরো ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্যের ভেতর আনবিক রিয়েকশন শেষ হবে। তখন এটা চতুর্দিকে বেড়ে যেয়ে এমনকি পৃথিবীকে পর্যন্ত তার ভেতরে নিয়ে যাবে। কেউ যদি সেদিন বেঁচে থাকে, তখন সে দেখতে পাবে সূর্যটা সত্যিই তার মাথার উপর অবস্থান করছে। সূর্যের এই অবস্থাকে বলে রেড জায়ান্ট। অর্থাৎ সূর্যের মৃত্যুর পর তার আয়তন শতগুণ বেড়ে বিরাট লালবর্ণের একটি তারায় পরিণত হবে। মহাবিশ্বে এরূপ অনেক লাল তারার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গর্ত

মহাকাশে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গর্ত নামক একটি বস্তুর ব্যাপারে ইতোমধ্যে বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে এ বস্তুটি কি? এবার এই রহস্যময় বস্তুটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যাক।

ব্ল্যাক হোল বাস্তবে একটি সম্ভাব্য থিওরিটিক্যাল বস্তু। এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কোন ব্ল্যাক হোলের সন্ধান মেলেনি। তবে কেণ্ডিডেটের অভাব নেই। এ পর্যন্ত অনেক বস্তু মহাশূন্যে পাওয়া গেছে যেগুলো ব্ল্যাক হোল হওয়ার শক্তিশালী কেণ্ডিডেট হিসেবে অনেকেই মনে করেন। এবার প্রশ্ন জাগে এসব বস্তুর নামকরণ ব্ল্যাক হোল করার পেছনে রহস্যটা কি?

ব্ল্যাক হোল হলো মহাকাশের এমন একটি বস্তু যার নিজস্ব মহাকর্ষ এতো শক্তিশালী যে, কোন কিছুই এর উপর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না (এস্কেপ করতে পারে না) এমনকি আলোকরশ্মিও বেরিয়ে আসে না। সুতরাং এটাকে দেখার কোন উপায় নেই- তাই এই নামকরণ।

সূর্যের ওজন থেকে বেশী ওজনবিশিষ্ট কোন তারার মৃত্যু ঘটতে পারে কয়েকটি পদ্ধতিতে। এগুলো হলো, সাদা ডোয়ার্ফ (শ্বেত বামন তারা!), নিউট্রন তারা কিংবা ব্ল্যাক হোল। ব্ল্যাক হোল হওয়ার কারণ হলো, তারাটি তার নিজস্ব মহাকর্ষের কারণে

ভেতরের দিকে কলাপ্স হতে থাকে। যতো বেশী কলাপ্স হয় তার মহাকর্ষও ততো বেশী বাড়তে থাকে- সুতরাং কলাপ্স হওয়া আরও বাড়ে। এক পর্যায়ে এসে এর মহাকর্ষ এতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, এর উপর থেকে আলোকরশ্মি পর্যন্ত আর বেরিয়ে আসতে পারে না। তার মহাকর্ষ আলোক রশ্মিকে পর্যন্ত আটকে রেখে দেয়। শুধু আলো নয় এক্স-রে, গামা-রে ইত্যাদি সকল ইলেকট্রমেগন্যাটিন সিগন্যালকেও সে আটক করে ফেলে। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, ব্ল্যাক হোল হচ্ছে মাহাকাশের কবরস্থান। কারণ, এর কাছে কোন বস্তু পৌঁছে গেলে আর রক্ষা নেই- তার মহাকর্ষ তা ছিড়ে-টেনে-হেচঁড়ে নাস্তেনাবুদ করে ছাড়বে। আপনি যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ব্ল্যাক হোলের কাছে গিয়ে পড়েন তবে আপনাকে টেনে অন্তত শতফুট লম্বা করবে এবং তার দেহের উপর নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে নিশ্চহ্ন করে দেবে। এই হচ্ছে ব্ল্যাক হোল নামক শক্তিশালী বস্তুর স্বরূপ।

লাইট ইয়ার বা আলোক বৎসর

ইতোমধ্যে আমরা অনেকবার আলোক বৎসর (ইংরেজীতে লাইট ইয়ার) কথাটি ব্যবহার করেছি। আলোক বৎসর বলতে এক বৎসর সময়ের মধ্যে আলো যতটুকু দূরত্বে গিয়ে পৌঁছে এটুকু বুঝায়। এই মহাবিশ্বের বড়ত্ব কিংবা আয়তন এতো বেশি যে, আমাদের মাইল বা কিলোমিটারের হিসেবে এগুলো বুঝিয়ে বলা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ আমাদের নিকটতম তারা থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতেই প্রায় ৪.৩ বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং এর দূরত্ব মাইল দিয়ে বলা মূলতঃ অর্থহীন। বাস্তবে তা হলো ৫.৮৭ x ৪.৩ ট্রিলিয়ন (এক হাজার বিলিয়ন = ১ ট্রিলিয়ন) = ২৫.২৪১ ট্রিলিয়ন মাইল। এখন এক বিলিয়ন হচ্ছে ১০০ কোটি, এক হাজার বিলিয়ন হলো (অর্থাৎ এক ট্রিলিয়ন), ১০ হাজার কোটি। সুতরাং ২৫.২৪১ ট্রিলিয়ন অর্থ হলো ২৫২.২৪১ হাজার কোটি মাইল। এই বিরাট নাম্বারটি ধারণা করারও ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে যেহেতু আলো আসতে চার বছর ও এর কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হয় (অর্থাৎ ৪.৩ বছর) তাই নিকটতম তারা আলফা সেন্টরীর দূরত্ব ৪.৩ আলোক বৎসর বলা অনেকটা সহজবোধ্য নয়কি? আর এ-তো গেল নিকটতম তারার কথা। কোন কোন তারা ও গ্যালাক্সি আছে যাদের আলো এই পৃথিবীতে পৌঁছুতে ৯ থেকে ১২

বিলিয়ন বছর পর্যন্ত অবিতাহিত হয়। চিন্তা করে দেখুন, এই বিরাট দূরত্বকে মাইলের হিসেবে লিখবেনই বা কি করে- বুঝা তো পরের ব্যাপার।

এবার হিসেব করে দেখা যাক এক আলোক বৎসর বাস্তবে কত মাইলের দূরত্ব। এক ঘণ্টার মধ্যে আছে ৩,৬০০ সেকেন্ড। সুতরাং এক দিনে (২৪ ঘণ্টায়) আছে ২৪ x ৩,৬০০ = ৮৬,৪০০ সেকেন্ড । এক বছরে আছে ৩৬৫ x ৮৬,৪০০ = ৩,১৫,৩৬০০০ সেকেন্ড । আলোকের গতি হলো ১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড। সুতরাং এক আলোক বৎসর = ৩,১৫,৩৬,০০০ x ১,৮৬,০০০ = ৫৮,৬৫,৬৯৬,০০০,০০০ মাইল। এই বিরাট নাম্বারকে সংখ্যায় কিভাবে বলা হবে ভেবে দেখুন। বাস্তবে তা প্রায় ৫৯ লক্ষ কোটি মাইল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, বিজ্ঞানীরা মহাকাশের তারা, গ্যালাক্সি ও অন্যান্য কজমিক বস্তুর দূরত্ব মাপতে কেন আলোক বৎসরের ব্যবহার করেন।

"আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই বেহুদা সৃষ্টি করিনি;..." [সূরা হিজ্বর ঃ ৮৫]।

পরিচ্ছেদ ৬

আপেক্ষিকতাবাদ বা রিলেটিভিটি থিওরী

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে আমরা একাধিকবার ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। এই গুরুত্বপূর্ণ থিওরীটি আজ বিজ্ঞানমহলে সর্বজনস্বীকৃত একটি মতবাদ। সুতরাং এই থিওরীটি ভালো করে বুঝা আমাদের জরুরী। আগেই বলে রাখি, এই আলট্রা-মডার্ণ বিশ্বতত্ত্ব সবার জন্য সহজে বুঝা সম্ভব নয়। আমি বাংলা ভাষায় এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সহজ-সরলভাবে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। তথাপি কেউ যদি মনে করেন, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তবে আমি উপদেশ দেব, একাধিকবার পড়ে বুঝার চেষ্টা করুন। স্বভাবত এরূপ থিওরীর সঙ্গে উচ্চগণিত জড়িত থাকে। কিন্তু আমি গাণিতিক দিকটি যতদুর সম্ভব এড়িয়ে গেছি। থিওরীর আসল বিষয়বস্তু ও এর সম্ভাব্য ফলাফল ইত্যাদির ব্যাপারে জানাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য।

আপেক্ষিকতাবাদ- এর নামকরণ থেকেই বুঝা যায়, মূলতঃ তা রিলেটিভ বা আপেক্ষিক কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। জগতের সব ঘটনা বাস্তবে মৌলিক নয়- অর্থাৎ কোন ঘটনাই চূড়ান্ত সত্য নয়- সবকিছুই আপেক্ষিক। আমরা যা দেখি বা পর্যবেক্ষণ করি তা আমাদের অবস্থান, গতি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। একই ঘটনা একাধিক ব্যক্তি ভিন্ন অবস্থান, গতি ইত্যাদির কারণে ভিন্নভাবে দেখবে। এছাড়া গতি এবং সময় বলতে যা বুঝায় তা-ও মূলত আপেক্ষিক- কোন চূড়ান্ত বা এবস্যুলুট গতি কিংবা সময় বলতে কিছু নেই। অথচ আইজাক নিউটন [১৬৪২-১৭২৭] ধারণা করেছিলেন, সময়, গতি ইত্যাদির একটি এবস্যুলুট অস্তিত্ব আছে। এই থিওরী তাঁর বিশ্বতত্ত্বকে তাই পাল্টিয়ে দিয়েছে। সবকিছুর আপেক্ষিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করেই আইনস্টাইন তাঁর থিওরী সৃষ্টি করেন।

আইনস্টাইন [১৮৭৯-১৯৫৫] আমাদের বলেছেন, বাস্তবে আমরা সমতল ইউক্লিডিয়ান (বিজ্ঞানী ইউক্লিডের জ্যামিতি ভিত্তিক) স্থানে (স্পেইসে) বসবাস করি না। যদিও সাধারণভাবে আমরা ভাবি, স্থান সমতল, সময় ও গতি ইউনিফর্ম (সমরূপ)। অর্থাৎ প্রাত্যহিক অনুভূতিতে মনে হয় সবকিছু সমভাবে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আসলে আমরা যে বিশ্বে বাস করি তা হলো ঘোমরা স্থান-কাল বিশিষ্ট। অর্থাৎ স্থানও বক্র এবং কালও বক্র। এই বক্র বা বাঁকা হওয়ার মানে কি তা একটু পরই আমরা বুঝতে পারবো। আপেক্ষিকতাবাদ থেকে আধুনিক কজমোলজি, অণু-পরমাণু বিজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতি সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ এ থিওরীটি মর্ডার্ণ যুগের বিজ্ঞানকে বৈপ্লবিক করে তুলে।

রিলেটিভিটির আসলে দু'টি আলাদা অংশ আছে। প্রথমটি হলো বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (স্পেশ্যাল রিলেটিভিটি) ও দ্বিতীয়টি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (জেনারেল রিলেটিভিটি)। আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে প্রথমটি প্রকাশ করেন এবং দ্বিতীয়টি ১৯১৬ সালে। দুটির মধ্যে বিরাট পার্থক্যও আছে। স্পেশ্যাল রিলেটিভিটি অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অথচ জোনারেল রিলেটিভিটির ব্যাপকতা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। স্পেশ্যাল রিলেটিভিটি বিজ্ঞানমহলে খুব দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে কিন্তু সাধারণ রিলেটিভিটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। এর একটি কারণ ছিলো। থিওরীকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্যায়ন করা সহজ নয়। এছাড়া এই থিওরীর সঙ্গে অত্যন্ত কঠিন উচ্চগণিত জড়িত- যা অতি সহজে অনুধাবন করা যায় না। বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন যিনি এই থিওরীটি পুরোদমে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁকে একদা কেউ জিজ্ঞেস করলো, "এটা কি সত্যি, পৃথিবীর ৩ ব্যক্তি মাত্র এই থিওরী বুঝতে সক্ষম হয়েছেন?" তিনি জবাবে বলেছিলেন, "তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?"!

অপরদিকে যেহেতু স্পেশ্যাল রিলেটিভিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপার-স্যাপার তাই তখনকার বিজ্ঞানীরা এটাকে অতি দ্রুত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্যায়ন করতে সক্ষম হন। আর জেনারেল রিলেটিভিটি দীর্ঘ ৪০ বছর পার হবার পরই সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালের দিকে এডিংটনের সেই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে- কারণ এ বছর জেনারেল রিলেটিভিটির উপর এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সংঘটিত হয় এবং তাতে ৮০০ জন বিজ্ঞানী ও গবেষক অংশগ্রহণ করেন। যা হউক, এবার দেখা যাক এ থিওরী দুটি আসলে কি জিনিষ।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ

এই থিওরীর মৌলিক ধারণা জন্মেছে মূলতঃ দুটি অবস্থা থেকে: এক. একটি বিশেষ ফ্রেম বা অবস্থা ও দুই. আপেক্ষিকতার বাস্তবতা। অর্থাৎ আমরা মুক্তভাবে মটির দিকে পতিত (ফ্রি ফোল) একটি ল্যাবেরটরীর কথা বলতে পারি। এই অবস্থায় ভেতরের লোকটি জগতকে কিভাবে দেখবে- সে ব্যাপারে আমরা আপেক্ষিকতার আলোকে গবেষণা করবো। যেহেতু ল্যাবটি মুক্তভাবে পৃথিবীর মহাকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে তাই এর ভেতরের সককিছুই সরলপথে একই গতিতে নীচের দিকে পড়তে থাকবে। বাস্তবে এই ফ্রি ফোল আসলে মহাকর্ষ থেকে মুক্ত। কারণ মহাকর্ষের টান ও বস্তুর পড়ার গতি একই হওয়ায় শেষ রেজাল্ট দাঁড়ায় যিরো। অর্থাৎ মুক্তভাবে পড়ার গতি ও মহাকর্ষের গতি একটা আরেকটার সঙ্গে ক্যানসেল হয়ে যায়। এরূপ ফ্রি ফোলিং ল্যাবের আভ্যন্তরকে বলে গ্যালিলিয়ান সিস্টেম। আমাদেরকে স্পেশ্যাল রিলেটিভি বলছে, এরূপ একটি ল্যাবের ভেতর যেসব ফিজিক্যাল (বস্তু নিয়ে) পরীক্ষা-নীরিক্ষা হবে তার ফলাফল ল্যাবের গতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অন্যকথায়, ফিজিক্সের (পদার্থবিজ্ঞানের) যাবতীয় আইন-কানুন প্রত্যেক এরূপ গ্যালিলিয়ান সিস্টেমে একই ধরণের হবে। এছাড়া আলোকের গতিও ল্যাবের গতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অর্থাৎ যেহেতু আলোকের গতি মাপাও একটি ফিজিক্যাল পরীক্ষা। আলোকের এই গতি তার মূল উৎসের গতি কিংবা পর্যবেক্ষকের গতি থেকেও মুক্ত।

উপরোক্ত গ্যালিলিয়ান সিস্টেমকে গবেষণা করে আইনস্টাইন অংক কষে কিছু নতুন বাস্তবতা উন্মোচন করেছেন, যা ইতোমধ্যে কারো জানা ছিলো না। প্রাথমিকভাবে অনেকে অবাকও হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আমরাও হবো। এবার দেখা যাক বিশেষ আপেক্ষিকতা আমাদেরকে কিসব অত্যাশ্চর্য কথা বলে।

গ্যালিলিয়ান সিষ্টেম
মহাকর্ষে ফ্রিভাবে পড়ন্ত এই লিফটের সবকিছুই ওজনশূন্য- কারণ মহাকর্ষের গতি ও পড়ার গতি সমান হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মহাকর্ষ সমতাবাদ ও স্থান-কাল বাঁকাকরণ

মহাকর্ষ সমতাবাদ হচ্ছে এই : সব উল্লেখযোগ্য আয়তনের বস্তু (বডি) কোন মহাকর্ষের ফিল্ডে একই গতিতে পড়ে- বডিগুলোর ওজন (ম্যাস), গঠনের উপাদান কিংবা আকার যেটাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। এই মহাকর্ষের সমতা সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই জানা ছিলো। গ্যালিলিও তা পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন। আমরা যে ইতোমধ্যে গ্যালিলিয়ান সিস্টেম-এর কথা বলেছিলাম- অর্থাৎ ফ্রিভাবে পতিত ল্যাবের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, তা এই সমতার আইনেরই আওতাভুক্ত হওয়ায় ল্যাবের ভেতরের সবকিছু একই গতিতে পড়বে বলা হয়েছিল। এই ফ্রি পড়ার অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় মহাকর্ষের ক্রিয়া যেন মুক্ত হয়ে গেছে।

এখন মনে করুন মহাকর্ষমুক্ত কোন স্থানে (স্পেইসে) যদি কোন লিফট দ্রুত গতিতে চালানো হয় তবে লিফট ও এর ভেতরের সবকিছু একইভাবে সমগতিতে চলবে। যেমনটি আমাদের মহাকর্ষের মধ্যে পতিত ল্যাবের অবস্থা হয়েছিল। তাহলে বুঝা গেলো, মহাকর্ষের আকর্ষণে পতিত ল্যাব ও মহাকর্ষমুক্ত লিফট-এর অবস্থার (অর্থাৎ গতিশীলতার) স্বরূপ মূলত অভিন্ন।

এখন, এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা নতুন কিছু নয়। এসব ব্যাপার বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই জানতেন। কিন্তু আইনস্টাইনের দৃষ্টি ছিলো প্রখর। তিনি এই মহাকর্ষের প্রক্রিয়া বস্তুর উপর থেকে ফ্রি-ফোল বা ইনার্শা [মহাকর্ষমুক্ত স্পেইসে লিফটের গতি ইনার্শা (ধাক্কা দেয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট গতি) থেকে সৃষ্ট] গতির ফলে মুক্ত হওয়াকে তিনি শুধুমাত্র মেকানিক্যাল গতিশীলতার ক্ষেত্রেই সত্য বলেননি, বরং এটা পদার্থবিজ্ঞানেরই একটি মৌলিক আইন হিসেবে সনাক্ত করেন। আইনস্টাইনের দিব্যদৃষ্টিটি এখানেই। তিনি দেখিয়েছেন, এই আইন মৌলিক শক্তি যেমন ইলেকট্রোমেগন্যাটিজম এর ক্ষেত্রেও সত্য। সুতরাং স্থানীয় বা লকেল যে কোন গ্যালিলিয়ান সিস্টেমে ফিজিক্সের আইন মূলতঃ আপেক্ষিক অবস্থাকে মেনে চলে। এই ধারণাকে বলে আইনস্টাইন ইক্যুইভেলেন্স প্রিন্সিপাল (ইইপি)- বাংলায় বলা যায়, আইনস্টাইনের সমতা প্রতিপাদ্য। এই অবস্থার একটি ফলাফল হলো মহাকর্ষজণিত রেড শিফ্‌ট (আলোর রং লাল হওয়া)। অর্থাৎ শক্তিশালী মহাকর্ষের মাধ্যমে আলেকরশ্মি লাল রং ধারণ করে। এর অর্থ হলো, আলো যখন মহাকর্ষের ফিল্ড ডিঙ্গিয়ে উঠে তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করে- কিন্তু যখন মহাকর্ষের মধ্যে পতিত হয় তখন তার রং হয় নীল। এই প্রক্রিয়ার ফলে সবদিক থেকে সমান দুটি ঘড়ির চলার রেইট ভিন্ন হয় যদি এগুলো মহাকর্ষের ফিল্ড থেকে ভিন্ন দূরত্বে রাখা থাকে। অর্থাৎ মহাকর্ষ সময়ের উপরও ক্রিয়া করে। ফিল্ডের কাছে সময় চলে দ্রুত এবং দূরে চলে স্বাভাবিকভাবে। ইইপি'র দ্বিতীয় ফলাফল হচ্ছে স্থান-কাল ঘোমরা বা বাঁকা হওয়া। নীচের ছবিটির দিকে তাকালে এ ঘোমরা হওয়ার ব্যাপারটি বুঝতে সহজ হবে।

সুতরাং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে আমরা যে তিনটি বিষয় অবগত হয়েছি তা হলো: ১. মহাকর্ষ আলোর রং লাল (ঊর্ধ্বে ওঠার সময়) এবং নীল (ফিল্ডে পড়ার সময়) করে, ২. মহাকর্ষ সময়ের উপর প্রতিক্রিয়া করে (দ্রুততর করে) এবং ৩. মহাকর্ষ স্থান-কাল (স্পেইস-টাইম) বাঁকা করে।

এই তিনটি ফলাফল পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। লালকরণ ১৯৬৫ সালে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়। আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরীক্ষা হয়েছিল। একটি উঁচু বিল্ডিংয়ে গামা-রে (ইলেকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশন) নীচ থেকে উপরের দিকে চালিত করে এই লাল রং ধারণ পরীক্ষা করে সনাক্ত করা হয়েছে। সময়ের ভিন্নতা এটমিক ঘড়ি দিয়ে পৃথিবী থেকে অনেক উচ্চে বায়ূমণ্ডলে বেলুন প্রেরণ করে সত্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া স্থান-কালের বাঁকা হওয়ার ব্যাপারটি অনেক আগেই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের সূর্যগ্রহণের সময়, আকাশে একটি তারার অবস্থান এর আসল জায়গা থেকে অনেকটা ভিন্ন অবস্থানে দেখার বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এই তারাটি থেকে আগত আলো সূর্যের পাশদিয়ে আসার সময় এর মহাকর্ষে সৃষ্ট বাঁকাপথে চলে এসেছিল তাই এটাকে অন্য অবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, আইনস্টাইন আগেই এই তারাটি কোথায় দেখা যাবে (অর্থাৎ সূর্যের বাঁকাকরণের ফলে আসল স্থান থেকে কত ডিগ্রী দূরত্বে দেখাবে) তা বলে দিয়েছিলেন। তাঁর হিসেব ও পর্যবেক্ষণ প্রায় একই হয়েছিল। বিষয়টি বুঝতে ২১৮ পৃষ্ঠার ছবিটি হয়তো সহায়ক হবে।

জেনারেল রিলেটিভিটি বা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ

উপরোক্ত সমতার প্রিন্সিপাল এবং এর পরীক্ষিত সত্যতা আমাদের জানা হলেও বস্তুর দ্বারা স্পেইস-টাইম বা স্থান-কাল ঠিক কতটুকু বাঁকা হয়ে থাকে তা আমরা বুঝতে পরিনি। এটা সঠিকভাবে মাপার জন্য কিছু বিশেষ গাণিতিক সমীকরণ প্রয়োজন। আর আইনস্টাইন এসব সমীকরণই আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন তাঁর প্রখ্যাত জেনারেল রিলেটিভিটি বা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে।

এসব সমীকরণকে বলে ফিল্ড ইক্যুয়েশন্স। বাংলায় বলা চলে, মহাকার্ষিক ক্রিয়া সমীকরণ। তিনি মোট ১০টি এরূপ সমীকরণ আবিষ্কার করেন। এগুলোকে মেট্রিক থিওরী বলে। আর আইনস্টাইনের এই ১০টিই শুধু নয় অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এ ধরণের অথচ ভিন্ন আরও কিছু থিওরী আবিষ্কার করেছেন।

টাইম ডিলে বা সময় লম্বিত হওয়া

আমরা সবাই সময়ের মধ্যে আবদ্ধ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনে মিলে সময়ের সাথে আমাদের পরিচিতি। আমাদের অস্তিত্ব সময়ের উর্ধ্বে নয় বরং এর ভেতরে। আমরা সর্বদাই বর্তমানের উপর বাস করি। অতীত থাকে আমাদের স্মরণে, কাগজে, ইতিহাসে আর ভবিষ্যৎ সর্বদাই বাস করে আমাদের নাগালের বাইরে। সময়ের ক্ষয় ও অবক্ষয় থেকেও আমরা কেউ মুক্ত নয়। চলমান সময় আমাদের দেহ-মন-প্রাণে ক্রিয়া করে একদিন নির্দিষ্ট ক্ষণে সবাইকে নিয়ে যায় কবরে। সে কবর হোক সলীল সমাধি, সাড়ে তিনহাত মাটির গহ্বর কিংবা শব-চুল্লি বা অন্যকিছু।
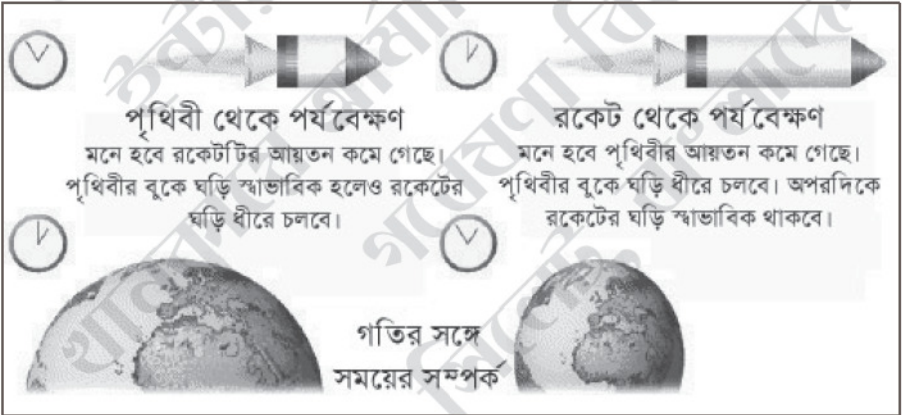
বস্তুজগতে সময় সদাক্রিয়াশীল। প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রভাব বিদ্যমান। বস্তুর জন্ম হয়- ক্ষয়, পরিবর্তন এবং ধ্বংস হয়। এই সময় যদি চলমান না থাকতো তবে সবকিছু অনড়, অক্ষয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো। সর্বাদিক মহাসত্য এই সময় জিনিসটি আসলে কি? বড় জটিল প্রশ্ন বটে। সময়কে বুঝার জন্য যুগ যুগ ধরে কত বিজ্ঞানী ও

দার্শনিক মাথা ঘামিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সময়কে চেনা যে কতো কঠিন তা এক ঘটনা থেকে জানা যায়।

কথিত আছে একদা এক বিদেশী বয়োবৃদ্ধ দার্শনিক লন্ডনে বেড়াতে এসেছিলেন। একদিন বিকেলে তিনি টেম্‌স নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নদীর তরঙ্গদোলা অবলোকন করছিলেন তন্ময় হয়ে। এসময় তার মতো আরেক বিদেশী পর্যটক এসে তাঁকে প্রশ্ন করলো, What is time? (সময় কি?) দার্শনিক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বিদেশী স্বরে বললেন, What did you say? What is Time? I Have spent my life to find that out! (কি বললে? সময় কি? আমি সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি এটা বোঝার চেষ্টায়!) বলাই বাহুল্য, দার্শনিকের মুখ থেকে এরূপ কথা শ্রবণ করে ঐ লোকটি ভাবলো, এ বৃদ্ধ পাগল-ছাগল হবে! কারণ সে জানতে চেয়েছিলো বিকেল ক'টা হয়েছে, কিন্তু লোকটি কি অদ্ভুত জবাবই না দিলো! আসলে দার্শনিকের জবাবই সঠিক ছিলো, কারণ লোকটি তো ইংরেজী ভাষায় অদক্ষ থাকায় প্রশ্ন করে বসেছে বড়টি। সময় কি? এটা তো দর্শন ও বিজ্ঞানের Sixty-four million dollar question! তবে সে যদি বলতো, হুয়াট টাইম ইজ ইট? তবে হয়তো তার কাঙ্খিত জবাব পেতো।

প্রথমে রহস্যজনক অথচ সার্বজনিন এই টাইম বা সময় সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা কি, তা আলোচনা করে দেখা যাক।

সময় সম্পর্কে বিজ্ঞান ও দর্শন যুগ যুগ ধরে গবেষণা চালানোর পর অবশেষে বিংশ শতকের শুরুতে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এর একটি সংজ্ঞা দেন। গণিত ও ফিজিক্সের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তাঁর এ ব্যাখ্যা এখন বিজ্ঞানজগতে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাঁর মতে সময় তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন বস্তু জগতের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একটি উপাদান। আমরা মূলত চার-বিস্তৃতিসম্পন্ন স্থান-কাল-চলমান (স্পেইস-টাইম-কন্টিনিউয়াম) জগতে বাস করি। আইনস্টাইন তাঁর প্রখ্যাত রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদ থিওরীর মাধ্যমে এ সত্য দেখিছেছেন। আপেক্ষিকতবাদ সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে। সময় সম্পর্কে এ থিওরী থেকে যেসব কথা বেরিয়ে এসেছে তা অবশ্যই ধারণাতীত। আইনস্টাইন দেখিছেছেন আলোকের গতির সাথে

সময়ের সম্পর্ক আছে। কেউ যদি আলোকের গতির কাছাকাছি চলতে পারে (আলোকের গতি প্রায় ১,৬৮,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড) অর্থাৎ এ উচ্চগতিসম্পন্ন ভ্রমণকারীর বয়স বৃদ্ধি হবে অনেক আস্তে আস্তেত! এ অদ্ভুত কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি কিন্তু পরবর্তীতে একাধিকবার এর সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার জন্য সুইজারল্যান্ডে স্থাপিত অণু-পরমাণু পরীক্ষা-নীরিক্ষার একটি বিশেষ লেবেরেটরী ব্যবহার করেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, কিছু পরমাণুর স্থায়িত্বকাল যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় হাফ-লাইফ বলে, নির্দিষ্ট সময় থেকে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোকের কাছাকাছি গতিতে এগুলো চালিত করার পর তা সম্ভব হয়েছে।

সময় সম্পর্কে আইনস্টাইন আরোও অনেককিছু বলেছেন। যেমন, সময়ের শুরু ছিলো এবং শেষ হবে। এর শুরু হয় জগতসৃষ্টির মুহূর্তে এবং শেষ হবে জগত ধ্বংসের কালে। সময় আপেক্ষিক, অর্থাৎ একেকজন দর্শকের কাছে সময় একেক রকম হয়ে থাকে। বিশ্বজনিন কোন সময় নেই। সময় মূলত: লকেল (স্থানীয়)। বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের থিওরী অনুসরণ করে আরো আবিষ্কার করেছেন যে, আমাদের দেহে বায়োলজিক্যাল ঘড়ি আছে। দেহের প্রতিটি কোষে এই ঘড়ি ক্রিয়া করে আমাদেরকে বুড়ো করছে।

এ হচ্ছে সংক্ষেপে সময় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা। সময়ের আপেক্ষিকতার ব্যাপারে টুইন প্যারাডক্স নামক একটি অত্যাশ্চর্য কাল্পনিক গল্প বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কাল্পনিক হলেও এটা সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যাক, গল্পটি এই: একদা সুইজারল্যান্ডের একজন নভোচারী সিদ্ধান্ত করলেন, তার আলোকের কাছাকাছি গতিসম্পন্ন রকেটশীপে পৃথিবীর নিকটতম তারা প্রক্সিমা সেন্টোরীতে ভ্রমণে যাবেন। বর্ণনার সুবিধার্থে আমরা তাকে জন বলে সম্বোধন করবো। জনের এক যমজ (টুইন) ভাই ছিলেন, তাকে আমরা জোহান বলে ডাকবো। যেহেতু যমজ, তাই দু'ভাইয়ের বয়স একই ছিলো এবং তা হলো ৪৭ বছর। জন নির্দিষ্ট দিনে তার যমজ ভাই জোহানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রকেটে আরোহণ করলেন এবং বললেন, ভাই জোহান, তোমার সাথে বারো বছর পর দেখা হবে। গুডবাই।

জনের মাহাকাশযান দ্রুত উপরের দিকে উঠে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। জনের 'বারো বছর পর দেখা হবে' বলার পেছনে রহস্য হলো, প্রক্সিমা সেন্টোরী তারাটি পৃথিবী থেকে ৪.৩ আলোক-বৎসর (আলো যেতে ৪.৩ বছর সময় লাগে) দূরে অবস্থিত। সুতরাং আলোকের কাছাকাছি গতিতে সেথা পৌঁছে ফিরে আসতে অন্তত বারো বছর সময় লাগবে।

যা হউক সময় যেতে লাগলো। পৃথিবীতে থেকে জোহান তার ভাইয়ের আগমণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। বারো বছর তো আর কম দিন নয়। জোহান বিয়ে করলেন এবং দুটি সন্তানের পিতা হলেন। একদিন তার অপেক্ষার অবসান ঘটলো এবং জনের প্রত্যাবর্তন দিসব এসে হাজির হলো। রকেট স্টেশনে তিনি স্বপরিবারে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। জন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এসে অবতরণ করলেন। এতোদিন পর ভাইকে দেখার জন্য জোহান ছুটে গেলেন রকেটের কাছে। জন বেরিয়ে আসলেন কিন্তু জোহান তাকে চিনতে পারলেন না। তার নিজের অর্ধেক দাড়ি পেকে গেছে কিন্তু জনের তো অবস্থা সেই বারো বছর আগে যেরূপ ছিলো ঠিক সেরূপই রয়েছে। সে তো ৫৯ বছর বয়স্ক লোক বলে মনে হয় না! জনও তার ভাইয়ের অবস্থা দেখে একেবারে থ! কি ব্যাপার? এই একদিনে আমার ভাইয়ের বয়স এতো বৃদ্ধি পেল কি করে! দুভাই একে অন্যের দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলেন, ঠিক এসময় এক বয়োবৃদ্ধ লোক সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি যমজ দু'ভাইয়ের দিকে গভীরভাবে তাকালেন তারপর মৃদু হেসে বললেন, "আরে! তোমরা অবাক হচ্ছো কেন? তোমরা আমার আপেক্ষিতাবাদের কথা শুননি বুঝি!"

জন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে? বি বলতে চান?"
বৃদ্ধ বললেন, "আমি আইনস্টাইন। তোমাদের মধ্যে বয়সের তারমত্য কিভাবে সৃষ্টি হলো তা বলে দিতে চাই।"
"বলুন।" বললেন জোহান।

বৃদ্ধ এবার বুঝিয়ে দিতে লাগলেন যে, জন যেহেতু আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে ভ্রমণ করেছেন তাই তার উপর দিয়ে সময় অত্যন্ত ধীর গতিতে চলেছে, অপরদিকে জোহানের উপর দিয়ে সময় স্বাভাবিকভাবেই চলেছে। তাই তার বয়স

বারো বছর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনের বয়স মাত্র একদিন বেড়েছে। সময় এরূপই গতির সাথে আপেক্ষিক।

এই গল্প থেকে পরিষ্কার হয়েছে, ইতোমধ্যে সময় সম্পর্কে যা ধারণা ছিলো তা পাল্টে গেছে। গতি ও মহাকর্ষ সময়কে লম্বা করে দিতে জানে। কেউ যদি আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে চলে তাহলে তাঁর নিজের কাছে সময় স্বাভাবিক মনে হলেও, সে তুলনায় বাইরজগতের সময় লম্বায়িত হবে। অপরদিকে বাইরজগতের তুলনায় গতিশীল ব্যক্তির সময় হবে খাটো।

ডপলার এফেক্ট

যাবতীয় ইলেকট্রমেগন্যাটিক তরঙ্গ এবং শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে একটি এফেক্ট বা ক্রিয়া আছে যাকে বলে ডপলার এফেক্ট। এই এফেক্টটি শব্দ-তরঙ্গ কিংবা যে কোন ওয়েভ সৃষ্টির সূত্রের গতির সঙ্গে সম্পর্কিত। শব্দসৃষ্টির সূত্র যখন শ্রবকের কাছ থেকে দূরে সরে যায় তখন শব্দের ফ্রিক্যুয়েন্সি (সেকেন্ডে কয়টি তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে সেই হিসাবকে বলে ফ্রিক্যুয়েন্সি) কমে এবং শব্দটির পীচ বা তীব্রতা অনেকটা হালকা হয়ে যায়। অপরদিকে সূত্র যখন শ্রবকের দিকে ছুটে আসবে তখন শব্দ-তরঙ্গে ফ্রিক্যুয়েন্সি বৃদ্ধি পায়, এতে শব্দটির তীব্রতা শ্রবকের কাছে বেড়ে ওটে। এই এফেক্টটি একটি রেল ষ্টশনে অপেক্ষারত যাত্রীরা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। মনে করুন আপনি একটি লক্যাল ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন। আপনার ট্রেন আসার আগেই একটি ইন্টারসিটি ট্রেন স্টেশনের দিকে দ্রুত আসতে লাগলো। ট্রেনের শব্দ তখন আপনার কানে বেশী থেকে বেশী মনে হবে, কিন্তু যেহেতু এটা ইন্টারসিটি ট্রেন তাই স্টেশনে না থেমে যখন এটা দ্রুত স্টেশন পেরিয়ে আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে, তখন ট্রেনের শব্দের তীব্রতা কমে আসবে। এই এফেক্টটি সর্বপ্রথম অষ্ট্রিয়ান এক বিজ্ঞানী, ক্রিস্টিয়ান জোহান ডপলার আবিষ্কার করেছিলেন বলে এটাকে তার নামানুসারে ডপলার এফেক্ট বলা হয়।

ডপলার দেখিয়েছেন, এই এফেক্টের কারণে সূত্রের দেহের রংও বদলে যায়। অর্থাৎ এই এফেক্ট আলোক-তরঙ্গের উপর ক্রিয়াশীল। কাছে আসতে তার রং হয় নীল এবং

দূরে সরে গেলে তা হয় লাল। এই এফেক্টের সহজ ব্যাখ্যা হলো, যেহেতু তরঙ্গ সৃষ্টির সূত্র বা বস্তুটি দ্রুত দর্শকের দিকে এগুচ্ছে তাই ওয়েভটিও (তরঙ্গটি) শ্রবকের দিকে অগ্রসর হয় অপেক্ষাকৃত দ্রুত। তখন এর ওয়েভ-লেন্থ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) স্বভাবতই একটা আরেকটা থেকে কাছে এসে পড়ে অর্থাৎ শ্রবকের কাছে প্রতি সেকেন্ডে বেশী থেকে বেশী তরঙ্গ পৌঁছে যায়। অপরদিকে সূত্রটি দূরে সরে গেলে তরঙ্গ-দ্যৈর্ঘ অনেকটা চওড়া হয়ে পড়ে, এতে শ্রবকের কাছে কম থেকে কম তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে এসে পৌঁছে। এই এফেক্ট আলোক-তরঙ্গের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

মহাকাশে দূর-দূরান্তে নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির গতি খুব দ্রুত হওয়ায় এই এফেক্ট থেকে বুঝা যায় গতিশীল বস্তু আমাদের দিকে আসছে না দূরে সরে যাচ্ছে। এই দুই অবস্থার প্রথমটি হলে- অর্থাৎ কাছে আসছে সেটা সত্যি হলে, আলোর রং নীলের দিকে শিফ্‌ট করবে; এই শিফ্‌ট বা সরে যাওয়াকে বলে ব্লু শিফ্‌ট (নীল শিফ্‌ট)। তবে বস্তুটি যদি দ্রুত সরে যায় তবে আলোর রং লালের দিকে সরে যাবে; এই অবস্থাকে বলে রেড শিফ্‌ট (লাল শিফ্‌ট)। এখন, একটি তারা কিংবা গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোরশ্মিকে যদি আমরা পরীক্ষা করে নেই, তবেই তারাটি কিংবা গ্যালাক্সিটি আমাদের দিকে আসছে না দূরে সরে যাচ্ছে তা সহজেই জেনে নিতে পারি। আরও জানতে পারি বস্তুটির দূরত্ব। জানা দূরত্বে অবস্থানরত বস্তুর লাল বা নীল শিফটের সঙ্গে তুলনা করলেই দূরত্ব হিসেব করে নেয়া যায়। এই ডপলার এফেক্ট থেকেই দেখা গেছে

বিশ্বের চতুর্দিকে গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে- অর্থাৎ বিশ্বটা দিন দিন বিস্তারলাভ করছে।

ডপলার এফেক্ট একমাত্র মূল সূত্র কিংবা পর্যপেক্ষকের গতিশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। সূত্র এবং পর্যবেক্ষক উভয়ই যদি স্থির অবস্থায় থাকে তবে ডপলার এফেক্ট ক্রিয়াশীল হয় না।
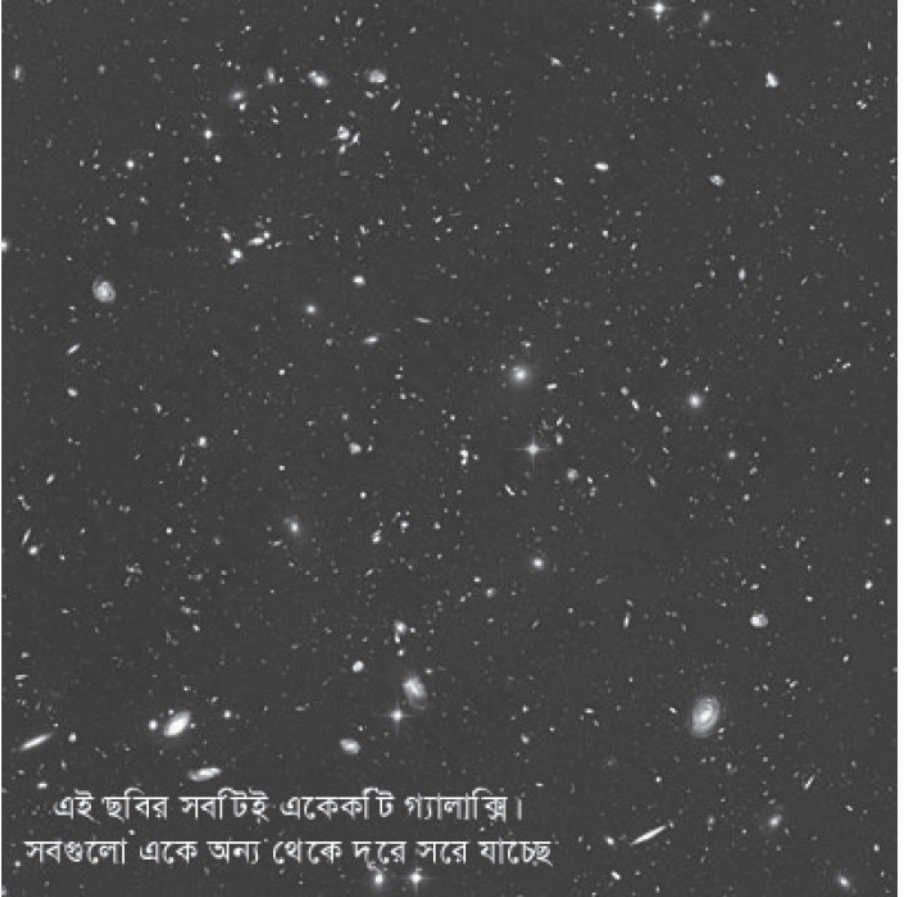
"আল্লাহ সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং সব বস্তুর রক্ষাকারী" [সূরা জুমার ঃ ৬২]।

পরিচ্ছেদ ৭

আলোকবিজ্ঞান

এ পর্যন্ত আমরা আলো নিয়ে অনেককিছু বলেছি। আইনস্টাইনের থিওরী বুঝাতে যেয়ে এই আলোকের কথা এসেছে। আলো মূলত স্থান-কালের অংশ, এর গতি সসীম ও অপরিবর্তনীয়। আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে চললে সময় আস্তে চলে। এসব কথা আমরা জেনেছি। কিন্তু বাস্তবে আলো কি জিনিস তা আমরা ভালোকরে বুঝিয়ে বলিনি। আলো নিয়ে গবেষণা একটি ব্যাপক বিষয়। এই গবেষণাকে এখন বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই শাখাটির নাম আলোকবিজ্ঞান। এই পরিচ্ছেদে পাঠকরা আলোকবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

আলো কি?

আলো বস্তাবে স্বভাবের মৌলিক চার শক্তির একটি থেকে সৃষ্ট। এই শক্তিটি হলো বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় তেজস্ক্রিয়া বা ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশন। এই শক্তি থেকে সৃষ্ট সব রেডিয়েশনের ভিন্নতা বা পরিচিতি আমরা রেডিয়েশনটির ওয়েভলেন্থ বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে পাই। অর্থাৎ রেডিয়েশনের ওয়েভলেন্থ কোন রেঞ্জের ভেরত আছে সেটা থেকে বিভিন্ন ইলেকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশন সনাক্ত করা হয়। যার মাধ্যমে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশনকে সনাক্ত করা হয়ে থাকে তাকে বলে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক স্পেকট্রাম। স্পেকট্রাম হচ্ছে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের পুরো রেঞ্জের হিসাব। এরমধ্যে চোখে দেখা যায় যে অংশটি সেটিই হলো আলো। অর্থাৎ ০.৪ মাইক্রন (ওয়েভলেন্থের পরিমাপ মাইক্রন দিয়ে করা হয়) থেকে ০.৭ মাইক্রন পর্যন্ত রেডিয়েশনের অংশটুকু আমাদের চোখে আলো হিসাবে ধরা পড়ে। তবে চোখে ধরা পড়েনা যে অংশটুকু তার রেঞ্জ বা ব্যাপ্তি কিন্তু অনেক বড়।

যেমন আলট্রাভাইলোট আলো, ইনফ্রারেড আলো ও কালো আলো- এগুলো আমরা দেখতে পাই না। সুতরাং দেখার রেঞ্জের ভেতরের আলো হচ্ছে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের যে অংশ আমাদের চোখে ধরা পড়ে সেটুকু।

আলো বাস্তবে চলমান একটি এনার্জি বা উদ্যম। এটা একটি গতিশীল এনার্জি আবার তরঙ্গও বটে। এই দুটির সমন্বয়ে একটি আলোক থিওরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাকে বলে ফোটন। ফোটন হলো এনার্জি ও ওয়েভলেন্থের উপর নির্ভরশীল একটি হিসেব। লাইট বা আলোককে কেউ কেউ বলেছেন, এনার্জি নিয়ে চলমান তরঙ্গের ট্রেন।

কিভাবে আলো সৃষ্টি হয়

যে কোন ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের মতো লাইট বা আলোও সৃষ্টি হয় তিনটির মধ্যে যে কোন একটি উপায়ে। এগুলো হলো: ১. ইলেকট্রিজ চার্জ গতিশীল করে, ২. নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রতিক্রিয়ায় এবং ৩. নিউক্লিয়ার ফিশন প্রতিক্রিয়ার

মাধম্যে। আগেই বলেছি আলো হচ্ছে ফোটন নামক উপদানে তৈরী। যে কোন বস্তুর মধ্যে এই ফোটন তৈরী হলেই বস্তুটি আলো বিকিরণ করে। যেমন নিউক্লিয়ার রিয়েকশনে একটি ফোটন সৃষ্টি হয়ে তা বিকিরণ হয় আলো হিসেবে। সূর্যালোক ও তারা থেকে আগত আলো মূলত নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে সৃষ্ট। তবে পৃথিবীতে বেশিরভাগ আলো সৃষ্টি হয় ইলেকট্রনিক উপায়ে। অর্থাৎ এটম ও মলিকিউল যখন এনার্জির মাধ্যমে পরিবর্তন হয় তখন আলোর সৃষ্টি হয়।

আলো মূলত সৃষ্টি হয় তাপ থেকে। একটি লাইট বাল্বের ভেতর থাকে ফিলামেন্ট (অতি কম ব্যাসবিশিষ্ট তার)। এই ফিলামেন্ট ইলেকট্রিক কারেন্টে উচ্চতাপ ধারণ করে। ফিলামেন্ট গরম হলেই তার এটম ও মলিকিউলে কিনেটিক এনার্জি (গতির মাধ্যমে সৃষ্ট এনার্জি) সৃষ্টি হয়। গতিশীলতার কারণে এটম ও মলিকিউলগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ শুরু হয়। এ থেকেই সৃষ্টি হয় ফটোন যা আলো হিসেবে চতুর্দিকে বিকিরণ করে। সুতরাং আলো এটম ও মলিকিউলের মধ্যে এনার্জি দেওয়ায় সৃষ্টি হয়। এই এনার্জি ইলেকট্রিকেল (যেমন লাইট বাল্ব) কিংবা কেমিক্যাল (যেমন হারিকেন) এনার্জি হতে পারে।

লেইজার (LASER)

লেইজার (ইংরেজীতে LASER) অর্থ হলো, লাইট আমপ্লিফিকেশন বাই সিম্যুলেইটেড এমিশন অব রেডিয়েশন। কথাটির ভাবার্থ হবে, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আলোকরশ্মিকে শক্তিশালী করা। লেইজার আলো সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ আলোকে প্রযৌক্তিক উপায়ে একটি শক্তিশালী ছোট্ট আলোক বীমে পরিণত করা। লেইজার বস্তুর ভেতর দিয়ে একটি ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত করে। এই বস্তুটি কঠিন, তরল কিংবা গ্যাস হতে পারে। কারেন্টের প্রক্রিয়ায় বস্তুর কিছু এটম এনার্জি গ্রহণ করে গুচ্ছ গুচ্ছ রেডিয়েশন বিকিরণ করে। এর ফলে বস্তুর অপর আরও এটম থেকে বিকিরণ শুরু হয়। এই বিকিরণ মূলত ফোটন (আলো)। দুটি আয়না দিয়ে এই ফোটনকে আটকে একটি সরুপথে বের করে আনা হয়, যা অত্যন্ত শক্তিশালী একটি আলোকরশ্মি হিসেবে চলমান হতে থাকে। এই বীমের মধ্যে একটি মাত্র ওয়েভলেন্থ থাকায় এটা বেশী শক্তিশালী এবং খুব দূরত্বে ভ্রমণশীল হয়ে উঠে।

আধুনিক লেইজার

অলোর অন্যান্য দিক

আলোকরশ্মি যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে চলমান থাকে (যেমন বাতাস থেকে কাঁচে) তখন এর ডাইরেকশন বা চলার দিক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন হওয়াকে বলে রিফ্রেকশন।

রিফ্রেকশন কিন্তু সব ধরনের চলমান এনার্জির ক্ষেত্রেই সত্য যা সাধারণত তরঙ্গ হিসেবে বিকিরণ হয়। রিফ্রেকশন হওয়ার অর্থ আলোকরশ্মি বাঁকা হওয়া। সাধারণত আলো সরপথে চলে। প্রত্যেক বস্তুর একেকটি আলাদা অপটিক্যাল ডেনসিটি (আলোক-ঘনত্ব) আছে। এই ঘনত্বের ফলে আলো ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন গতিতে চলমান হয়। যেমন বাতাসে চলার পর আলো যখন পানির ভেতর প্রবেশ করে তখন এর গতি কমে যায়। এখন এই আলো যদি সরাসরি উপর থেকে প্রবেশ না করে তাহলে তা বাঁকা হয়ে যাবে।

আমরা অনেক সময় চন্দ্রের চতুর্দিকে একটি গ্লো বা উজ্জ্বল আলো দেখতে পাই। বাস্তবে এটি রিফ্রেকশনের মাধ্যমে সৃষ্ট। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডের উপরিভাগে ছোট্ট ছোট্ট বরফখণ্ডের উপর চন্দ্রের আলো এসে এই গ্লো সৃষ্টি করে।

রিফ্লেকশন

রিফ্লেকশন হচ্ছে প্রতিবিম্ব। আলো যেহেতু ওয়েভ এনার্জি বা তরঙ্গশক্তি তাই এটা কোন পরিষ্কার শাইনী (পালিশ-করা) বস্তুর উপর পতিত হলে রিফ্লেকশনের সৃষ্টি করে। যেমন আয়না বা শান্ত পুকুরের পানিতে আলো প্রতিবিম্ব হয়।

রিফ্লেকশনের মধ্যে দুটি আলোকরশ্মি কাজ করে। প্রথমটি হচ্ছে আলোক সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে আগত রশ্মি এবং দ্বিতীয়টি রিফ্লেকটিং বস্তু বা সারফেস থেকে চলমান রশ্মি

যা পতিত হয়ে লাফমেরে বিকিরণ করে। মনে রাখা দরকার, রিফ্রেকশন ও রিফ্লেকশন ভিন্ন ক্রিয়া। প্রথমটি হচ্ছে আলোকরশ্মির দিকপরিবর্তন হওয়ার ক্রিয়া, আর শেষেরটি হলো শাইনী সারফেস থেকে প্রতিবিম্ব হওয়া।

কনকেভ-কনভেক্স লেন্স ও আয়না

গাড়ির হেডলাইটের ভেতরের আয়নাটি কিংবা টর্চ লাইটের ভেতরের আয়না (বা পালিশ বস্তু) কেন এভাবে বাঁকা (ভেতরের দিকে) থাকে তা কি আমরা চিন্তা করি? এছাড়া গাড়ির ড্রাইভিং মিররই বা কেন বাইরের দিকে বাঁকা থাকে? এসব আয়না এভাবে তৈরীর মূলে আলোকের রিফ্লেকশন আইন কাজে লাগানো হয়। আমরা চাই টর্চের লাইট কিংবা গাড়ির হেডলাইট দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুক। এটা করতে যেয়ে আমাদেরকে আলেকের বীমটি (বীম: একাধিক রশ্মির সমন্বয়ে গঠিত হয় একেকটি বীম- বাংলায় বলে অংশুজাল) সরু করতে হয়। সুতরাং (ভেতররে দিকে, কনকেভ-ভাবে) বাঁকা করলে এ কাজটি সম্পন্ন হবে। অপরদিকে কোন বস্তুকে মোটা দেখাতে গিয়ে আমরা আয়নাকে কনভেক্স উপায়ে (বাইরের দিকে) বাঁকা করি। উপরের ডায়াগ্রাম ও ছবির দিকে লক্ষ করলে এই কনকেভ ও কনভেক্স এর স্বরূপ বুঝা যাবে। উল্লেখ্য কনকেভ আয়না দৃশ্যটিটে পাল্টে দেয়। তা কিভাবে দেয় ছবি থেকে সেটা স্পষ্ট। আলোক রশ্মি পতিত হয়ে উল্টোদিকে ফিরে আসে। আর আলো যখন বস্তুর উপর পতিত হয়ে ফিরে এসে আমাদের চোখে পড়ে তখনই আমরা কোন বস্তু দেখতে পাই।
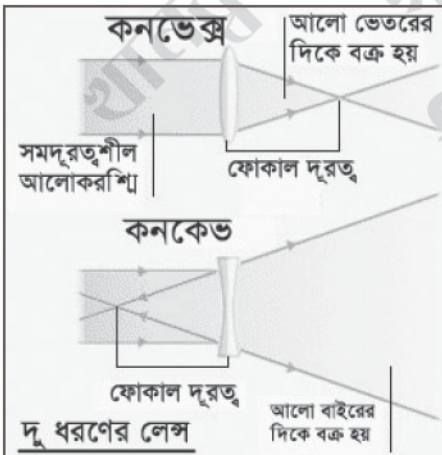
একই উপায়ে আমরা এই দু'ধরণের পদ্ধতিতে চশমার গ্ল্যাস তৈরী করি। চোখের মধ্যে যদি ফক্যাল দূরত্বে বেশকম হয় তবে সঠিক লেন্স দিয়ে তা ঠিক করা যায়। ফক্যাল লেন্থ হচ্ছে যেটুকু দূরত্বে লেনস পেরিয়ে আলোর বিভিন্ন রশ্মি একত্রিত হয়। চোখের ভেতরে নেচারেল লেনসের মধ্যদিয়ে আলো গিয়ে রেটিনা

নামক স্থানে পতিত হয়। এই রেটিনায় থাকতে হবে ফক্যাল দূরত্ব কিন্তু চোখের লেনসে সমস্যা হলে, তা হয় বেশি না হয় কম দূরত্বসম্পন্ন।

ফক্যাল দূরত্বের মধ্যে বেশকম থাকায় লেনস থেকে আলোকরশ্মি রেটিনার সঠিক জায়গায় পতিত হয় না। সুতরাং আমরা তখন ঠিকমতো দেখতেও পারি না। আলাদা লেনস (চশমা) লাগিয়ে এই ফক্যাল দূরত্বকে কৃত্রিম উপায়ে সঠিক করা হয়।

রংয়ের খেলা

এই বসুন্দরা হচ্ছে নানা রংয়ের খেলা। রঙ্গিন ফুলে-ফলে-পল্লবীতে ভরপুর এ পৃথিবীটা কী সুন্দর সৃষ্টি! কিন্তু রং আসলে কী? এটা আমরা দেখিই বা কি করে?
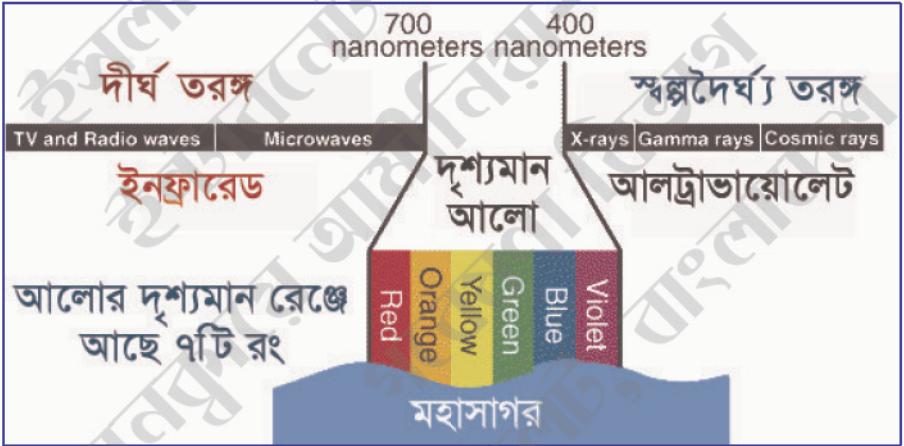
রং মূলতঃ আলোর সঙ্গে সম্পর্তিক একটি উপাদান। রঙ্গিন বস্তু বা পিগ্‌মা আলোকরশ্মিকে একেকটি বিশেষ পদ্ধতিতে রিফলেক্স বা প্রতিবিম্ব করে। সূর্য কিংবা যে কোন বাতি থেকে আগত সাদা লাইট আসলে মোটেই সাদা নয়। ৭টি ভিন্ন রংয়ের মিশ্রণেই এই আলো তৈরী হয়েছে। এই সাত রংকে বলে স্পেকট্রাম। আইজ্যাক নিউটন সর্বপ্রথম প্রিজম নামক কাঁচের মাধ্যমে সূর্যালোকের ৭টি রংবিশিষ্ট স্পেকট্রাম

আলাদা করে দেখিয়েছিলেন। এই রংগুলো হচ্ছে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, ইণ্ডিগো (ধূর্মনীল) ও বেগুনী (ভায়োলেট)।

আমরা স্কুলে থাকতে এই সাতটি রংবিশিষ্ট স্পেকট্রামকে মনে রাখতে যেয়ে একটি ইংরেজি বাক্য মুখস্ত করেছিলাম। এ বাক্যটি হচ্ছেঃ Richard Of York Gave Battle In Vain. (R = Red, O = Orange, Y = Yellow, G = Green, B = Blue, I = Indigo, V = Violet)

কোন বস্তুর উপর যখন সাদা আলো পতিত হয় তখন বস্তুটি উপরোক্ত এক বা একাধিক আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব করে এবং বাকীগুলো এবজোর্ব বা চুষে নেয়। বস্তুটি যে রংয়ের হবে সেই রংয়ের আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব হয়ে আমাদের চোখে পড়ে- তাই আমরা রং দেখি। ৭টি মৌলিক রংয়ের মিশ্রণ যদি বস্তুর রং হয় তবে ঐসব মিশ্রিত রং প্রতিবিম্ব হবে। সুতরাং আমরা বিভিন্ন রং দেখতে পাই।

মনে করুন আপনি একটি সবুজ পল্লবী দেখছেন। এটাকে সবুজ দেখার কারণ হলো সাদা আলোর মধ্যে যে সবুজ রংয়ের রশ্মি আছে শুধুমাত্র সেটিই এই পাতা প্রতিবিম্ব করে বাকীগুলো চুষে নেয়। অর্থাৎ বাকীগুলো প্রতিবিম্ব করে না। এখন কথা হচ্ছে ৭টি রংয়ের প্রতিটিই যদি কোন বস্তু প্রতিবিম্ব করে ফেলে তাহলে বস্তুটি দেখতে কিরূপ লাগবে। একটু ভাবলেই এর জবাব মেলবে। আমরা যে সাদা আলো দেখি তার মধ্যেও তো প্রতিটি রং আছে কিন্তু আমরা দেখি তাকে সাদা হিসেবে। এ থেকে এটা সহজেই বুঝা যায়, যে বস্তু প্রতিটি রং প্রতিবিম্ব করবে তা হবে সাদা। বস্তু প্রতিটি রং যতো বেশি প্রতিবিম্ব করবে তার রংও ততো বেশি শ্বেতবর্ণের হবে। অপরদিকে যে বস্তু সব কটি রং চুষে নেয় অর্থাৎ প্রতিবিম্ব করবে না- তার রং হবে কালো। অর্থাৎ কালো দেখার কারণ হলো বস্তুটি কোন রং প্রতিবিম্ব করছে না।

এ পর্যন্ত রং নিয়ে আলোচনায় আমরা দুটি বিষয় বুঝতে পেরেছি- ১. রং দেখা মানে প্রতিবিম্বের মধ্যে যে আলোকরশ্মি আছে তা-ই দেখা। ২. বস্তুর উপর থেকে ৭টি রং একই সাথে প্রতিবিম্ব হলে তার রং হয় সাদা আর একটিও প্রতিবিম্ব না হলে তা হয় কালো। এবার এই দুটি বিষয় থেকেই আমরা রং আসলে কি তা সজহে বুঝতে পারবো।

রং হচ্ছে বস্তুর মধ্যে যে রসায়ন দ্রব্য আছে তার একটি গুণ। যে রসায়ন দ্রব্য (যেমন পিগমা কিংবা তৈল রং) যদি নীল আলোকরশ্মি ছাড়া বাকীগুলো চুষে নেয় তবে এই দ্রব্যটি দেখতে নীল লাগবে। লাল রং লাল আলোকরশ্মি ছাড়া বাকীগুলো চুষে নেয়। সুতরাং রং আর কিছু নয়- কোন্ রংয়ের আলোকরশ্মি বস্তু চুষে কিংবা প্রতিবিম্ব করে, সেটার উপরই বস্তুর রং কোন্‌টি হবে তা নির্ভর করে। তাহলে বোঝা গেল, রঙিন বস্তু আলোর রং প্রতবিম্ব করে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়। কারণ, আসলে আলোকরশ্মির মধ্যে ৭টি রং যদি থাকতো না তাহলে জগতটাকে আমরা ব্লাক-এণ্ড-হুয়াইট দেখতাম।

সুতরাং রংয়ের খেলা বাস্তাবে '৭ রংবিশিষ্ট আলোর খেলা' ছাড়া আর কিছুই নয়। পিগমা বা রঙিন বস্তুর মধ্যে চোষা আর না চোষার গুণই বস্তুকে রঙিন দেখানোর জন্য দায়ী।

প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী রং

আলোর মধ্যে তিনটি প্রাথমিক রং আছে। এগুলোকে বলে প্রাইমারী কালার। এই প্রাইমারী কালারের মিশ্রণে বিভিন্ন রং তৈরী হয়। প্রাইমারী রং হলো: লাল, নীল ও সবুজ। সাদা আলোসহ মোট ৭টি ভিন্ন রং এই মৌলিক তিনটি রঙের মিশ্রণ থেকে সম্ভব। এবার দেখা যাক কিভাবে এসব রং তৈরী করা যায়।

লাল+নীল=ম্যাজেন্টা; লাল+সবুজ=হলুদ; নীল+সবুজ=সায়ান (আকাশ নীল); লাল+নীল+সবুজ=সাদা। সুতরাং আমরা লাল, নীল, সবুজ, সায়ান, ম্যাজোন্ট, হলুদ ও সাদা এই ৭টি রং পেলাম।

প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী রং

ফটোসিনথেসিস

সূর্যালোক থেকে যে পদ্ধদিতে এনার্জি বা উদ্যম সংগ্রহ করে সবুজ উদ্ভিত খাদ্যগ্রহণ করে তাকে বলে ফটোসিন্থেসিস। এটাকে কে বা কারা কেন যে বাংলায় 'সালোকসংশ্লেশন' নামকরণ করেছেন তা আমার বোধগম্য নয়। আমার ধারণা বাংলাভাষায় সকল বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী যতো সম্ভব সহজ করে লেখা জরুরী। আমাদের সমাজে বিজ্ঞান বিষয়টি সম্পর্কে একটি বিশ্বাস প্রায় সবার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে- তাহলো, বিজ্ঞান একটি কঠিন বিয়ষ। কিন্তু বাস্তবে এ ধারণাটি ভিত্তিহীন। বিজ্ঞানকে যদি সঠিকভাবে সরল বাংলায় উপস্থাপন করা যায়, তাহলে সর্বসাধারণের কাছে তা দিন দিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। সুতরাং সালোকসংশ্লেশন ইত্যাদি বলার কোন প্রয়োজন নেই। বরং ফটোসিন্থেসিস শব্দটি দিয়েই বিষয়টি উপস্থাপন করা সহজ বলে মনে করি। কারণ, ফটো শব্দটির অর্থ আমাদের প্রায় সাবারই অল্প-বিস্তর জানা আছে। এছাড়া সালোকসংশ্লেশন থেকে এটি উচ্চারণও অনেকটা শ্রুতিমধুর। যেসব শব্দ বাংলা থেকে ইংরেজী বেশি ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চারণ সহজ হবে, তা মূল ইংরেজী শব্দব্যবহারের মধ্যেই লেখার পক্ষপাতী আমি। অবশ্য বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র ভাষা। বাংলায় নতুন শ্রুতিমধুর সরল শব্দ আবিষ্কারের পক্ষে আমি। ইতোমধ্যে কলিকাতা থেকে কিছু শব্দ আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হয়, এগুলো এতো কঠিন ও শ্রুতিকঠোর যে, তা সচরাচর ব্যবহার হবে পাঠকদের প্রতি জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়!

দুটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ফটোসিন্থেসিস সংগঠিত হয়। প্রথমতঃ লাইট রিয়েকশন বা আলোর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম্যে আলোকের এনার্জি চুষা এবং দ্বিতীয়তঃ কার্বন রিয়েকশন (কার্বন নামক রসায়নিক বস্তুর মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া) বা কালো প্রতিক্রিয়া। এর অপর নাম ক্যালভিন সাইকেল। আমরা এ দুটি প্রসেস আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

লাইট রিয়েকশন

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, রং বা পিগমা (এ ক্ষেত্রে এই রংকে বলে ক্লোরোফিল্‌স) সূর্যালোক বা ৭ রংবিশিষ্ট যে কোন আলোকরশ্মিকে চুষে নেয়। যেটি চুষে না, সেটি প্রতিবিম্ব হয়ে আমাদের চোখে রং দেখায়। সবুজ পাতা তাই সূর্যালোকের সবুজ রং ছাড়া বাকী রংগুলো চুষে ভেরতে নিয়ে যায়। তবে যেহেতু আলেকরশ্মি হচ্ছে এনার্জি বা উদ্যম তাই এই চুষা থেকে পাতার ভেতর সামান্য ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে। এই কারেন্ট থেকে জন্ম নেয় উচ্চমানের দুটি রসায়নিক বস্তু- এর একটি হচ্ছে এটিপি ও অপরটি এনএডিপিএইচ। এ দুটি নামের অর্থ বুঝা আমাদের জন্য জরুরী নয়- তবে এগুলো থেকেই শুরু হয় দ্বিতীয় প্রসেস।

Photosynthesis
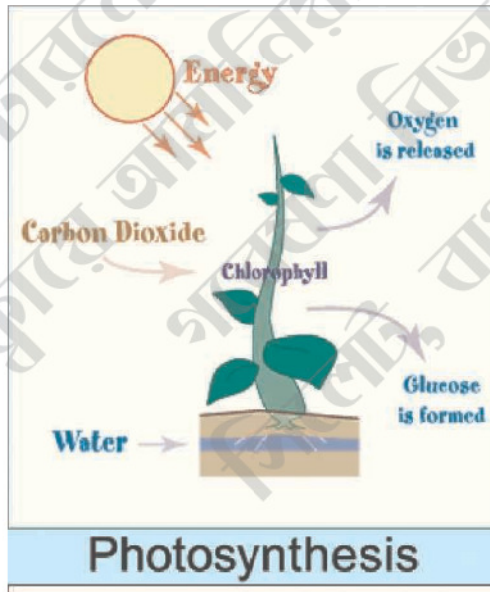
কালো রিয়েকশন

পাতার ভেতর কারবন নামক রসায়নের সঙ্গে উপরোক্ত এটিপি ও এনএডিপিএইচ মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি হয় আরও কিছু জৈবিক পদার্থ- যেমন, চিনি। এ প্রসেসে কার্বন ডায়োক্সাইড ও পানি সক্রিয় থাকে। এ থেকে উদ্ভিদ খাদ্য আহরণ করে। তবে এই ফটোসিন্‌থেসিস রিয়েকশনের মাধ্যমে সমগ্র গ্রহের প্রাণীর জন্য যে জরুরী একটি বাই-প্রোডাক্ট তৈরী হয় তা হচ্ছে অক্সিজেন। এই অক্সিজেন কিভাবে সৃষ্টি হয় এবার সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাক।
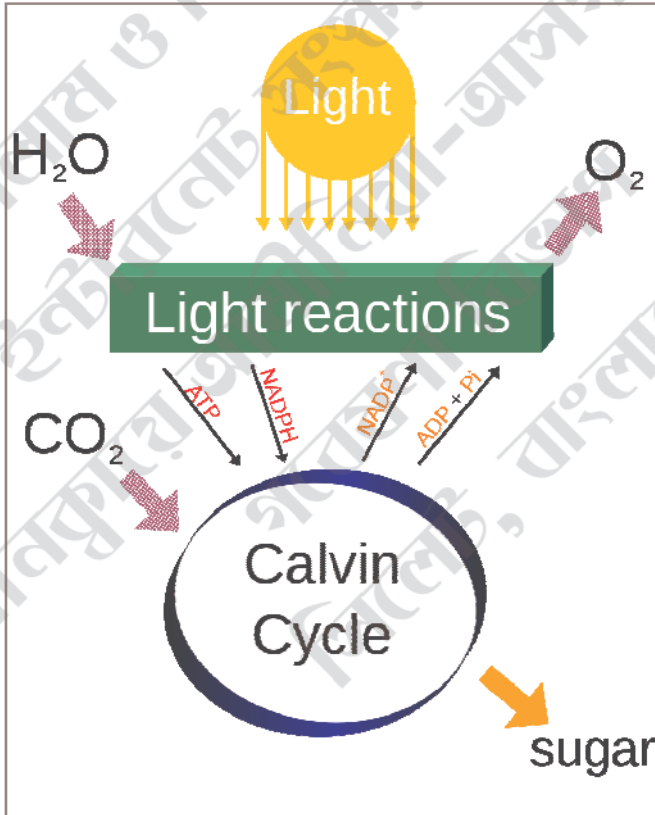
অক্সিজেন রিলিজ

ফটোসিন্থেসিস প্রসেসে যে রিয়েকশন সংঘটিত হয় তাতে সূর্যালোক থেকে সৃষ্ট কারেন্ট পানির মলিকিউল (কয়েকটি এটম মিলে একেকটি মলিকিউল হয়) ভেঙ্গে যায়। পানির মলিকিউলে অক্সিজেন এটম আছে, কারণ পানির কেমিক্যাল ফর্মুলা হলো H_2O (দুটি হাউড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন এটম)। কারেন্ট এই অক্সিজেন এটমকে মুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ বায়ূমণ্ডলে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই উপায়ে যদি অক্সিজেন সৃষ্টি না হতো তবে অচিরেই বায়ূমণ্ডলের সকল অক্সিজেন আমাদের ও প্রাণীদের শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে ফুরিয়ে যেতো। এখানে উল্লেখ্য যে, উদ্ভিত তথা গাছ-গাছাড়ি আমাদের জীবনরক্ষার জন্য কতো জরুরী তা এখন আশাকরি সবাই বুঝতে পেরেছেন। আশা করবো পাঠকরা বৃক্ষরোপণ কাজে সবসময় সচেতন থাকবেন।

ফটোসিন্থেসিস ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। বাস্তবে একটি আরেকটির বিপরিত ক্রিয়া। আমরা এই দুটি বিষয়কে সহজে বুঝার জন্য উপস্থাপন করতে পারি এভাবে: শ্বাস-প্রশ্বাস = জৈবিক পদার্থ + অক্সিজেন = কার্বন ডাইয়োক্সাইড +পানি; ফটোসিনথেসিস = কার্বন ডাইয়োক্সাইড + পানি = জৈবিক পদার্থ + অক্সিজেন।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করতে যেয়ে আমরা বলতে পারি: শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন ও জৈবিক পদার্থের সমন্বয়ে যে বাই-প্রোডাক্ট বা ফলাফল-বস্তু সৃষ্টি করি তা হলো কার্বন ডাইয়োক্সাইড ও পানি। অর্থাৎ প্রশ্বাসের সময় কার্বন ডাইয়োক্সাইড গ্যাস ও পানি আমাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। অন্যদিকে ফাটোসিন্থেসিস এর মাধ্যমে গাছের সবুজ পাতা কার্বন ডাইয়োক্সাইড ও পানি থেকে সৃষ্টি করে অক্সিজেন ও জৈবিক পদার্থ। জৈবিক পদার্থ হয় গাছের খাদ্য আর অক্সিজেন ছেড়ে দেয়া হয় বায়ূমণ্ডলে।
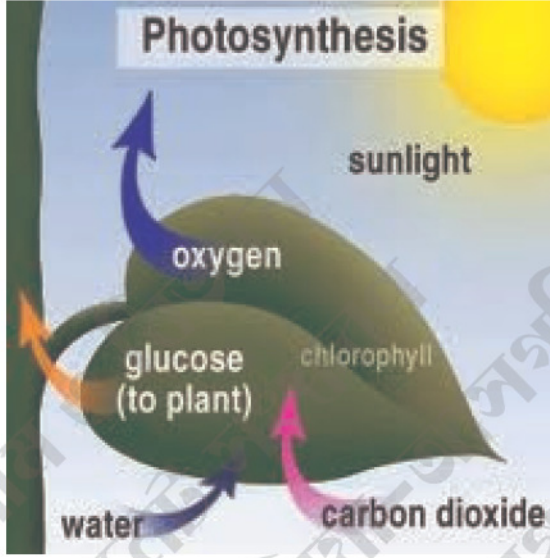
আলো সম্বন্ধে উপরোল্লিখিত বিভিন্ন তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আলো হচ্ছে এ জগতের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। আলো ছাড়া সবকিছুই অন্ধকার থাকতো। বাস্তবে ইলোকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ফোটনের তৈরী এই আলো। এছাড়া সূর্যালোক থেকে সৃষ্ট ফটোসিন্থেসিস যে কত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্রিয়া তা আশাকরি সবাই অনুধাবন করেছেন।

“আকাশ-পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন” [সূরা জ্বাসিয়া ঃ ৩]।

পরিচ্ছেদ ৮

রেডিওএক্টিভিটি বা তেজষ্ক্রিয়তা

ইতোমধ্যে পাঠকরা রেডিওএক্টিভিটি বা তেজষ্ক্রিয়তা শব্দটি অনেকবার পড়েছেন। এই ক্রিয়াটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। বর্তমান আনবিক বিজ্ঞানের সঙ্গে এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আনবিক বোমা বিস্ফোরণে মারাত্মক তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ হয় বলে আমরা শুনে থাকি। কিন্তু এটি কি? আসুন, এই জিনিষটি আসলে কি তা আমরা সরলভাষায় জেনে নিই।

তেজষ্ক্রিয়া মৌলিক চার শক্তির একটি, যাকে বলে ইলেকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশন, তা থেকে সৃষ্ট। কোন কোন বস্তুর এটমের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র থেকে এই তেজষ্ক্রিয়া এমনিতেই বিকিরণ হয়।
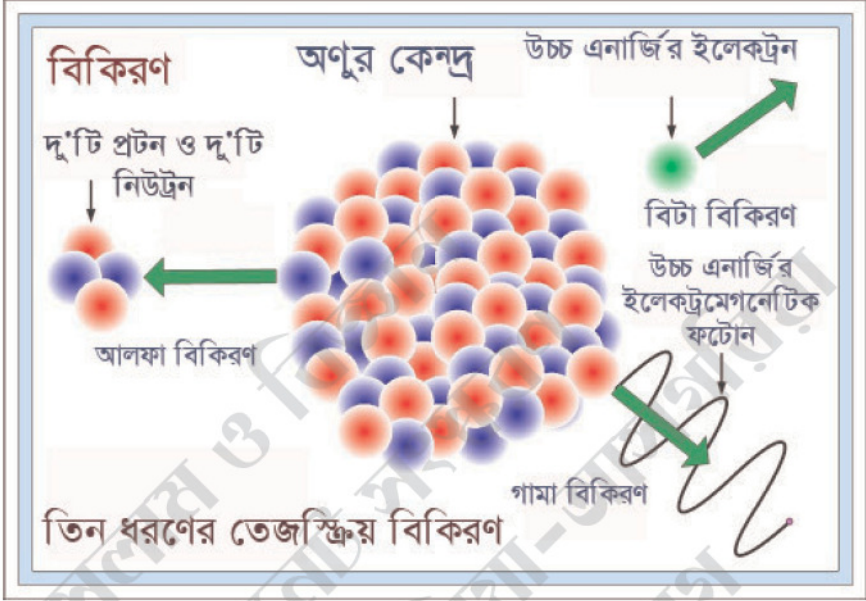
১৮৯৬ সালে জেতষ্ক্রিয়া সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। পিয়ার ও মেরী কিউরী নামক স্বামী-স্ত্রী জুটি এই ক্রিয়াকে রেডিওএক্টিভিটি নামকরণ করেন। তাঁরা প্রমাণ করেন যে, ইউরেনিয়াম (আনবিক বোমা তৈরীর পদার্থ) হচ্ছে বাস্তবে একটি তেজষ্ক্রিয়াসম্পন্ন পদার্থ। এছাড়া পলোনিয়াম ও রেডিয়ামে যে তেজষ্ক্রিয়া আছে তা-ও তাঁরা আবিষ্কার করেন। শেষোক্ত দুটি পদার্থের হাফ-লাইফ বা অর্ধ-জীবন [এ ব্যাপারে একুট পরেই আলোচিত হবে] অনেকটা কম এবং ইউরেনিয়াম থেকেও এগুলো বেশি রেডিওএক্টিভ (তেজক্রিয়াসম্পন্ন)।

এটমের নিউক্লিয়াস

তেজষ্ক্রিয়াকে বুঝতে হলে এটমের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র নিয়ে আবারও আমাদের গবেষণা করতে হবে। আমরা জানি এটমের কেন্দ্রে দুটি পরমাণু আছে- এর একটি হলো প্রটোন (চার্জ- ধণাত্মক) এবং নিউট্রন (চার্জ- নেই)। এ দুটিকে একত্রে বলে নিউক্লিওন্‌স। আমরা এটাও জানি একটি এটমে সমপরিমাণ ইলেকট্রন ও প্রটোন

আছে। তাই নেগেটিভ চার্জ সম্বলিত ইলেকট্রন ও পজিটিভ চার্জ সম্বলিত প্রটোন থাকায় এটমের মধ্যে একটি ব্যালান্স তৈরী হয়। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি এটমের নিউক্লিয়াসে যেসংখ্যক প্রটোন থাকে সেটাকে বলে এটমিক নাম্বার এবং যতোটি নিউক্লিওন্স আছে তা হলো এটমের ম্যাস নাম্বার। পিরিওডিক টেবিল থেকে সহজেই দেখা যায় যে, প্রতিটি ইলেমেন্ট বা মৌলিক পদার্থেরই একেকটি আলাদা এটমিক নাম্বার আছে। তবে এটমের কেন্দ্রে একই পদার্থের ম্যাস নাম্বার (ওজন নাম্বার) ভিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ একই পদার্থের এটমের নিউক্লিয়াসে এটমিক নাম্বার একটি হলেও এর মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকতে পারে। এই প্রতিটি (অর্থাৎ কতটি ভিন্ন ম্যাস আছে সে হিসেবে) ভিন্নতাকে বলে এই ইলেমেন্টের আইসোটপ। সুতরাং একই পদার্থের বিভিন্ন আইসোটপ থাকতে পারে। সাধারণত এটম যতো ভারী হবে এর আইসোটপের সংখ্যাও ততো বেশি হবে।
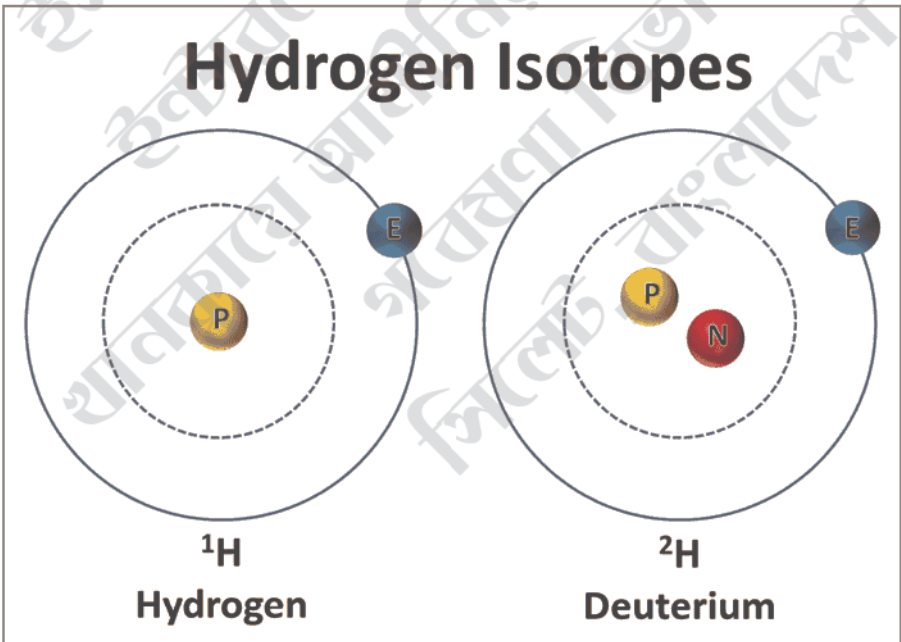
তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, পদার্থের ম্যাস নাম্বার ভিন্ন হলে এটাকে বলে আইসোটপ। এখন একই পদার্থের ভিন্ন আইসোটপকে আমরা কিভাবে সনাক্ত করবো। বিজ্ঞানীরা সাধারণত এই পরিচিতিকরণের জন্য পদার্থের নামের সাথে হাইফ্যান যোগ করে ম্যাস নাম্বারটি সংযুক্ত করেন। যেমন "কার্বন- ১৪"। অন্য আরেকটি লেখনপদ্ধতি হলো C_{14}। এখানে C হচ্ছে কার্বনের কেমিক্যাল সংকেত।

স্থিতিশীল ও অস্থির নিউক্লিয়াস

আগেই বলেছি, কোন এটমের স্থিতিলীশতা নির্ভর করে এর নিউক্লিয়াসে কটি নিউট্রন ও প্রটোন আছে সেটার উপর। অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রটোন এবং ইলেকট্রনের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ যদি সামঞ্জস্য বা ব্যালান্স সৃষ্টি করে তবে এটমটি হবে স্থিতিশীল। সব এটম কিন্তু এভাবে স্থিতিশীল নয়।

স্থিতিশীল ও অস্থির নিউক্লিয়াস

কিছু কিছু এটমের বা পদার্থের নিউক্লিয়াস অস্থিরও আছে। তবে এ অবস্থায় নিউক্লিয়াসটি থাকতে চায় না। সে চায় ব্যালান্স। সুতরাং সে তার নিউক্লিয়াসের কিছু নিউক্লিওন্‌স (প্রটোন ও নিউট্রন) দূরে ছেড়ে দেয় যাতে স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। এই অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াসকে বলে রেডিওআইসোটপ। আর এই দূরে ছেড়ে দেয়া বা বহিষ্ককরণকেই বলে রেডিওএক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা।

তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে পদার্থের মধ্যে রদবদল ঘটে। কালে এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তবে এটমের নিউক্লিয়াসের ওজনের উপর নির্ভর করে- এ পরিবর্তনে সময় কতটুকু ব্যয় হবে।
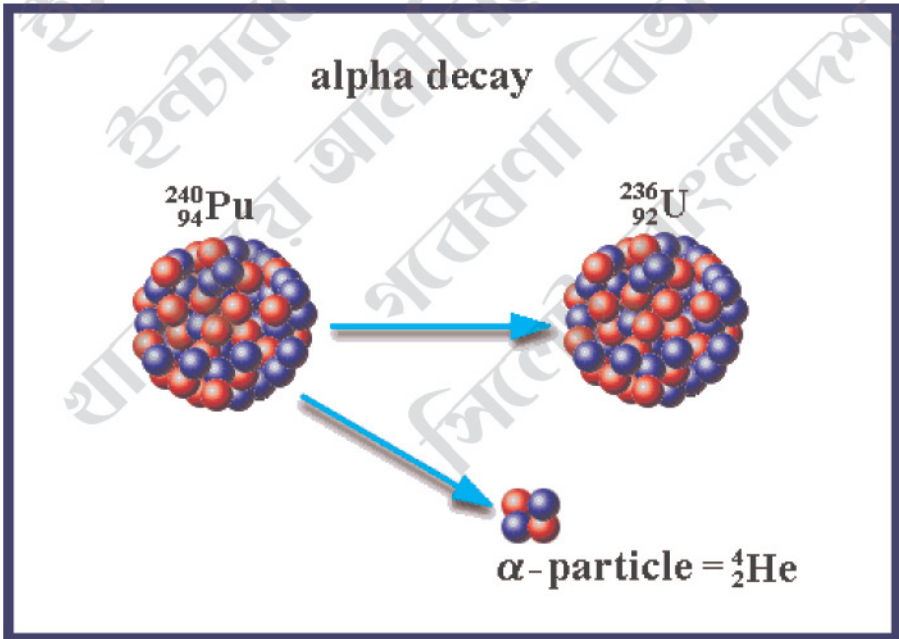
এই পরিবর্তন হওয়ার কয়েকটি ধারা আছে। তেজস্ক্রিয়ার বা রেডিয়েশনের মাধ্যমে উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন পার্টিকেল বা পরমাণু বিকিরণ হয়। বাস্তবে সাধরণত তিন ধরণের পার্টিকেল বিকিরণ হয়: এক. আলফা পার্টিকেল, দুই. বিটা ডিকে (ক্ষয়) ও তিন. গামা রেইজ (রশ্মি)।
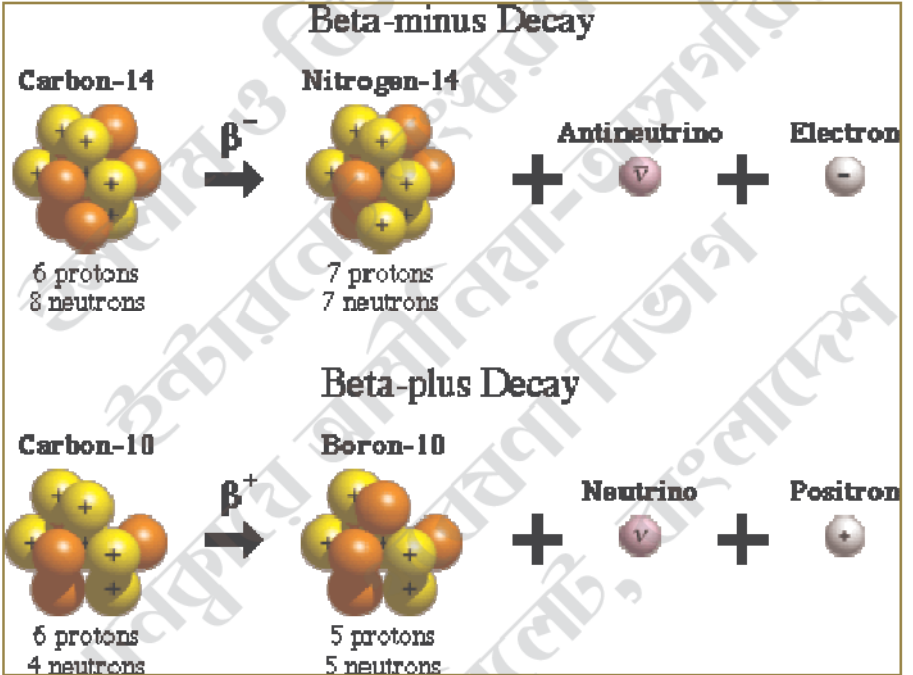
আলফা ও বিটা পার্টিকেল ক্ষয়ের কারণে পদার্থের নিউক্লিয়াসে চার্জের মাধ্যমে তা অপর পদার্থে রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে গামা রশ্মি হচ্ছে একধরণের আনবিক এনার্জি বিকিরণ। আলফা পার্টিকেল একমাত্র উচ্চ ম্যাসসম্পন্ন (ওজনবিশিষ্ট) ইলেমেন্ট থেকে বিকিরণ হয়। আলফা পার্টিকেল হিলিয়াম নামক পদার্থের কিউক্লিয়াসের সমান। অর্থাৎ এতে আছে দুটি প্রটোন ও দুটি নিউট্রন। রেডিওআইসোটপ থেকে এই পার্টিকেল ক্ষয় হলে পদার্থের নিউক্লিয়াস বদলে অন্য পদার্থে পরিণত হয়। কারণ এটা দুটি প্রটোন ও দুটি নিউট্রন নিয়ে চলে যায়। যেমন রেডিয়াম-২২৬, আলফা পার্টিকেল রেডিয়েশনের মাধ্যমে রেডন-২২২-এ রূপান্তরিত হয়। অপর আরেকটি পরিবর্তন হচ্ছে পলোনিয়াম-২০৯ থেকে লেড-২০৫ [সীসা]-এ পরিণত হওয়া।
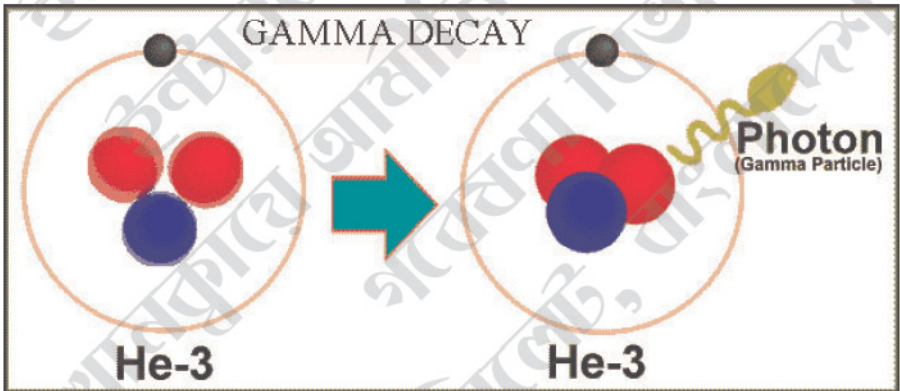
বিটা পার্টিকেল হচ্ছে দুধরণের। এর একটিকে বলে নিগেট্রন (বা ইলেকট্রন) আর অপরটিকে বলে পজিট্রন। কোন কোন রেডিওআইসোটপ যার মধ্যে অতিরিক্ত নিউট্রন আছে তা হয়তো একটি নিউট্রনকে প্রটোনে রূপান্তরিত করে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে। এই প্রসেসেই পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকে একটি নেগেটিভ বিটা

পার্টিকেল ছেড়ে দেয়া হয়। সুতরাং বিটা বিকিরণের মাধ্যমে এটমিক নাম্বার এক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই রদবদলের মাধ্যমে কিছু অতিরিক্ত এনার্জি নিউক্লিয়াসে জমা হতে পারে। এটম এই এনার্জিকে মুক্ত করতে যেয়ে গামা রশ্মি বিকিরণ করে। এই প্রসেসে যেসব পদার্থ পরিবর্তন হয় তার উদাহণর হচ্ছে ফোসফোরাস-৩২ থেকে সোলফার-৩২ এবং কোবল্ট- ৬০ থেকে নিকেল- ৬০।

রেডিওআইসোটপের অতিরিক্তি প্রটোন অপর আরেকটি উপায়ে বদলে যেয়ে স্থিতিশীল হতে পারে। এই প্রসেসকে বলে পজিটিভ বিটা পার্টিকেল বা পজিট্রন বিকিরণ। নিউক্লিয়াসের একটি প্রটোন নিউট্রনে রূপান্তরিত হয় পজিট্রন বিকিরণের মাধ্যমে। সুতরাং এরফলে এটমিক নাম্বার একটি সংখ্যা কমে যায়। আর এই রদবদলের সময় যে অতিরিক্ত এনার্জি নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে আসে তা হলো গামা রশ্মি তেজস্ক্রিয়া। পজিট্রন বিকিরণের উদাহরণ হলো নাইট্রোজেন-১৩ থেকে কার্বন-১৩ এবং অক্সিজেন-১৫ থেকে নাইট্রোজেন-১৫-তে রূপান্তর।

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, গামা রেডিয়েশন সাধারণত ফোটন হিসেবে (অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে) বিটা রেডিয়েশনের প্রসেস থেকে সৃষ্টি হয়। পজিটিভ ও নেগেটিভ বিটা রেডিশয়েশন থেকে সৃষ্ট অতিরিক্ত এনার্জি নিউক্লিয়াস থেকে তেজস্ক্রিয়া হিসেবে বিকিরণ হওয়াই হচ্ছে গামা রশ্মি। তবে কিছু নিউক্লিয়াস আছে যারা এমনিতেই এই তেজস্ক্রিয়া বিকিরণ করে। এ ধরণের রেডিয়েশন কিন্তু পদার্থের নিউক্লিয়াসের এটমিক নাম্বার কিংবা ম্যাস নাম্বার রদবদল করে না। অর্থাৎ পদার্থটি বদলে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় না। এই উপায়ে মূলত নিউক্লিয়াসের অতিরিক্ত এনার্জি মুক্ত করে দেয়া হয়। এরূপ গামা রেডিয়েশনের একটি উদাহরণ হচ্ছে আয়োডাইন-১৩১ রেডিওআইসোটপ।
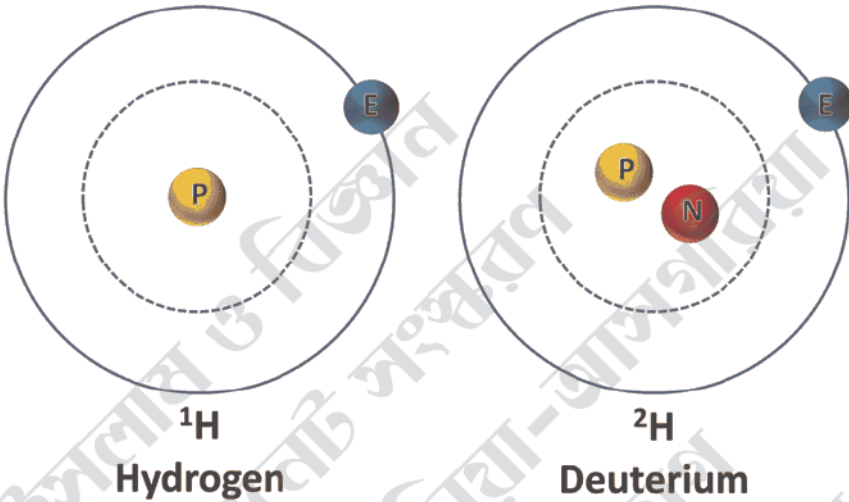
একটি বিশেষ ক্ষয়ের (তেজস্ক্রিয়ার) উদাহরণ হচ্ছে রেডিয়াম-২২৩। এই রেডিওআইসোটপ থেকে একটি কার্বন নিউক্লিয়াস (কার্বন-১৪) ক্ষয় হয়ে তা লেড-২০৬ (সীসা- ২০৬)-এ রূপান্তরিত হয়।

অর্ধ-জীবন (টি ১/২)

রেডিওএক্টিভিটির সঙ্গে হাফ-লাইফ নামক কথাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হাফ-লাইফ বা অর্ধ-জীবন হচ্ছে, একটি রেডিওএক্টিভ বা তেজস্ক্রিয়াশীল আইসোটপ, তার প্রাথমিক ম্যাস (ওজন) অর্ধেকে কমে আসতে যেটুকু সময় নেয়- তা-ই। অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আইসোটপের ওজন কমে আসে। পূর্বের তুলনায় অর্ধেক ওজনবিশিষ্ট হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়- এই সময়টি হলো অর্ধ-জীবন। তবে অর্ধ-জীবন একটিই নয়- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি অর্ধ-জীবন আছে। অর্থাৎ এক অর্ধ-জীবন বাদে ৫০% ম্যাস অবশিষ্ট থাকে, দুই অর্ধ-জীবন অতিবাহিত হলে ম্যাস থাকে ২৫%, তিন অর্ধ-জীবন বাদে থাকবে ১২.৫% ওজন

ইত্যাদি। এই প্রসেসে কিন্তু একটি পদার্থ অপর আরেকটি পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকে। তবে সাধারণত অনেক পদার্থেরই অর্ধ-জীবন অত্যন্ত দীর্ঘ। উদাহরণস্বরূপ রেডিয়াম- ২২৬-এর কথা বলা যেতে পারে। এর অর্ধ-জীবন হলো ১,৬০০ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে এর ম্যাস হবে ৫০% এবং এটি পরিবর্তিত হবে অপর পদার্থ রেডন- ২২২ এবং হিলিয়াম- ৪-এ। অবশ্য কোন কোন পদার্থের হাফ-লাইফ এক সেকেন্ডের এক বিলিয়নের এক অংশও হতে পারে। আবার কোনটির অর্ধ-জীবন কোটি কোটি বছরও আছে। মনবতৈরী আইসোটপের অর্ধ-জীবন সাধারণত অতি অল্প হয়ে থাকে। তবে অকৃত্রিম পদার্থের অর্ধ-জীবন দীর্ঘ বলেই প্রতীয়মান হয়।

কিছু সুপরিচিত পদার্থ ও তাদের অর্ধ-জীবন হলো: ১. ইউরেনিয়াম- ২৩৮, অর্ধ-জীবন ৫ বিলিয়ন বছর; ২. ইউরেনিয়াম- ২৩৫, অর্ধ-জীনব ৭০০ মিলিয়ন বছর; ৩. প্লেটোনিয়াম- ২৩৯, অর্ধ-জীবন ২৪,০০০ বছর; ৪. কার্বন- ১৪, অর্ধ-জীবন ৫,৬০০ বছর; ৫. কোবল্ট- ৬০, অর্ধ-জীবন ৫ বছর,; ৬. আয়োডিন- ১৩১, অর্ধ-জীবন ৪ দিন; ৭. স্বর্ণ- ১৯৮ (অস্থিতিশীল স্বর্ণ), অর্ধ-জীবন ৩ দিন; সোডিয়াম- ২৪, অর্ধ-জীবন ১৫ ঘণ্টা; ৮. ফ্লোরিন- ১৭, অর্ধ-জীবন ১ মিনিট; পলোনিয়াম- ২১৪, অর্ধ-

জীবন ০.০০০০০০০৩ সেকেন্ড (মাত্র এক মুহূর্ত) এবং সীসা, অর্ধ-জীবন নাই (এটা স্থিতিশীল)।
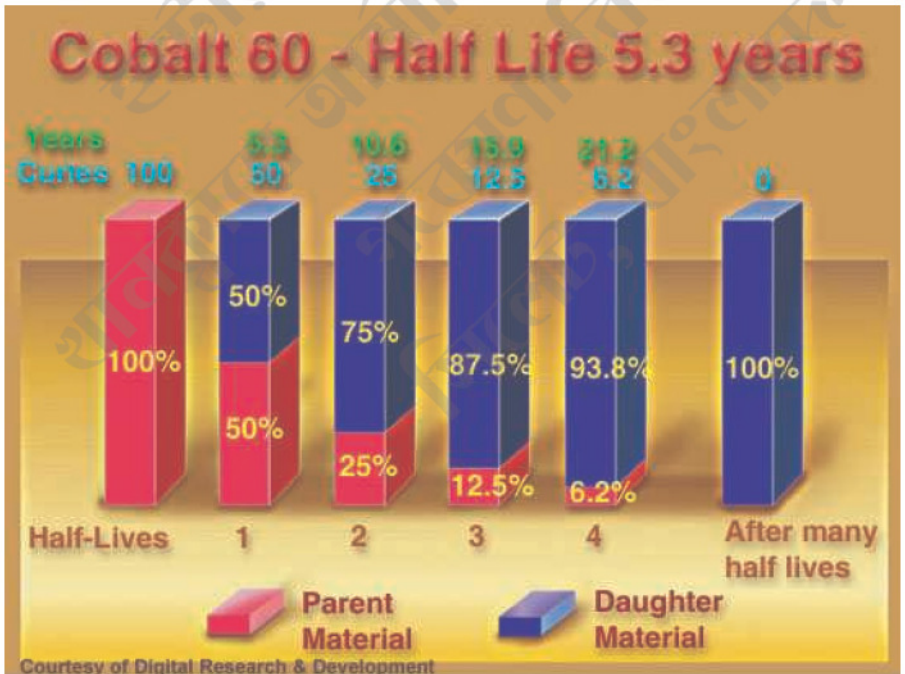
কার্বন ডেইটিং

তেজষ্ক্রিয়তার সঙ্গে সম্পৃক্ত অর্ধ-জীবন পদ্ধত্তি থেকেই অতি পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক বস্তুর বা যুগের সঠিক বয়স নির্দিষ্ট করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত গবেষণায় কার্বন ডেইটিং টেকনিক বা কার্বন-তারিখনির্ধারণ পদ্ধতি আজকাল এক শক্তিশালী সিস্টেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কার্বন-ডেইটিং সিস্টেমে কয়েকটি বিষয়ের সঠিক তথ্য ব্যবহৃত হয়। এই পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর দেহে কার্বন-১৪ নামক তেজষ্ক্রিয়াশীল কিছু না কিছু বস্তু থাকে। এই পদার্থটি মূলত বায়ুমণ্ডল ও প্রাণীদেহের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইয়োক্সাইডের সচরাচর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদজীবী যথাক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস ও ফটোসিন্‌থেসিসের মাধ্যমে উপর্যুক্ত দুটি গ্যাস দেহের মধ্যে প্রবেশ-বহিষ্করণ করে। এ থেকেই দেহের ভেতর কার্বন-১৪ জমা হয়। কিন্তু প্রাণী বা উদ্ভিদের যখন জীবনাবসান ঘটে তখন উপরোক্ত গ্যাস দুটোর ক্রিয়া ও রদবদল বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরই তাই দেহের ভেতরের জমাকৃত অস্থিতিশীল কার্বন-১৪ তেজষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয় হতে শুরু করে।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, কার্বন-১৪-এর অর্ধ-জীবন হলো ৫,৬০০ বছর। অর্থাৎ এই সময় অতিবাহিত হলে কার্বন-১৪ ক্ষয় হয়ে অর্ধেক পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং একটি মৃতদেহ ৫,৬০০ বছর পর জীবীত থাকতে যে পরিমাণ তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ করতো সে তুলনায় ঠিক অর্ধেক পরিমাণ তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ করবে। তবে অর্ধ-জীবন পরও তেজষ্ক্রিয়া কিন্তু কমে না, এটা সর্বদাই বিকিরণ করতে থাকে। সুতরাং এই রেডিয়েশন কি তা মেপে নিলেই কতদিন পূর্বে এই দেহটি পৃথিবীতে

জীবিত ছিলো তা সহজেই বের করা যায়। এই উপায়ে কোন প্রণী কিংবা উদ্ভিদের মৃত্যুর তারিখ নির্ধারণকেই বলে কার্বন-ডেইটিং।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা কার্বন-ডেইটিংয়ের মাধ্যমেই অনেক পুরাতন কার্বন-বেইস্ড বস্তু ও প্রাণীর 'ফসিল' [প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত প্রাণীর দেহাবশেষ] থেকে রেডিয়েশন মেপে তা কতদিন পূর্বে জীবিত ছিলো তা জেনে নেন। যেমন: মিশরের মমিগুলো ঠিক কতদিনের পুরাতান তা তারা সঠিকভাবে নির্ণিত করেছেন কার্বন-ডেইটিংয়ের মাধ্যমে।

Radioactive Parent	Stable Daughter	Half life
Potassium-40	Argon-40	1.25 billion yrs
Rubidium-87	Strontium-87	48.8 billion yrs
Thorium-232	Lead-208	14 billion years
Uranium-235	Lead-207	704 million years
Uranium-238	Lead-206	4.47 billion years
Carbon-14	Nitrogen-14	5730 years

"তিনি পবিত্র, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ ও ওরা যা জানে না তার প্রতিটি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়" [সূরা ইয়া-সীন ঃ ৩৬]।

পরিচ্ছেদ ৯

বিদ্যুৎ ও চুম্বক

আধুনিক যুগে টেকনোলজির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও চুম্বক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের স্বরূপ বুঝতে না পারলে মডার্ণ প্রযুক্তির অনেককিছুই বুঝা সম্ভব নয়। এই পরিচ্ছেদে তাই আমরা প্রথমে বিদ্যুৎ ও পরে চুম্বক এবং বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ কি?

বিদ্যুৎ বাস্তাবে একটি এনার্জি বা উদ্যম। বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ আছে। এ থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বৈজ্ঞানিক থিওরীবলীর মধ্যে বিদ্যুৎ ও চুম্বক নিয়ে গেল শতকে গভীরভাবে গবেষণা হয়েছে। বিদ্যুৎ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের ফলেই ইলেকট্রিক মটর, জেনারেটর, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, এক্স-রে যন্ত্র, কম্পিউটার, নিউক্লিয়ার এনার্জি ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে রাতেরবেলা বড় বড় শহর, রাস্তাঘাট, ফুটবল খেলার মাঠ ইত্যাদি দিনের মতো আলোকিত করা হচ্ছে। আজকের আধুনিক সভ্যতা অনেকটা বিদ্যুতের উপর নীর্ভরশীল।

বিদ্যুৎ আগেই বলেছি, ইলেকট্রিক চার্জ থেকে সৃষ্ট। আপনি যদি আম্বার নামক একখণ্ড মিনারেল জাতীয় বস্তুকে এক টুকরো লোমযুক্ত চামড়া দিয়ে ঘর্ষণ করেন তবে আম্বার খণ্ডটি এমন হবে যে, এর কাছে পালক কিংবা কাগজের টুকরো নিয়ে আসলে তা আকর্ষিত হবে। আম্বারের এই গুণ সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জানতো। তবে

এর কারণ জানা ছিলো না। গ্রীক ভাষায় আম্বারকে বলে, ইলেকট্রন। এই শব্দ থেকেই ইলেকট্রিক শব্দটি এসেছে। আম্বারের এই গুণ সম্পর্কে ষষ্ঠ শতকে গবেষকরা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং অন্যান্য বস্তু, যেমন কাঁচের মধ্যে এই গুণ আবিষ্কার করেন। এছাড়া আরও একটি তথ্য বেরিয়ে এলো যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আকর্ষণের স্থলে বিকর্ষণও সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ঘর্ষণ থেকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুটিই সৃষ্টি হয়। সুতরাং বিজ্ঞানীরা আকর্ষণের নামকরণ করলেন, পজিটিভ (ধনাত্মক) ও বিকর্ষণকে নাম দিলেন নেগিটিভ (ঋণাত্মক) চার্জ। তাহলে বৈদ্যুতিক উপায়ে চার্জকৃত কোন বস্তু হওয়ার অর্থ দাঁড়ালো, এই বস্তু হয় অপর কোন বস্তুকে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ করবে।

এই ইলিকট্রিক চার্জ আবিষ্কারের ফলে এটা স্পষ্ট হলো যে, সব বস্তুর মধ্যেই এই চার্জ আছে যা সৃষ্টি করা যায় না কিংবা ধ্বংস করাও সম্ভব নয়। এই শক্তিটি নেচারেল শক্তি। চার্জ করা কোন বস্তু থেকে ইলেকট্রিসিটি স্বভাবতই অপর বস্তুতে চলমান হয়। অর্থাৎ নেগিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জের প্রতি চলন্ত অবস্থায় বিরাজ করে। আর এই চলার নামই হলো ফ্লো অব ইলেকট্রিসিটি বা কারেন্ট। যেমন একটি ইলেকট্রিক

সার্কেটে বেটারীর নেগিটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনালের দিকে কারেন্ট চলে। কারেন্ট-এর শাব্দিক অর্থ হলো চলমান থাকা। যেমন নদীর স্রোতকেও ইংরেজীতে কারেন্ট বলে। তবে আজকাল পারিভাষিক অর্থে কারেন্ট শব্দটি ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ইলেকট্রন নামক পরমাণু বৈদ্যুতিক তারের (কন্ডাকটার) ভেতর দিয়ে চলার নামই হচ্ছে 'কারেন্ট'।

ব্যাটারী

ব্যাটারীর মধ্যে পজিটিভ ও নেগিটিভ চার্জ আছে। যখন কোন তার দিয়ে দুটি টার্মিন্যাল সংযোগ করা হবে তখন নেগেটিভ টার্মিন্যাল থেকে পজিটিভ টার্মিন্যালের দিকে ইলেকট্রিসিটি চলমান হবে। এই চলার রাস্তায় যদি অন্য কোন ইলেকট্রিক বস্তু যেমন লাইট-বাল্ব থাকে, তবে তা জ্বলে উঠবে। লাইট-বাল্ব জ্বলার কারণ হলো, চলমান চার্জের মধ্যকার এনার্জি। ব্যাটারী বাস্তবে কেমিক্যাল এনার্জিকে বিদ্যুতে পরিণত করে।

ইলেকট্রিক্যাল ভলটেজ

বৈদ্যুতিক উপায়ে যে কোন সিস্টেম থেকে যে পরিমাণ কর্ম বা এনার্জি সম্ভব তা হলো ভলটেজ। সুতরাং ভলটেজ হলো এনার্জির পরিমাণ নির্ণয়ের একটি ইউনিট। এনার্জি যতো বেশী হবে ভলটেজও ততো বেশী হবে। যে কোন ইলেকট্রিক্যাল সার্কেটে ভল্টমিটার নামক একটি যন্ত্র সংযোগ করে ভলটেজ মাপা যায়।
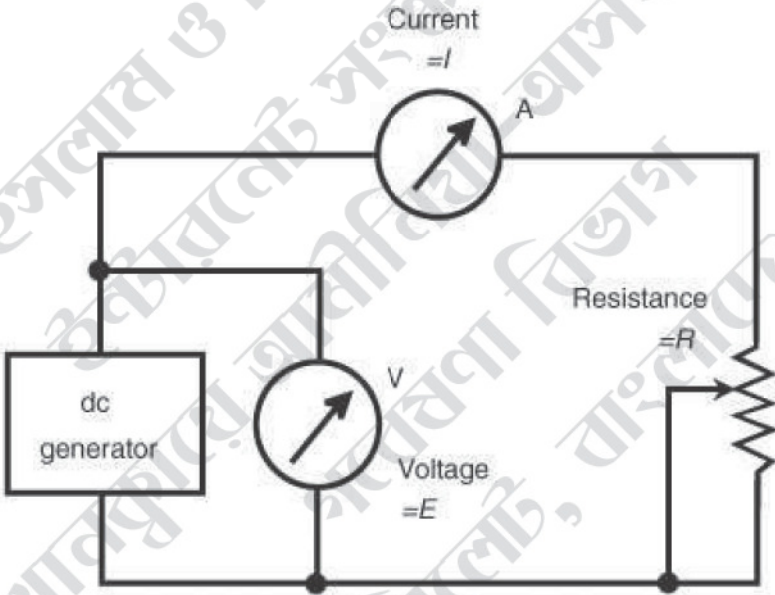
কারেন্ট

ইলেকট্রিক চার্জ চলমান থাকার নামই হচ্ছে ইলেকট্রিক কারেন্ট। কারেন্টে শক্তি কি পরিমাণ ইলেকট্রিক চার্জ প্রতি সেকেন্ডে চলমান আছে সেটার উপর নির্ভরশীল। কারেন্টকে আমপায়ার বা আম্‌প নামক ইউনিট দিয়ে মাফা হয়। ১ আম্‌প অর্থ হলো,

প্রতি সেকেন্ডে ১ কুলোম্ব (ইলেকট্রিক চার্জের পরিমাণ) চার্জ। আমিটার নামক একটি যন্ত্র দিয়ে কারেন্ট মাপা যায়।

ইনস্যুলেটর ও কন্ডাক্টার

ইলেকট্রিক চার্জ সব বস্তুর ভেতর দিয়ে সমানভাবে চলে না। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত বেশীরভাগ বস্তুর ভেতর দিয়ে কারেন্ট কম চলে। এসব বস্তুকে বলে ইনস্যুলেটর। ইনস্যুলেটররের এটমগুলো সহজে তাদের ইলেকট্রনকে ছেড়ে দেয় না। অর্থাৎ কারেন্ট চলতে হলে যে পরিমাণ ইলেকট্রনের প্রয়োজন সে পরিমাণ ইলেকট্রন এসব বস্তুতে স্বাধীন নয়- এটমের নিউক্লিয়াস এগুলোকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে। তবে ইলেকট্রিক ফিল্ড সৃষ্টি করে কিছু ইলেকট্রন মুক্ত করে দিলে এগুলো থেকেও কারেন্ট চলমান হয়। যে উপায়ে তা করা হয় তাকে বলে আয়োনাইজেশন। আয়োনাইজেশনের মাধ্যমেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। মাটি ও মেঘের মধ্যে চার্জ যখন আলাদা হয় তখন একটি শক্তিশালী ইলেকট্রিক ফিল্ড সৃষ্টি হয়। এই ফিল্ড মেঘ ও মাটির মধ্যবর্তী বায়ূকে আয়োনাইজ করে ফেলে (ইলেকট্রিসিটি চলার পথ সৃষ্টি করে দেয়)। এ থেকে সৃষ্টি হয় বৈদ্যুতিক চমক। অর্থাৎ আয়োনাইজ বায়ূ কন্ডাক্টার হিসেবে কাজ করে।
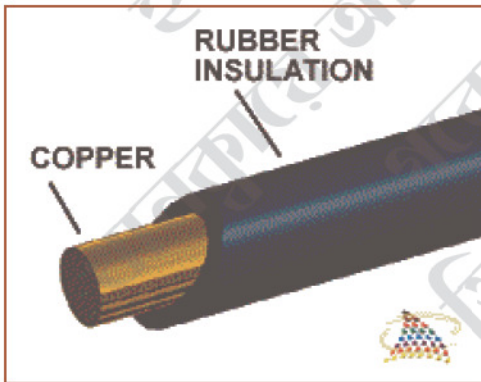
কণ্ডাক্টার ঐসব বস্তু যার ভেতর দিয়ে কারেন্ট তথা ইলেকট্রিক চার্জ সহজে চলতে পারে। এদের এটম ইলেকট্রনগুলোকে খুব শক্তভাবে ধরে রাখে না। ফলে সামান্য ইলেকট্রিক ফোর্স থেকেই কারেন্ট চলমান হয়। আজকাল বহুল ব্যবহৃত একটি কণ্ডাক্টার হলো তামা। আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রিক সার্কেটে এই তামার ব্যবহার দেখে থাকি।

রেজিসটেন্স

কণ্ডাক্টারে চলমান চার্জ তথা ইলেকট্রনকে ইলেকট্রিক ফোর্স বা ফিল্ড দিয়ে চালাতে হয়। এতে এনার্জির প্রয়োজন। ইলেট্রনগুলো কিছুদূর অগ্রসর হয়েই কিন্তু কণ্ডাক্টারের কোন না কোন এটমের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে তা ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে যায় এমনকি একেবারে স্থির হতেও পারে। এরফলে চলমান ইলেকট্রন থেকে এনার্জি এটমে স্থানান্তরিত হয়ে তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই এনার্জি তখন কারেন্টের বিপরিত শক্তি বা রেজিসটেন্স সিহেবে কাজ করে। যে কোন বস্তুর মধ্যে কতটুকু রেজিসটেন্স আছে তা যে ইউনিট দিয়ে মাপা হয় তার নাম হলো অমিটার। কোন বস্তুতে কতটুকু রেজিসটেন্স আছে তা নির্ভর করে বস্তুর ব্যাস (তারের ক্রস-সেকশনের পরিমাণ), ভলটেজের পরিমাণ, বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং বস্তুটির কণ্ডাক্টিভিটি (এটা কতটুকু চার্জ কনডাক্ট করতে পারে) ইত্যাদির উপর। কোন কোন বস্তুর রেজিসটেন্স অত্যন্ত বেশী, আবার কোনটির অতি অল্প। সম্প্রতি সীসার তাপমাত্রা কমিয়ে এবস্যুলুট শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে দেখা গেছে, এটার রেজিসটেন্স প্রায় একেবারে যিরোতে পৌঁছেছে। যেসব বস্তুতে এরূপ অল্প রেজিসটেন্স বিদ্যমান এগুলোকে বলে সুপারকনডাক্টার। সাধারণত অল্প তাপমাত্রায় বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এই সুপারকনডাক্টিভিটি বিদ্যমান।

কণ্ডাক্টার যেমন কারেন্ট চলার জন্য জরুরী তেমনি কারেন্ট থেকে তাপ-এনার্জি কিংবা লাইট-এনার্জি পেতে আমাদেরকে রেজিসস্টারও ব্যবহার করতে হয়। ইলেকট্রিক হিটার ও লাইট-বাল্ব এর 'ফিলামেন্ট' [যে তার বা কয়েলটি জ্বলে ওঠে] হচ্ছে এরূপ একেকটি রেজিসস্টার।

চুম্বক কি?

চুম্বকীয় শক্তি এমন একটি ফোর্স যা কোন বস্তুর মধ্য থেকে বেশ দূর পর্যন্ত প্রভাবশীল হতে পারে। যেটুকু দূরত্ব পর্যন্ত মেগন্যাটিক ফোর্স ক্রিয়াশীল থাকে সেই এলাকাকে বলে মেগন্যাটিক ফিল্ড। দুটি বস্তুর মধ্যে যদি চুম্বকীয় শক্তি বিদ্যমান থাকে এবং একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে তবে তা হবে পজিটিভ বা ধনাত্মক ফোর্স। কিন্তু যদি একটা আরেকটাকে বিকর্ষণ করে তাহলে তা নেগিটিভ বা ঋণাত্মক ফোর্স। যেসব বস্তুর মধ্যে মেগন্যাটিক শক্তি আছে এগুলোকে বলে মেগনেট বা চুম্বক।
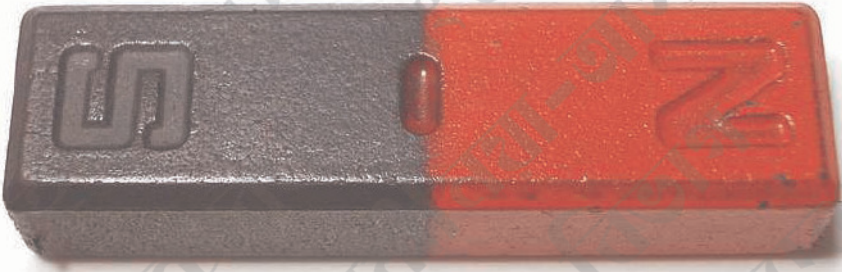
আমরা অহরহ চুম্বক ও এর ক্রিয়া দেখতে পাই। একটি স্ক্রু ড্রাইভারের মাথায় চুম্বকশক্তি থাকায় এটি দ্বারা স্ক্রুগুলোকে এমনিতে ধরে রাখা যায়; কম্পাস মূলত একটি চুম্বক যা পৃথিবীর উত্তরমেরুর দিকে আকর্ষিত হয়ে সেদিকে স্থির হয়। এগুলো হচ্ছে চুম্বক। কিন্তু বাস্তবে সমস্ত পৃথিবীটাও একটি বিরাট চুম্বক এবং প্রায় সব বস্তুতেই কিছু না কিছু চুম্বকশক্তি আছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা চুম্বক নয় এমন বস্তুর মধ্যেও চুম্বকের শক্তি মাপা যায়।

চুম্বক সম্পর্কে আমাদের সবার ধারণা থাকলেও এই চুম্বক আজকের টেকনোলজিতে যে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সে ব্যাপারে আমরা কতটুকু ওয়াকিবহাল? সাধারণ স্ক্রু ড্রাইভার থেকে, ইলেকট্রিক মটর, জেনারেটর, হাই-টেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতিতে এই চুম্বক ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া লাউড স্পীকার, টেপ রেকর্ডিং, কম্পিউটার ইত্যাদিতেও চুম্বকের ব্যবহার অপরিহার্য।

মোটকথা চুম্বক যেহেতু বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই যে কোন বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক বস্তুতে এর ব্যবহার করা একান্ত জরুরী।

চুম্বক সাধারণত দুধরণের হয়ে থাকে: ১. সাধারণ চুম্বক ও ২. বৈদ্যুতিক-চুম্বক (ইলেকট্রমেগন্যাট)। সাধারণ চুম্বকের দুটি মেরু বা পোল আছে। একটি হচ্ছে উত্তর ও অপরটি দক্ষিণ মেরু। অর্থাৎ একটি উত্তরমেরুর দিকে ও অপরটি দক্ষিণমেরুর দিকে আকর্ষিত হয়। দুটি ভিন্ন চুম্বকের একই ধরণের মেরু বিকর্ষণ আর ভিন্ন ধরণের মেরু আকর্ষণ সৃষ্টি করে। চুম্বকের এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত একাধিক ফোর্স লাইন আছে। প্রাকৃতিকভাবে কিছু বস্তু এমনিতেই একেকটি চুম্বক। যেমন আয়রন অক্সাইড। এসব বস্তুকে বলে পারমানেন্ট বা স্থায়ী চুম্বক। তবে স্থায়ী চুম্বক কৃত্রিম উপায়েও সৃষ্টি করা যায়। এরজন্য বিশেষ ধরণের পদার্থের প্রয়োজন যেমন, লৌহ, নিকেল ইত্যাদি। স্থায়ী চুম্বক তৈরী সহজ। একটি পারমানেন্ট চুম্বকের ফিল্ডে একই দিকে বস্তুকে ঘর্ষণ কিংবা চলমান রাখলেই তা চুম্বকে পরিণত হবে। এই সৃষ্ট স্থায়ী চুম্বকের শক্তি ধ্বংসও করা যায়। একে উক্ত স্থায়ী চুম্বকের সঙ্গে উল্টো দিকে ঘর্ষণ কিংবা ফিল্ডে চলমান রাখলে তার চুম্বকশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এ হচ্ছে প্রথম ধরণের চুম্বক।

দ্বিতীয় ধরণের চুম্বক হলো ইলেকট্রমেগন্যাট বা বৈদ্যুতিক চুম্বক। আর এই চুম্বকটিই আজকাল বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা দেখেছি কিভাবে স্থায়ী চুম্বকের সঙ্গে ঘর্ষণের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে চুম্বক তৈরীও করা যায় আবার ধ্বংসও করা যায়। চুম্বকের যেহেতু আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি আছে তাই এটিকে তৈরী ও ধ্বংস করার সহজ এবং

স্বয়ংক্রিয় কোন পদ্ধতি পাওয়া গেলে বিভিন্ন যন্ত্রে ব্যবহার অনেকটা সহজ হয়ে উঠে। এখানেই আসে ইলেকট্রমেগন্যাটের ব্যবহার।

যে বস্তুটি চুম্বক ও চুম্বক-নয় হিসেবে কাজ করবে তাকে যদি বৈদ্যুতিক তার দ্বারা পেছিয়ে কারেন্ট চলমান করা হয় তাহলে সেটা চুম্বকশক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে- আবার কারেন্ট চলা বন্ধ হলেই সে চুম্বকীয় শক্তি হারিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ এটা চুম্বক কিংবা চুম্বক-নয় তা কারেন্ট চলার উপর নির্ভরশীল। এরূপ চুম্বকের নামই হচ্ছে বৈদ্যুতিক-চুম্বক। টেকনোলজিষ্টরা তাই ইচ্ছেমতো এই চুম্বককে ব্যবহার করতে পারেন। তার থেকে শক্তির প্রয়োজন হলে কারেন্ট চালানো হয়- আর শক্তির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই কারেন্ট বন্ধ করে এটিকে শক্তিহীন করা হয়। সাধারণতঃ লোহার ধাতু দিয়ে বৈদ্যুতিক-চুম্বক তৈরী করা হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক চুম্বক যন্ত্রপাতির ভেতর সুইচ হিসেবে কাজে লাগানো যায়। এরূপ সুইচকে বলে রিলে।
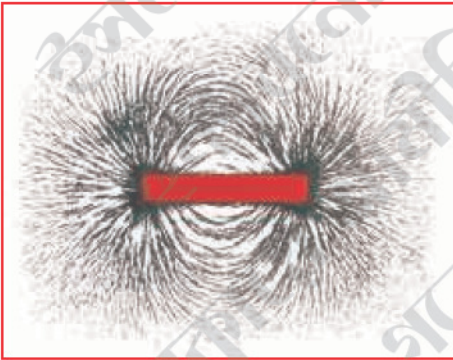
বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ব্যবহার আজকের প্রযৌক্তির যুগে কি পরিমাণ হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। প্রায় প্রতিটি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ ও চুম্বক- বিশেষকরে বৈদ্যুতিক চুম্বকের প্রয়োজন পড়ে। এ দুটি নেচারেল এনার্জি মূলতঃ মৌলিক শক্তি ইলেকট্রমেগন্যাটিক ফোর্স (স্বভাবের চার মৌলিক শক্তির একটি) থেকে উদ্ভুত। আজকের জগতে কোন প্রযুক্তিসম্পন্ন অর্থনীতিতে ইলেকট্রিসিটি ও মেগন্যাটিজম যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা অতীতে কোন সময়ই ছিলো না। সুতরাং প্রযুক্তির এই ফিল্ডে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা যে কোন অর্থনীতির জন্য একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে টেকনোলজিক্যাল উত্তানে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের উপর গভীর গবেষণার লক্ষ্যে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ, বলতে গেলে আজকের প্রযুক্তির মেরুদণ্ডই হচ্ছে এই দুটি বিষয়।

চুম্বকীয় ফ্লাক্স রেখা
S
N
S
N
ভিন্ন মেরুর মধ্যে আকর্ষণ
S
N
N
S
অনুরূপ মেরুর মধ্যে বিকর্ষণ
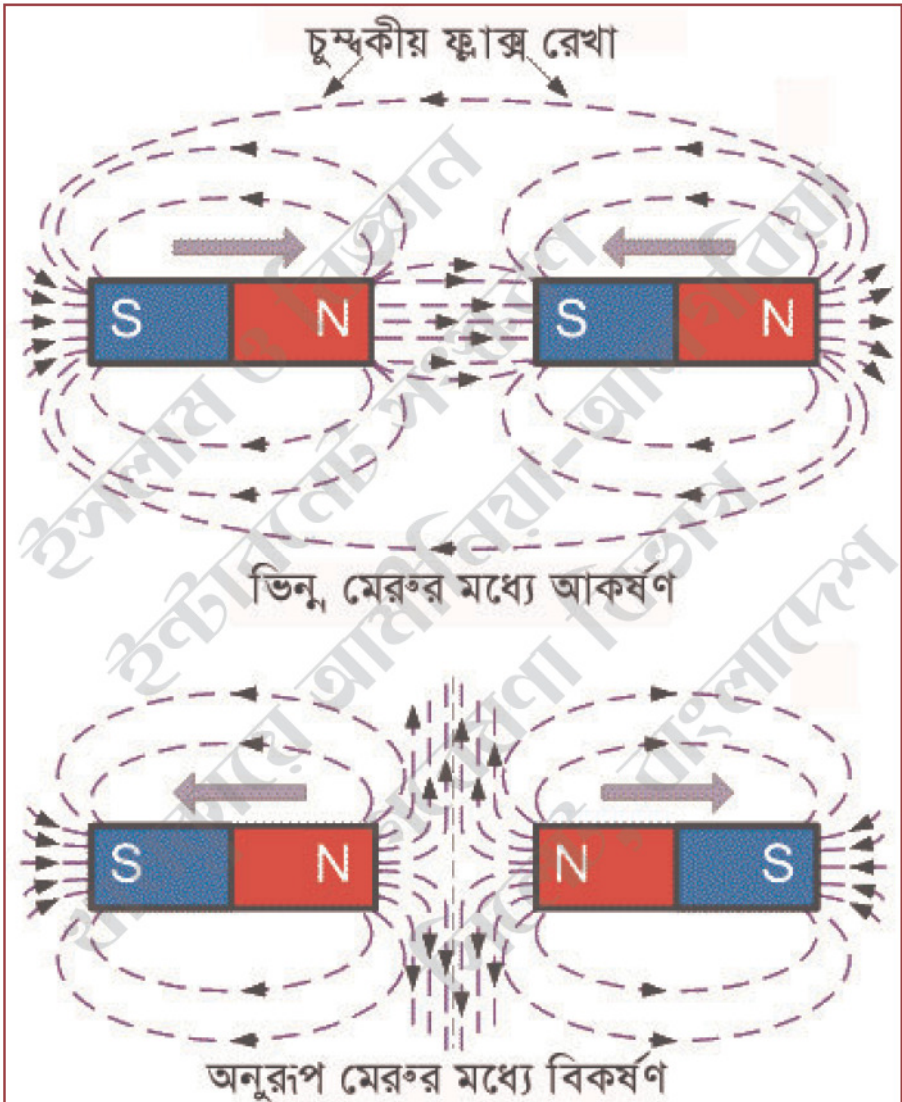
"পড়! তোমার প্রতিপালক মহামহিম; যিনি শিখিয়েছেন কলমের দ্বারা; শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না" [সূরা আলাক্ব ঃ ৩-৫]।

পরিচ্ছেদ ১০

কম্পিউটার বিপ্লব

আজকের জগতে কম্পিউটার শুধু একটি যন্ত্র নয় বরং এক বিরাট বিপ্লবের নাম। এখন ঘরে ঘরে কম্পিউটার এসেছে। এসেছে এর মাধ্যমে তথ্য প্রচারের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম ইন্টারনেট। কম্পিউটার তাই আমাদের জীবন চলার একটি নির্ভরযোগ্য উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে, এমনকি এটার উপর আমরা অনেকে নির্ভরশীল হয়ে উঠছি। এই গ্রন্থটির একটি অক্ষরও আমি কলম দিয়ে কাগজে লিখি নি। আমার আপেল কম্পিউটারের মাধ্যমে একটি ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে এই পুরো পুস্তকটি রচনা করেছি। এরপর আবার লেখাটিকে পিসি (পার্সোন্যাল কম্পিউটার) ফরমেটে কনভার্ট (পরিবর্তন) করেছি নিজেই একটি কনভার্টার প্রোগ্রাম তৈরী করে। কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আজকাল সবার জন্য একান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানের আলোচনায় কম্পিউটার প্রযুক্তির কথা না আসলে পুরো বিষয়টিই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই পরিচ্ছেদে ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতাসহ এবার কম্পিউটার বিপ্লবের কথা আমি বিস্তারিত আলোচান করবো।

আজ থেকে ৩৬ বছর আগের কথা, ১৯৭৭ ইংরেজীর শীতকাল। কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। হেভী শীতের কাপড় পরে ভোরে ঘর থেকে বের হয়েছি, বিকেল এক ঘটিকার আগে (ইংল্যান্ডের) লিভারপুল ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছুতেই হবে। ওখানে ভর্তি হবার জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, তাই ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ইউনিভার্সিটি ডেকেছে। সাসেক্সের ছোট্ট একটি টাউন- বেক্সহিল-অন-সি, ঐতিহাসিক হেস্টিংস শহরের নিকটে ইংলিশ চ্যানেলের সৈকতে। এই হেস্টিংয়ের অদূরে ব্যাটেল নামক একটি জায়গা আছে। সেখানে ১০৬৬ সালে উইলিয়াম দ্যা কনক্যুরার নামক এক রাজা ফ্রান্স থেকে এসে ইংল্যান্ডের বাদশাহ হ্যারডকে পরাজিত ও হত্যা করেছিলেন। অনেকের মতে, বৃটিশদের ইতিহাস এই বছর অর্থাৎ ১০৬৬ থেকেই শুরু হয়েছে!

বেক্সহিল-অন-সি থেকে লিভারপুল অনেক দূরে। যাক, প্রথমে রেলপথে লন্ডনের ইউস্টনে এসে এখান থেকে আবার ইন্টারসিটি-১২৫ (১২৫ মাইল বেগে চলমান ইলেকট্রিক লকোমোটিভ) ট্রেনে সময়মতো লিভারপুলে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম।
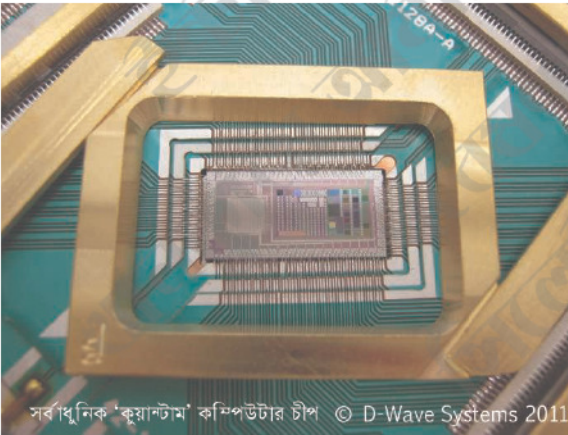
সর্বাধুনিক 'কুয়ান্টাম' কম্পিউটার চীপ © D-Wave Systems 2011

দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী এসেছে ইন্টারভিউ দিতে। ওয়েটিং রুমে বসে একবার ভাল করে তাকালাম- না আর কোন বাঙ্গালী ছাত্র চোখে পড়লো না, আমিই এখানে একমাত্র বাঙ্গালী। সবার ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর একজন লেকচারার এসে আমাদেরকে নিয়ে চললেন, ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করে দেখাতে। আমরা যখন ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবে পৌঁছুলাম, তখন দেখতে পেলাম একজন ছাত্র মোটা আকারের একটা মেশিনে কাজ করছেন। কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, এটা মাইক্রো কম্পিউটার। এ কম্পিউটারের দ্বারা একটা বলকে

এ্যানিমেশনের মাধ্যমে নড়াচড়া করা যায়। তিনি আরও বললেন, আসা করা হচ্ছে যে, অচীরেই এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার ব্যাপকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

মাত্র তিন বছর পরই কিন্তু প্রথম হোম কম্পিউটার (ZX-80) ক্রয় করে লেখালেখি ও গেম খেলতে শুরু করি। আর আজ ৩৬ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু ঘরে ঘরে কম্পিউটার আসে নি, এই যন্ত্রের উপর পুরো পৃথিবীর মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। সেদিনের ঐ লেবের কম্পিউটার এবং সেই ছাত্রের কথা আমি কখনও ভুলবো না। বলা হয়, ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিলো চাকা। আমি বলবো, আধুনিক ইতিহাসে 'কম্পিউটার' হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্ববহ এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার। পাটকবৃন্দ! আসুন, এ কম্পিউটার বিপ্লবের সুত্রপাত কিভাবে হলো তার উপর আলোকপাত করে দেখি।

কম্পিউটার কি?

এ প্রশ্নের উত্তর 'কম্পিউটার' শব্দের মধ্যেই নিহিত। কম্পিউটার একটা ইলেকট্রনিক মেশিন যার মাধ্যমে নানান ধরনের প্রসেস (কম্পিউটেশন) করা হয়ে থাকে। এসব প্রসেসের মধ্যে ভাষা (লেখা বা ট্যাক্সট্), অংক, ছবি, সাউন্ড (শ্রবণীয় শব্দ) প্রভৃতি হতে পারে। কম্পিউটার প্রসেস অতি দ্রুত গতিতে সাধিত হয়। কম্পিউটার সাধারণতঃ ৩ ধরনের হয়ে থাকে। এগুলো হলো, ডিজিট্যাল, আনালগ ও হাইব্রিড কম্পিউটার। ডিজিট্যাল কম্পিউটার নাম্বারের (ডিজিটের) মাধ্যমে কাজ করে। এ ধরনের কম্পিউটারই আজকাল বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। আপনার ঘরে যে কম্পিউটার আছে, এটা হচ্ছে একটা ডিজিট্যাল কম্পিউটার। এ প্রসঙ্গে এই ডিজিট্যাল কম্পিউটার নিয়েই আমি লিখবো।

ইনটেল চীপ

আনালগ কম্পিউটারের মধ্যে অনেক অংশ থাকে যা প্রয়োজনে রদবদল করা সম্ভবপর। এসব কম্পিউটার কোন বিশেষ কার্য সমাধা করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাইব্রিড কম্পিউটার হলো ঐসব কম্পিউটার যেটির মধ্যে আনালগ এবং

ডিজিট্যাল এ দুটি সিস্টেমই থাকে। এ ধরনের কম্পিউটারের ব্যবহার আজকাল খুবই বিরল। কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে, কম্পিউটার কিভাবে আবিষ্কৃত হলো এবং বিগত কয়েক দশকে এটির চরম উন্নতি সাধিত হলো, তা জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আসুন এবার আমরা কম্পিউটারের ইতিহাসের উপর কিছুটা আলোকপাত করে দেখি।

ঐতিহাসিকভাবে মানবসৃষ্ট প্রথম কম্পিউটার ছিলো অ্যাবাকাস। আজ থেকে প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে এ যন্ত্র চীনে আবিষ্কৃত হয়েছিলো। অ্যাবাকাস হলো কাঠের তৈরী একটি কালক্যুলেটার যার মধ্যে সারিবদ্ধভাবে কতকগুলো কাঠের তৈরী পুঁতি থাকে। এ পুঁতিগুলোকে কোন একটি বিশেষ আইন অনুযায়ী রদবদল বা প্রোগ্রাম করে যে কোনো হিসেব করা যায়। ব্যবহারকারীকে এ প্রোগ্রামের নিয়ম কানুন অবশ্যই শিখে নিতে হবে। এ ধরণের আরেকটি কমপিউটিং যন্ত্র হলো এ্যাস্ট্রলেব, যেটির মাধ্যমে অতীতে সমুদ্রে জাহাজ চলাচলে দিকনির্ণয় করা হতো। গ্রন্থের ইতিহাসখণ্ডে আমরা এ্যাস্টলেব সম্পর্কে একাধিকবার লিখেছি। যন্ত্রটি ছিলো মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত একটি প্রসিদ্ধ ন্যাভিগেশন মেশিন।

কম্পিউটার চীপের অভ্যন্তর
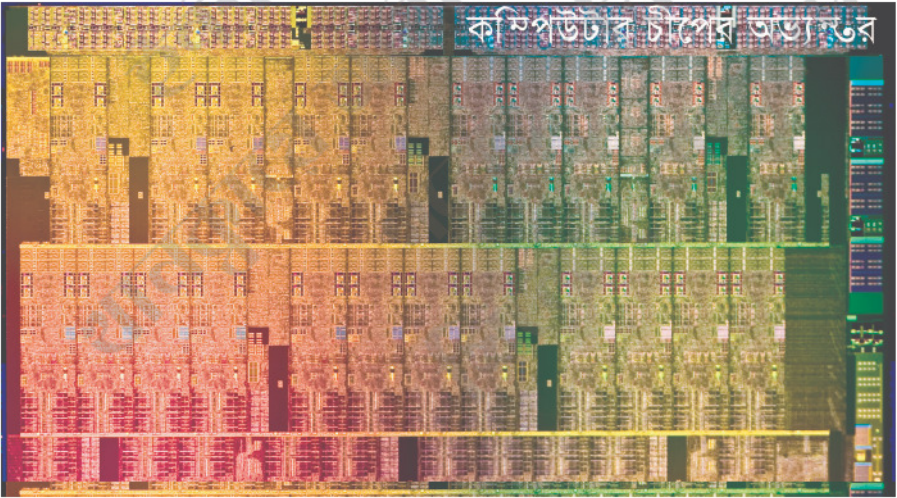
ফরাসীর বিজ্ঞানী ব্লেইজ পাসক্যাল ১৬৪২ সালে প্রথম ডিজিট্যাল কম্পিউটার আবিষ্কার করেন। পাসক্যাল এ যন্ত্র তাঁর ট্যাক্স সংগ্রাহক পিতার জন্য তৈরী

করেছিলেন। এটির মাধ্যমে শুধুমাত্র যোগ অংক করা যেতো। পাসক্যালের যন্ত্র থেকে আরও উন্নতমানের যন্ত্র পরবর্তী একশত বছরের মধ্যেও আর কেউ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি। ১৮২০ সালে টমাস কলবার নামক একব্যক্তি বাণিজ্যিকভাবে সফল-প্রথম কালক্যুলেটার আবিষ্কার করেন। এটির মাধ্যমে যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও পূরণ অংক করা যেতো। এর পরে আরও অনেক ধরনের মেশিন বাজারে বের হতে থাকে, কিন্তু এগুলো সাধারণ কালক্যুলেটার পর্যায় থেকে আর এগুতে পারে নি। একই সময় বিলেতের কেম্ব্রিজে, চার্লস বাবেজ নামক একজন গণিতের অধ্যাপক কম্পিউটারের উপর বেশ গবেষণা করে যাচ্ছিলেন। বাবেজ ১৮২২ সালের দিকে একটি বিয়োগ মেশিন তৈরী করতে সক্ষম হন। এ মেশিনটি ছিলো সম্পূর্ণ একটি মেকানিক্যাল মেশিন। মেশিনটি প্রথমাবস্থায় ছোট আকারের একটি মডেল ছিলো মাত্র, তবে কিছুদিনের মধ্যেই তখনকার সরকার বাবেজকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে বড়ো আকারের আরেকটি মেশিন তৈরী করতে বললেন। চার্লস বাবেজ ১৮২৩ সালে এ মেশিন তৈরী আরম্ভ করেন। এ মেশিনটি সত্যিকারের একটি কম্পিউটারই ছিলো। এটির মাধ্যমে প্রিন্টিং পর্যন্ত করা যেতো। তাছাড়া মেশিনটি ছিলো সম্পূর্ণ অটোমেটিক এবং প্রোগ্রাম করার যোগ্যতাসম্পন্ন। চার্লস বাবেজের এ কম্পিউটার চলতো বাষ্পীয় শক্তির মাধ্যমে।
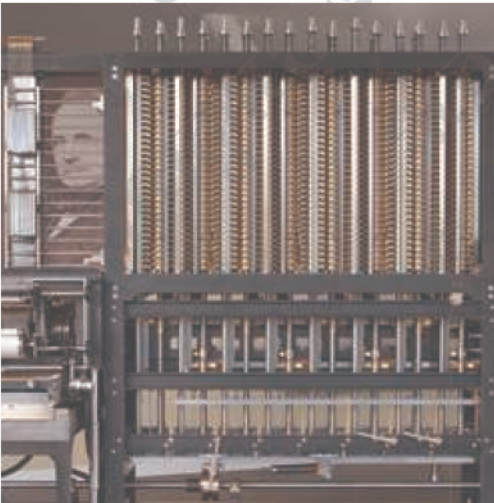
পাঠকরা ইচ্ছে করলে চার্লস বাবেজের এ কম্পিউটারের একটি ডুপলিকেট মেশিন লন্ডনের সাইন্স যাদুঘরে দেখতে পারবেন (যদি বিলেত প্রবাসী হয়ে থাকেন বা অচিরেই সেথা যাবার পরিকল্পনা থাকে)। চার্লস বাবেজের এ বিয়োগ করার মেশিন যদিও কম্পিউটার সৃষ্টির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলা যায়, তথাপি এটির ক্ষমতা বাস্তবে খুবই অল্প ছিলো। বাবেজ তাঁর এ মেশিনটাকে আরও উন্নতমানের করার লক্ষ্যে

পরবর্তী ১০ বছর প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তবে বাবেজ নিরাশ হলেন না, ১৮৩৩ সালে তিনি আরেক ধরনের কম্পিউটার সৃষ্টি করতে প্ল্যান-প্রোগ্রাম শুরু করলেন। তাঁর এ নতুন ডিজাইনের কম্পিউটারের নাম হলো, আনালিটিক্যাল মেশিন। বাবেজ এ মেশিনের পাওয়ারের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ছিলো সত্যিই দূরদর্শী, যদিও এসব স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হয় তাঁর মৃত্যুর আরও একশত বৎসর পরে।

আনালিটিক্যাল মেশিনের ডিজাইনে ছিলো ৫০ টা পর্যন্ত ডেসিমেল নাম্বারের ব্যবহার, একটা মেমরীর ব্যবস্থা যেখানে এ নাম্বারগুলো রাখা হবে, মেশিন পরিচালনা করার পদ্ধতি (অপরেটিং সিস্টেম)- যা আধুনিক কম্পিউটার করে থাকে; এমনকি প্রোগ্রাম করার ব্যবস্থাও এ মেশিনের ডিজাইনে ছিলো। বাবেজ তাঁর মেশিনে পরবর্তীতে সর্বত্র ব্যবহৃত ছোট ছোট ছিদ্র করা কার্ডের (পান্চ কার্ড) কথাও বলেছিলেন। কিন্তু বাবেজের এ মেশিন তাঁর জীবিতাবস্থায় কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে কিছুদিনের জন্য মানুষ ডিজিট্যাল কম্পিউটারের উপর উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তবে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের উপর বেশ উন্নতি সাধিত হয়, যার ফলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, প্রায় সবগুলো গতিশীল বা ডাইনামিক ঘটনাই গাণিতিক উপায়ে বীজগণিতের সমীকরণ ব্যবহার করে উপস্থাপন করা যায়। এতে যে কোন সমস্যার সমাধান এই সমীকরণ দিয়ে করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। একই সময় বাস্পীয় শক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় কুঠির শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন হতে থাকে। এক কথায়, এ সময় প্রযুক্তির এক চরম উন্নতির কাল ছিলো। তবে বাস্পীয় যন্ত্রপাতি ডিজাইন, রেললাইন তৈরী করা, বাস্পীয় জাহাজ বানানো, টেক্সস্টাইল মিল সৃষ্টি, আর বড়ো বড়ো সেতু গড়তে প্রয়োজন হয় অনেক ধরনের হিসাব নিকাশ বা অংক কষা। এসব ডিজাইন করতে হলে টেকনোলজিক্যালী ব্যবহৃত বস্তুর সেন্টার অব গ্রাভিটি (মহাকর্ষের টানের কেন্দ্র), সেন্টার অব বয়েন্সি, মমেন্টস্ অব ইনারশা এবং স্ট্রেস ডিষ্ট্রিবিউশন প্রভৃতি ব্যাপারে সঠিকভাবে অবগত হবার প্রয়োজন হয়; এমনকি বাস্পীয় যন্ত্রের পাওয়ার কতটুকু তা জানতে হলেও গণিতের দরকার হয়। এ প্রেক্ষাপটে একটি মেশিনের বেশ প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন তখনকার ইঞ্জিনিয়াররা- যেটির মাধ্যমে এসব কালক্যুলেশন সঠিক ও তাড়াতাড়ি করা যায়।

বলাই বাহুল্য এ অভাব পূরণের লক্ষ্যে ১৮৯০ সালে হারম্যান হলারিথ ও জেমস পাওয়ার নামে দুই বিজ্ঞানী বাবেজের ডিজাইনের ছিদ্র করা কার্ডের মেশিন তৈরী করলেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আদমশুমারী ব্যুরোতে কাজ করতেন। তাঁদের এ মেশিন কার্ডের ছিদ্রগুলো থেকেই প্রোগ্রামের ইনসস্ট্রাকশন বা নির্দেশ পড়ে নিতে পারতো, এখানে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হতো না। এ মেশিনের সর্বাপেক্ষা জরুরী কার্যক্ষমতা যা ছিলো তা হলো, এই কার্ড থেকে ইনসস্ট্রাকশন পড়া, আর এর কারণে কার্ডগুলোকে মেমরী (স্মৃতিরক্ষক) হিসাবে ব্যবহার করা যেতো। এ উন্নতমানের মেশিনের প্রতি অচিরেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর নজর পড়লো এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ ধরনের কার্ড মেশিন সিস্টেম বাজারে বের হলো। প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত কম্পিউটার কোম্পানী ইন্টারনেশন্যাল বিজনেস মেশিন্স (IBM) এ ধরনের মেশিন ব্যবসায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

আইবিএম ও অন্যান্য কোম্পানীর এসব কার্ড মেশিন কম্পিউটারগুলোই পরবর্তী অর্ধ শতাব্দি ধরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সফলতার সহিত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এগুলো

সর্বসাধারণের নাগালের বাইরেই ছিলো। এসব কম্পিউটারের মূল্যও ছিলো খুব বেশী, আর এ কারণেই এগুলো ক্রয় করা সাধারণ্যের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না।

গেল শতাব্দির তৃতীয় দশকের শেষের দিকে কার্ড মেশিন তৈরীর পদ্ধতি বেশ উন্নতমানের হয়ে ওঠে। যার ফলে এইকেন নামক একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী আইবিএম-এর সাথে জড়িত হয়ে একটি বড় আকারের ডিজিট্যাল কম্পিউটার তৈরী করেন। এইকেন তাঁর এ মেশিনের নামকরণ করেন, হারভার্ড মার্ক-১। এই কম্পিউটার দিয়ে ২৩টি পর্যন্ত ডেসিমেল নাম্বারের অংক করা যেতো, এছাড়া তা ছিলো সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম করার একটি মেশিন। এটা লগ (লগেরিথম) ও ট্রিগ (ট্রিগোনোমেট্রি) ফাংশনের সমাধান করতে পারতো। মার্ক-১ এর ফলাফল একটি ইলেকট্রিক টাইপরাইটারের মাধ্যমে প্রিন্ট হয়ে আসতো। তবে আজকের তুলনায় তখনকার দিনের এই মেশিনও অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন একটি কম্পিউটার ছিলো। একটা সাধারণ পূরণ অংক এ মেশিন দিয়ে করতে হলে ব্যবহারকারীকে প্রায় ৫ সেকেন্ড সময় অপেক্ষা করতে হতো! তবে মার্ক-১ সম্পূর্ণ অটোমেটিক ছিলো। আপনি কিছু করতে চাইলে আগের দিন প্রোগ্রাম করে রেখে গেলেন এবং পরের দিন এসে রেজাল্ট নিয়ে গেলেন! আগেকার দিনে কমপিউটিং এরকমই ছিলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হলো, উন্নতমানের কম্পিউটার সৃষ্টির প্রয়োজন হঠাৎ করে অনেক গুণ বেড়ে গেল। বিশেষ করে মিলিটারীর জন্য কম্পিউটার ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো। নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করা হলো এবং এগুলো কন্ট্রোল করতে কম্পিউটারের ব্যবহার দরকারী হয়ে পড়লো।

১৯৪২ সালে জন একার্ট ও জন মউজলি নামক দু'জন ইঞ্জিনিয়ার একটি কম্পিউটার সৃষ্টি করলেন, যার নাম ছিলো ই.এন.ই.এ.সি. (ইলেকট্রিক্যাল নিউমারিক্যাল ইনটেগ্রেটার এণ্ড কালক্যুলেটার)। এ মেশিন ১০টি পর্যন্ত ডেসিমেল নাম্বার নিয়ে কালক্যুলেশন করতে পারতো এবং এটা আগেকার দিনের মেশিনগুলো থেকে হাজার গুণ দ্রুততর ছিলো। তবে এ মেশিনের আয়তন অত্যন্ত বড়ো ছিলো, কারণ এটার মধ্যে প্রায় ১৮,০০০ ভ্যাকিউম (বাতাসশূন্য) টিউব ছিলো, যার ফলে এটা ১৮০০ বর্গফুট জায়গা দখল করে নিতো, তাছাড়া এটা পরিচালনা করতে ১৮০ কিলো-ওয়াট

বিদ্যুতের দরকার হতো। বলাই বাহুল্য এরূপ বিরাট আকারের মেশিন সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে ছিলো, এবং এটি খুব বেশী দিন ব্যবহৃত হয়নি।

প্রথম আপেল-ম্যাক পিসি

জন নিউম্যান নামে একজন বিজ্ঞানী ১৯৪৫ সালে কম্পিউটারের উপর বিশেষ গবেষণা আরম্ভ করলেন। তাঁর এ গবেষণার ফলে বুঝা গেল যে, কম্পিউটার একটি সাধারণ স্থায়ী মেশিন হয়েও যে কোন ধরনের কমপিউটেশন কার্য সমাধা করতে পারবে। অর্থাৎ কম্পিউটার হতে হবে সম্পূর্ণ একটি প্রোগ্রাম করার ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিন। যে কোন কমপিউটেশন কাজ করতে তাই বার বার এর যন্ত্রপাতি রদবদল করার প্রয়োজন থাকবেনা। নিউম্যানের এসব চিন্তাদ্বারা কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক নতুন সাড়া জাগালো। প্রোগ্রাম মেমরীতে জমা করে রাখার পদ্ধতি ব্যবহার করতে নতুন বৈপ্লবিক কম্পিউটার ডিজাইনের দরকার পড়লো। এবং এর ফলে আধুনিক প্রথম জেনারেশনের প্রোগ্রাম করার ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ১৯৪৭ সালে বাজারে বের হলো।

এ ধরণের কম্পিউটারে যেসব ব্যবস্থাবলী ছিলো, এর মধ্যে রানডম একসেস মেমরী (জঅগ - এর মাধ্যমে মেমরীর মধ্যে কমপিউটেশন চলাকালে ইনফরমেশন জমা করা হয় ও প্রয়োজনে বের করা হয়), এগুলো পান্‌চ কার্ড ও পান্‌চ টেপের মাধ্যমে চলতো, এগুলো খুব দ্রুত কাজ করতো এবং মেশিনগুলো আকারে অনেক ছোট ছিলো। তবে এগুলো তখনও বেশ দামী ছিলো এবং পরিচালনা করতে বেশ খরচ হতো। এক একটা মেশিন ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত চালানো যেতো। এসব কম্পিউটারে যে প্রোগ্রামিং করার ভাষা ব্যবহার করা হতো তা ছিলো 'মেশিন কোড' (প্রোগ্রামিং করার ভাষা সম্পর্কে এ পরিচ্ছেদের শেষের দিকে বিস্তারিত আলোচনা হবে)। এসব মেশিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং বাণিজ্যিকভাবে এগুলো বড়ো বড়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্য হয়।

গত শতাব্দির পঞ্চম দশকের শেষের দিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে কম্পিউটারের বেশ উন্নতি সাধিত হয়। এসব আবিষ্কার হলো মেঘন্যাটিক-কোর মেমরী বা চুম্বকীয় মেমরী এবং ট্রানসিষ্টার সার্কেট সৃষ্টি। এ দুটি যন্ত্রাংশ কম্পিউটারে জড়িত করার ফলে, রাম (রানডম এক্সেস মেমরী) মেমরীর ক্ষমতা ৮,০০০ শব্দ থেকে

৬৪,০০০ শব্দে উন্নীত করা হয়। ষাট দশকের প্রথম দিকে এসব নতুন কম্পিউটার বাজারে বের হয়। এরূপ কম্পিউটার বড়ো বড়ো অফিসে থাকতো, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশের সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এগুলোর ব্যবহার সর্বত্র করা হতো। প্রতিটি কম্পিউটার অনেক কম্পিউটার প্রোগ্রামার দ্বারা পরিচালনা করা হতো। এ সময় কম্পিউটার প্রোগ্রাম জমা (ষ্টোর) করে রাখার জন্য অল্প মূল্যে সৃষ্ট মেঘন্যাটিক ড্রামের ব্যবহার করা হয়।

ষাট দশকের শেষের দিকে আরও শক্তিশালী দ্রুত গতিসম্পন্ন কম্পিউটার সৃষ্টির প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এর ফলে, তৈরী হয় লার্ক মেশিন (এলএআরসি), এটা কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিলো। একই সময়ে আইবিএম কোম্পানী ষ্ট্রেছ নামে আরেকটি কম্পিউটার তৈরী করে। লার্ক মেশিনের কোর মেমরী ছিলো ৯৮,০০০ শব্দ এবং ১০ মাইক্রোসেকেণ্ডের মধ্যে পূরণ অংক করতে পারতো (১ মাইক্রোসেকেণ্ড = ১/১০০০০০০ বা ০.০০০০০১ সেকেন্ড)। ষ্ট্রেছ মেশিনের মেমরী ক্ষমতা ছিলো বেশী- প্রায় ১০ কোটি শব্দ, তবে তা বেশ আস্তে চলতো। এ সময় বড়ো বড়ো কম্পিউটার কোম্পানী ইনপোর্ট কনস্যাল (এক ধরণের কি-বোর্ড), পেইজ প্রিন্টার, কেথড-রে ডিসপ্লে (এক ধরণের মনিটর), গ্রাফিক্স করার যন্ত্র, মেগন্যাটিক টেপ ও মেগন্যটিক ডিস্ক ফাইল ষ্টোর করার ব্যবস্থাসহ কম্পিউটার বাজারে বের করতে থাকে। এ মেশিনগুলোর মাধ্যমে হিসাব রক্ষা, শ্রমিকদের কাজের হিসাব, দ্রব্যাদির তালিকা, দ্রব্যাদি যোগানোর অর্ডার তৈরী, রশিদ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য সহজে করা সম্ভবপর হয়ে উঠে। এই কম্পিউটারগুলোতে যে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, একটু পরই হবে) ছিলো তা এ ধরণের ব্যবহারের জন্য খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়ার বেশ প্রয়োজন ছিলো না। এ মেশিনগুলো সাধারণতঃ রেকর্ড রাখার জন্য ব্যবহার করা হতো। হাসপাতালে রোগীদের, লাইব্রেরীতে বইয়ের প্রভৃতি রেকর্ড রাখার জন্য এগুলো বেশ উপযোগী হয়ে ওঠে।

আধুনিক কম্পিউটার

বর্তমানে সর্বত্র ব্যবহৃত আধুনিক কম্পিউটার তৈরীর কাজ শুরু হয় সত্তুর দশকে। এ সময় কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা ছোট আকারের সর্বত্র ব্যবহার করার যোগ্যতাসম্পন্ন

অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের কম্পিউটার তৈরীর চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। আগেকার দিনের কম্পিউটার, কোন বিশেষ কার্য সমাধা করার লক্ষ্যে তৈরী করা হতো, কিন্তু সত্তুর দশকে কয়েকটি প্রোগ্রাম করার নিম্ন স্তরের (লো- লেভেল) ভাষা (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে) আবিষ্কৃত হওয়ায়, বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ফ্লেক্সিবল মেশিনের চিন্তাদ্বারা জাগ্রত হয়। তারা ভাবলেন যে, এমন ধরনের কম্পিউটার হওয়া দরকার যেটির মধ্যে যে কোন কার্য করার জন্য কম্পিউটার ভাষার মাধ্যমে সফট্ওয়ার তৈরী করে ঐ কার্য সমাধা করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ একই কম্পিউটারে প্রয়োজনমতো সফট্ওয়ার তৈরী করে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করা যাবে। এ সময় কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য বিশেষ বিশেষ ছোট্ট আয়তনের যন্ত্রাংশ তৈরী করা শুরু হয়। এটা তখন বুঝতে আর বাকী ছিলনা যে, যন্ত্রাংশ আয়তনে ছোট করলে পরে প্রসেসিং করা দ্রুততর ও কর্মক্ষম হবে। কম্পিউটারের মধ্যে ব্যবহৃত সার্কেটগুলোও তখন ফটো টেকনিকের (প্রিন্টেড সার্কেট) মাধ্যমে তৈরী করা আরম্ভ হলো। সত্তুর দশকের মাঝামাঝির দিকে কম্পিউটার প্রযুক্তির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার- চিপ, বাজারে আবির্ভূত হয়। কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ এই ইনটেগ্রেইটেড সার্কেট বা চিপ এর মাধ্যমে তৈরী হতে থাকে। এখন থেকে যাবতীয় কম্পিউটার টেকনোলজী এই চিপের উপর ভরসা করেই অগ্রসর হয়। এক একটি চিপের পাওয়ার দিনদিন শক্তিশালী হচ্ছে, একই সময়ে এগুলোর মূল্যও কমে আসছে। এর একটা বিশেষ কারণ হলো চিপ তৈরীর আসল যে পদার্থ তা হলো সিলিকন বা সাধারণ বালুকা, আর পৃথিবীব্যাপী বালুকার কোন অভাব নেই।

সত্তুর দশকে বিভিন্ন কম্পিউটার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এই চিপ প্রযুক্তির ফলে সফট্ওয়ারসহ ছোট আকারের মিনি কম্পিউটার বাজারে বের করতে থাকে। এ দশকেই প্রোগ্রাম করা যায় এমন ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা পারসন্যাল কম্পিউটার (পিসি) বাজারে প্রথম বের হয়। আপেল কম্পিউটার ও রেডিও সাক নামে দুটি কোম্পানী এসময় অত্যন্ত সফলতার সহিত কয়েকটি কম্পিউটার বাজারে বের করে। পরবর্তীতে আপেল মেকিনটশ্ (ম্যাক) কোম্পানীই পৃথিবী বিখ্যাত কম্পিউটার কোম্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মৌলিক দুই ধরনের কম্পিউটারই সমগ্র পিসি মার্কেটকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এগুলো হলো আইবিএম বা আইবিএম কম্পাটিবল মেশিন (পিসি) এবং মেকিনটশ্ বা মেকিনটশ কম্পাটিবল মেশিন।

১৯৮০ ইংরেজী হতে বর্তমান কম্পিউটার বিপ্লব সত্যিকার অর্থে শুরু হয়। কম্পিউটারের চিপ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (ঈচট) প্রস্তুত করতে উপর্যুক্ত দুটি কোম্পানীসহ বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে। এ প্রতিযোগিতার ফলে কিন্তু একটা বিশেষ লাভ হচ্ছে, আর তা হলো কম্পিউটারের মূল্য দিনদিন কমে আসছে, একই সময় ভালো থেকে ভালো চিপ তৈরী হচ্ছে। সাধারণতঃ ইনটেল করপোরেশন পিসি ও আইবিএম সিস্টেমের জন্য চিপ বানাচ্ছে, অন্যদিকে মটোরলা করপোরেশন ম্যাক সিস্টেমের চিপ তৈরী করছে।

বর্তমান কম্পিউটার বিজ্ঞান

আজকাল কম্পিউটার ব্যবসা সত্যিকার অর্থে একটি মাল্টি-বিলিয়ন ডলার ব্যবসায় রূপান্তিরিত হয়েছে। এটা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কম্পিউটারের সফ্‌টওয়ার তৈরীর কোম্পানী মাইক্রোসফ্‌ট এর মালিক বিল গেইট্‌স আজ ক’বছর যাবৎ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছেন।

পৃথিবীর সর্বত্র কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে, বহু ধরনের কার্য সমাধানে। আজকাল কম্পিউটার শুধুমাত্র নিছক অংক কষা অথবা ফাইল ও রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত হয়না। এখন কম্পিউটার দিয়ে ফাইল মেন্যাজমেন্ট থেকে মহাশূণ্যে কৃত্রিম উপগ্রহ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। কম্পিউটারের মূল্য হ্রাস হবার ফলে ঘরে ঘরে কম্পিউটার এসেছে। আপনার ঘরেও হয়ত একটি কম্পিউটার আছে, আপনার বাচ্চা ওটা দিয়ে হোমওয়ার্ক করছে, সিডি রমের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষালাভ করছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর কোটি কোটি কম্পিউটারের সঙ্গে নেটওয়ার্ক করে তথ্য সেয়ার করছে প্রভৃতি। বস্তুতঃ আজকাল কম্পিউটার এমন একটা মেশিনে পরিণত হয়েছে যেটি ছাড়া উন্নত বিশ্বে চলাই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর উন্নয়নশীল দেশসমূহে দ্রুত এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ছে। যার ফলে নতুন প্রজন্মকে তো অবশ্যই, এমনকি পুরাতনদেরকেও কম্পিউটার অপারেশন পদ্ধতি বাধ্য হয়ে জেনে নিতে হচ্ছে। পাঠকদের সুবিধার্থে এ পরিচ্ছেদের বাকী অংশে আমি কম্পিউটার

কিভাবে কাজ করে, অর্থাৎ এর মৌলিক প্রযুক্তির উপর সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

কম্পিউটার যেভাবে কাজ করে

কম্পিউটারে যে নাম্বার-ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়, তা হলো বাইনারি নাম্বার। যে কোন বৈদ্যুতিক সিস্টেমে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও সাধারণ উপায়ে যে কোন অবস্থার দুটি সম্ভাব্য ফলাফল আলাদা করা যায়। যেমন একটা বালব হয় জ্বলন্ত না হয় নিভানো অবস্থায় থাকতে পারে, এ দুটি সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে আলাদাভাবে গ্রহণযোগ্য দুটি অবস্থা। বাইনারি নাম্বারে শুধুমাত্র ০ বা ১ ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে বালব যখন অন (জ্বলন্ত) থাকবে, তখন এ অবস্থাকে ১ দিয়ে বোঝানো যাবে এবং অফ (নিভানো) থাকলে, ০ দিয়ে আলাদা করা যাবে। ঠিক এভাবে দুটি বাইনারি নাম্বারের মাধ্যমে কম্পিউটারে দুটি আলাদা অবস্থাকে উপস্থাপিত করা হয়। প্রতিটি বাইনারি নাম্বারকে এক একটি বিট নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাইনারি নাম্বার দিয়ে তাই যে কোন নাম্বার বা সংখ্যা অথবা বর্ণ উপস্থাপিত করা যায়, যা কম্পিউটার সহজে বুঝতে পারে। তাই ০ ও ১ দিয়ে একটি সংখ্যা অথবা অক্ষরকে উপস্থাপিত করার জন্য যতটুকু সম্ভাবনা আছে তা হলো ২ (যতোটা বিট আছে)। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনার কম্পিউটার যদি ৪ বিটসম্পন্ন হয়, তাহলে সর্বমোঠ ২৪ = ১৬টা সম্ভাবনা হবে বাইনারি নাম্বার লিখতে। এগুলো হলো:- ০০০০, ০০০১, ০০১১, ০১১১, ১১১১, ০০১০, ০১০০, ১০০০, ০১১০, ১১০০, ১০০১, ১০১০, ০১০১, ১০১১, ১১০১, ১১১০,। লক্ষ করুন, এখানে প্রতিটি সেটই আলাদা। এখন আমরা যদি ৬ বিট ব্যবহার করি তাহলে ২৬ = ৬৪টা সম্ভাবনা পাব। আজকাল বেশীরভাগ কম্পিউটারে ১৬ অথবা ৩২ বিট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধরনের বাইনারি কোডিং এর মাধ্যমেই ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে যাবতীয় ডাটা (ইনফরমেশন) উপস্থাপন করা হয়। বাইনারি নাম্বার হচ্ছে ১ এবং ০ যা কম্পিউটারে সহজে ব্যবহার করা যায়।

কম্পিউটারের ভেতরের যন্ত্রাংশ

যে কোন ডিজিটেল কম্পিউটারের মধ্যে চারটি মৌলিক যন্ত্রাংশ থাকে। এগুলো হচ্ছে:- (ক) এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট (অখট/ঈচট) বা অংক ও লজিক অংশ। (খ) মেমরী ইউনিট (জঙগ ্ জঅগ) বা স্মৃতি অংশ। (গ) একটি কন্ট্রোল ইউনিট (ঈট) বা নিয়ন্ত্রণ অংশ। (ঘ) একটি ইনপুট/আউটপুট ইউনিট (ওঙ) বা ভেতরে প্রবেশকরণ/ বাহিরকরণ অংশ।

(ক) এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট

এ ইউনিটকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটও বলা হয়ে থাকে। আজকাল চিপ বলতে এ ইউনিটকেই বুঝায়। ইনটেল পেন্টিয়াম চিপ ও পাওয়ার পিসি চিপ সম্পর্কে নিশ্চয়ই পনারা জ্ঞাত আছেন। [এ লেখার সময় পিসি'র লেটেষ্ট চিপ ছিলো ইনটেল পেন্টিয়াম-৪, অপরদিকে ম্যাক কম্পিউটারের লেটেষ্ট চিপের নাম ছিলো- পাওয়ার পিসি জি-৫।] এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট দিয়ে ডাটাকে নিয়ন্ত্রণ এবং যাবতীয় অংক কষার কাজ করা হয়। এখানে কোটি কোটি রেজিষ্টার বা রেকর্ড থাকে। রেজিষ্টার হচ্ছে কতকগুলো মেমরী-যন্ত্রাংশ যেখানে, যে কোন বিশেষ মান জমা করা যায়। যেমন আমরা যদি দুটি নাম্বারকে যোগ করতে চাই তবে দুটি নাম্বারই প্রথমে এক টুকরো কাগজের মধ্যে লিখতে হবে, তারপর যোগ করে যোগফলটি আবার লিখে দিতে হবে। রেজিষ্টারের মধ্যেও এই কাগজে লিখার মতো নাম্বার অথবা যে কোন মান (ভেলু) লিখে রাখা হয়। এক একটি রেজিষ্টার হচ্ছে এক একটি মেমরী বা, যেখানে কোন বিশেষ কিছু জমা করে রাখা যায়।
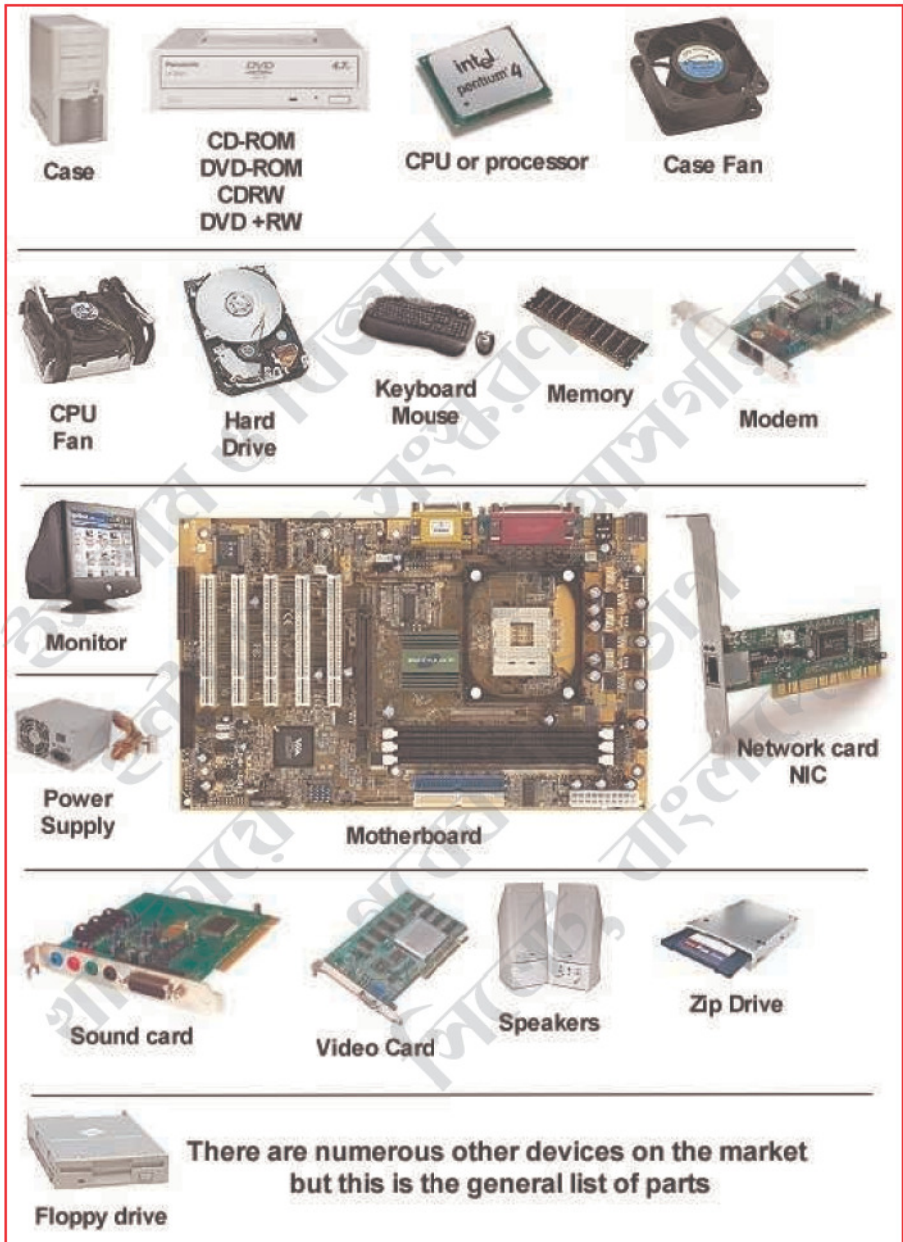
কম্পিউটার যন্ত্রাংশঃ এই চিত্রে কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দেখা যাচ্ছে।

এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিটের কাজ তাই অত্যন্ত সহজবোধ্য। একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম যেসকল ভেলুর উপর যেরূপ কার্য সমাধা করতে চাইবে, এ ইউনিট ঠিক তাই করবে। যাবতীয় লজিক্যাল সমস্যাবলীর কতকগুলো ফাংশন বা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। এগুলোর নাম হলো খড়মরপ এধঃবং (ইড়ড়ষবধহ- গঊঝ ড়ৎ ঘঙ) ফাংশন। কম্পিউটার এই লজিক-অংকের মাধ্যমে চলে। এধরনের গণিতকে বুলিয়ান বীজগণিত বলে। বুলিয়ান বীজগণিতে যে কোন সমস্যার দুটিমাত্র ফলাফল সম্ভব হতে পারে, হয় উহা সত্য না হয় মিথ্যা। একই সময় সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বুলিয়ান বীজগণিত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নয়, তবে কম্পিউটারে কিভাবে প্রসেস করে তার একটা ধারণা এখানে উপস্থাপন করলাম মাত্র।

একই সময়ে প্রসেস করা এবং সবকিছু জমা করে রাখা কিন্তু এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট দ্বারা সম্ভবপর নয়। এর জন্য আলাদা আরও মেমরীর প্রয়োজন।

(খ) মেমরী ইউনিট

কম্পিউটারে দুই ধরনের মেমরী ইউনিট থাকে, এদের একটা হলো প্রাথমিক ও অপরটি মাধ্যমিক ইউনিট। প্রাথমিক ইউনিটে জমাকৃত সবকিছু একটা প্রোগ্রাম চলাকালে ব্যবহৃত হয়। এটাকে রাম (রানডম এক্সেস মেমরী) বলা হয়। মাধ্যমিক মেমরীর মধ্যে প্রসেস করা সবকিছু জমা করে রাখা হয়। আপনার কম্পিউটারে যে হার্ড ডিক্স আছে এটাই হচ্ছে মাধ্যমিক বা ষ্টোরেজ মেমরী। কম্পিউটার বন্ধ করে দিলে যাবতীয় রাম মেমরী বিলুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু হার্ড ডিক্সে জমাকৃত মেমরী নষ্ট হয় না। আজকাল বিভিন্ন উপায় উপকরণের মাধ্যমে প্রোগ্রাম ফাইল ও ডাটা জমা রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে সিডি রম (রিড অনলি মেমরী), সাড়ে তিন ইঞ্চি ফ্লপি ডিক্স, জিপ ও ঝাজ ড্রাইভ, পেন ড্রাইভ প্রভৃতি উল্লেখগুেযাগ্য।

(গ) কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ অংশ

এ ইউনিটের মাধ্যমে ষ্টোর করা মেমরীকে প্রোগ্রামের কমাণ্ড ও নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়। অর্থাৎ এটির কাজ হলো ষ্টোর করা জিনিসপত্র প্রয়োজন অনুযায়ী কন্ট্রোল করে রাখা। এটা দ্বারা যাবতীয় প্রসেস পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(ঘ) ইনপুট/আউটপুট ইউনিট

যে কোন কম্পিউটার পরিচালনায় ডাটা বা ইনফরমেশনকে কোন উপায়ে ভেতরে প্রবেশ করানো এবং প্রসেস শেষে ফলাফল বের করে আনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ দুটি জরুরী কার্য সমাধা হয় ইনপুট/আউটপুট ইউনিটগুলো দ্বারা।

আজকাল ইনপুট ইউনিট হিসেবে কিবোর্ড, মাউস, মাইক্রোফোন, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, মডেম, স্ক্যানার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে আউটপুটের জন্য মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, ইমেজসেটার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত কম্পিউটারের ভেতর ও বাহিরের যন্ত্রাংশ বা হার্ডওয়ার সম্পর্কে আলোচনা হলো। এবার যে উপায়ে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং আপনি এটা দিয়ে যাকিছু করবেন তা কিভাবে করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই সফট্ওয়ারের কথা শুণে থাকবেন। বাংলাতে সফট্ওয়ারকে তরল-যন্ত্রাংশ বলা যায়। এটা সহজেই অনুমেয় যে, একটা কম্পিউটার এই সফট্ওয়ার ছাড়া চলে না। সফট্ওয়ার হচ্ছে একটা কোড-করা (কম্পিউটারের প্রতিটি যন্ত্রাংশের জন্য অর্থবোধক কিছু কোড), অনুজ্ঞেয় বা নির্দেশনাবলী। আপনি এসব সফট্ওয়্যার বা প্রোগ্রাম সর্বদাই ব্যবহার করে যাচ্ছেন। যে মুহূর্তে আপনি একটা কম্পিউটার অন করবেন, তখন থেকেই সফট্ওয়্যারের কাজ আরম্ভ হবে। অপারেটিং সিস্টেম ও প্রয়োজনভিত্তিক প্রোগ্রাম, এ দু'ধরনের সফট্ওয়্যার দ্বারা কম্পিউটার চলে।

অপারেটিং সিস্টেম বা কার্য-পরিচালনা ব্যবস্থা

যে কোন কম্পিউটারকে একটা বিশেষ নিয়মে পরিচালনা করার জন্যে একটা বিশেষ অপরিবর্তনীয় সফট্ওয়্যারের প্রয়োজন হয়। এ পরিচালনা করার প্রোগ্রামকে অপারেটিং সিস্টেম বলে। অপারেটিং সিস্টেমের কাজ হলো কম্পিউটার পরিচালনার মৌলিক পদ্ধতি বা ইনটারফেইস। আপনি আরও যতোসব প্রয়োজনীয় সফট্ওয়্যার এনে কম্পিউটারে ব্যবহার করবেন তা এই অপারেটিং সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল। অনেক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আছে, তবে আজকাল দু-ধরনের সিস্টেমই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর এগুলো হলো পিসি এর জন্য মাইক্রোসফটের তৈরী উইনডোজ ৯৫/৯৭/৯৮/২০০০ ... ও আপেল মেকিনটশের তৈরী মেক অপারেটিং সিস্টেম। আপনার যদি পিসি থাকে তবে আপনাকে অবশ্যই, উইনডোজ সিস্টেমে চলে- এ ধরনের প্রোগ্রাম ক্রয় করতে হবে। আর মেকিনটশ কম্পিউটার হলে, মেক অপারেটিং সিস্টেমের সফট্ওয়্যার আনতে হবে। অবশ্য আজকাল একই প্রোগ্রাম দুটি সিস্টেমের জন্যেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ সফট্ওয়্যার যারা সৃষ্টি করছেন, তারা দুটি সিস্টেমের জন্যেই করছেন। আপনি কোন সিস্টেম ব্যবহার করবেন তা একান্ত পনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবে সাধারণতঃ মেক সিস্টেমকে সহজবোধ্য বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু এটার মূল্য উইনডোজ থেকে অনেকটা বেশী।

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার বা তরল যন্ত্রাংশ

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার হচ্ছে একটা বিশেষভাবে লিখিত প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার বুঝতে পারে। এই সফট্ওয়্যার প্রোগ্রাম ছাড়া একটা কম্পিউটার সম্পূর্ণ অকেজো যন্ত্র মাত্র। শক্ত যন্ত্রাংশ আর তরল যন্ত্রাংশ- এ দুটি অংশের মিশ্রণে একটা কম্পিউটার ব্যবহারযোগ্য মেশিনে পরিণত হয়। যে কোন প্রোগ্রামকে জমা করে রাখার জন্য, জবধফ ঙহষু গবসড়ৎু (জঙগ), বা শুধু পড়া যায়, এমন মেমরীর মধ্যে রাখা হয়ে থাকে। আপনার কম্পিউটারের ভেতর যে হার্ড ডিস্ক আছে ওটা হলো জঙগ মেমরী। জঙগ মেমরীর আরোও দৃষ্টান্ত হলো, ঋষড়ঢ়ঢ়ু উরংপ, ঈউ জড়স প্রভৃতি।

যে কোন কম্পিউটার প্রোগ্রাম একজন প্রোগ্রামার দ্বারা বিশেষ কোন কার্য সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখা হয়। প্রোগ্রাম লেখার অনেক ধরনের ভাষা আছে, যা ইংরেজী ভাষার মত এবং তা বুঝা সহজবোধ্য। যে কোন একটা ভাষার মাধ্যমে প্রোগ্রাম লেখার পর এটাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিটি কমাণ্ড এবং অনুজ্ঞাকে (Instructions) ০ ও ১- এ দুটি বাইনারি কোডে রূপান্তরিত করতে হবে। এ কাজ অবশ্য প্রোগ্রামারকে নিজে করতে হয় না, এর জন্য আলাদা আরেকটি বিশেষ প্রোগ্রাম আছে যেটির নাম হলো কমপাইলার (Compiler)।

দুই ধরনের প্রোগ্রাম করার ভাষা আছে। এগুলো হলো, মেশিন কোড যাকে নিম্নস্তরের প্রোগ্রামও (Low Level Language) বলা হয় এবং উচ্চ স্তরের প্রোগ্রাম (High Level Language)। সাধারণতঃ বাইনারি কোডে প্রোগ্রাম লেখা হয় না। নিম্ন স্তরের ও উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামকে কমপাইলার দিয়ে বাইনারি কোডে রূপান্তরিত করা হয়। আপনার কম্পিউটারে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত প্রোগ্রাম বা ওয়ার্ড প্রসেসারগুলো- যেমনঃ মাইক্রোসফ্‌ট ওয়ার্ড, ওয়ার্ড পারফেক্ট, ক্লারিস ওয়ার্কস, ফটোশপ, ইলোস্ট্রেটর, কুয়ার্ক এক্সপ্রেস প্রভৃতি সফট্‌ওয়্যার হচ্ছে এক একটা প্রোগ্রাম, যা প্রথমে হাই লেভেল প্রোগ্রাম করার ভাষায় (যেমন পাসকেল বা সি++) লিখে কমপাইলার দ্বারা বাইনারিতে বদলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একটি কম্পিউটারের জন্য তা গ্রহণযোগ্য কোডে পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যে উল্লেখিত এক একটা প্রোগ্রামের মধ্যে হাজার হাজার লাইন প্রোগ্রামিং কোড আছে। একজন প্রোগ্রামারকে তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোড লিখতে হয়, কারণ সামান্যতম বেশ-কম হলেই সমগ্র প্রোগ্রাম অকেজো হয়ে যাবে। এতে প্রোগ্রামের মধ্যে বাগ (খারাপ প্রোগ্রাম) ঢুকে যেতে পারে। প্রোগ্রাম করা তাই সহজ ব্যাপার নয়। ওয়ার্ড প্রসেসারের মত একটা জটিল কঠিন প্রোগ্রাম লিখতে এবং প্রকাশ করতে, তাই এক থেকে দু'বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। কম্পিউটার সফট্‌ওয়্যারের মূল্যও তাই আজকাল বেশী হচ্ছে। বর্তমানে মাইক্রোসফটের মত পৃথিবী বিখ্যাত বৃহৎ কোম্পানী গড়ে উঠেছে শুধুমাত্র কম্পিউটার সফট্‌ওয়্যার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক বিল গেইট্‌স এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি হয়েছেন- কম্পিউটার তৈরী করে নয়, সফট্‌ওয়্যার সৃষ্টি ও প্রকাশ-বিকাশ করে। সফট্‌ওয়্যার ব্যবসা তাই এখন একটি মাল্টি-বিলিয়ন ডলার ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

কম্পিউটার ও ইনটারনেট

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্বজুড়ে ইনফরমেশন (তথ্যাদি) সহজে এবং কম খরচে বিনিময় করার উদ্দেশ্যে ইনটারনেট নামে একটি অভিনব ব্যবস্থা চালু হয়। খুব শীঘ্রই এটা জনপ্রিয় একটি শিক্ষা-মাধ্যম ও তথ্য বিনিময় উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। আজকাল আপনি ইনটারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে যে কোন অন্যান্য একাধিক স্থানে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। এই ইনটারনেট সত্যিই ইনফরমেশন টেকনলজীকে বিপ্লবে পরিণত করে দিয়েছে। কম্পিউটারের উপর এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে এসে আমি এ সর্বাধুনিক কম্পিউটার বিপ্লবের উপর আলোকপাত করবো।

ইনটারনেট হলো একাধিক কম্পিউটার, যেগুলো টেলিফোনের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক হিসেবে জড়িত করা হয়। এ নেটওয়ার্ক সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হতে সক্ষম। অর্থাৎ যেখানেই টেলিফোন লাইন থাকবে সেখানে একটি কম্পিউটার ইনটারনেটের নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত করা সম্ভব। এমনকি ল্যান্ড-লাইন না থাকলেও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সুদূর মফস্বলে থেকেও আপনি ইনটারনেটের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। তাহলে, অভিনব এই টেকনোলজি আসলে কি- তা একবার তলিয়ে দেখা যাক।

বাস্তবে ইনটারনেট হচ্ছে, মাকড়সার জালের মতো প্রকাণ্ড একটি ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্ক, যা ভূ-গোলকের চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। ইনটারনেটকে Net বা জালও বলা হয়ে থাকে। যে মুহূর্তে আপনি আপনার নিজের কম্পিউটার ও টেলিফোনের (মডেম) মাধ্যমে ইনটারনেট খুলবেন, তখন আপনার কম্পিউটারও এই জালের অংশ হিসেবে হয়ে যাবে। নেটওয়ার্কে যে লক্ষ লক্ষ আরও কম্পিউটার একই সময় জড়িত আছে, তখন এগুলো আপনার সাথে ইনফরমেশন সেয়ার করতে পারবে, অর্থাৎ আপনি তাদের সাথে সরাসরি ইনফরমেশন রদবদল করতে পারবেন। ইনটারনেটের মাধ্যমে যে কোন ধরনের ফাইল স্থানান্তরিত করা যায়। আপনি যদি আপনার কোন বন্ধুর নিকট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানে পত্রাদির

মাধ্যমে যোগাযোগ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে আপনি ইনটারনেটের ই-মেইল (ইলেকট্রনিক মেইল) সার্ভিস ব্যবহার করতে পারেন। আপনার এ পত্র প্রথমতঃ একটি সুপারকম্পিউটার বা সার্ভারে জমা হয়ে থাকবে। যখনই আপনার বন্ধু ইনটারনেট খুলবেন তখনই সার্ভার থেকে আপনার বন্ধুর কম্পিউটারে লেখাটা পৌঁছে যাবে।

ইনটারনেট একটি পৃথিবী-বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

বস্তুত এই সুপারকম্পিউটার সার্ভারের মাধ্যমেই ইনটারনেটকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ ধরনের বহু সার্ভার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে। এই অতিথি বা হস্ট কম্পিউটারের মাধ্যমেই আপনি ইনটারনেটে জড়িত হতে পারবেন।

ইনটারনেটে যোগ দিতে হলে কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। প্রথমতঃ আপনার একটা কম্পিউটার অবশ্যই থাকতে হবে। সেই সাথে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য একটি মডেম এর দরকার। আজকাল এই মডেম কম্পিউটারের

সাথেই এসে থাকে। তারপর ইনটারনেটে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যে কোন একটি সার্ভিস প্রভাইডার বা ইনটারনেটে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

আজকাল ঢাকা, সিলেট, চিট্টগ্রামসহ বাংলাদেশেরও বিভিন্ন শহরে এসব সার্ভিস প্রভাইডার আছে। এসব প্রতিষ্ঠান মাসিক বা বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট ফি নিয়ে থাকে। সাধারণতঃ যতোক্ষণ আপনি ইনটারনেট খুলে রাখবেন ততক্ষণ লক্যাল রেইটে টেলিফোন খরচ পড়বে, তবে এ খরচটা তেমন বেশী নয়। এর কারণ হলো আপনি পৃথিবীর যে কোন স্থানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকলেও লক্যাল রেইটে টেলিফোন চার্জ হবে।

আজকাল ইনটারনেট সার্ভিস বেশ সস্তা হয়েছে। লণ্ডন-আমেরিকা ও ইউরোপে কোন কোন ক্ষেত্রে ইনটারনেট প্রায় ফ্রি হয়ে গেছে। এসব সার্ভিস প্রভাইডাররা তাদের আয় মূলত বিজ্ঞাপন থেকে পেয়ে থাকে। এছাড়া টেলিফোন কোম্পানী থেকেও তারা একটি লভ্যাংশ পায়।

ইনটারনেট সত্যিই ইনফরমেশন টেকনোলজীকে সর্বসাধারণের নাগালের ভেতরে এনে দিয়েছে। কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের ধারণা, ২০১০ সাল নাগাত পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ বাড়িতেই এবং স্কুল কলেজে সর্বত্র ইনটারনেট চালু থাকবে।

ইনটারনেট যদিও আমাদের জন্য অনেক সুফল বয়ে নিয়ে এসেছে সত্যি- কিন্তু এসাথে নতুন প্রজন্মের নৈতিক ও মানসিক উন্নত চরিত্রগঠনে বিরাট হুমকিস্বরূপ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। অনিয়ন্ত্রিয় এই সর্বাধুনিক মিডিয়ায় অশ্লীলতা সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে- যা যে কোন ব্যবহারকারীর নিকট অনায়াসেই প্রাপ্য। সুতরাং ইনটারনেটের এই নেগিটিভ দিকটি নিয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে ভেবে শতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। এ ব্যাপারে প্রথমখণ্ডের শেষের দিকে কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করেছি। সুতরাং এখানে অতিরিক্ত আর কিছু বলার নেই। এ কথাগুলো প্রয়োজনের তাগিদে ইনটারনেট ব্যবহারকারীদের জ্ঞাতার্থে ব্যক্ত করলাম।

"তাঁরই স্বত্বাধীন যা কিছু আছে আসমানে, যা কিছু যমীনে, যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে এবং যা কিছু ভূগর্ভে আছে" [সূরা ত্বাহা ঃ ৬]।

পরিচ্ছেদ ১১

টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি

ইংরেজীতে টেলিকমিউনিকেশন শব্দটির অর্থ ব্যাপক। গ্রীক শব্দ টেলি- কে কমিউনিকেশন শব্দটির সঙ্গে যুক্ত করে এ শব্দটি সৃষ্ট। টেলি অর্থ দূরবর্তী স্থান বা শুধু দূরে। আর কমিউনিকেশন অর্থ যোগাযোগ। সুতরাং গ্রীক ও বাংলা শব্দের সমন্বয়ে 'টেলিযোগাযোগ' বলতে মূলতঃ কোন দূরবর্তী স্থানে সংবাদ বা মেসেজ প্রেরণকে বুঝায়। আধুনিক যুগে তাই রেডিও, টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, রাডার ইত্যাদি সবই হচ্ছে টেলিযোগাযোগের অন্তর্ভূক্ত। এককথায় তথ্য প্রেরণের জন্য যেসব দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং দূরত্বে পাঠানোর যোগ্যতাসম্পন্ন টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে তা সবই হলো টেলিযোগাযোগ।

টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির মূলে যে জিনিসটি সর্বক্ষেত্রেই কার্যকরী তাহলো তথ্যকে প্রথমে প্রযৌক্তিক উপায়ে এনার্জি বা উদ্যমে পরিণত করা।

সাধারণত তিনটি এনার্জিতে তথ্য রূপান্তর করা হয়। এগুলো হলোঃ ইলেকট্রিক এনার্জি, ইলেকট্রমেগন্যাটিক এনার্জি এবং আলো বা লাইট এনার্জি। এই এনার্জি সৃষ্ট হয় প্রথমে যেখান থেকে মেসেজ প্রেরণ করা হবে সেখানে। তারপর এই এনার্জিকেই আবার রিসিভার বা তথ্যসংগ্রহ যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দ, লিখিত ফাইল কিংবা ছবিতে রূপান্তরিত করা হয়, যাতে প্রাপক তা সহজে বুঝে নিতে পারে। অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংবাদটি কোন বিশেষ উপায়ে প্রথমে রেকর্ড করতে হয়- যেমন, মূদ্রণ, হাতের লেখা, ছবি, ডিস্ক, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি উপায়ে। কিন্তু টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে মিডিয়াম বা মাধ্যম হিসেবে এনার্জি ব্যবহৃত হয়। মাধ্যম হিসেবে এনার্জি ব্যবহারের মধ্যে বড় ধরণের সুবিধা আছে। প্রথমতঃ এনার্জিকে পাঠাতে গিয়ে আমরা স্বভাবের মৌলিক শক্তি ব্যবহার করতে পারি যেমন, বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি (ইলেকট্রমেগন্যাটিজম)। দ্বিতীয়তঃ এনার্জি প্রেরণ হবে অতিদ্রুত- বাস্তবে আলোকের গতির সমপরিমাণ গতিতে। তৃতীয়তঃ এটা সহজ ও পরিষ্কার পদ্ধতি। এছাড়া নিষ্কলুষ এনার্জির মাধ্যমে একাধিক তথ্য আমরা একই সঙ্গে প্রেরণ করতে পারি যেমন, শব্দ, ছবি ও গ্রাফিক্স।

মৌলিক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি

চারটি মৌলিক যন্ত্র বা কম্পোনেন্ট দ্বারা টেলিযোগাযোগ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো: ১. ট্রান্সমিটার (প্রেরকযন্ত্র), ২. সিগন্যাল (তরঙ্গ), ৩. মিডিয়াম (মাধ্যম) ও ৪. রিসিভার (প্রাপকযন্ত্র)।

প্রেরকযন্ত্র কোন মেসেজকে প্রথমে একটি এনার্জি কিংবা তরঙ্গে পরিণত করে। এই এনার্জি একটি মাধ্যম যেমন, রেডিও-অডিও কিংবা ধাতুর তৈরী তার দ্বারা প্রাপকযন্ত্রে প্রেরণ করা হয়। প্রাপকযন্ত্র এই এনার্জিকে আবার মূল মেসেজে পুনঃরূপান্তর করে। প্রাপকযন্ত্র থেকে প্রেরকযন্ত্রে সংবাদ পৌছুতে কিছুটা এনার্জি বা তথ্য ক্ষয় হয়ে যেতে

পারে- এই ক্ষয় হওয়াকে বলে নইজ। এছাড়া প্রেরকযন্ত্র থেকে মেসেজ আবার প্রাপকযন্ত্রে ফিরে আসতে পারে- এটাকে বলে, ফিডব্যাক।

টেলিযোগাযোগের মৌলিক পদ্ধতি এটাই। এবার একে একে এসব সিস্টেম নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

এনালগ সিগন্যাল বা তরঙ্গ

তরঙ্গ ইলেকট্রিক্যাল কিংবা ইলেকট্রমেগন্যাটিক হতে পারে। ১৮৩৭ সালে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ সার্ভিস চালু হয়। বৃটিশ রেলওয়ে এই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল দ্বারা যোগাযোগ সৃষ্টি করে। একটি ইলেকট্রিক্যাল সার্কেটে বিশেষ পদ্ধতিতে অন-অফ সুইচ দিয়ে টেলিগ্রাফ সিগন্যাল প্রেরণ করা হতো। এরপর সাম্যুয়েল এফ. মোর্স নামক একব্যক্তি ডট-ডাশ [ফোটা ও লাইন] সিস্টেম আবিষ্কার করেন। এই কোডিং মূলত লিখিত অক্ষর এবং নাম্বারের জন্য ব্যবহৃত হতো। এটাকে বলে মোর্স কোড।
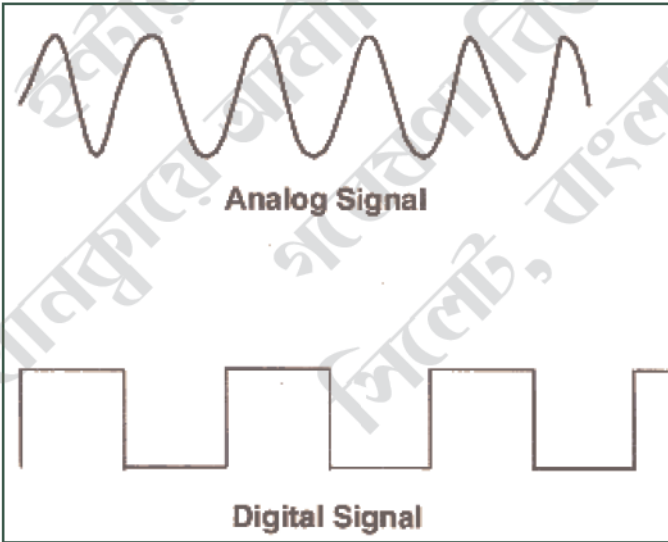
আলেকজান্ড্রার গ্রাহাম বেল কর্তৃক ১৮৭৬-৭৭ সালে টেলিফোন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত মোর্স কোডের মাধ্যমে টেলিগ্রাম সিস্টেমই ছিলো টেলিযোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। টেলিফোন মূলত একটি এ্যানালগ টেলিযোগাযোগ সিস্টেম। এটাকে এ্যানালগ বলার অর্থ হলো টেলিফোনের মাধ্যমে মূলত আপনার-আমার কথা থেকে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গকে ইলেকট্রিক্যাল ওয়েভে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ মানুষের কথার শব্দতরঙ্গ ও ইলেকট্রিক্যাল তরঙ্গ একটা আরেকটার সঙ্গে এ্যানালোজাস-সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ্যানালগ পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে, মডিউলেশন। এ্যানালগ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন আরেকটি পদ্ধতি আছে যাকে বলে, ডিজিট্যাল কোডিং। ডিজিট্যাল মানে নাম্বার ব্যবহার। প্রতিটি তরঙ্গকে শূন্য (০) কিংবা এক (১)-এ পরিণত করে কোডিং করা হয়। এ উপায়ে কোর্ডি করলে সিগন্যাল হয় উন্নতমানের ও কলুষমুক্ত। আপনি নিশ্চয়ই ডিজিট্যাল টেলিভিশন বা টেলিফোনের কথা শুনেছেন। ডিজিট্যাল সিগন্যাল নিয়ে আমরা একটু পরই আলোচনা করবো।

এ পর্যন্ত সিগন্যাল প্রেরণের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি-যুক্ত ইলেকট্রিক্যাল সার্কেটের ব্যাপারে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ সিগন্যালকে ধাতুর তৈরী তারের মাধ্যমে প্রেরণ করার পদ্ধতি। কিন্তু তামার কিংবা অন্য কোন ধরণের ধাতুর তৈরী তার ছাড়াও সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিকে বলে রেডিও সিগন্যাল। তবে এটা মূলত একটি ইলোকট্রমেগন্যাটিক তরঙ্গ। স্বভাবের চার ফোর্সের একটি হচ্ছে এই এনার্জি বা তরঙ্গ। প্রাথমিক অবস্থায় এই তরঙ্গ ব্যবহারে এ্যানালগ সিস্টেমই চালু হয়েছিল। বিংশ শতাব্দির শুরুতে ভয়েস বা কথা এবং শব্দতরঙ্গকে ইলেকট্রমেগন্যাটিক সিগন্যালে পরিণত করে পাঠানো হতো। এই তরঙ্গকে বলে ক্যারিয়ার ওয়েভ বা মাধ্যম তরঙ্গ। প্রাথমিক যুগে টেলিভিশন সিগন্যালও একই উপায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে অত্যন্ত জটিল টেকনোলজির মাধ্যমে শব্দ, কথা ও ছায়াছবিকে মাধ্যম তরঙ্গে (ক্যারিয়ার ওয়েভ) রূপান্তর করে পাঠিয়ে তা আবার টিভির পর্দায় সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করা হতো।

ডিজিট্যাল সিগনাল

বিংশ শতাব্দির শেষের দিকে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার থেকেই ডিজিট্যাল সিগন্যালের প্রতি মানুষ ঝুকে পড়ে। আগেই বলেছি এই সিগন্যাল মূলতঃ নাম্বার কোডিং। এ্যনালগ সিস্টেমে কোন তরঙ্গকে ওয়েভ পেটার্নে পরিণত করে মাধ্যম তরঙ্গে বদলানো হতো। অর্থাৎ শব্দ কিংবা কথাকে প্রথমে একটি ইলেকট্রমেগন্যাটিক তরঙ্গে রূপান্তর করে ক্যারিয়ার ওয়েভ বানিয়ে দূরে প্রেরণ করার সিস্টেম প্রচলিত ছিলো। এই সিস্টেম এখনও আছে- তবে, ডিজিট্যাল সিগন্যাল এখন বেশি থেকে বেশি ফ্যাশনেবল হয়ে উঠছে। ডিজিট্যাল সিগন্যাল যেহেতু যিরো কিংবা এক দ্বারা কোডিং হয় তাই এটা নইজ থেকে অনেকটা মুক্ত। এছাড়া আরও সুবিধা আছে। মেসেজকে কম্পিউটার দ্বারা কমপ্রেস বা ছোটকরণও সম্ভব- এতে অল্প সময়ে বেশি মেসেজ প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়া অত্যাধুনিক তথ্য-যোগাযোগ ইনটারনেটও এই ডিজিট্যাল সিগন্যালের উপর নির্ভরশীল। ডিজিট্যাল সিগন্যাল ব্যবহারে আরেকটি উল্লেখওেযাগ্য সুবিধা হচ্ছে প্যাকেজ ট্রান্সমিশন। একই সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য একত্রে পাঠানো সম্ভব- যেমন, ভয়েস (কথা), ইমেজ (ছবি), গ্রাফিক্স (চিত্রাঙ্কন), ডাটা (তথ্য) ইত্যাদি একই সঙ্গে প্যাকেজ হিসেবে প্রেরণ করা যেতে পারে।
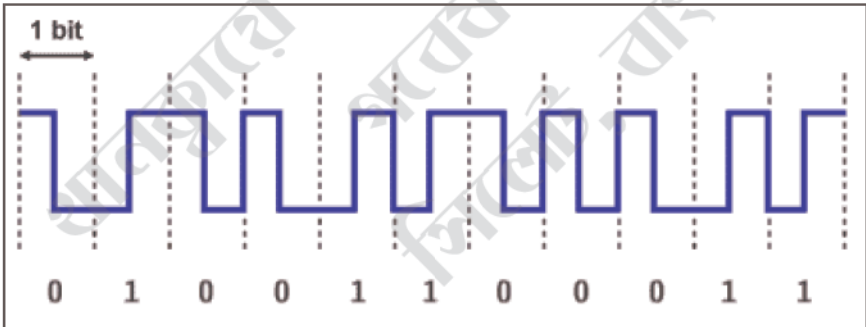
যোগাযোগ স্যাটেলাইট

আজকাল টেলিফোন, টেলিভিশন ইত্যাদির সিগন্যাল পৃথিবীর যে কোন স্থানে সহজে ও একই সঙ্গে অসংখ্য সিগন্যাল প্রেরণ করা হচ্ছে মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। এই বিশেষ কৃত্রিম উপগ্রহকে বলে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ স্যাটেলাইট।

যোগাযোগ স্যাটেলাইট মূলত মহাকাশে জিও-স্টেশনারী কক্ষপথে ঘুর্নমান থেকে কাজ করে। জিও-স্টেশনারী অরবিট বা কক্ষপথ হচ্ছে- পৃথিবীর আহ্নিত গতির সমপরিমাণ গতিশীল কক্ষপথ। মনে করুন, বাংলাদেশের উপরে যদি একটি যোগাযোগ স্যাটেলাইট স্থাপিত হয় তবে তা সর্বদাই মহাকাশে একই অবস্থানে অর্থাৎ বাংলাদেশের উপরেই থাকবে। এর কারণ হলো, বাংলাদেশের ভূখণ্ড যে গতিতে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ছুটে যাচ্ছে সেই একই গতিতে স্যাটেলাইটটিও পূর্ব দিকে প্রদক্ষিণ করছে। এই উপায়ে প্রদক্ষিণকেই বলে জিও-স্টেশনারী অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় স্থির প্রদক্ষিণপথ।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক-কাল্পনিক ঔপন্যাসিক আর্থার সি. ক্লার্ক ১৯৪৫ সালে জিও-স্টেশনারী অরবিটের ধারণা জন্ম দেন। ওয়েরলেস ওয়ার্লড নামক একটি ম্যাগাজিনে এ সম্পর্কে তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য রাশিয়া কর্তৃক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণের তখনও ১২ বছর (১৯৫৭ সাল) বাকী ছিলো। যা হউক, আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশ সরকারীভাবে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করে বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছে। এবার দেখা যাক এসব উপগ্রহ কিভাবে কাজ করে।

যোগাযোগ স্যাটেলাইটে থাকে রেডিও রিসিভার ও ট্রান্সমিটার এবং এদের এ্যান্টেনা। পৃথিবী থেকে এসব রিসিভার (প্রাপক এ্যান্টিনা) সিগন্যাল গ্রহণ করার পর তা উন্নতমানের করে (আমপ্লিফিকেশন-এর মাধ্যমে)। এরপর এই সিগন্যালটিকে আবার পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করে। প্রতিটি স্যাটেলাইটের মূল পাওয়ার সোর্স হচ্ছে সোলার সেল (সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত এনার্জি)।

যোগাযোগ স্যাটেলাইটের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার্থে পৃথিবীর উপর প্রধান একটি স্টেশন থাকে। এই স্টেশনে বিরাট আয়তনের অন্তত একটি রিসিভার এ্যান্টেনা (প্রায় ৩০ মিটার ব্যসসম্পন্ন) থাকা জরুরী। এছাড়া থাকতে হবে একটি শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার (যেটির মাধ্যমে কয়েক শত ওয়াট থেকে কয়েক হাজার ওয়াট সিগন্যাল প্রেরণ করা যায়)। আর্থ-স্টেশন ছোট আকারেরও হতে পারে এবং একই স্যাটেলাইটের জন্য একাধিক স্টেশন থাকতে পারে। আর্থ-স্টেশন ও

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সিগন্যাল লেদদেন হয়। একটি স্যাটেলাইট টিভি স্টেশন থেকে অডিও-ভিডিও ডিজিট্যাল সিগন্যাল প্রথমে আর্থ-স্টেশনে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে সিগন্যালটি চলে যায় মহাকাশে স্থাপিত যোগাযোগ স্যাটেলাইটে। স্যাটেলাইট তা আমপ্লিফাই (উন্নত) করে আবার পৃথিবীপানে প্রেরণ করে। বিভিন্ন বাড়িতে স্থাপিত ডিশ-এ্যান্টেটা এই সিগন্যালকে ধরে টিভির পর্দায় এনে দেয়। প্রশ্ন জাগতে পারে এভাবে সিগন্যাল প্রসেসিং কেমন করে এতো দ্রুত সম্পন্ন হয়? বাস্তবে কোন লাইভ বা সরাসরি সম্প্রচারে তো আমরা কোন সময় অপচয় হতে দেখি না? এ প্রশ্নের জবাব হলো, ইলেকট্রম্যাগনাটিন যে কোন সিগন্যাল আসলে আলোকের গতিতে চলে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল হলো এ সিগন্যালের গতি। সুতরাং পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত কিংবা মহাকাশে ২০০-৩০০ মাইল ভ্রমণে অত্যল্প সময় অতিবাহিত হয়। তাই আমরা এই- মাত্র এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় দেরী হওয়া অনুধাবন করতে পারি না। কিন্তু মঙ্গলগ্রহ থেকে একটি সিগন্যাল পৃথিবীতে আসতে পুরো ২০ মিনিট সময় লেগে যায়- যদিও তা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিসম্পন্ন। সুতরাং টিভি স্টেশন যদি মঙ্গলে হয় তবে প্রতিটি সিগন্যাল বা ছবি দেখতে আমাদের ২০ মিনিট সময় অপেক্ষা করতে হতো।

মাইক্রওয়েভ

ইলেকট্রমেগন্যাটিক তেজষ্ক্রিয়ার একটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (ওয়েভলেনথ) ও ফ্রিক্যুয়েন্সি (প্রতি সেকেন্ডে যে ক'টি ওয়েভ বিকিরণ হয় তাকে বলে ফ্রিক্যুয়েন্সি- বাংলায় বলা যায় তরঙ্গহার) আছে যাকে বলে মাইক্রওয়েভ। এসব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার এবং এর ফিক্যুয়েন্সি ৩ থেকে ৩০০ গাইগা হার্টজ (এক গাইগা হার্টজ = ১ বিলিয়ন হার্টজ্) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি থেকে মাইক্রওয়েভের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনেকটা ছোট আবার ইনফ্রারেড রেডিয়েশন থেকে তা অনেকটা দীর্ঘায়িত। সুতরাং মাইক্রওয়েভ হলো রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি ও ইনফ্রারেড ফ্রিক্যুয়েন্সি থেকে ভিন্ন একটি তেজষ্ক্রিয়া। এই তেজষ্ক্রিয়া একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রওয়েভ ওভেন বা কুকারের কথা আমরা সবাই জানি। এই তরঙ্গের মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে তাপশক্তি সৃষ্টি করে খাদ্য পরিপাক করা হয়। মাইক্রওয়েভ রাডার ও অন্যান্য কমিউনিকেশন সিস্টেমেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টেলিফোন ও টেলিভিশন সিগন্যাল ক্যারি বা বহণের জন্য মাইক্রওয়েভ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ রেডিও তরঙ্গের পরিবর্তে মাইক্রওয়েভ ব্যবহার অনেকটা উন্নতমানের। এরমধ্যে একটি দিক হলো, এই ওয়েভ দ্বারা বেশি তথ্য প্রচার করা সম্ভব। কারণ, যেহেতু এর ফ্রিক্যুয়েন্সি বেশি আর ইনফরমেশন ক্ষমতা ফ্রিক্যুয়েন্সির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে মাইক্রওয়েভের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা আছে। প্রেরিত সিগন্যাল পৃথিবীর বায়ূমণ্ডল পেরিয়ে চলে যায়- অন্যান্য সিগন্যালের মতো এটা ফিরে আসে না। এ কারণে মাইক্রওয়েভ শুধুমাত্র দিগন্ত (হোরাইজন) পর্যন্ত প্রেরণ করা সম্ভব। এই সমস্যা দূর করতে ৪০ কিলোমিটার পর পরই একেকটি রিলে স্টেশন তৈরী করে একটি নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে। এছাড়া মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহের মাধ্যমেও মাইক্রওয়েভের এই সমস্যা দূর করা যায়।

মাইক্রওয়েভ ট্রান্সমিশন ও রিসেপশন

মাইক্রওয়েভ অন্যান্য সকল ইলেকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের মতো আলোকের গতিতে চলে। তবে মাইক্রওয়েভকে কোন কোন ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা তথা গাইড করতে হয়। এ কাজটি এ্যান্টেনার মাধ্যমে করা যায়। এই এ্যান্টেনা এবং প্রাপক এ্যান্টেনা কিছুটা ভিন্ন ধরণের।

মাইক্রওয়েভ একটি নতুন টেকনোলজি। এ থেকে ভবিষ্যতে আরও উন্নতমানের যোগাযোগ সিস্টেম আবিষ্কৃত হবে বলে অনেকেই বলে থাকেন। তবে মাইক্রওয়েভ একটি উচ্চতর এনার্জির তেজস্ক্রিয়া। এ থেকে মানুষের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় কি না সেটাই ভাবার বিষয়।

ফাইবার অপটিক্স

অপেক্ষাকৃত নতুন আরেক ধরণের যোগাযোগ টেকনোলজির উদ্ভাবন ঘটেছে যার নাম হলো ফাইবার অপটিক্স। চুলের মতো সরু কাঁচের তৈরী ফাইবার টিউবের ভেতর দিয়ে আলো প্রেরণ করে তথ্য প্রচার হচ্ছে এই নতুন প্রযুক্তি। কাঁচের ভেতর থেকে আলো বেরিয়ে আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব কারণ, আলোর তুলনায় ফাইবারের রিফ্লেকটিভ ইনডেক্স (আলো প্রতিবিম্ব হওয়ার একটি পরিমাপ) অনেকটা বেশী। এটা আগে থেকে জানা, আলোর নিজের রিফ্লেকটিভ ইনডেক্স যদি যে মাধ্যমের উপর দিয়ে সে চলমান তার তুলনায় কম হয় তবে, তা বেরিয়ে আসতে পারে না। অর্থাৎ আলো আটকা পড়ে যায়। ফাইবার কাঁচের ভেতর থেকে তাই আলো সামনের দিকে চলমান থাকে। ফাইবার কাঁচ আয়নার মতো কাজ করে। এখন, যে আলো এই টিউবের ভেতর দিয়ে

ভ্রমণ করবে তাতে যদি তথ্য থাকে তবে তা সহজেই এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় প্রেরণ করা যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, যে কোন তথ্যকে প্রযৌক্তিক উপায়ে তিনটি ভিন্ন এনার্জিতে রূপান্তর করা যায়। এগুলো হলো, ইলেকট্রিক (কারেন্ট), ইলেকট্রমেগন্যাটিক (রেডিও ওয়েভ) এবং আলো। সুতরাং প্রযুক্তির মাধ্যমে অডিও-ভিডিও কিংবা অন্য কোন তরঙ্গকে আলোক-তরঙ্গে রূপান্তর করা যেতে পারে। এরপর এই আলোক-তরঙ্গকে ফাইবার অপটিক্স দিয়ে প্রেরণ করে যোগাযোগের সিস্টেম তৈরী সম্ভব।
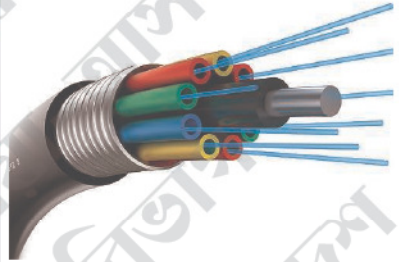
আধুনিককালে ফাইবার অপটিক্স টেকনোলজি পশ্চিমা দেশে সর্বত্র খুব দ্রুত গজিয়ে উঠছিলো। টিভি, রেডিও এই টেকনোলজির মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঘরে ঘরে স্থাপিত হচ্ছিলো। ফাইবার অপটিক্স কমিউনিকেশনও অন্যান্য সিস্টেম থেকে অনেকটা ভালো। এর মাধ্যমে অসংখ্য ধরণের সিগন্যাল সহজে ও দ্রুত প্রেরণ করা যায়।

"আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে" [সূরা নাম্‌ল ঃ ৭৫]।

পরিচ্ছেদ ১২

এনার্জি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সচরাচর ব্যবহৃত ও সম্পৃক্ত একটি শব্দ হচ্ছে এনার্জি। এনার্জিকে বাংলায় শক্তি, বল, উদ্যম ইত্যাদি বলা যায়। তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এনার্জির একটি বিশেষ স্থান আছে। বাস্তবে এর একটি স্বতন্ত্র অর্থও আছে। এই পরিচ্ছেদে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এনার্জির স্বরূপ আমরা আলোচনা করবো।

এনার্জি কি?

গ্রীক শব্দ এনার্জিয়া থেকে এনার্জি শব্দটি ধারকরা হয়েছে। এনার্জিয়ার অর্থ হলো, কর্মশীল। এনার্জির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হলো কর্মের ক্ষমতা। কর্মক্ষমতা বা এনার্জি সাধারণত মেকানিক্যাল (যান্ত্রিক) কর্ম সিহেবে মাপা যায়। এনার্জি মাপার ইউনিট হলো ওয়াট ও জুল্‌স।

বাতাস (বায়ে) ও সৌরবিদ্যুৎ (ডানে) থেকে এনার্জি আহরণ।

বিভিন্ন ধরনের এনার্জি

এনার্জি অনেক ভিন্ন অবস্থায় অস্তিত্বশীল হতে পারে। এরমধ্যে প্রধান ক'টি হলো, পটেনশিয়াল (জমাকৃত বা সম্ভাব্য এনার্জি), কিনেটিক (গতির মধ্যে এনার্জি), রসায়নিক (বস্তুর আভ্যন্তরীণ এনার্জি), আলোক এনার্জি ইত্যাদি। এনার্জি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরও করা যায়- যেমন পেট্রল (রসায়নিক এনার্জি) জ্বালিয়ে একটি গাড়ির ইঞ্জিন পরিচালনা (মেকানিক্যাল এনার্জি)। এনার্জি পরিবর্তনের সময় কর্ম সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় এনার্জি রদবদলের সময় আমরা এই এনার্জি থেকে উপকারযোগ্য কর্ম (ওয়ার্ক) পেয়ে থাকি। সুতরাং টেকনোলজি মূলত এনার্জি নিয়েই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আমরা আসলে কোন এনার্জি সৃষ্টি করতে পারি না। বাস্তবে এনার্জি সৃষ্টি অসম্ভব। আমরা এক ধরনের এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে অন্য ধরনের এনার্জিতে পরিণত করি মাত্র এবং এরই মাধ্যমে আমাদের কাঙ্খিত কর্মটি সম্পাদিত হয়।

ম্যাস (বস্তু) ও এনার্জি

আলবার্ট আইনস্টাইন সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, বাস্তবে বস্তু নিজেই এক ধরনের এনার্জি। তিনি তাঁর প্রখ্যাত সমীকরণ ই=এমসি স্কোয়ার দ্বারা তা দেখিয়েছেন। এখানে ই হচ্ছে এনার্জি, এম বস্তুর মধ্যকার ম্যাস এবং সি হলো আলোকের গতি। লক্ষ করুণ এমনিতেই আলোকের গতি বিরাট (১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড) আর এখানে এই গতির নিজস্ব গুণফল বলা হয়েছে। সুতরাং সামান্য একটু বস্তুর মধ্যে কত বিরাট অংকের এনার্জি বিদ্যমান তা সহজেই অনুমেয়। তবে সাধারণত বস্তুকে এরূপ বিরাট অংকের এনার্জিতে রূপান্তর সম্ভব নয়। যদিও এই সমীকরণ থেকেই আনবিক বোমা তৈরী হয়েছিল।একটি আনবিক বোমার জন্য মাত্র ৫ থেকে ৭ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম পদার্থের প্রয়োজন। আইনস্টাইনের সমীকরণ এটাই বুঝাচ্ছে যে, বস্তুকে যদি নিষ্কলুষ এনার্জিতে রূপান্তর করা যায় তবে তা হবে বিরাট শক্তিবিশিষ্ট।

কিনেটিক এনার্জি হচ্ছে- গতিশীলতার মাধ্যমে সৃষ্ট এনার্জি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন একটি বস্তু যার ম্যাস হলো m এবং k গতিতে তা চলমান আছে। এরূপ বস্তুর মধ্যে এনার্জি = $1/2 *m*k^2$ হবে। অর্থাৎ তাহলো, ০.৫ পুরণ m পুরণ (k*k)। মনে করুন বস্তুটির ওজন ১০ কেজি, এর গতি ৩ মিটার প্রতি সেকেন্ড- তাহলে এর মধ্যে কিনেটিক এনার্জি হবে, ০.৫x১০x(৩x৩) = ৪৫।

পটেনশিয়াল এনার্জি

এই এনার্জি হলো- জমাকৃত বা সম্ভাব্য এনার্জি। একটি স্প্রিংয়ের মধ্যে সম্ভাব্য এনার্জি থাকতে পারে। এটাকে টেনে লম্বা করার পর ছেড়ে দিলে জমাকৃত এনার্জি মুক্ত হয়ে কিনেটিক এনার্জিতে রূপান্তরিত হতে পারে। তবে পটেনশিয়াল এনার্জি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীর মহাকর্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি বস্তুকে যদি উপরে ওঠানো হয় তবে তার মধ্যে মহাকর্ষজণিত পটেনশিয়াল এনার্জি জমা হবে।

ইলেকট্রিক্যাল চার্জের মধ্যে থাকে সম্ভাব্য এনার্জি যা কর্মের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। কেপ্যাসিটর নামক একটি ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশে এভাবে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি জমা করে রাখা হয়। প্রয়োজনে এটাকে ডিসচার্জের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে কাংখিত কর্ম সম্পাদিত হতে পারে। এরপর এটাকে আবার চার্জ করে এনার্জি জমা করা যায়।

আভ্যন্তরীণ এনার্জি

বস্তুর ভেতরের এটম ও মলিকিউলের মধ্যে যেসব এনার্জি থাকে এগুলোকে বলে আভ্যন্তরীণ এনার্জি। এই এনার্জি যখন কোন কারণে রদবদল হয় তখন কোন কোন সময় ফলাফলস্বরূপ বস্তু থেকে তাপ এনার্জি বেরিয়ে আসে। মনে করুন এক টুকরো ধাতু আগুনে রাখা হলো। এতে ধাতুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে: এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ হলো, আগুন থেকে তাপ এনার্জি ধাতুর আভ্যন্তরীণ এনার্জিকে বৃদ্ধি করেছে; ধাতুর এটমগুলো বেশি দ্রুত কম্পন করছে এবং একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য এনার্জি

উপরোক্ত ভিন্ন ধরণের এনার্জি ছাড়াও আরও বহু রকমের এনার্জি স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান। এর একটি হলো রেডিয়াল (দীপ্তিমান) এনার্জি। এটা মূলত ইলেকট্রমেগন্যাটিক কম্পন থেকে সৃষ্ট- যেমন, আলো বা রেডিও তরঙ্গ। অপর আরেকটি এনার্জি হচ্ছে মেগন্যাটিক ফিল্ড এনার্জি। একটি ইলেকট্রমেগন্যাটে এই এনার্জি জমা থাকতে পারে। কারণ, এটি বৈদ্যুতিক তার দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং যখন কারেন্ট চলে তখন এটার মধ্যে মেগন্যাটিক ফিল্ড সৃষ্টি হয়। তেজস্ক্রিয়া, এক্স-রে, আলফা-বিটা-গামা তরঙ্গ ইত্যাদি সবই একেক ধরণের এনার্জি।

এনার্জি রূপান্তর

আগেই বলেছি, আমরা সর্বদাই এনার্জিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর বা পরিবর্তন করে থাকি এবং এর মাধ্যমেই উপযোগী কর্ম সাধিত হয়। তবে এই

রূপান্তর সীমিত। এছাড়া এনার্জি সৃষ্টি করা কিংবা রূপান্তরের সময় এর মাত্রা বাড়ানোও সম্ভব নয়। এনার্জি সংরক্ষণ আইন তা গ্রহণ করে না। এই আইন হলো: এনার্জি সৃষ্টিও করা যায় না কিংবা ধ্বংসও সম্ভব নয়- শুধুমাত্র এটাকে এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় রূপান্তর সম্ভব। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়তো ভালো হবে।

আমরা সবাই আনবিক শক্তির চুল্লীর কথা শুনেছি। এই পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক এনার্জি দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেয়া হয়। এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বাস্তবে কিভাবে কাজ করে?

প্রথমতঃ ইউরেনিয়াম নামক ভারী পদার্থের এটমিক নিউক্লিয়াস রিয়েকশনের মাধ্যমে ভেঙ্গে পড়ে। এই ভেঙ্গে দেয়ার জন্য উচ্চগতিসম্পন্ন নিউট্রন নামক পরমাণু নিউক্লিয়াসের উপর পতিত করা হয়। এটমের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে আরও নতুন নিউক্লিয়াস তৈরী হয়। এর ফলে নিউক্লিয়াসের আভ্যন্তরীণ এনার্জির ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিন্তু এই হ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে রিয়েকশনকে ঠাণ্ডা করার জন্য যে ভারী পানি ব্যবহৃত হয় তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের এনার্জি ক্ষয়ের ফলাফল দাঁড়ায় পানির মধ্যে তাপ এনার্জি সৃষ্টি। এই উত্তপ্ত পানি থেকে সৃষ্টি হয় বাষ্প যা দিয়ে ইলেকট্রিক টারবাইন পরিচালিত হয়। টারবাইন থেকে সৃষ্টি হয় জেনারেটরের মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যা শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘরে ঘরে এসে পৌঁছে নেশন্যাল গ্রীডের মাধ্যমে।

এখানে এনার্জির রূপান্তরের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠেছে। ইউরেনিয়ামের আভ্যন্তরীণ এনার্জিকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করছি কয়েকটি ধাপে। প্রথমে আভ্যন্তরীণ এনার্জি থেকে আসছে তাপ এনার্জি, এরপর তাপ থেকে কিনেটিক এনার্জি তথা টারবাইন ঘুরানো হচ্ছে, সবশেষে টারবাইন দিয়ে ঘুরানো হচ্ছে একটি জেনারেটর। এটা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের শেষ এনার্জি ইলেকট্রিসিটি। তহালে দেখাই যাচ্ছে- আমরা মূলতঃ কোন এনার্জি সৃষ্টি করছি না, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় রূপান্তর করছি মাত্র।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে এনার্জি দিয়ে কার্য সমাধার পর এটা যায় কোথায়? যেহেতু আমরা জেনেছি, এনার্জি ধ্বংস করাও অসম্ভব। এর জবাব হলো এনার্জি কাজের মাধ্যমে মূলতঃ তাপ এনার্জি হিসেবে বায়ুমণ্ডলে চয়ে যায়। যেমন একটি লাইট বাল্ব থেকে শুধু আলোই বেরিয়ে আসে না, এ থেকে তাপ এনার্জিও বিকিরণ হয়। একটি জ্বলন্ত বাল্বে হাত লাগালেই তা বুঝতে পারা যায়। এনার্জি দিয়ে যখন কোন মেকানিক্যাল কার্য সমাধা হয়- যেমন একটি গাড়ির ইঞ্জিন চালনা, তখন ইঞ্জিনটি গরম হয়ে এনার্জি বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়।

সুতরাং সবশেষে আমরা এটাই বলতে পারি- বিশ্বব্যাপী নেচালের এনার্জি সর্বত্র বিদ্যমান। আমরা এই এনার্জিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করে আমাদের প্রয়োজন মেটাই- এরপর এই এনার্জি আবার যেখান থেকে এসেছিলো সেখানেই ভিন্ন অবস্থায় ফিরে যায়। আর এই এনার্জিকে যে যতো বেশি কাজে লাগাতে সক্ষম সে-ই বেশি উপকৃত হয়- অর্থাৎ সেই দেশ বা জাতিই পৃথিবীর মধ্যে উন্নত জাতি।

"হে জ্বিন ও মানবজাতি! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান ও যমীনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার, তবে বের হয়ে যাও; কিন্তু ক্ষমতা (সুলতান) ব্যতিরেকে তোমরা বের হতে পারবে না" [সূরা আর-রাহমান ঃ ৩৩]।

পরিচ্ছেদ ১৩

মহাকাশ অনুসন্ধান

বিংশ শতাব্দির ষষ্ঠ দশকে মাহাকশ অনুসন্ধান যুগের সূচনা হয়েছিল। সূচনালগ্নে মাত্র কয়েক বছরের মাথায় এসেই প্রথমে কৃত্রিম রবট উপগ্রহ এবং পরে মানুষ স্ব-দেহে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশের একটি বস্তু চন্দ্রের উপর পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। এরপর একাধিক মানুষশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সৌরজগতের দূর-দূরান্তে- মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি গ্রহে।

পৃথিবীর নিকট-মহাকাশে স্থাপিত আন্তর্জাতিক স্পেইস স্টেশন (ISS)।

তবে মহাকাশ যুগ এখনও বাস্তবে অতি টেণ্ডার বয়সের মধ্যে আছে। এখনও এ যুগটি সূচনালগ্ন পেরিয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক আশাতীত সফলতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া এ যুগের সত্যিকারের সূচনা গেল শতকের ষাটের দশকে হয়ে থাকলেও এর জন্য থিওরিটিক্যাল ও প্রেকটিক্যাল উন্নয়ন-প্রস্তুতি কিন্তু অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞান এই যুগের ফাউনেণ্ডশন প্রস্তর অনেক আগেই প্রোথিত করেছিল।

মহাকাশ অনুসন্ধানের মৌলিক উপায় হচ্ছে রকেট ইঞ্জিন সৃষ্টি। পৃথিবীর বায়ূমণ্ডল ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দিতে হলে এই রকেট ইঞ্জিনের বিকল্প নেই। এছাড়া এস্কেপ ভেলোসিটি বা মুক্তগতি অর্জিত না হলে মহাকাশে যাওয়াও সম্ভব নয়- আর এই ভেলোসিটি অর্জনে প্রয়োজন পড়ে বিরাট অংকের এনার্জির। এসব প্রেকটিক্যাল সমস্যাবলীর সমাধান মানুষ খুঁজে বের করার পরই ব্যাপকভাবে মহাকাশ অনুসন্ধান প্রোগ্রাম শুরু হয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে স্থাপন করে মাহাকাশ ও এর মধ্যে অসংখ্য বস্তু যেমন, গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, তারা, গ্যালাক্সি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহিত হতে থাকে। এছাড়া কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা (ইতোমধ্যে এ ব্যপারে আলোচনা হয়েছে) সৃষ্টি হয়েছে। একবিংশ শতাব্দির শুরুতে স্থাপিত হয়েছে মহাকাশে আন্তর্জাতিক স্পেইস স্টেশন (আইএসআই)। আইএসআই একটি বিরাট কৃত্রিম উপগ্রহ- এতে একাধিক নভোচারী অনেকদিন পর্যন্ত বসবাস করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করবেন।

মৌলিক রকেট প্রযুক্তি

আইজ্যাক নিউটনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আইন রকেট প্রযুক্তির মধ্যে ব্যবহৃত হয়। রকেট ইঞ্জিনে থাকে হাইড্রোজেন জ্বালানী। হাউড্রোজেন জ্বলতে থাকলে প্রতিক্রিয়াশীল ম্যাস (ওজন) অগ্নিকুণ্ডের আকারে রকেটের ইঞ্জিন থেকে দ্রুত নীচের দিকে বেরিয়ে

আসে। এরফলে সৃষ্টি হয় একটি উর্ধ্বগতিশীল ফোর্স যা ইঞ্জিনকে উপরের দিকে তুলে।

রকেট উড্ডয়ন মুহূর্ত

থ্রাস্ট বা ধাক্কা

রকেট ইঞ্জিনের থ্রাস্ট বা ধাক্কা পাউণ্ড কিংবা কিলোগ্রাম দিয়ে মাপা হয়। এক কে.জি থ্রাস্ট এর অর্থ হলো ৯.৮১ মিটার প্রতি সেকেন্ড গতি। এই গতি মহাকর্ষের গতির সমপরিমাণ।

এফিসিয়েন্সি বা কার্যদক্ষতা

একটি রকেট ইঞ্জিনের এফিনিয়েন্সি থেকেই এর সঠিক কার্যক্ষমতা নিরূপণ করতে হয়। স্পেসিফিক ইম্পাল্‌স (নির্দিষ্ট বেগ) হচ্ছে এটা নিরূপণের ইউনিট। এই ইউনিট = গতি / মহাকর্ষ। সুতরাং রকেটের উর্ধ্বগতিশীলতা যতো বেশি হবে এর নির্দিষ্ট বেগও ততো বড় হবে। সাধারণত রকেট ইঞ্জিনের স্পেসিফিক ইম্পাল্‌স হয়ে থাকে ২০০ ইউনিট। কিন্তু আনবিক শক্তিসম্পন্ন রকেট ইঞ্জিনের স্পেসিফিক ইম্পাল্‌স ৮০০ থেকে ৯০০ পর্যন্ত হতে পারে।

মহাকাশে রকেট প্রেরণে একাধিক স্টেজ বা পার্যায় ব্যবহৃত হয়। আরোহণের সময় প্রাথমিক পর্যায়ে বিরাট ফোর্সের প্রয়োজন পড়ে। বড় বড় বুস্টার ইঞ্জিনের মাধমে বিরাট মাত্রার জ্বালানি ব্যবহার করে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পেইস ক্রাফটিকে প্রথমে পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে মুক্ত করতে হয়। মহাকর্ষ থেকে মুক্তির জন্য যে গতির প্রয়োজন তাকে বলে মুক্তগতি। এই গতি সম্পর্কে একটু পরই আলোচনা হবে।

উর্ধ্বাকাশে আরোহণের পর বুস্টার ট্যাংকের আর প্রয়োজন নেই তাই এগুলোকে ক্রাফট থেকে আলাদা করে ভূপাতিত করা হয়। সাধারণত এগুলো মহাসাগরে পতিত করা হয় যাতে ভবিষ্যতে আবার ব্যবহার করা যায়। তবে এই প্রথম স্টেজের পরও স্পেইস ক্রাফটে আরও ইঞ্জিন থেকে যায়। এগুলো ক্রাফটিকে আরও উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়ার পর আলাদা করে দেয়া হয়। মহাশূন্যে অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ূমণ্ডলের বাইরে পৌঁছার পর কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে ঘুর্ণমান হয়। তখন আর বেশি ফোর্স বা পাওয়ারের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র ক্রাফটিকে সঠিক কক্ষপথে ঘুরানোর জন্য ধাক্কা লাগে যা অল্প শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন দিয়ে সহজে তা সম্পাদন করা যায়। কক্ষপথে একবার ঘুর্ণমান হয়ে গেলে ক্রাফটি পৃথিবীর মহাকর্ষ দ্বারা চালিত হয়।

বাস্তবে কক্ষপথে ঘুরার অর্থ হলো পৃথিবীর দিকে এমনিতেই পতিত হওয়া বা মুক্তভাবে পড়ন্ত অবস্থা (ফ্রি ফল), কিন্তু একটি নির্দিষ্ট এ্যাঙ্গুলে (বক্রভাবে) পতিত হওয়ায় তা পৃথিবীর উপর এসে পড়ে যায় না। ঠিক যেভাবে পৃথিবীর চতুর্দিকে চন্দ্র তার কক্ষপথে ঘুরে সেভাবে কৃত্রিম উপগ্রহও একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে

থাকে। সুতরাং চন্দ্রের যেহেতু কোন ইঞ্জিন নাই তাই ক্রাফটেরও কোন ইঞ্জিনের প্রয়োজন মূলত নেই। তবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনে আবার পৃথিবীতে ফিরে আনতে যেয়ে ছোট্ট আকারের একটি ইঞ্জিন এর গায়ে জড়িত করে দেয়া হয়।

মিশন

একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ সহজ ব্যাপার নয়। এটা একটি মিশন। প্রতিটি কাজ সুস্পষ্টভাবে সম্পাদন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষজ্ঞ টীম। সাধারণতঃ তিনটি পর্যায়ে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো: ১. লঞ্চ (উৎক্ষেপণ), ২. ইনফ্লাইট অপারেশন (উড়ান্তাবস্থায় নিয়ন্ত্রণ) ও ৩. পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা (তবে সর্বক্ষেত্রে নয়)।

লঞ্চ: রকেট ইঞ্জিনসহ উপগ্রহটিকে খাড়াভাবে একটি লঞ্চ প্যাডে রাখা হয়। এরপর উচ্চতর ধাক্কা সৃষ্টিতে বিরাট মাত্রার জ্বালানী ব্যবহারের মধ্যমে ছোড়ে দেয়ার জন্য ফোর্স তৈরী করা হয়। বুষ্টার ইঞ্জিন থেকে নিম্নের দিকে খুব দ্রুত আগুন বেরুতে থাকে। এরফলে মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত ক্রাফটের বিরাট ওজনকে উপরের দিকে তুলা হয়। স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল হতে বেশি পাওয়ারের প্রয়োজন। যেমন, একটি গাড়ির সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গিয়্যার হলো ফাষ্ট গিয়্যার। এর কারণ হলো গাড়িটিকে স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল করতে বেশি ফোর্সের প্রয়োজন। কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সময়ও স্থির অবস্থা থেকে উপরের দিকে গতিশীল করতে বেশি শক্তির দরকার হয়। এই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অনেক জ্বালানী ক্ষয় হয়ে যায়। বুষ্টার ইঞ্জিন ক্রাফটির গতি ৭,৬০০ মিটার প্রতি সেকেন্ডে নিয়ে পৌঁছায়। সাধারণতঃ ২ মিনিটের মধ্যেই সমগ্র ক্রাফটি অন্তত ১০০ মাইল ঊর্ধ্বে আরোহণ করে।

কৃত্রিম উপগ্রহকে একশ মাইল ঊর্ধ্বে তুলেই পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুর্ণমান করা হয়। এই কক্ষপথকে বলে লো আর্থ অরবিট [এলইও], অর্থাৎ পৃথিবীর নিম্ন প্রদক্ষিণপথ। কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট বা যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহকে আরও বহু ঊর্ধ্বে নিয়ে

যেতে হয়- এই কক্ষপথকে বলে, জিওসিক্রোনাস বা জিওষ্টেশনারী অরবিট [জিএসও], অর্থাৎ ভূখণ্ডস্থির প্রদক্ষিণপথ। কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। জিএসও মূলত: ২৪ ঘণ্টার অরবিট। অর্থাৎ পৃথিবীর আহ্নিত গতির সমপরিমাণ, এর ফলে ক্রাফটি পৃথিবীর যে কোন ভূখণ্ডের উপর স্টেশনারী বা স্থির থাকে।

কোন স্পেইস ক্রাফট্‌কে যদি পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হয়, যেমন, আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের জন্য- তাহলে এটাকে মহাকর্ষ থেকে একটি বিশেষ ফোর্স দ্বারা মুক্ত করে দিতে হবে। অর্থাৎ মুক্তগতির মাধ্যমে এমন ধাক্কা দিতে হবে যাতে পৃথিবীর মহাকর্ষ এটাকে আর আটকে রাখতে না পারে [মুক্তগতি সম্পর্কে বিস্তারিত একটু পরই বর্ণিত হবে]।

ইনফ্লাইট অপারেশন: উড়ান্তাবস্থায় ক্রাফটিকে নিয়ন্ত্রণ, ন্যাভিগেশন ও কন্ট্রোল করতে হবে। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থার বিশেষ অর্থ আছে। গাইড্যান্স বা নিয়ন্ত্রণ হলো ক্রাফটিকে কোনদিকে নিয়ে মহাকাশে স্থাপন করা হবে- যেমন, কোনো বিশেষ গ্রহের কক্ষপথে নেয়া কিংবা অন্য কোনো কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে ডক করা (ভিড়ানো)। ন্যাভিগেশনের মাধ্যমে উড়ান্তাবস্থায় ক্রাফটি কোনো বিশেষ সময়ে এবং ভবিষ্যতে ঠিক কোন স্থানে এটি অবস্থান করবে তা নির্ণয় করা হয়। কন্ট্রোল অর্থ হলো যে কোন সময় ক্রাফটির গতিপথ রদবদল করার ব্যবস্থা। সাধারণতঃ কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যে ছোট্ট রকেট ইঞ্জিন থাকে সেটি দিয়ে এ কাজটি আঞ্জাম দেয়া হয়।

একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে যেয়ে বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। ক্রাফটের ওজন, গতি, অবস্থান, মহাকর্ষ ইত্যাদি বিষয় সঠিকভাবে নির্ণয়ের মাধ্যমে অঙ্ক কষে এর নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হবে তা জেনে নিয়ে রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে অন-বোর্ড (ক্রাফটের আভ্যন্তরে স্থাপিত) কম্পিউটারে ইন্সট্রাকশন বা নির্দেশ দিতে হবে। এই কাজটির জন্য কর্মশীল থাকে একটি গ্রাউন্ড ক্রু। ক্রাফটের অবস্থান নির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। শক্তিশালী রাডার থেকে মহাকাশে সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়। এই সিগন্যাল স্পেইস ক্রাফট থেকে ফিরে আসার পর এর

অবস্থান হিসেব করে বের করা যায়। তবে এ উপায়ে অবস্থান নির্ণয় নিম্ন কক্ষপথে স্থাপিত ক্রাফটের বেলা প্রযোজ্য।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের অবস্থান তার নিজের রেডিও সিগন্যাল থেকে জানা যায়। আর যেসব স্পেইস ক্রাফট আন্তঃগ্রহ মহাকাশে চলমান থাকে এগুলোর অবস্থান জানতে বিজ্ঞানীরা রেডিও সিগন্যাল ও তা ফেরত আসার মাধ্যমে হিসেব করে বের করেন। অবশ্য সিগন্যাল যাওয়া আসার সময়, রেডশিফট (টার্গেট পর্যবেক্ষকের নিকট থেকে দূরে যেতে সিগন্যালের রদবদল- ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে) এবং ডপলার এফেক্ট (এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে) ইত্যাদি বিষয় হিসেবে নিতে হবে। একটি ক্রাফটকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। ক্রাফটের মধ্যেও অটোমেটিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। মহাকাশে তারার অবস্থান, যে কোন মুহূর্তে তার নিজের অবস্থান ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান ইত্যাদি থেকে ক্রাফটের নিজস্ব কম্পিউটার হিসেব করতে পারে ঠিক কোথায় ক্রাফটি আছে এবং কোনদিকে চলতে হবে। প্রয়োজনে এই অটোপাইলট সিস্টেম দিয়েও যানটিকে কাংখিত পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

পাওয়ার সাপ্লাই

মহাকাশযানের মৌলিক পাওয়ার সোর্চ হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি। স্বল্পমেয়াদী কৃত্রিম উপগ্রহকে সাধারণ ব্যাটারী কিংবা উচ্চ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ফিউল সেল দ্বারা পাওয়ার দেয়া হয়ে থাকে। ফিউল সেল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে যার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট বা বৈর্জ্য হলো পানি।

দীর্ঘমেয়াদী কত্রিম উপগ্রহে থাকে সোলার প্যানেল। পাখার মতো স্থাপিত এসব প্যানেলে আছে অসংখ্য সোলার সেল [সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টির এক ধরণের ব্যাটারী]। কোন কোন ক্রাফটে সেলগুলো চতুর্দিকে জড়িয়ে দেয়া হয়। তবে এই সেলগুলো থেকে সৃষ্ট বিদ্যুৎ কিছু সাধারণ ব্যাটারীকে চার্জের জন্যও ব্যবহার করা হয়। কারণ সবসময় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সূর্যালোক পায় না। তার কক্ষপথে ঘুরার সময় এক পর্যায়ে পৃথিবী বা গ্রহের ছায়র মধ্যে পতিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

সোলার এনার্জি কিন্তু দূর দূরান্তে মিশনের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়। বিরাট গ্রহ জুপিটার ও এর থেকে দূরবর্তী গ্রহে ভ্রমণরত কৃত্রিম উপগ্রহে ছোট্ট আনবিক জেনারেটর ব্যবহার করা হয় পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য। সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে থার্মোইলেকট্রিক (তাপইলেকট্রিক) সিস্টেম। তেজক্রিয়া থেকে সৃষ্ট তাপকে থার্মোকাপোল্‌স নামক একটি যন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়।

পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাঃ কোন মহাকাশযানকে যদি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন পড়ে যেমন স্পেইস শ্যাটল, তাহলে একটি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে অবরোহণ করতে হবে। প্রথমে ডি-অরবিট নামক একটি স্টেজ আছে। এর মাধ্যমে ক্রাফটের মধ্যে স্থাপিত যন্ত্র দিয়ে এটির গতি কমিয়ে আনা হয়। এই অল্পমাত্রায় গতি স্তিমিত হওয়ার ফলেই কিন্তু ক্রাফটি পৃথিবীর দিকে অবরোহণ শুরু করবে। পৃথিবীর ঊর্ধ্ব বায়ূমণ্ডল এই গতিকে আরও কমাতে থাকবে। এরপর শুরু হবে বায়ূমণ্ডলে রি-এন্ট্রি বা পুনঃপ্রবেশ ফেইজ। এই ফেইজ ক্রাফটের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা। ক্রাফটের একটু সামনেই সৃষ্টি হয় বিরাট উচ্চতাপ। বাস্তবে ক্রাফটের দেহে সরাসরি কোন তাপমাত্রা হয় না, গতিশীল ক্রাফট থেকে সৃষ্ট শক্‌-ওয়েভ সামনের বায়ূর মধ্যে কমপ্রেশন (চাপের মাধ্যমে এঁটে দেয়া) তৈরী হয়- যা এই তাপসৃষ্টির জন্য দায়ী।

সময় সময় ক্রাফটের সামনের বায়ূ প্লাজমা অবস্থায় পৌঁছে যায় যার তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রার সমান হতে পারে। এই উচ্চতাপে ক্রাফটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার বাস্তব সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। সুরতাং এ থেকে রক্ষার্থে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। বারবার ব্যবহারযোগ্য স্পেইস ক্রাফট শ্যালট-এর দেহে এই অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এক ধরণের বিশেষ টালি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলো মূলতঃ তাপ-ইনস্যুলেটর- অর্থাৎ তাপকে এই বস্তু ভেতরের দিকে যেতে বাঁধা দেয়।

উচ্চগতিশীল ক্রাফটকে বায়ূমণ্ডল খুব দ্রুত কমগতিতে নামিয়ে আনে। বাস্তবে বায়ূমণ্ডল গাড়ির ব্রেকের মতো কাজ করে। এসময় অপর একটি ব্যাপার হচ্ছে রেডিও যোগাযোগ ব্লাক-আউট। পৃথিবী ও ক্রাফটের মধ্যে যোগাযোগ রাখা যায় না। ভীষণ তাপযুক্ত বাতাস আয়োনাইজ (চার্জ অবস্থা) হয়ে ক্রাফটকে ঘিরে রেখে রেডিও-তরঙ্গ আসা-যাওয়া অসম্ভব করে দেয়।

এস্কেপ ভেলোসিটি বা মুক্তগতি

এ পর্যন্ত মুক্তগতি শব্দটি একাধিকবার লেখা হয়েছে। এটা হচ্ছে পৃথিবী বা যে কোন গ্রহ-উপগ্রহের মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গতি।

সবকিছুর মধ্যে স্বভাবের মৌলিক ফোর্স মহাকর্ষ ক্রিয়াশীল আছে। একটি বড় জড়বস্তু যেমন সূর্য বা পৃথিবীর মধ্যে নির্দিষ্ট মহাকর্ষ আছে যা তার জড়বস্তুর পরিমাণের (মূলত এর ওজনের) উপর নির্ভরশীল। জড় যতো বেশী থাকবে মহাকর্ষও ততো বেশি হবে। মহাকর্ষের এই আকর্ষণ থেকে মুক্ত না হতে পারলে কোন বস্তু কিংবা একটি স্পেইস ক্রাফট মহাশূন্যে যেতে সক্ষম হবে না। একটা দৃষ্টান্ত হলো উড়োজাহাজ। আমরা জানি, পৃথিবীর আহ্নিক গতি থাকায় পৃথিবীটা একটি উচ্চগতিতে (প্রতি সেকেন্ডে ২৭ মাইল) পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে (স্পিন করছে)। উড়ন্ত একটি বিমান যখন আকাশে ভ্রমণ করে তখন এই গতির ফলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যেতে গতি হওয়ার কথা, বিমানের নিজস্ব গতি + আহ্নিক গতি। অপরদিকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে আহ্নিক গতি − নিজস্ব গতি হওয়ার কথা। অর্থাৎ যেহেতু নিম্নের ভূমি এমনিতেই ভ্রমণরত সুতরাং এক দেশ থেকে আরেকদেশে উড়ে যেতে নীচের মাটির ভ্রমণকেও হিসেবে ধরতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রেয়োজন নেই। ৫০০ মাইল কিংবা ১০০০ মাইল গতিশীল হলেও বিমানটি আসলে মহাকর্ষের খপ্পর থেকে মুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ পৃথিবীর মাটি যেভাবে আমাদের নিয়ে ঘুরছে সেভাবে বিমনটিকেও সে না ছেড়ে ঘুরাতে থাকে। অর্থাৎ পৃথিবী তার বায়ূমণ্ডলসহ ঘুরে। আর বায়ূমণ্ডলে গতিশীল কোন বস্তুকে সে ঘুরায়। একারণে বিমানের গতি হবে নীচের মাটির সঙ্গে তুলনামূলক। কিন্তু বিমানের গতি যদি হয় ১০,৮০০ মিটার প্রতি সেকেন্ড! তহালে ভিন্নকথা। কারণ এই গতি পৃথিবী থেকে মুক্তির গতি বা মুক্তগতি। এরূপ গতিশীল বস্তুকে মহাকর্ষ আটকে রাখতে পারে না। তবে যতো বেশি ঊর্ধ্বে আরোহণ করা হবে মুক্তগতির মাত্রাও ততো বেশি কমে আসবে। বাস্তবে একটি স্পেইস ক্রাফট যখন ১ মিলিয়ন মাইল দূরত্বে চলে যায় তখন সেটা পৃথিবীর মহাকর্ষের প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত হবে। কিন্তু তখন এটা সূর্যের বিরাট মহাকর্ষে আবদ্ধ হয়ে ঘুরতে থাকবে। সূর্যের

মুক্তগতি হলো ৬১৭.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। সুতরাং সৌরজগত থেকে মুক্ত হতে হলে এই গতির প্রয়োজন।

এস্কেপ ভেলোসিটি নির্ণয়ের একটি সরল পদ্ধতি আছে। এই ফর্মুলাটা হলো: Sq(2 x GM/R) এখানে Sq অর্থ ব্র্যাকেটের সবকিছুর ফলাফলের স্কোয়ার রুট, G হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন্যাল স্থির নাম্বার (বর্তমানে যে নাম্বার সাবাই মেনে নিয়েছেন তা হলো, $G = 6.67259 \times 10^{-8}$), M অর্থ গ্রহের ম্যাস (ওজন) এবং R হলো গ্রহের ব্যাসার্ধ (রেডিয়াস)।

বস্তু	ওজন (কি.গ্রা.)	ব্যাস (কিমি)	মুক্তগতি
সূর্য	১.৯৯×১০^৩০	৬,৯৬,০০০	৬.১৭৭×১০^৭ সেমি/সে
বুধ	৩.৩×১০^২৩	২,৪৩৯	৪.৩ কিমি/সে
শুক্র	৪.৮৭×১০^২৪	৬,০৫১	১০.৩ কিমি/সে
পৃথিবী	৫.৯৮×১০^২৪	৬,৩৭৮	১১.২ কিমি/সে
চন্দ্র	৭.৩৫×১০^২২	১,৭৩৮	২.৪ কিমি/সে
মঙ্গল	৬.২৪×১০^২৩	৩,৩৯৩	৫.০ কিমি/সে
বৃহস্পতি	১.৯০×১০^২৭	৭১,৪৯২	৫৯.৫ কিমি/সে
শনি	৫.৬৯×১০^২৬	৬০,২৬৮	৩৫.৬ কিমি/সে
ইউরেনাস (গ্রীষ্ম)*	৮.৬৮×১০^২৫	২৫,৫৯৯	২১.২ কিমি/সে
নেপচুন (বর্ষা)*	১.০২×১০^২৬	২৪,৭৬৪	২৩.৬ কিমি/সে
প্লুটো (শরৎ)*	১.২৯×১০^২২	১,১৫০	১.১৭৮ কিমি/সে
তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট। * বিকল্প নাম (আমার লেখা 'আসুন ঘুরে দেখি সৌরজগৎ' গ্রন্থে এসব নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে।)			

মহাকাশে অভিযান মানুষ 'এই মাত্র' শুরু করেছে। আমাদের সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহে মানবশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। পৃথিবী থেকে প্রথম মানুষ মাত্র ক'দশক আগে আমাদের অকৃত্রিম উপগ্রহ চন্দ্রের মাটিতে অবতরণ করেছে। কিন্তু মাহাকাশ তো বিরাট। অন্য একটি গ্রহ- মঙ্গলে মানবশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ অবতরণ করা সম্ভব হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই এ গ্রহে মানুষ গিয়ে পৌঁছুবে। আমেরিকা ও রাশিয়া একটার পর একটা কৃত্রিম উপগ্রহ বা রবোট উপগ্রহ মাহাকাশে প্রেরণ করে যাচ্ছে। দূর-দূরান্তের গ্রহ জুপিটার, শনি, ইউরেনাস ইত্যাদির কাছে এগুলো পাঠিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য

সংগ্রহ করা হচ্ছে। মানুষ যদি কোনদিন এই সৌরজগত ছেড়ে যেতে চায়, আর আমার বিশ্বাস যাবেই- তাহলে এসব তথ্যাদি একান্ত জরুরী।

তবে সৌরজগত ছেড়ে তারকাজগতের দিকে পাড়ি দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এতে মৌলিক সমস্যা হচ্ছে দূরত্ব। নিকটতম তারাটিই ৪ থেকে ৫ আলোক বৎসর দূরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ আলো যেতেই ৪-৫ বছর সময় লেগে যায়। সুতরাং কাছাকাছি না হলেও অন্তত আলোকের ৫০% গতিশীল মাহাকাশযান ছাড়া আন্তঃতারা মহাশূন্যে মানবসহ ভ্রমণ আদৌ সম্ভব নয়। তবে নিরাশ হবার কিছু নেই। ইতোমধ্যে মানবশূন্য একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আন্তঃতারা মহাশূন্যে আমরা প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৭৮ সালে পাইওনিয়ার নামক এই স্পেইস ক্রাফ্ট ঐতিহাসিক এ পদক্ষেপটি গ্রহণ করে। জুপিটারের বিরাট মাহকর্ষ দ্বারা ধাক্কা দিয়ে এটির গতি ৪০,০০০ মাইল প্রতি ঘণ্টায় উত্তীর্ণ করা হয়। এরপর এটিকে ৯ আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত ভেগা নামক একটি তারার দিকে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে এই উচ্চগতিও কিন্তু আন্তঃতারা মহাশূন্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অত্যল্প। পাইওনিয়ার যদি কোনদিন ভেগায় পৌঁছতে সক্ষমই হয় তাহলে, তা হবে আজ থেকে অন্তত ৪০ হাজার বছর পরে!

আন্তঃতারা ভ্রমণে 'সময়' ব্যয় হওয়ার ব্যাপারে আলবার্ট আইনস্টাইন আমাদেরকে কিছুটা আশার আলো যোগিয়েছেন। তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আলোকের গতির সঙ্গে তুলনামূলক গতিশীল স্পেইস ক্রাফটের নভোচারীরা অন্তত 'সময়'কে অনেকটা বাঁচাতে সক্ষম হবেন। তাদের কাছে কয়েক আলোক বৎসরের দূরত্বও লাগবে কায়েক মাস কিংবা এরচেয়ে কম সময়। তবে পৃথিবীতে ঠিকই কয়েক বছর পার হয়ে যাবে। তথাপি এই থিওরী আমাদেরকে টাইম ট্রাভেলের সম্ভাবনা উন্মোচন করে দিয়েছে যদিও তা শুধুমাত্র ভবিষ্যতের দিকে হবে।

এমন দিন হয়তো আসবে, যেদিন এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সৃষ্টি মানবজাতি মাহাকশের অগণিত তারায় তারায় ভ্রমণ করবে। সেদিন আমরা যতো দূরে মনে করছি, হয়তো তা ততো দূরে নয়।

"আমি (আল্লাহ) তো মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত বিশুষ্ক টনটনে মাটি থেকে" [সুরা হিজর ঃ ২৬]।

পরিচ্ছেদ ১৪

প্রাণীজগৎ

মহান আল্লাহর সৃষ্ট এ জড়জগৎ নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে বিশদ আলোচনা করেছি। তবে জড়জগতের চেয়েও জটিল এবং চিত্তাকর্ষক সৃষ্টি হচ্ছে প্রাণীজগৎ। বিজ্ঞান এখনও এই পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে কিংবা তারাজগতে প্রাণীর সন্ধান পায় নি। এ মহাবিশ্বে একমাত্র আমাদের এই নীল গ্রহটিই প্রাণী জীবনের জন্য সবদিক থেকে উপযোগী। এই পরিচ্ছেদে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে প্রাণীজীবন এবং বিশেষকরে শ্রেষ্ঠ জীবী মানুষ ও তার দেহ নিয়ে আলোচনা করবো। তবে যেহেতু এই গ্রন্থটি কোন পাঠ্যপুস্তক নয় তাই এখানে বায়োলজি বা প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হবে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশাল সাবজেক্টের উপর জরুরী কিছু আলোচনা হবে মাত্র।

জীবন বা প্রাণ আসলে কি?

জীবন বা প্রাণ বলতে আমরা আসলে কি বুঝাচ্ছি তা এখনও পরিষ্কার হয়নি। এমনকি বিজ্ঞানও লাইফ শব্দটির সংজ্ঞা ভাঙ্গাভাঙ্গাভাবে উপস্থাপন করেছে। জীবিত মানুষ বলতে আমরা কি বুঝি তা নিয়ে লিখিত ইতিহাস শুরু হওয়ার পর থেকেই চিন্তাশীলরা ঝগড়া করে আসছেন। মানবদেহটি একটি চলমান, শক্তিশালী, জ্যান্ত বস্তু হলেও এরমধ্যে লুকিয়ে আছে আরও অনেক রহস্য যার সঠিক সংজ্ঞা বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষের চিন্তাক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতা, অনুভূতি, সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, আত্মা, ইত্যাদি বস্তু কিছুটা বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে। এগুলো সুষ্ঠু মাপকাঠির মাধ্যমে নির্ণয় ও সংজ্ঞায়িত করা যায় না। অথচ এসব বস্তুর অস্তিত্বও অস্বীকার করার উপায় নেই। দার্শনিকরা এসব ব্যাপারে যুগ যুগ ধরে চিন্তা করে

আসছেন। তুলে ধরছেন আমাদের সামনে বিভিন্ন থিওরী। অপরদিকে একদল সাইকোলজিষ্ট [মনোবিজ্ঞানী] বিজ্ঞানের কাছাকাছি থেকে মানুষের ইমোশন ও কর্মকাণ্ডের সঠিক স্বরূপ উন্মোচন করার চেষ্টায় রত আছেন। এ ক্ষেত্রেও বিশ্বজনিন কোন সঠিক তথ্য তারা খুঁজে পাননি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেন বাস করে একেকটি আলাদা, একক, স্বতন্ত্র বিশ্ব। সুতরাং এতো জটিল-কঠিন মানুষ নামক এই প্রাণীকে বুঝা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তবে একটি জিনিস সর্বক্ষেত্রেই প্রায় সমান বলে দেখা যায়, তহালো মানুষের দেহের কার্যকারিতা। প্রাণীজীবন নিয়ে আলোচনায় আমরা প্রথমেই মানবদেহের বিভিন্ন অংশের ফাংশন নিয়ে আলোচনা করবো। তবে প্রাণ বা জীবন আসলে কি তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও বায়েলজিতে এর একটি সংজ্ঞা আছে। প্রথমে এই সংজ্ঞাটি কি তা জানা জরুরী।

সাধারণতঃ জীবন্ত হওয়ার অধিকারী ঐসব বস্তুকে বুঝায় যার মধ্যে তিনটি গুণ নিহিত: ১. মেটাবলিজম [খাদ্য গ্রহণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, পাকযন্ত্রের ক্রিয়া এবং অকেজো বস্তু পরিত্যাগ], ২. গ্রোউথ [ক্রমবৃদ্ধি বা বেড়ে ওঠা] এবং ৩. রিপ্রোডাকশন [বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা]। নির্জীব কোন কোন জড়বস্তুর মধ্যে এই তিনটির এক বা দুটি পর্যন্ত গুণ থাকতে পারে কিন্তু তা প্রাণী হিসেবে গন্য হয় না।

উপরোক্ত তিনটি মৌলিক গুণ ছাড়াও প্রায় সব প্রাণীদের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ প্রাণীর দেহ তৈরী হয় কার্বন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন পদার্থের সমন্বয়ে। এবার উপরোক্ত মৌলিক তিনটি গুণাবলী নিয়ে আরও কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

মেটাবলিজম: এই সিস্টেমই দেহের কোষগুলোকে কর্মশীল করে তুলে। খাদ্য পাকস্থলীতে হজম হতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং এই ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডায়োক্সাইড বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ অক্সিজেন খাদ্যকে এনার্জিতে রূপান্তরিত করে। একটি দেহের কি পরিমাণ এনার্জি দরকার তা কয়েকটি ভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল। একটি দেহ নির্দিষ্ট সময়ে যেটুকু অক্সিজেন ব্যবহার করে- অর্থাৎ এনার্জি ক্ষয় হয়, তাকে বলে মেটাবলিক রেইট। এই রেইট বিভিন্ন কারণে বেশী কিংবা কম হতে পারে। যেমন, কোন প্রাণী যদি তার পেশীকে অতিরিক্ত কর্মে ব্যবহার করে তাহলে রেইট হবে বেশী; কি পরিমাণ খাদ্য সে গ্রহণ করছে সেটা থেকে এনার্জির

পরিমাণ নির্ণিত হবে; গর্ভাবস্থায় এনার্জি খুব দ্রুত কমে যেতে পারে; ইমোশন বা অনুভুতিও রেইটকে রদবদল করে। মেটাবলিক রেইটকে কিছু মৌলিক কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে একটি স্ট্যান্ডার্ড হিসেব উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এ রেইটকে বলে বাসেল মেটাবলিক রেইট (বিএমএ)।

মানুষের ক্ষেত্রে কন্ডিশন হলো, ৮ ঘণ্টা নিদ্রা; অন্তত ১২ ঘণ্টা পূর্বে খাদ্যগ্রহণ; ৩০ মিনিটব্যাপী কোন ব্যায়াম নেই; এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা ১৬.৭ ডিগ্রী থেকে ৩০.৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে হতে হবে। এবস কন্ডিশন সঠিকভাবে প্রাপ্তির পর, সম্পূর্ণ স্থির অবস্থায় রেখে একজন মানুষের জন্য কি পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন, সেটা মেপে বের করলেই তা হবে সঠিক মেটাবলিক রেইট।

মেটাবলিজমের মাধ্যমে মূলতঃ দেহের ভেতর জরুরী এনার্জি সাপ্লাই হয়ে থাকে। খাদ্রগ্রহণের পর মেটাবলিক সিস্টেম এটাকে ভেঙ্গে এনার্জিতে পরিণত করে এবং ওয়েষ্ট প্রোডাক্ট কার্বন ডায়োক্সাইড, মল-মূত্র ইত্যাদি দেহ থেকে বের করে দেয়। এনার্জি দ্বারা দেহের প্রতিটি কোষ কর্মশীল হয়ে উঠে- অর্থাৎ এগুলো জীবন্ত থেকে নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত থাকে।

গ্রোউথ: ক্রমবৃদ্ধি হচ্ছে যে কোন প্রাণীর একটি মৌলিক গুণ। প্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রোউথ শব্দটি কিছু বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। একক একটি সেল বা কোষ যেমন বাড়ে তেমনি একাধিক কোষের সমন্বয়ে ঘটিত একটি প্রাণীও বেড়ে ওঠে। মানুষের ক্ষেত্রে একটি ডিম্বকোষ বীর্যের মাধধ্যে ফারটিলাইজ [ফলনশীল] হওয়ার পর থেকেই বাড়তে শুরু করে। গর্ভাশায়ে এই ভ্রূণটি কোষ বিভক্তির মাধ্যমে বেড়ে ওঠে। বৃক্ষ-তরু-লতাও এই কোষ বিভক্তির মাধ্যমে কোষের সংখ্যা বাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে।

বংশবৃদ্ধি: প্রত্যেক প্রাণীজীবনই রিপ্রোডাকশন বা বংশবৃদ্ধি করে অস্তিত্ব বজায় রাখে। সাধারণতঃ দুটি উপায়ে বংশবৃদ্ধি হয়- এক. এসেক্সুয়াল (যৌনাঙ্গবিহীন) এবং দুই. সেক্সুয়াল (যৌকর্মের মাধ্যমে)। প্রথম ধরণের বংশবৃদ্ধি বৃক্ষরাজির মধ্যে বিদ্যমান। একটি ফুলের মধ্যে মুকুল বিকাশ করে, এরপর এতে সৃষ্টি হয় একটি বীচি যার মাধ্যমে নতুন আরেকটি গাছের জন্ম হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন শেওলা জাতীয় বৃক্ষ, বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে স্পোর বা বীজগুটি ছাড়ে যা অন্যত্র গিয়ে পতিত হয়ে

আরেকটি বৃক্ষের জন্ম দেয়। স্পোরের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি অপুষ্প উদ্ভিদের মধ্যেই দেখা যায়।

সেক্সুয়াল বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হয় স্ত্রী ও পুরুষের ভিন্ন দুটি কোষ একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে। এই কোষগুলোকে বলে গ্যামেটিস- যেমন পুরুষের বীর্য ও নারীর ডিম্বকোষ। গ্যামেটিস একত্রিত হয়ে যে নতুন বস্তু সৃষ্টি করে তার নাম হলো জাইগোট। একটি ফারটিলাইজ ডিম্বকোষ হচ্ছে এই জাইগোট। এই জাইগোট থেকেই শুরু হয় একটি নতুন জীবনের।

মানবশিশু

নারীর গর্ভাশয়ে একটি ডিম্বকোষে একটি মাত্র শুক্র (বীর্য) প্রবেশ করে একজন নতুন মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায়। অথচ একক কোন শুক্রকে মানুষ নগ্নচোখে দেখতেই পায় না। এই ডিম্বকোষ ও শুক্রের ভেতর কিসব গুপ্ত জৈবিক পদার্থ আছে, যা থেকে আস্ত একটি মানবদেহ সৃষ্টি হয়ে যায়? শুধু তাই নয়, এ দুটোর মিলনে যে ভ্রূণটি অস্তিত্বে আসে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রং, রূপ, আকার, প্রভৃতি সবকিছুই ঐ দুটি ক্ষুদ্রকায় জৈবিক পদার্থের মধ্যে লুকানো থাকে। মানবশিশু কিভাবে মায়ের গর্ভাশয়ে জন্ম নেয় এবং বেড়ে ওঠে এ ব্যাপারে এখন কিছুটা আলোচনা করে দেখা যাক।

ডিএনএ এবং আরএনএ

প্রাণীজগত কোষ বা সেল দ্বারা সৃষ্ট। আমাদের দেহটির মধ্যে অসংখ্য সেল আছে। এই সেলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অংশ আছে। প্রতিটি সেলকে মেমব্রেন নামে একপ্রকার পদার্থ ঘিরে রাখে। বৃক্ষ-তরু-লতার সেলের চতুর্দিকে আরো একটি আলাদা শক্ত মেমব্রেন থাকে। এটাকে দেয়াল বলা যায়। তবে মানুষের সেলের এই দেয়াল তেমন শক্ত নয়।

মেমব্রেন এর ভেতর আছে সাইটোপ্লাজম নামক একপ্রকার জৈবিক পদার্থ। প্রতিটি সেলের একটি কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আছে। এটির সাথে বাইরের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা হয় পোর্স বা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা। সেলের কেন্দ্রেই অবস্থান করে এক বা একাধিক মৌলিক জৈবিক এসিড। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ডিএনএ (ডিওক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড) আর অপর আকেরটি হলো আরএনএ (রিবোনিউক্লিক এসিড)।

ডিএনএ মলিকিউলের মডেল
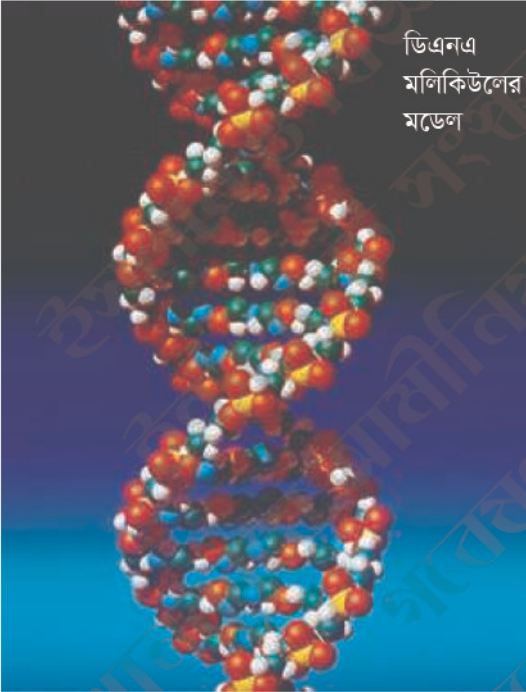
ডিএনএ এর মধ্যে ক্রমোজাম নামক দুটি বস্তু আছে। এর একটি হলো এক্স-ক্রমোজাম আর অপরটি ওয়াই-ক্রমোজাম। প্রতিটি নবজাতকের যাবতীয় সৃষ্টি-কৌশল এই ডিএনএর মধ্যে কোড করা আছে। অন্যদিকে আরএনএ এর কাজ হলো প্রোটিন সিনথেসিস বা প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা। ডিএনএ এর মধ্যে কোড দেয়া আছে নতুন শিশুর চুল, চামড়ার রং কিরূপ হবে, নাক চাপা না খাড়া হবে, চোখ বড় না ছোট হবে প্রভৃতি দেহের প্রতিটি অংশের অবস্থান ও গঠনপ্রণালী এই ডিএনএ-তে কোড করা আছে। মূলতঃ ডিএনএ-কে মানবদেহ তৈরীর ব্লু-প্রিন্ট বলা যায়। এখানে অংকিত আছে সবকিছু।

ডিএনএ থেকে নির্দেশ যায় দেহের কোথায় কি এবং কোন ধরণের অংগ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হবে। এবার দেখা যাক একটিমাত্র ক্ষুদ্র শুক্র ও ডিম্বকোষ থেকে কিভাবে আস্ত একটি মানুষের সৃষ্টি হয়।

গর্ভাশয়ে ভ্রূণ

মায়ের উদরে কিভাবে একটি শিশু পালিত হয় তা জানার বিজ্ঞানকে ভ্রূণবিদ্যা বা এ্যম্ব্রিয়োলজী বলে। এ প্রসংঙ্গে এই জ্ঞানের শাখার উপর অত্যল্প আলোকপাত করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং কোন টেকনিক্যাল গবেষণায় না গিয়ে সরল ভাষায় ভ্রূণবিদ্যার উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরছি মাত্র।
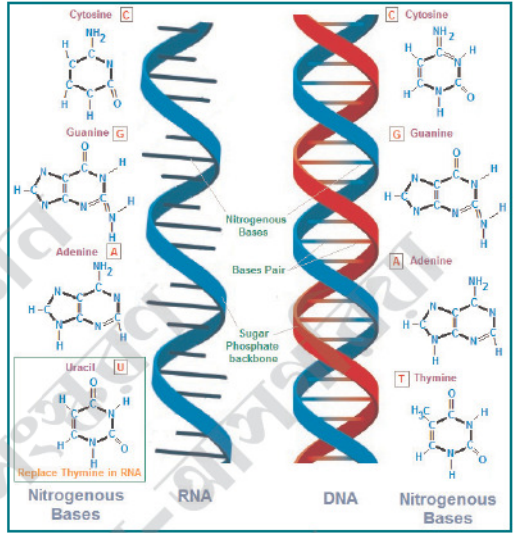
নারীদের গর্ভাশয়ে ফেলোপিয়ান টিউব নামে একটি অংশ আছে। এ টিউবে একটি বিশেষ স্থানে ডিম্বকোষ অপেক্ষা করতে থাকে। নারী-পুরুষের মিলনের ফলে পুরুষের শুক্রগুলো দ্রুত সেই অপেক্ষারত ডিম্বটির দিকে অগ্রসর হয়। অনেকের মতে ডিম্বের মধ্যে একধরণের কেমিক্যাল আছে যা এই শুক্রকে টেনে তার দিকে নিয়ে যায়। প্রতিটি শুক্রের আকার হচ্ছে ঠিক বেঙ্গাচির মতো। এদের একটি গোলাকার মাথা ও একটি লম্বা লেজ আছে। এগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে সাঁতার কেটে ডিম্বকোষের দিকে অগ্রসর হয়। ডিম্বের আয়তন শুক্র থেকে অনেকগুণ বড়। শুক্রগুলো ডিম্বের চতুর্দিকে একত্রে ভেতরে ঢুকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তবে একটিমাত্র ডিম্ব [সময় সময় দুটি বা ততোধিক] ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই ডিম্বের মধ্য থেকে একটি সিগন্যাল এসে আর ভেতরে ঢুকার সম্ভাবনাকে রহিত করে দেয়।

মায়ের উদরে শিশুর প্রথম ১০ দিন

এই ভেতরে ঢুকার মুহূর্তই হচ্ছে ফারটিলাইজ হওয়া বা গর্ভধারণ করা। এ মুহূর্তের তিনদিন পরেই ডিমটি ইউটেরাস বা আসল গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। এর পরই ডিমের কেন্দ্রে ভ্রূণটি বাড়তে শুরু করে। অন্যদিকে ডিমের অন্যান্য অংশ থেকে প্লাসেন্টা বা নাভী সংযুক্তি সৃষ্টি হয়। এই প্লাসেন্টার মাধ্যমে নবজাতকের খাবার ও বর্জ্য পদার্থ মায়ের দেহের মাধ্যমে চলাফেরা করে। ভ্রূণটি যাতে সহজে এবং নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারে এজন্য তার চতুর্দিকে মাত্র ৭ দিনের মধ্যেই একধরণের পানীয় দ্রব্য তৈরী হয়। এ তরল পিচ্ছিল পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ভ্রূণটি ভাসতে থাকে। মায়ের ছোটাছুটি ও নড়াচড়ায় যাতে ভ্রূণটির দৈহিক কোন ক্ষতি না নয়, এ নিশ্চয়তা দেয় এই পানীয়টুকু। এ পানীয়কে বিজ্ঞানের ভাষায় অ্যামনিয়টিক ফ্লোইড বলে।

ক্রমাগত বেড়ে ওঠা এই ভ্রূণের ভেতর সেলগুলো সর্বদাই বিভক্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিনের মধ্যেই তিনটি আলাদা অংশে বিভক্ত হয়ে উন্নতি হতে থাকে। এ

তিনটি অংশ থেকেই আস্ত মানবদেহ সৃষ্টি হয়। এ্যাক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এ্যান্ডোডার্ম হচ্ছে এসব অংশের বৈজ্ঞানিক নাম।

এ্যাক্টোডার্ম থেকে চামড়া, চুল, নখ, দাঁত প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। এটা নার্ভাস সিস্টেমকেও সৃষ্টি করে। মেরুদণ্ডের ভেতরের কোর্ড এবং মস্তিষ্কও এই অংশের দ্বারা তৈরী হয়।

মেসোডার্মের মাধ্যমে মানবদেহের হাড্ডিগুলো এবং মাসুল বা পেশী তৈরী হয়। এছাড়া হৃদযন্ত্র, ছোটবড় ধমনী, কিডনী, ব্লাডার ও যৌনাঙ্গ এ অংশ থেকে সৃষ্টি হয়।

মেসোডার্ম থেকে সৃষ্ট হৃদযন্ত্রটি মাত্র ২৪ দিনের মধ্যেই কম্পন বা বিট দেয়া শুরু করে। এ্যান্ডোডার্ম দ্বারা ডাইজেস্টিভ টিউব বা আঁত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সিস্টেমের ভেতরের লাইনিং তৈরী হয়।

প্রায় দশমাস মায়ের গর্ভে ভ্রূণটি এভাবে বড় হতে থাকে এবং অবশেষে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেঁচে থাকা ও আরোও দেড়যুগ যাবৎ বেড়ে ওঠার যাবতীয় উপায়-উপাদানসহ জন্মগ্রহণ করে।

এ হচ্ছে অতি সংক্ষেপে মায়ের গর্ভে শিশুর জীবনবৃত্তান্ত। কোন্ উপাদান থেকে নবজাতক ছেলে না মেয়ে হিসেবে সৃষ্ট হয়, তা এবার একটু গবেষণা করে দেখা যাক।

মায়ের গর্ভে শিশু

পুরুষের প্রতিটি শুক্র বা স্পার্ম দুটি অবস্থার একটি হয়ে থাকে। আগেই বলেছি ডিএনএ-এর মধ্যে ক্রমোজাম আছে। এর একটি হচ্ছে এক্স আর অপরটি ওয়াই ক্রমোজাম (এক্স বা ওয়াই নামগুলো ভিন্নতা বুঝাতে ব্যবহার করা হয় মাত্র)। পুরুষের শুক্রে থাকে এক্স এবং ওয়াই- এই উভয় ক্রমোজাম। অন্যদিকে মহিলাদের ডিম্বে আছে শুধুমাত্র এক্স ক্রমোজাম। আর ডিমের মধ্যে এই একক এক্স ক্রমোজাম সম্পূর্ণ অকেজো। তাই পুরুষের দুটি (এক্স এবং ওয়াই) ক্রমোজামের মধ্যে একটি মাত্র প্রয়োজন যা থেকে ডিমের মধ্যে একটি জোড়ার সৃষ্টি হয়। এই জোড়া হয় এক্স-এক্স

না হয় এক্স-ওয়াই হবে। এক্স-এক্স হলে শিশুটি মেয়ে হবে আর এক্স-ওয়াই হলে শিশুটি ছেলে হবে। এখানে লক্ষ করুন, যেহেতু নারীর ডিমের মধ্যে শুধুমাত্র এক্স আছে তাই নতুন শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে, তা নিশ্চিত করার কোন ক্ষমতা নারীদের নেই। কিন্তু পুরুষের এক্স এবং ওয়াই উভয়টি থাকায় নারীর এক্স এর সাথে উভয় জোড়া সৃষ্টি করতে পারে (অর্থাৎ, নারীর এক্স এর সাথে এক্স ক্রমোজাম দিয়ে এক্স-এক্স জোড়া বা ওয়াই দিয়ে এক্স-ওয়াই জোড়া তৈরী করে)। সুতরাং, নবজাতক শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে সেটা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপরই নির্ভরশীল।

মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়

মানবদেহে অনেকধরনের ভিন্ন বস্তু ও অংশ আছে। এর সবগুলো মিলেই একটি পূর্ণ মানবদেহ জ্যান্ত থাকে এবং জীবনভর বিভিন্ন ফাংশন করে থাকে। মানবদেহের প্রতিটি অংশই এক বা একাধিক কার্যে নিয়োজিত আছে। হৃদযন্ত্র দেহের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করে, ফুঁসফুসি স্বাস গ্রহণ নিশ্চিত করে এবং রক্তের মধ্যে অক্সিজেন সাপ্লাই দেয়। পকস্থলী খাদ্যদ্রব্যকে পাক করে উপকারী দ্রব্যাদি দেহে রেখে বর্জ্য পদার্থ ভাওয়েলে নিক্ষিপ্ত করে। মাথার খুলিতে রক্ষিত মোটা ব্রেনটি দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া কন্ট্রোল করে। এটা একটা মেমরী ষ্টোরেজ ও চিন্তার বস্তুও বটে। এছাড়া মানবদেহে আরোও কত কিছু বিদ্যমান তার ইয়ত্তা নেই। ব্লাডার, কিডনী, লিভার প্রভৃতি যন্ত্রাংশও নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত আছে।
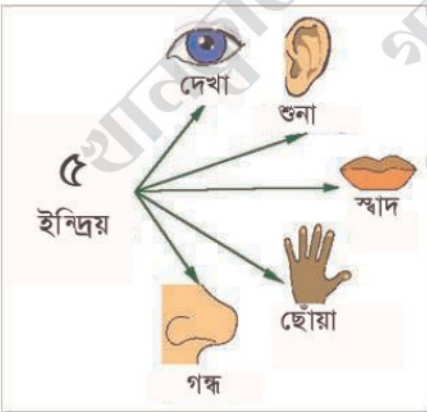
বাইর জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি ও এ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষের মধ্যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। এগুলো হলো, চোখ (দৃষ্টি), কর্ণ (শ্রবণ), নাক (গন্ধ), জিহ্বা (স্বাদ) ও ত্বক (ছোঁয়া)।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলী সম্পর্কে সবারই জানা আছে। তবে এগুলো আমরা অহরহ ব্যবহার করে কিভাবে জগতে বিচরণ করছি

তা কি গভীরভাবে একবার ভেবে দেখেছি? এবার এগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা করে দেখা যাক।

পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষের মধ্যে আছে কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়। যেমন: বুদ্ধি, অনুভূতি, চিন্তা, চেতনা ও দিব্যদৃষ্টি। এবার সবগুলো ইন্দ্রিয় সম্পর্কে একে একে আলোচনা করে দেখা যাক।

(১) চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তি: মানুষের চোখ একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে চক্ষুকে একটি ক্যামেরার সাথে তুলনা করা যায়। ঠিক ক্যামেরার মতো বস্তু থেকে আগত আলো একটি লেন্সের ভেতর দিয়ে রেটিনা বা অক্ষিপটে (ক্যামেরার ক্ষেত্রে ফিল্মে) পতিত হয়ে বস্তুর একটি ছবি অংকিত হয়। এ ছবিটি পরে ব্রেনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে। তবে ঠিক সাধারণ ছবির মতো হয়ে যায় না। এই আলো-আঁধারের খেলা থেকে মস্তিষ্ক কিভাবে দেখে তা বিজ্ঞান এখনও পরিষ্কার করে বলতে সক্ষম হয়নি। আমাদের চোখগুলো আসলে দেখে না, দেখে আমাদের ব্রেন। চোখের কাজ হলো বাইর জগতের আলো-আঁধার ব্রেনে নিয়ে পৌঁছানো। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্রেন গবেষণা বা আনালাইজ করে বোধশক্তিসম্পন্ন জিনিস হিসেবে দেখে। এ কঠিন কাজটি ঠিক কিভাবে মস্তিষ্ক সম্পন্ন করে তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। আমাদের ব্রেন শত শত ভিন্ন ধরণ, রং ও গঠনের বস্তু দেখতে পারে ও আলাদা করতে জানে।

(২) নাক (গন্ধশক্তি): নাকের সাহায্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদিত হয়। এর একটি হচ্ছে শ্বাস-নিঃশ্বাস আর অপরটি হলো গন্ধ অনুধাবন করার শক্তি। নাক থেকেও কিছু তথ্য ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে এবং ব্রেন গন্ধের অনুভূতি দান করে।

নাকের গভীরে ওলফেক্টরী নামক একটি অংশ আছে। এখানে কিছু গন্ধ অনুধাবন করার সেল বা কোষ আছে। বাতাসের সাথে বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন কেমিক্যাল ও এদের আলাদা গন্ধ নাকের ভেতরে গিয়ে এই কোষগুলোতে প্রতিক্রিয়া করে। ওলফেক্টরী সেলে পতিত কেমিক্যাল তথ্য শেষ পর্যন্ত নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। ব্রেন এসব তথ্য থেকে বিভিন্ন গন্ধ অনুধাবন করে।

এভাবে আমরা সুগন্ধী আর বাসি জিনিসের অর্থ কি বুঝতে পারি। এ ক্ষেত্রে ঠিক কিভাবে আমরা গন্ধ অনুধাবন করি তা বিজ্ঞান বের করতে সক্ষম হয়নি। এর একটা বিশেষ কারণ হলো, মানুষের মধ্যে ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিক্ষমতা এবং চেতনা আছে। সর্বোপরি আত্মা নামক একটি অজড় জিনিসের নিবাস মানুষের মধ্যে। ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলির (চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বার) মাধ্যমে আগত তথ্যসমূহ ব্রেন বুঝতে পারে, কিন্তু কে বুঝে? এ প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান জানে না। এটা ফিলোসফি ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার। তবে এক্ষেত্রে এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, মানুষ একটি যন্ত্র নয়। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট রহস্যের জগত। বিজ্ঞান সৃষ্ট বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে। মানব দেহটিও একটি সৃষ্ট বস্তু, কিন্তু এটির সাথে জড়িত আছে অতিন্দ্রিয় জতগের সংযোজন, যা বিজ্ঞানের গণ্ডিসীমার বাইরে অবস্থান করে। মানবদেহের পরিচলন, এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েই বিজ্ঞানের গবেষণা সিমীত।

(৩) জিহ্বা বা স্বাদঃ স্বাদ গ্রহণ করা ও বুঝার বস্তুটি হলো আমাদের জিহ্বা। জিহ্বা ও নাক একত্রে কাজ করে থাকে। এ দুটো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে খাবারের মধ্যে বিষাক্ত কিছু আছে কি না তা অনুধাবন করা যায়। এছাড়া শ্বশুরবাড়ির খোরমা-পোলাও সুস্বাদু কি না তা-ও জানা যায়।

জিহ্বার মধ্যে স্বাদ কি তা বুঝার মতো সেনসিটিভ সেল আছে। কোন খাদ্যদ্রব্য জিহ্বায় পড়লেই এসব সেল লালার সাথে মিশে খাদ্যের স্বাদ অনুযায়ী বিভিন্ন নার্ভ সিগন্যাল ব্রেনে পাঠিয়ে দেয়।

স্বাদ ও গন্ধ ব্রেনের যে অংশটুকু বুঝতে পারে তা ব্রেনের গোড়ায় অবস্থিত। জিহ্বার স্বাদ ও গন্ধ থেকে আমাদের অনুভূতি বা ইমোশনও উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানেও কি উপায়ে আমরা ব্রেন দিয়ে স্বাদ অনুভব করি বা আসলে কে তা করে বিজ্ঞান ঠিকমতো বলতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত মানুষের চেতনা ও নিজস্ব পরিচিতি বলতে যা বুঝায়, এসব না থাকলে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন তথ্য অনুধাবন করতে পারতাম না।

(৪) কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয়ঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ও আরেকটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। বাতাসে ভ্রমণকারী শব্দ-তরঙ্গ কানে পৌঁছলে কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর ফলে শব্দ-তরঙ্গ নার্ভ সেলের

মাধ্যমে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। যদিও শব্দের উৎপত্তি ভাইব্রেশন বা কম্পন থেকে কিন্তু ব্রেন এটাকে শব্দ হিসেবে শোনে। ব্রেনের ভেতর এমন কিছু গুপ্ত রহস্য লুকিয়ে আছে যে, এটা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিটি নার্ভ সিগন্যালকে (এক ধরণের ইলেকট্রিক তরঙ্গ) আলাদাভাবে বুঝতে পারে এবং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে জানে। মূলতঃ ব্রেনকে এজন্যেই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বলা হয়। একমাত্র হৃদযন্ত্র ছাড়া আমাদের দেহের যাবতীয় ফাংশন বা কার্যকারিতা এই ব্রেনই নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা, শোনা, অনুভব করা, চিন্তা, চেতনা, স্বাদ, গন্ধ, হাত-পায়ের চলাচলসহ প্রতিটি দৈহিক ফাংশন একমাত্র ব্রেনই কন্ট্রোল করে থাকে।

কর্ণের কার্যকারিতা অনেকটা স্পিকারের মতো। কানের ভেতরে ইয়ার-ড্রাম নামে একটি অংশ আছে। এ ড্রামের মধ্যে বাতাস ভর্তি থাকে। বাইর থেকে আগত শব্দ-তরঙ্গ এই ড্রামের মধ্যে কম্পন শুরু করে। ড্রামের মধ্যে কিছু নার্ভ-সেল আছে যা ব্রেনের সাথে সংযুক্ত। আগত শব্দ ড্রাম থেকে এই নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে পৌঁছে এবং ব্রেন তা শব্দ হিসেবে আমাদের চেতনায় জানিয়ে দেয়। এভাবে আমরা জগতের শব্দ শ্রবণ করে থাকি।

(৫) ত্বক বা ছোঁয়াঃ আমরা চোখ বন্ধ করে রাখলেও কেউ যদি আমাদের হাতে একটি ছোট বল দেয় তবে আমরা বলতে পারি এটা গোলাকার একটি বল। অনুরূপভাবে এটা যদি অন্য কোন আকারের বস্তু হয় তবে তা আমরা সহজে বুঝতে পারি বস্তুটির আকার কি। যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বুঝতে সক্ষম হই এটাকে টাচ বা ছোঁয়ার ইন্দ্রিয় বলে। ত্বক বা চামড়ার মধ্যে সর্বত্র এক ধরণের নার্ভ সেল আছে। আমরা যখন কিছু স্পর্শ করি তখন এগুলোর মাধ্যমে অনেক সিগন্যাল আলোকের গতিতে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। ব্রেন তখন এসব সিগন্যালকে ব্যাখ্যা করে চেতনার মধ্যে অনুভূতি জাগায়। আমরা তখন বুঝতে পারি যে বস্তুটি স্পর্শ করেছি তা কী হয় এবং এটা গরম না ঠাণ্ডা, লম্বা না বেটে, ভারী না হালকা, কঠিন না তরল প্রভৃতি।

এ হচ্ছে আমাদের দেহের পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এক্ষেত্রে আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

মানবদেহে অনুভূতি ও চেতনা সম্পর্কে দার্শনিক এ্যারিষ্টটল প্রথম গবেষণা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এরপর প্রায় ন'শ বছর পূর্বে মহাত্মন ইমাম গায্যলী (রহঃ) ইন্দ্রিয় সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করেন।

তিনি সাধারণ পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ছাড়াও আরো একাধিক আভ্যন্তরীণ চেতনা সৃষ্টিকারী ইন্দ্রিয় যে মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে, সেগুলো নিয়েও আলোচনা করেন। যেমন: ব্যথা, উষ্ণতা, ব্যালান্স, হাড্ডির জোড়ার অবস্থান, পেশী ও এতে সৃষ্ট চাপ এবং রক্তচাপ। এসব ক্ষেত্রেও ব্রেনে তথ্যসমূহ আসে (মস্তিষ্ক ইনফরমেশন পায়)। এখানে উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু তথ্য ব্রেনে পৌঁছলেও আমাদের চেতনা বা কনশিয়াসনেছ তা বুঝতে পারে না। যেমন রক্তচাপের ক্ষেত্রে ব্রেনে আগত তথ্য অনুযায়ী চাপের মধ্যে ব্যালান্স তৈরী করে স্বাভাবিক করা হয়। অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, দেহের মধ্যে কোন রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের মধ্যে এ্যবিডি নামক কিছু সেল আছে, এগুলো এই ফরেন জীবাণুগুলোকে আক্রমণ করে। এটাকে দেহের ইম্যিউন সিস্টেম (রোগ প্রতিশেধক ক্ষমতা) বলে। তবে রোগজীবাণুগুলো যে দেহে প্রবেশ করেছে এ তথ্য ব্রেনে নার্ভ সেলের মাধ্যমে পৌঁছার পরই সেখান থেকে আক্রমণের ওর্ডার আসে। এরূপ অসংখ্য তথ্যাবলী ব্রেন ও দেহের মধ্যে চলাচল করছে যার খবর আমাদের চেতনা মোটেই জানে না। আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এসব আয়োজন করা হয়েছে।

সক্রিয় একটি অপূর্ব পাম্প হৃদযন্ত্র

মানবদেহের প্রতিটি কোষে বা সেলে যে যন্ত্রটি রক্ত সরবরাহ করে সেটি হলো হৃদযন্ত্র। এ যন্ত্রের সাথে সমগ্র দেহের বিভিন্ন অংশের সরাসরি যোগাযোগ আছে। ধমনী, শিরা, উপশিরা প্রভৃতির মাধ্যমে এ যোগাযোগ রক্ষিত হয়।

মানবদেহের খাদ্যদ্রব্য হিসেবে আমরা সাধারণত তরল ও কঠিন পদার্থ গ্রহণ করে থাকি। তবে দেহের বিভিন্ন অংশ এবং সেলগুলো কিন্তু এ অবস্থায় খাদ্য থেকে উপকার গ্রহণ করতে অসমর্থ। আর আগেই বলেছি মানবদেহের প্রতিটি সেলই জ্যান্ত, সুতরাং তাদের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যকে যেসব অবস্থায় সেলগুলো গ্রহণ (ব্যবহার) করতে পারে তাহলো অক্সিজেন, কার্বন ডায়োক্সাইড, জৈবিক নিউট্রিয়েন্স প্রভৃতি।

যে সিস্টেমের মাধ্যমে এই খাদ্যগ্রহণ সম্ভব হয় সেটিই হচ্ছে মানবদেহের সার্কুলেটরী সিস্টেম। এ সিস্টেমের কেন্দ্রীয় যন্ত্রটির নামই হচ্ছে হৃদযন্ত্র বা হার্ট। হার্টের ভেতর চারটি চেম্বার (কামরা) আছে। এগুলো হলো ডান ও বাম আট্রিরাম, এ দুটি চেম্বার দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ফিরে-আসা রক্তকে গ্রহণ করে, বাকী আরো দুটি চেম্বার আছে যেগুলোকে ডান ও বাম ভেনট্রিকোল বলে। ভেনট্রিকোলগুলোর মাধ্যমে রক্ত দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। আর্টারী বা ধমনী হচ্ছে রক্ত-ভেস্যাল, যার মাধ্যমে রক্ত হার্ট থেকে বেরিয়ে যায়। অপরদিকে শিরা বা ভেইন রক্তকে হার্টে নিয়ে আসে। আর্টারী ও শিরার সাথে অসংখ্য ছোট ছোট উপশিরা বা ক্যাপিলারী সংযুক্ত আছে। এই ক্যাপিলারীর দেয়াল থেকেই সেলগুলো রক্ত (রক্তে উপস্থিত খাদ্য) গ্রহণ করে এবং বর্জ্য (অনুপকারী বস্তু) ফিরিয়ে দেয়। এসব কার্য সম্পাদিত হয় হৃদযন্ত্রের পাম্প বা চাপ থেকে, যা একটি মানুষ যতোদিন বেঁচে থাকে ততোদিন পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, হৃদযন্ত্র কিভাবে কাজ করে- কিন্তু এর পেশীগুলো যে অনবরত নিয়মমাফিক পাম্প করে যাচ্ছে তার কারণ কি বলতে পারছেন না। দেহের প্রতিটি যন্ত্র ও অংশকে মস্তিষ্ক কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু হার্টকে পারে না।

শেষকথা

বিজ্ঞান আজ একটি বিরাট বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আজকাল শুধুমাত্র এই একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা হচ্ছে বহুখণ্ডে প্রকাশিত বিশ্বকোষ। সুতরাং জ্ঞানের এই বিরাট শাখার উপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে আমি আশাকরি এই খণ্ড পাঠ করার পর অনেকেই হয়তো বিজ্ঞানের উপর কিছুটা অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে কতো চিত্তাকর্ষক বিষয় তা-ও হয়তো অনুধাবন করেছেন। এই লেখা পাঠের পর বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও অধিক জানার আগ্রহ যদি বাড়ে তবে এ চেষ্টা সার্থক হবে।

নিঃসন্দেহে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে, বিজ্ঞানের উপর আরোও অধ্যয়ন করতে যেয়ে বাংলা ভাষায় বই-পুস্তক পাবো কোথায়? কারণ, এটা সর্বজনজ্ঞাত একটি ফ্যাক্ট যে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর বাংলা ভাষায় লেখালেখি খুব

অল্প হয়েছে। তবে পত্র-পত্রিকায় ইদানিং এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে যা অনুসন্ধিৎসুদের জন্য সুখবর বটে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সবার প্রিয় একটি সাবজেক্ট হিসেবে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তুলে ধরতে হলে আমাদেরকে কিছু মৌলিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রথমতঃ সর্বসাধারণের মধ্যে একটি অবাস্তব ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। আর তাহলো, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবার জন্য বুঝা খুব কঠিন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদেরকে বিজ্ঞানই বলে দিচ্ছে, মস্তিষ্কের ক্ষমতার মাত্র ২% বা ৩% অধিকাংশ মানুষ ব্যবহার করে থাকে। বাকী ৯৭% কিংবা ৯৮% অকেজো হিসেবে পড়ে আছে! সুতরাং বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে ব্রেন-পাওয়ার বা বুদ্ধিক্ষমতার ক্রটি থাকতে পারে- তা আদৌ সঠিক নয়। কিন্তু এরপরও এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি মানুষের আগ্রহ কেন এত অল্প- তা ভালোভাবে গবেষণার প্রয়োজন আছে।

আমরা জানি পুরো দেশব্যাপী সাবজেক্টের প্রতি আগ্রহের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর অধ্যয়নে নিরুৎসাহ প্রদর্শন করে। আর এই অনীহার প্রধান কারণ হলো, তারা মনে করে এ বিষয়ে অধ্যয়ন কঠিন। সুতরাং, যেহেতু দীর্ঘকাল সাইন্সে লেখাপড়া শেষে পাশের আশা নেই- তাই সহজ-সরল আর্টস্ সাবজেক্ট একটা নিয়ে ডিগ্রী দিলেই সারলো! ভাবটা এটাই।

ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞানাতঙ্ক কেন জন্মে, এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলবো- ছোট থেকেই বিজ্ঞানের উপর সরল ভাষায় লিখিত অপর্যাপ্ত বই-পুস্তক হেতু এ বিষয়ে তারা তেমন বেশী জানতে সক্ষম হয় নি। এর চিত্তাকর্ষক দিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকায় তারা বিষয়টির উপর অনুৎসাহিত।

সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আকর্ষণীয় দিক প্রথমতঃ সবার জন্য প্রাঞ্জল, সরল-সহজ ভাষায় প্রিন্টেড মিডিয়ায় তুলে ধরতে হবে। আজকাল পত্র-পত্রিকায় যা লিখা হচ্ছে তার সিংহভাগই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে বলে মনে হয় না। এর একমাত্র কারণ

হলো উপস্থাপনে কাঠিন্যতা অবলম্বন করা হচ্ছে। বিদেশী শব্দব্যবহার হচ্ছে অবাধে। অথচ এভাবে লেখার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের সকলেরই ভালোবাসা আছে বলে আমরা দাবী করি- কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, লেখক-গবেষকরা বিদেশী শব্দ-প্রয়োগে তৃপ্তিবোধ করেন! এ প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে। কাঠিন্যতা প্রজ্ঞাকে প্রমাণ করে না- বরং দুর্বোধ্যতার ফলে পাঠকের আগ্রহে ভাটার সৃষ্টি করে।

অনেকে বলবেন, বিজ্ঞান যেহেতু আজকের বিশ্বে এসে ইংরেজির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেছে তাই অন্তত ইংরেজি শব্দব্যবহার ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি আছে? এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা ভাষার খাতিরে, পাঠকদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সরল ভাষায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমরা অনেক ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে পারি- সাথে সাথে মূল ইংরেজিটাও রেখে দিতে পারি। এতে যারা ইংরেজি শব্দটির উপর বেশী আস্থাশীল তাদেরকে যেমন খুশী রাখা যায়- একই সময় বাংলা শব্দটি প্রয়োগের ফলে ইংরেজি যে বুঝেন না, তার জন্য অনেকটা বোধগম্যও হয়ে গেল। আর কালে এই ব্যবহৃত বাংলা প্রতিশব্দটি সবার বোধগম্য হয়ে ওঠলে আমরা অবশেষে ইংরেজিটা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে পারি। তবে প্রয়োজনে বাংলা শব্দব্যবহার ছাড়াও অর্থের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পরে। এতে দুর্বোধ্য বা অল্প ব্যবহৃত বাংলা শব্দটির সঠিক অর্থ পাঠকদের কাছে ধরা পড়ে যাবে। এসাথে পুরো ব্যাপারটি বোধগম্য হয়েও ওঠবে।

দ্বিতীয়তঃ খুব বেশী বেশী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর সরল ভাষায় লেখালেখির প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন বয়সের পাঠকদের উদ্দেশ্য করে এ লেখালেখি করতে হবে। চিত্তাকর্ষক ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও তথ্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

যা হোক, আমি আশা করবো লেখক, বিজ্ঞানী, গবেষক ও চিন্তাশীল সুধীজন আমার এই গ্রন্থটি পাঠ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব যে কতো বিরাট তা আরোও বেশী অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এসাথে এটাও অনুধাবন করবেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের সংঘাত নেই- যার উপর পরবর্তী খণ্ডে বিশদ আলোচনা হয়েছে। আর এটাও সবাইকে অনুধাবন করতে হবে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর ব্যাপক আগ্রহ-অধ্যয়ন ও গবেষণা ছাড়া আমাদের সমাজজীবনে বৈষয়িক উন্নয়নসহ ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ঠিকে থাকা খুব কঠিন হবে।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বীন ও বিজ্ঞান

ইসলাম ও বিজ্ঞান

তৃতীয় খণ্ড

রচনাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ।
engineerazizulbari@gmail.com

"আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" [সূরা নূর: ৪৫]।

তৃতীয় খণ্ড : দ্বীন ও বিজ্ঞান

ভূমিকা

গ্রন্থের শেষ এই খণ্ডে আমরা দ্বীন ইসলামের আলোকে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করবো। পাঠকরা সর্বক্ষেত্রে আমার সঙ্গে একমত হবেন তা আমি মনে করি না। তবে বিজ্ঞান যে ইসলামের সঙ্গে কোন সংঘাত সৃষ্টি অতীতেও করে নি এবং এখন কিংবা ভবিষ্যতেও করবে না এ সত্যটি উপলব্ধি করার জন্যই আমি আমার ব্যক্তিগত গবেষণা পাঠকদের সকাশে উপস্থাপন করেছি।

এই গবেষণা যেহেতু একান্তই আমার নিজস্ব, তাই এতে ভুল-ত্রুটি বেশি থাকা স্বাভাবিক। বিশেষকরে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতমালার কিছু নতুন ব্যাখ্যা এসেছে যা অতীতে বড় বড় জ্ঞানবানদের ব্যাখ্যা বা তাফসীর থেকে ভিন্ন। তবে আমার এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো তাফসীর হিসেবে গ্রহণ করার জন্য কাউকে বলবো না। বিজ্ঞানের উপর যেসব আয়াতমালা আছে এগুলোর ব্যাখ্যা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তুলে ধরেছি মাত্র। এর মাধ্যমে অতীতের তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যা বাতিল কিংবা রহিত হয়ে মোটেই যায় নি। তাঁদের ব্যাখ্যা যেমন সঠিক তেমনি আমারটাও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাঠকরা অনুগ্রহ করে, এই **'সম্ভাবনা'** কথাটি মনে রেখে কুরআনের আয়াতমালার ব্যাখ্যা যেসব ক্ষেত্রে এসেছে তা পাঠ ও অনুধাবন করবেন। এছাড়া এটা মনে রাখতে হবে, পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা একাধিক হতে পারে। বরং এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, কুরআনের একেকটি আয়াতের ৭টি পর্যন্ত অর্থ আছে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুটি অর্থ যে আছে, সেকথা প্রায় সবাই বলে থাকেন।

সুতরাং শেষ এই খণ্ডটি পাঠের সময় আমি আশা করবো পাঠকরা উপরোক্ত বিষয়বস্তু স্মরণ রেখে অগ্রসর হবেন। আমি ক্ষুদ্রজ্ঞানী এক সাধারণ লোকের পক্ষে এমন উচ্চতর গবেষণার ইচ্ছাপোষণই মূলতঃ দুঃসাহস বৈ কিছু নয়। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানমনা মানুষের মনে কিছু ভুল ধারণার জন্ম নিয়েছে বিধায় এ কাজে আল্লাহর নামে হাত দেওয়া একান্ত জরুরী মনে করেই সাহস করেছি। আমি আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং এই গবেষণায় তাঁর একান্ত সাহায্য কামনা করছি।

"তিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অধীন করেছেন; এতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন" [সূরা জ্বা-ছিয়াঃ ১৩]।

পরিচ্ছেদ ১

ইসলাম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মানবেতিহাসে এমন কোন তুলনামূলক কাল অতিবাহিত হয় নি, যে হারে আজকের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত সম্প্রসারণ হচ্ছে। এ গতি নতুন এ (একবিংশ) শতাব্দিতে আরও দ্রুততর হবে, একথা নিশ্চিত। আজকের মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিধি বর্ধনে যেভাবে যৌথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তার নজির গত পাঁচ হাজার সালের লিখিত ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বড় বড় ইন্সটিটিউট, গবেষণাকেন্দ্র। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির ফলে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে আজ ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো পৌঁছেছে। কম্পিউটার আর ইনটারনেটের মাধ্যমে পাঁচ বছরের শিশুরাও আজ যে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে, তা মাত্র দু'দশক পূর্বেও অসম্ভব বলে ধারণা করা হতো। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক বিজ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে কিছুটা দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তবে এই জ্ঞান আহরণ কি আমরা মুসলমানদের জন্য জরুরী?

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব হলো, বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও এ থেকে উপকার সাধন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই এবং মুসলমান হিসেবে এই জ্ঞান অর্জন করা শুধু নিরাপদ নয় বরং একান্ত কাম্য। বিজ্ঞানের এ ব্যাপক সম্প্রসারণ থেকে যে কেউ এটা আহরণ করা থেকে বঞ্চিত হবে, সে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন হবে। জ্ঞানই ক্ষমতা বা নলেজ ইজ পাওয়ার- এ প্রবাদ বাক্যের বাস্তবতা আজ যেন সূর্যের অস্তিত্বের মত সত্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যার কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান বেশী সে-ই এ পৃথিবীতে কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। কারো পছন্দ হোক বা না, এটাই বাস্তবতা। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো এ জ্ঞান-বিজ্ঞান আজ আর কারো ব্যক্তিগত

সম্পদ নয় বা গুপ্ত-জ্ঞানও নয় যে, কারো পক্ষে তা আহরণ করা কঠিন হবে। আজকাল এমন কিছু সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে; ফলে যে কোন লোক প্রায় বিনামূল্যে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির মৌলিক উৎস হচ্ছে কুরআন শরীফ

এটা ধীরে ধীরে মুসলিম ও এমনকি অমুসলিমদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে যে, ইসলামের মহান ঐশিগ্রন্থ আল-কুরআনই অধুনিক বিজ্ঞানের মৌলিক উৎস। এ মহাসত্য ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ইতিহাসের আঁধার-কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো। যারা এ সত্যকে দাবিয়ে রেখেছিলেন তারাই আবার এটা বাধ্য হয়ে প্রকাশ করছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বিগত আট শতাব্দি যাবৎ মুসলিম সভ্যতার ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় ও মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানপিপাসার অধঃপতনের ফলে এ সত্য তাদের মনন, মস্তিষ্ক ও ইতিহাস থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। পশ্চিমা বিজ্ঞানমুখী সভ্যতার ক্রমাগত উৎকর্ষ মুসলমানদের আপন জ্ঞান-পিপাসু অতীতকে পর্যন্ত বিস্মিত করে দেয়। অবশ্য এর জন্য উইরোপীয় ও পরবর্তীতে আমেরিকান অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র প্রভৃতিও বহুমাত্রায় দায়ী ছিলো। যেখানে ইউরোপ মুসলিম সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে চতুর্দশ শতক থেকে সাদরে গ্রহণ করে পৃথিবীর বুকে নবতর বিপ্লব সৃষ্টি করলো, অথচ তখনকার পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যারা সেই জ্ঞানের উত্তরসূরী ছিলো, তারা এ অগ্রগতি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। বিগত মিলেনিয়াম বা সহস্র বছরের ইতিহাসে এ অকৃতকার্যতাই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা হৃদয়-বিদারক ব্যাপার। এটা প্রকাশ করতে দ্বিধা নেই যে, এ ফেইলারের কথা সচেতন মুসলমানদেরকে সময় সময় বেশ আপ্লুত ও আহত করে ফেলে। চলন্ত মিলেনিয়াম যেন মুসলমানদের জন্য এরূপ না হয়, এ কামনা, এ বাসনা আমাদের মনে সদা-জাগ্রত হয়ে আছে। আল্লাহর দরবারে তাই আকুল আবেদন করি, তিনি যেন আমাদের জ্ঞান-চক্ষু এখনই খুলে দেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরা একবিংশ শতকের শুরুতেই অগ্রণী হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে প্রায় আটশত আয়াত আছে যেগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। এসব আয়াতমালা দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন নাজিল হয়েছিলো, তখন মানুষ এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পান নি। তবে এসব মহাসত্যের আয়াতমালা তখন নাজিল হওয়ায় কিন্তু বিফলে যায় নি। আল্লাহর দেওয়া এসব জ্ঞান-বাক্যগুলোর অনুকরণেই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কিছুদিন পর থেকেই প্রায় সাত শতাব্দি যাবৎ শত শত মুসলিম বিজ্ঞানী, গবেষক, দার্শনিক ও জ্ঞান-সাধকদের আবির্ভাব শুরু হয়। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা দেখেছি তাঁরা অতীতে আবিষ্কৃত গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা, তাঁদের লেখার অনুবাদ ও নিজেরা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মেডিক্যাল বিজ্ঞানসহ কয়েকটি নতুন শাখার জন্ম কিভাবে দিয়েছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ ব্যাপক প্রসার ইসলামিক বিশ্ব ও এর চতুর্সীমানায় দ্রুত বিস্তৃত হয়। এটা ইতিহাসের বাস্তবতাসহকারে প্রমাণসহ বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ অগ্রগতি হয়েছিলো। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দির ইউরোপীয় রেনেসাঁ ছিলো এ অগ্রগতির সরাসরি ফসল।

কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অমুসলিম গবেষকদের উক্তি

সম্পূর্ণ কুরআন শরীফই যে ওহীর জ্ঞান, এটা মানবতার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক জ্ঞানের উৎস এবং এ মহাগ্রন্থের প্রাপক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যে মানবেতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান মহাপুরুষ ছিলেন- তার কয়েকটি বাস্তব প্রমাণ এবার পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরছি। মুসলমান হিসেবে ভাবের আবেগ ও আপন ধর্মের সুবাদ প্রকাশে উপরোল্লিখিত কথাগুলো আমি বলেছি, এ ধারণা অনেকের মনে জন্ম নিতে পারে। আর এটা অস্বাভাবিকও নয়। তাই এখন পশ্চিমা পণ্ডিত ও অ-মুসলিমরা কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলছেন তা তুলে ধরছি। আগেই বলে রাখি এসব চিন্তাশীল মনীষীরা পূর্ব-প্রাচ্যে সর্বত্র বড় ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বলে সর্বজন-স্বীকৃত।

(ক)

"Leaders must fulfil three functions; provide well-being of the led, provide social organisation in which people feel relatively secure, and provide them with one set of beliefs. People like Pasteur are leaders in the first sense. People like Gandhi and Confichyus, on one hand, and Alexander, Caesar, and Hitler on the other, are leaders in the second and perhaps third sense. Jesus and Buddha belong to third category alone. Perhaps the greatest leader of all times was Muhammad (ASW), who combined all three functions. To a lesser degree Moses did the same."

-Jules Masserman, Jewish, Psychoanalysis Professor at the University of Chicago; quoted in Time, July 15, 1974

ভাবার্থ: "নেতাদের পক্ষে তিনটি বিষয় পূর্ণ করা আবশ্যক; অনুরাসীদের সুখ-শান্তির নিশ্চয়তা দান, সামাজিক নিরাপত্তা দান- যেখানে মানুষ নিরাপদে বাস করতে পারে এবং তাদেরকে (অনুসারীদেরকে) একগুচ্ছ জীবনদর্শন (বিশ্বাস) দান করা। পাসটিউ (ফরাসী দার্শনিক) হচ্ছেন এমন একজন নেতা যাকে প্রথম শর্তানুযায়ী নেতা বলা চলে। একদিকে গান্ধি, কনফিউসিয়াস আর অপরদিকে আলেকজান্ড্রার, সিজার ও হিটলারকে দ্বিতীয় এবং হয়তো বা তৃতীয় শর্তানুযায়ী নেতা বলা যায়। ঈসা (আলাইহিস্‌সালম) এবং বৌদ্ধ হচ্ছেন তৃতীয় শর্তের নেতা। তবে সর্বকালের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন হয়ত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যিনি তিনটি শর্তই পূর্ণ করে গিয়েছেন। এর থেকে কিছুটা নিম্নমানের পর্যায়ে মূসাও (আলাইহিস্‌সালাস) তা করেন।"

(খ)

Shepherd people of Thomas Carlyle (1840's):

"A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world: a hero-prophet was sent down to them with a word they could believe: See, the unnoticed becomes world-notable, the small has grown world-great; within one century afterwards, Arabia is at Grenada, Spain on this hand, at Delhi, India on that; -Glancing in valour and splendour and the light of genius, Arabia shines through long ages over a great section of the world. Belief is Great, life-giving. The history of a nation becomes fruitful, soul elevating, great, as soon as it believes. These Arabs, the Man Muhammed (ASW), and that one century; -Is it not as if a spark had fallen, one spark, on a world of what seemed black unnoticeable sand; but LO!, the sand proves explosive powder, blazes heaven high from Delhi to Grenada I said, the Great Man was always as lightning out of heaven; the rest of men waited for him like fuel, and then they too would flame."

ভাবার্থ: থমাস কার্লাইল "মেষপালক জনগোষ্ঠী (১৮৪০)"-তে বলেন: "জগত সৃষ্টির সূচনা থেকে একদল নিঃস্ব অজানা-অচেনা মেষপালক, মরুর বুকে যাযাবর জীবন কাটাতো: এক মহানায়ক-বার্তাবাহক তাদের কছে পাঠানো হলো একটি বাণী সহকারে, যা তারা বিশ্বাস করতে পারে: দেখো, অজানা হলো বিশ্বব্যাপী জানা, ক্ষুদ্র বেড়ে হলো পৃথিবী-বৃহৎ; মাত্র একটি শতকের পরে আরবরা এলো গ্রেনাডা (স্পেন), স্পেন এক হস্তে, দিল্লীতে, ভারত তার ওপর হাতে;- বীরত্বের ক্ষণিক-প্রভা নিয়ে দীপ্তিময় এবং আলোর প্রতিভাসহ। আরাবিয়া করে ঝলঝল পৃথিবীর বৃহত্তর ভাগে যুগ-যুগান্তর ধরে। ঈমান মহান, জীবন-দাতা। একটি জাতির ইতিহাস হলো সাফল্যমণ্ডিত। এসব আরব, মহাপুরুষ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম), এবং ঐ [ইতিহাসের] এক-শতক:- এটা নয় যে, একটি স্ফুলিঙ্গ নেমে এসেছে, একটি জগতে যা মনে হচ্ছিল অবহেলিত কৃষ্ণ-বালুকা; কিন্তু ওয়াও! বালুকা হলো বিস্ফোরনোম্মুখ ধূলিকণা, আকাশ-পাতাল অগ্নিশিখা দিল্লী থেকে গ্রেনাডা, আমি বলেছি, এ মহান ব্যক্তি ছিলেন সদা, যেন আকাশ থেকে আগত বিজলীবাতি; বাকি সব মানুষ তাঁরই জন্য অপেক্ষায় ছিলো যেন ইন্ধন, এবং তারাও শেষে জ্বলন্ত হলো।"

(গ)

"The Creed of Muhammad (ASW) is free from the suspicions of ambiguity and the Qur'an is Glorious testimony to the Oneness of God."
-by Gibbon in his "Decline and Fall of the Roman Empire."

ভাবার্থ: "মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বীন হলো দ্ব্যর্থহীন এবং কুরআন হচ্ছে আল্লাহর একত্বের গৌরবোজ্জ্বল সাক্ষী।" (গিবন, "ডিক্লাইন এন্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার।")

(ঘ)

"If a man like Muhammad (ASW) were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems that would bring it the much needed peace and happiness"
-George Bernard Show

ভাবার্থ: "আজকের বিশ্বে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এঁর মতো যদি কেউ নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হতেন এবং এর ফলে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হতো।" (জর্জ বার্নাড শো)

(ঙ)

"Well then, if the Koran were his own composition other man could rival it. Let them produce ten verses like it. If they could not (and it is obvious that they could not), then let them accept the Koran as an outstanding evidential miracle."

-H.A.R. Gibb, Muhammedanism, London 1953, p. 33.

ভাবার্থ: "ভালোকথা, কুরআন যদি তাঁর (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিজস্ব রচনা হতো তবে অন্য কোন মানুষ প্রতিযোগিতা করতে পারত। তাদেরকে কুরআনের মত দশটি আয়াত রচনা করতে বলো। যদি তারা পারে না (এবং এটা সহজে বুঝা যায় যে তারা পারে নি), তাহলে তাদেরকে, কুরআনকে একটি অত্যাশ্চর্য অলৌকিক প্রমাণস্বরূপ বলে গ্রহণ করে নিতে দাও।" (এইচ.এ.আর. গিব, মুহামেডানিজম, লন্ডন ১৯৫৩, পৃ: ৩৩।)

(চ)

"There is no other Book exists in the World where, its language has not changed after as long as thirteen centuries have elapsed."

-Sir William Muir, Life of Mohammed, London

ভাবার্থ: "এ জগতে অন্য কোন গ্রন্থ (আল-কুরআনের মত) নেই যে, তেরশ বছর পার হয়ে গেছে, আর এতো দীর্ঘকাল পরও তার ভাষা বদলে যায় নি।" -স্যার উইলিয়াম মুইর, লাইফ অব মুহাম্মেদ, লন্ডন।

(ছ)

"Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was born at Mecca, in Arabia the man who, of all men exercised the

greatest influence upon the human race. . .Muhammad (ASW). . ."
-John William Draper, M.D., LL.D., A History of the Intellectual Development of Europe, London 1875, Vol 1, pp329-330

ভাবার্থ: "জাসটিনিয়ান-এর মৃত্যুর চার বছর পর, ৫৬৯ [মতান্তরে] খৃস্টাব্দে, যে পুরুষ আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি সব মানুষের মধ্যে সর্বপেক্ষা বৃহত্তর প্রভাব বিস্তার করেন সমগ্র মানবজাতির উপর... [তিনি হচ্ছেন] মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)...।" -জন উইলিয়াম ড্রেপার, এম.ডি., এলএল.ডি., এ হিস্টোরী অব দ্যা ইন্টেলেকচ্যুয়াল ডেভেলাপমেন্ট অব ইউরোপ, লন্ডন ১৮৭৫, খণ্ড ১, পৃ: ৩২৯-৩৩০।

(জ)

"So there has been no opportunity for any forgery or pious fraud in the Koran, which distinguishes it from almost all other important religious works of ancient times. . .It is exceedingly strange that this illeterate person should have composed the best book in the language."
-Basanta Kumar Bose, Mohammedanism, Calcutta 1931, p.4.

ভাবার্থ: সুতরাং কুরআনে কোনো প্রতারণা বা নকল করার সুযোগ আসে নি, যা অন্যান্য পুরাতন প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এটাকে একক অবস্থানে রেখেছে... ... এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, এই নিরক্ষর (নবী- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোক, ভাষার (আরবীর) মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম পুস্তক রচনা করতে পারেন।" -বসন্ত কুমার বসু, মুহামেডানিজম, কলকাতা, ১৯৩১, পৃ: ৪।

(ঝ)

"How could a man (Muhammad [ASW]) being illeterate, become the most important author, in terms of literary merits, in the whole of Arabic literature? How could he then pronounce truths of a scientific nature that no other human-being could possibly have developed at that time, and all this without once making the slightest error in his pronouncement on the subject?"
-Dr. Maurice Bucaille

ভাবার্থ: "একজন লোক (মুহাম্মদ- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরক্ষর হয়ে কি করে আরবী সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লেখক হতে পারেন? কি করে তিনি বিজ্ঞানের সত্য তথ্যে পরিপূর্ণ বিষয় লিখতে পারেন যা, তাঁর সময়ের মানব-সমাজ সেসব ব্যাপারে কিছুই জানার কোন সম্ভাবনাই ছিলো না, এবং এ সবকিছুই লেখা হয়েছে একটিবারও ভুল ছাড়া; এ বিষয়কে (বিজ্ঞানের তথ্যাবলী) ব্যক্ত করতে?" -ড. মরিস বুকাইলি।

(ঞ)

"If greatness of purpose, smallness of means, and astounding results are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad (ASW)? The most famous man created arms, laws and empires only. They founded, if anything at all, no more than material powers which often crumbled away before their eyes. This man moved not only armies, legislation, empires, peoples and dynasties, but millions of men in one-third of the then inhabited world; and more than that, he moved the altars, the gods, the religions, the ideas, the beliefs and souls...his forbearance

in victory, his ambition, which was entirely devoted to one idea and in no manner striving for an empire; his endless prayers, his mystic conversations with God, his death and his triumph after his death; all these attest not to an imposture but to a firm conviction which gave him the power to restore a dogma. This dogma was twofold, the unity of God and immateriality of God; the former telling what God is, the latter telling what God is not; the one overthrowing false gods with the sword, the other starting an idea with words."
-Lamartine, Historie de la Turquie, Paris 1854, Vol II, pp. 276-277.

ভাবার্থ: "যদি কার্যের মহত্ত্ব, সামর্থের অভাব ও আশ্চর্য ধরনের ফলাফল অর্জনই হয় মানব-মাহাত্ম্য বিচারের উপায়, তবে এ পর্যন্ত আধুনিক ইতিহাসে এমন মহৎ ব্যক্তিত্ব কে আছেন যে, মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে তুলনা করা যায়? সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা অস্ত্র, আইন ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছেন মাত্র। তারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যদি ঠিক করেই থাকেন, বৈষয়িক ক্ষমতা, যা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরই চোখের সম্মুখে আবার ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু সৈন্যদেরকে নিয়ন্ত্রিত করেন নি, আইন, সাম্রাজ্য, মানুষ এবং খিলাফতসমূহ-সহ, তাঁর সময়ের কোটি কোটি মানুষ; পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রণ করেছেন; এবং আরও তাঁর দ্বারা ধ্বংস হয়েছে- দেবদেবী, কৃত্রিম খোদাসমূহ, আগেকার ধর্মগুলো, আগের ধারণাসমূহ, বিশ্বাস ও আত্মা (মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি)... তাঁর সহিষ্ণুতা জয়ের মধ্যে, তাঁর উচ্চাভিলাষ, যা একমাত্র একটি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ এবং তা সাম্রাজ্য সৃষ্টির জন্য নয়; সেটা তাঁর অশেষ এবাদত, তাঁর গুপ্ত কথোপকথন আল্লাহর সাথে, তাঁর মৃত্যু এবং অতঃপর তাঁর সাফল্য; এ সবকিছু প্রমাণ করে এটা কোন ভণ্ডামী নয়, বরং একটি বলিষ্ঠ উদ্দেশ্য সমাধানের আকাঙ্ক্ষা যা তাঁকে শক্তি যোগিয়েছে একটি সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। এ সত্য ছিলো দু'ধরনের;

আল্লাহর একত্ব ও আল্লাহ কোনো বস্তু নন; প্রথমটি বলে যা আল্লাহ হন, আর দ্বিতীয়টি বলে যা আল্লাহ নন; একটি কৃত্রিম খোদাকে অসির মাধ্যমে উৎখাত করে, আর অপরটি একটি ধারণা জন্মায় শব্দের (কালাম) মাধ্যমে।" -লামারটিন, হিস্টোরী দি লা তুর্কী, প্যারিস ১৮৫৪, খণ্ড ২, পৃ: ২৭৬-২৭৭।

(ট)

"... A Book which is a Poem, a Code of Laws, A Book of Common Prayer and Bible all in one; and is reverenced to this day by a sixth of the whole human race as a miracle of purity, of style, of wisdom and of truth. It is the one miracle claimed by Mohammed (ASW), his standing miracle, he called it and a miracle indeed it is."

"He is Caesar and Pope in one; but he was Pope without Pope's pretentions, Caesar without the legions of Caesar: without a standing army, without a bodyguard, without a palace, without a fixed revenue; if ever any man had the right to say that he ruled by the right divine, it was Muhammad (ASW), for he had all the power without its instruments and without its supports."
-Rev. R. Bosworth Smith, Mohammad and
Mohammadanism, London 1874, p 92

ভাবার্থ: "... একটি গ্রন্থ যা একটি কবিতা, একটি আইনশাস্ত্র, একটি সাধারণ উপাসনার বই এবং একটি বাইবেল- সব একত্রে; এবং আজ পর্যন্ত এটা পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ [এখন এক তৃতীয়াংশের অধিক] মানুষের শ্রদ্ধার বিষয়, একটি পবিত্র অলৌকিক ব্যাপার, ধারা, জ্ঞান ও মহাসত্য। এটাই একটি অলৌকিক জিনিস যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাবী করেছেন, তাঁর চিরন্তন মু'যিজা- তিনি বলেছেন, এবং অবশ্যই এটি একটি মু'যিজা।"

"তিনি কায়সার এবং পোপ একই সাথে; কিন্তু তিনি পোপ ছিলেন পোপের দাবি ছাড়া, তিনি কায়সার ছিলেন কায়সারের সৈন্য-সামন্ত ছাড়া, প্রাসাদ ছাড়া, স্থিরীকৃত কোন আয় ছাড়া; যদি কখনো কোন মানুষের পক্ষে একথা বলার দাবি থেকে থাকে যে, শাসন করার ক্ষমতা তাঁর খোদায়ী প্রত্যাদেশ তবে সে মানব ছিলেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), কারণ, তাঁর ছিলো সর্ব-ক্ষমতা, এর (ক্ষমতার্জনের সচরাচর) উপকরণসমূহ ও সহযোগিতা ছাড়াই।"
-রেভারেন্ড (পাদ্রী) আর. বসওয়ার্থ স্মিথ, মুহাম্মাদ এন্ড মুহামেডানিজম, লন্ডন ১৮৭৪, পৃ: ৯২।

(ঠ)
"In making the present attempt to improve on the performance of my predecessors, and to produce something which might be accepted as echoing however faintly the sublime rhetoric of the Arabic Koran, I have been at pain to study the intricate and richly varied rhythms which -apart from the message itself- constitute the Koran's undeniable claim to rank amongst the greatest literary masterpieces of mankind."
-Arthur J. Arbery, The Koran Interpreted, London: Oxford University Press, 1964, p. X.

ভাবার্থ: "আমার পূর্ববর্তীদের কার্যের উন্নতি সাধনের বর্তমান এ প্রচেষ্টা এবং এমন একটি বস্তু (লেখা) প্রকাশ করার ইচ্ছা যা, সামান্য হলেও গ্রহণযোগ্য হবে আরাবী কুরআনের, ভক্তিমূলক বক্তব্যের ভাব, আমি অত্যন্ত কষ্টে এর (কুরআনের) বিজড়িত ও প্রচুর ছন্দের সৌন্দর্য অধ্যয়ন করেছি যা- এর আসল বাণী ছাড়াও - কুরআনের সঠিক অনস্বীকার্য দাবী হলো, এটা মানবজাতির একটি সর্ব-প্রধান সাহিত্যকর্ম।" -আর্থার জে. আরবেরী, দ্যা কুরআন ইন্টারপ্রিটেড, লন্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪, পৃ: ১০।

(ঙ)

"Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without images; the founder of twenty terrestrial empires, that is Muhammad (ASW). As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he?"

-Lamartine, "Historie de la Turquie", Paris 1854, Vol II, pp. 276-277

ভাবার্থঃ "দার্শনিক, বক্তা, পয়গম্বর, আইন-প্রণেতা, যোদ্ধা, ভাবের বিজেতা, যুক্তিবাদী ধর্মমতের প্রত্যর্পণদাতা, একটি দেবতাহীন ধর্ম-পদ্ধতি; ২০টি পার্থিব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যতো মাপেই মানব-মাহাত্ম্য বিবেচনা করা হোক না কেন, আমরা হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারি, কোনো মানুষ কি আছে তাঁর থেকে আরোও মহান?" -লামারটিন, হিস্টোরী দি লা তুর্কী, প্যারিস ১৮৫৪, খণ্ড ২, পৃ: ২৭৬-২৭৭।

(চ)

"A totally objective examination of it (The Qur'an) in the light of modern knowledge, leads us to recognise the agreement between the two, as has been already noted on repeated occasions. It makes us deem it quite unthinkable for a man of Muhammad's (ASW) time to have been the author of such statements on account of the state of the knowledge in his day."

-Dr. Maurice Bucaille, "The Qur'an and the Modern Science", 1981, p.18.

ভাবার্থ: "নতুন জ্ঞানের আলোকে এটাকে (আল কুরআন) শুধুমাত্র বস্তুগতভাবে বিবেচনা করলেই আমরা ধরতে পারি যে, কুরআন ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান যা ইতোমধ্যে অনেক জায়গায়ই বর্ণিত হয়েছে। এটা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে এরূপ জ্ঞান মানুষের জানা ছিল, যা থেকে তিনি এসব অত্যাধুনিক তথ্য নিজে লিখতে পারেন।" -ড. মরিস বুকাইলি, দ্যা কুরআন এন্ড দ্যা মডার্ণ সাইন্স, ১৯৮১, পৃ: ১৮।

(ণ)

"It is impossible for anyone who studies the life and character of the great Prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty Prophet, one of the great messengers of the Supreme."
-Annie Besant, "The Life and Teachings of Muhammad", Madras, 1932, p.4

ভাবার্থ: "আরবের মহান নবীর জীবন ও চরিত্র যারা অধ্যয়ন করেন, যারা জানেন তিনি কিভাবে থাকতেন ও কিভাবে শিক্ষা দিতেন, তাদের জন্য এ মহান শক্তিশালী নবীর ব্যাপারে একমাত্র শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছু অনুভব করা অসম্ভব, তিনি হচ্ছেন মহা-প্রতাপশালীর (আল্লাহর) একজন মহান পয়গম্বর।" -আনী বেসেন্ট, দ্যা লাইফ এন্ড টিচিংস অব মুহাম্মাদ, মাদ্রাজ, ১৯৩২, পৃ: ৪।

(ত)

"Here, therefore, its merits as a literary production should perhaps not be measured by some preconceived maxims of subjective and aesthetic taste, but by the effects which it produced in Muhammad's (ASW) contemporaries and fellow countrymen. If it spoke so powerfully and

convincingly to the hearts of his hearers as to weld hitherto centrifugal and antagonistic elements into one compact and well organised body, animated by ideas far beyond those which had until now ruled the Arabian mind, then its eloquence was perfect, simply because it created a civilised nation out of savage tribes, and shot a fresh woof into the old warp of history."
-Steingass, quoted in Hughes' Dictionary of Islam, p.528

ভাবার্থ: "অতএব, এখানে, এটার (কুরআনের) মূল্য, একটি সাহিত্যকর্ম হিসেবে পূর্ব-ধারণাকৃত কোন বিষয়ভিত্তিক এবং রসসমৃদ্ধ সৌন্দর্যবিজ্ঞানের সূত্র হতে এটা উদ্বুদ্ধ হয়ত বিবেচনা করা উচিৎ নয়, তবে মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমসাময়িকদের ও তাঁর দেশের মানুষের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া বিচার্য। এ গ্রন্থ যদি কথা বলে থাকে শক্তিশালী ও নিঃসন্দেহভাবে তার শ্রোতাদের হৃদয়ে যার ফলে, অদ্যাবধি জড়িত হয়ে যায় অপকেন্দ্রিক এবং বিরোধী উপাদানসমূহ একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী সংঘে, এমন একটি ধারণা দ্বারা চালিত যা ছিলো ইতোপূর্বে শাসিত আরব মনন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহলে এটার (কুরআনের) বাগ্মিতা ছিলো পূর্ণাঙ্গ, এর কারণ কেবল, এটা একটি বর্বর গোত্রগুলো থেকে জন্ম দিয়েছে সভ্যতা এবং পুরাতন ইতিহাসের পাতায় রাঙ্গানো হয়েছে নতুন লক্ষ্যবস্তু।" -স্টিগনেস, হিউজ প্রণীত 'ডিকশনারী অব ইসলাম' -এ উদ্ধৃত, পৃ: ৫২৮।

(থ)

"My choice of Muhammad (ASW) to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but He was the ONLY man in history who was supremely successful on both the religious and secular level."

-Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, New York: Hart Company, Inc. 1978, p. 33.

ভাবার্ত: "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম স্থান দেওয়ার ব্যাপরে আমার মনোনয়ন হয়ত অনেক পাঠককে বিস্মিত করতে পারে, এবং অন্যান্যদের দ্বারা আলোচিত হতে পারে, কিন্তু তিনিই ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পার্থিব ও ধার্মিক এ উভয় ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী সফলতা অর্জন করেছিলেন।" -মাইকেল এইচ. হার্ট, দ্যা ১০০: এ রেংকিক অব দ্যা মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল পার্সন্স ইন হিস্টোরী, নিউ ইয়র্ক: হার্ট কোম্পানী, আইএনসি. ১৯৭৮, পৃ: ৩৩।

(দ)

The union of the theorist, organizer, and leader in one man is the rarest phenomenon on this earth; therein consists greatness... In the person of the prophet of Islam the world has seen this rarest phenomenon on earth, walking in flesh and blood.

-Professor K. S. Ramakrisna Rao.

ভাবার্ত: "এক ব্যক্তির মধ্যে মতবাদকারী, সাংগঠক এবং নেতৃত্বদানকারীর সংযুক্তি হচ্ছে এ বিশ্বপরে একটি অতিদুর্লভ ঘটনা; এখানে ছিলো মাহাত্ম্য... ইসলামের পয়গম্বরের ব্যক্তিত্বে এ জগৎ দেখেছে পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা দুর্লভ এক অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা, রক্তে মাংসে বিচরণশীল।" -প্রফেসর কে.এস. রামাকৃষ্ণ রাও।

"এ কিতাব বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তরফ থেকে নাজিলকৃত, এতে কোন সন্দেহ নেই'' [সূরা সাজদা: ২]।

পরিচ্ছেদ ২

যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল-কুরআন

কুরআনে পাকের রচয়িতা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থাৎ, "তিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অধীন করেছেন; এতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন" [সূরা জ্বা-ছিয়া (৪৫):১৩]

এ আয়াতে করীমে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, সৃষ্ট জগতের সবকিছু মানুষেরই অধীন। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্ট জগতের শক্তিকে আপন কল্যাণহেতু ব্যবহার করতে সক্ষম, কারণ এ জগত তাঁর আওতাধীন। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সত্য উদঘাটন হয়েছে যে, মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে জগতের ব্যাপ্ত-সুপ্ত শক্তিকে নিজের অধীন করার ক্ষমতা রাখে। আজকের বিজ্ঞান এ ঘোষণার সুফল গ্রহণ করছে সর্বাপেক্ষা বেশী। বিজ্ঞানের অসংখ্য অবিষ্কার ও এর উপকারিতা থেকে আজ কেউই বঞ্চিত নয়।

পবিত্র কুরআনে পাকের এ ইঙ্গিতই মানুষকে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নয়। স্বভাবে (নেচারে) আল্লাহর প্রদত্ত যাবতীয় শক্তিকে সে চিন্তা-গবেষণা ও রীতিবদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে আয়ত্বাধীন করে প্রগতিশীল হবে। এটা স্বয়ং প্রভুরই একান্ত ইচ্ছা। তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবি জগতের রহস্য উদঘাটন করবে তাঁরই সৃষ্টিতে লুকানো শক্তিসমূহ আয়ত্বে এনে। তবে এর জন্য তাঁর মহিমার কথা স্বরণ ও গুণকীর্তন করতে হবে। বলতে হবে, "আল-হামদুলিল্লা-হি

রাব্বিল আ-লামীন।" অন্যথায় তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে।

পশ্চিমা সন্দেহবাদী ও নাস্তিকদের পতন অনিবার্য। এরা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের সুফল উপভোগ করেও তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না- শুকরিয়া জ্ঞাপন দূরের কথা। ঐতিহাসিকভাবে দু'টি সত্যধর্ম; ইহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী হয়েও মানব রচিত অনেক কু-প্রথা ও মিথ্যাকে তাদের ধর্মে সংযুক্ত করে আসল তাওহিদী বাণীকে কলুষিত করে দেয়। ফলে আজ কি হলো? ধর্ম নিয়ে তামাসা।

মুসলিম বিজ্ঞান ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রগতিবিরোধী পাদ্রী-শক্তির ধ্বংস করে ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটালো। কিন্তু তারা মুসলামনদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধার করে নিলো সত্যি- তবে ইসলামের আসল মেসেজকে গ্রহণ করে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। তাই ইসলামেরই অনুগ্রহে বিজ্ঞানের পথ ধরে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করেও আজ তাদের সমাজে অশান্তি আর অশান্তি বিরাজমান। বৈষয়িক এ উন্নতি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসহীন মানবাত্মায় আজ চরম বস্তুবাদিত্বের মত ঘৃণ্য শয়তানী ধারণা জন্ম দিয়েছে। এ প্রভু-বিরোধী মতবাদ মানুষকে জঘন্য ষড়-রিপুর আকর্ষণে পশুর মত করে দিচ্ছে। আমরা আজ বড় বড় নেতাদের দেখতে পাই যারা লোভের বশিভূত হয়ে, যৌন তাড়নায়, হিংসার প্রভাবে ও টাকার লোভে তাদের অন্তরে লালিত গুপ্ত শয়তানী কুমন্ত্রণাকে জনসমক্ষে প্রতিনিয়ত উন্মোচিত করছেন। অন্তরে এ কু-প্রবৃত্তি লালিত হয়ে মানুষকে গ্রাস করে দেয়, একটি মাত্র কারণে; ঈমানী নূরের অভাব। হৃদয়ে ঈমানের শক্তি সহকারে কেউ যদি বিত্তশীল হয় তবে তা মানবতার জন্য কল্যাণকর।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানবজীবনের উন্নতিসাধন তাই কোন ক্রমেই দুনিয়াদারী বা দুনিয়ার প্রতি বেশী আকর্ষণ বুঝায় না- যদি অন্তরে ঈমান থাকে, প্রভুর প্রদত্ত এ অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত হয়, শুকরিয়ার কণ্ঠ বুলন্দ থাকে। জগতকে ঘুরে দেখা, এর থেকে প্রাপ্ত ধন-অনুগ্রহকে আহরণ করা, ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া এবং সেই সাথে প্রভুর আনুগত্য করাই মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

ইসলাম একটি প্রগতিশীল ধর্ম। এতে কোন সন্দেহ নেই। পবিত্র কালামে তাই আল্লাহ পাক পরোয়ার দেগারে আলম ঘোষণা করেন:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ "বলো, পৃথিবী ঘুরে দেখ অনুসন্ধান করে; লক্ষ্য করো কিভাবে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি শুরু করেছেন (সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করো), পরে আল্লাহ পূণর্বার (ধ্বংসের পরে) উঠাবেন (মানুষকে আবার পুণরুত্থিত করবেন কিয়ামত দিবসে); আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তিশালী" [আনকাবুত (২৯) :২০]।

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করার জন্য। আর এ গবেষণার মাধ্যমে মানুষের অগ্রগতি নিহিত। পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টি-রহস্য উদঘাটন করলে মানুষের যেমন উন্নতি হবে, তদ্রূপ প্রভু ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত হতে পারবে। সুতরাং পরকালে অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। সৃষ্ট জগত- এর অসংখ্য রহস্য আর সৃষ্টি-কৌশলই মানুষকে এ বিশ্বাসের খোরাক যোগায়। এখানে আল্লাহ পাক বিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট তাগিদ দিয়েছেন, কারণ গবেষণা সঠিকভাবে করতে হলে বিজ্ঞানের মাধ্যমেই করতে হবে। আল্লাহ কিভাবে এ জগতকে সৃষ্টি করলেন ও পরিচালিত করছেন, তা যদি কারো জ্ঞানে আসে তবে সে আশ্চর্য না হয়ে পারবে না। ঈমানের আলোকে যখন এসব রহস্য সে অবলোকন করে, তখন সে এমনিতেই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা অনুধাবন করতে পারে। সে তখন কৃতজ্ঞতায় নতমস্তকে আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। স্বচক্ষে দেখা কোন কিছু কি অস্বীকার করা যায়? বাস্তবে অবিশ্বাসীরা এসব সৃষ্টি-রহস্য দেখে এবং এ থেকে অনুগ্রহ উপভোগ করেও, মূলতঃ আল্লাহর অস্বিত্বকে স্বীকার করতে পারে না। কেন পারে না? কারণ তার মধ্যে ঈমানের আলো অনুপস্থিত। ঈমানদার জ্ঞানী আর বে-ঈমান জ্ঞানীদের মধ্যে তাই দিন ও রাতের মতো তফাৎ।

এটা এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা যায় যে, যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল-কুরআনুল হাকীম। এ পবিত্র গ্রন্থে মানুষের সৃষ্টি রহস্য থেকে সৃষ্ট-জগতের রহস্য ও এর চুড়ান্ত পরিণতি প্রভৃতি সবকিছু সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোন বিজ্ঞানী বা জ্ঞানবান ব্যক্তি- যার মধ্যে ঈমানী শক্তি নিহিত থাকে, তিনি অনায়াসেই আল্লাহর আনুগত্য ও শুকরিয়া আদায় করবেন। পশ্চিমা অন্ধত্ব ও অপপ্রচার তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর দূর্বল ঈমানের অধিকারী কিছু মুসলমান নামধারীদের সন্দেহ প্রবল হয়ে পশ্চিমাদের ফাঁদে তারা আটকা পড়বে এবং ইদানিং পড়ছেও অনেকে। আমি সবাইকে দৃঢ়চিত্তে আল্লাহর নাম স্মরণ করে বলছি, যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অবিশ্বাসীরা, নাস্তিকরা, সন্দেহবাদীরা ও মুনাফিকরা সত্যধর্ম ইসলাম নিয়ে বিভ্রান্তিকর কথা বলে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সময় সময় অজ্ঞতাপ্রসূত বাক-বিতণ্ডা মাত্র। বিজ্ঞান কখনো মুসলমানের ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না, বাস্তবে কখনো করে নি। আপন ধর্ম, পবিত্র ঐশীবাণী আল-কুরআন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার সদ্যবহারই এরা করছে। বিজ্ঞানের প্রতিটি অবিসংবাদিত সত্য (অনেক বিজ্ঞানের তথ্য সময় সময় ভুল বলেও প্রমাণিত হয়- তাও মনে রাখা জরুরী) আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও কুরআনের সাথে অসামঞ্জস্য মোটেই নয়। আর তা হবে কি করে? মহাবিশ্ব ও জগতসমূহের স্রষ্টাই যে এ মহান গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি তাই তাঁর রচনা যে নির্ভুল, সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ "এ কিতাব যাবতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত; মুত্তাক্বীদরে জন্য পথ-প্রদর্শক" [বাক্বারাহ (২): ২]।

একথা আমরা ভাল করে প্রমাণ করলাম যে, কুরআন শরীফ হচ্ছে মহাবিজ্ঞানী (আল-হাকীম) আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজ্ঞানপূর্ণ হিদায়াতের প্রেরিত বাণী। তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির জন্য এ সত্যজ্ঞান একটা মহা-উপহার। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাই এ সত্যকে মেনে নিয়েছে। এটা যে মানুষের রচনা হতে পারে না সে ব্যাপরে কারো দ্বিমত নেই। অবশ্য কিছু কিছু অর্ধ-শিক্ষিত বা জ্ঞান-পাপী মুনাফিকরা সন্দেহ করতেই থাকবে। আল্লাহর বাণী সম্পর্কে এরূপ ধারণা যে কত

জঘন্য তা, যে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন। এরা কি মনে করে যে অ-মুসলিম, নাস্তিকের দ্বারা অবিষ্কৃত কোন বৈজ্ঞানিক সত্য উদঘাটন বা মানবকল্যাণকর কোন মহৎ কার্য সম্পাদনের পেছনে, আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ কাজ করছে না? নাস্তিক হলেও তার দেহ, জীবন, মস্তিষ্ক, অন্তকরণ কে পরিচালিত করছে? সে-ও তো আল্লাহর 'বান্দাহ'। তাই মানবজাতির "যাবতীয়" উৎকর্ষসাধণই একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। তা সম্পাদন করতে তিনি নাস্তিক, আস্তিক, সন্দেহবাদী, মুনাফিক এবং ঈমানদারদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর এ একচ্ছত্র অধিকার আছে সবার উপরে, কারণ তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করে অসংখ্য অনুগ্রহ দান করেছেন এ পৃথিবীতে, যা থেকে সবাই উপকৃত হচ্ছে। তাই কেউ যদি বলে, "আমরা অ-মুসলমানরা- এই এই উন্নতি করেছি।" এতে তাদের বাস্তবে কোন গৌরবের কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহ হেতু তা তাদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে মাত্র।

আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের মালিক ও সবার প্রভু। মুসলমান হিসেবে এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে এসব ব্যাপারে আমাদের অবগত থাকাটা একান্ত জরুরী। একই সাথে একথাটাও বুঝতে হবে যে, কুরআনে পাকে প্রকাশিত জ্ঞান, সকল জ্ঞানের উৎস। বিজ্ঞানসহ মানুষ আজ যত ধরনের জ্ঞান সাধনাই করুক না কেন, তা সবই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, বা তার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যন্ত সবকিছুই এ মহান ঐশী গ্রন্থে বিদ্যমান। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধান হেতু মানুষ দ্রুত এগুচ্ছে। আল্লাহকে স্বীকার করে তাঁর নির্দেশ মান্য করে নিলেই, এ অনুসন্ধান হয়ে যায় কল্যাণকর ও মানবজীবনের জন্য সার্থক।

পৃথিবীর প্রথম মানবসন্তান যিনি চন্দ্রের উপর পদার্পণ করেছিলেন তিনিও শেষ পর্যন্ত ঈমানদার হয়ে গেলেন। নীল আমস্ট্রং আল্লাহর কুদতরকে স্বচক্ষে অবলোকন করেই ঈমানের নূরে আলোকিত হয়েছিলেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভবিষ্যতে মানুষ ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে।

"এ কিতাব যাবতীয় ভুল-ত্রূটি থেকে মুক্ত; মুত্তাক্বীদরে জন্য পথ-প্রদর্শক" [সূরা বাকারা: ২]।

পরিচ্ছেদ ৩

আল-কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান

ঈমান তথা দ্বীন ও বিজ্ঞানের উপর গবেষণায় ইসলামের পবিত্র ঐশিগ্রন্থ আল-কুরআনকে উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু এটা এখন সর্বজনবিদিত সত্য যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও থিওরীর সঙ্গে ১৪০০ বছর পূর্বে নাজিলকৃত মহান কুরআন শরীফে বর্ণিত অনেক আয়াতমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নয়ন যতো বেশি হচ্ছে, এই জ্ঞানের আলোকে আমরা কুরআনকে ততো বেশি বুঝতে সক্ষম হচ্ছি। এই সত্য উদঘাটনের পর **'ঈমান বিল গায়েবে'** বিশ্বাস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে না। তবে বাংলা ভাষায় কুরআনের আলোকে আধুনিক বিজ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে এখনও গভীর কোন গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যা হয়েছে, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষায় লিখিত কিছু গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমেই হয়েছে বলে দেখা যায়। বিশেষ করে আধুনিক যুগে ফরাসী লেখক ডা. মরিস বুখাইলীর 'দ্যা বাইবেল দ্যা কুরআন এণ্ড সাইন্স' বইটি বাংলায় প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। এটা একটি মূল্যবান গবেষণা, তা স্বীকার করতেই হয়।

বইটিতে ডা. বুখাইলী মূলতঃ ইয়াহুদিদের পুরাতন টেস্টেমেন্ট (তাওরাত), খৃস্টানদের নিউ টেস্টেমেন্ট (বাইবেল) ও ইসলামের ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এককভাবে শুধুমাত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আয়াতের উপর ব্যাপক কোন গবেষণা এখনও কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আমার এ লেখাও সে পর্যায়ের কোন গবেষণা নয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানে বর্ণিত আয়াতমালা ও

এরসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের মিল আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। পাঠকরা দেখবেন ডা. বুখাইলীর গবেষণার পরেও যেসব বৈজ্ঞানিক নতুন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতের কী অপূর্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

সময়ের আপেক্ষিক ধারণা

আপেক্ষিতাবাদের প্রবর্তক হচ্ছেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন [১৮৭৯-১৯৫৫]। গেল (বিংশ) শতকের প্রথম দু'দশকের মধ্যে তিনি এই থিওরীটি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। আগের খণ্ডে আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই মতবাদটি এখন সাবাই সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাপকাঠিতে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

আপেক্ষিকতাবাদের মৌলিক দিকটি হচ্ছে সময় নিয়ে। আইনস্টাইন সময় বলতে যা বুঝায় তার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে আসলে এবস্যুলুট টাইম বা দ্রুব সত্য সময় বলতে কিছু নেই। এটা ভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানে অস্তিত্বশীল ভিন্ন ব্যক্তি বা পর্যবেক্ষকের কাছে ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হবে। অর্থাৎ সময় পর্যবেক্ষকের গতি, অবস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। তিনি দেখিয়েছেন আইজাক নিউটনের [১৬৪২-১৭২৭] ধারণা মতো এবস্যুলুট সময় বলতে কিছু থেকে থাকলে বিশ্বের কোথাও একটি স্থির বিন্দুর প্রয়োজন যার উপর ভিত্তি করে (রেফারেন্স করে) সময়কে মাপা যায়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান দেখিয়েছে, এরূপ কোন স্থির বিন্দু এ মহাবিশ্বের কোথাও বিদ্যমান নাই। সমগ্র বস্তু জগতটাই মূলত গতিশীল। এছাড়া সময় মহাকর্ষ ও আলোকের গতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। বিরাট মহাকর্ষের ফোর্স সময়কে ধীর গতিসম্পন্ন করে দেয় এবং আলোকের কাছাকাছি গতিতে গতিশীল কোন বস্তুর উপর দিয়ে বহির্বিশ্বের তুলনায় সময় আস্তে চলে। অর্থাৎ সময় স্থান বা স্পেইসেরই একটি ডাইমেনশন বা বিস্তৃতি। এটা বাস্তবে মহাবিশ্বের চতুর্থ বিস্তৃতি যাকে আইনস্টাইন **'স্থান-কাল কন্টিনিউয়াম'** নামকরণ করেছেন।

সময় সম্পর্কে এসব অদ্ভুত অথচ বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য তথ্য জানার পর বস্তু জগত নিয়ে আমাদের যতো ধারণা ছিলো তা পাল্টে যায়। সময়ের এসব তথ্য কিন্তু নতুন কিছু নয়। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আল-কুরআনে সময় সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা সময়ের আপেক্ষিকতাকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।

এবার পবিত্র কুরআন শরীফে বর্ণিত কয়েকটি আয়াত নিয়ে এখানে আলোচনা কবরো- এগুলো প্রতিটিই সময়ের ধারণা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেয় এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিতাবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়।

একদিন হাজার বা পঞ্চাশ হাজার বৎসর

আল-কুরআনে দু'টি আয়াত আছে যা আমাদেরকে সময় সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলে। এর প্রথমটি হলো:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰه وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّون

অর্থাৎ "তারা আপনার নিকট তড়িৎ আজাব হওয়া চায়, অথচ আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান" [সূরা হাজ্জ (২২): ৪৭]।

এখানে সময় সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় সময়ের মানবিক ধারণাটি যে আদৌ ধ্রুব সত্য কোন ধারণা নয় তা জানিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া আল্লাহর নিকট একদিন আমাদের হিসাবে **'হাজার বছরের সমান'** কথাটির মাধ্যমে আপেক্ষিকতাকে বুঝাচ্ছে। সুতরাং স্বয়ং সময়কেই যদি আমরা বুঝতে অপারগ হই তাহলে কোন্ সময় কি হবে, কিংবা কবে কিয়ামত সংঘটিত হবে এসব প্রশ্ন মূলতঃ অর্থহীন। এখানে একদিন সমান এক হাজার বছর কথাটি আসলে আপেক্ষিকতাকে বুঝানোই উদ্দেশ্য কারণ, অন্যত্র আল্লাহ

পাক তাঁর নিকট একদিন মানুষের হিসেবে ৫০ হাজার বছরও বলেছেন। এই দ্বিতীয় আয়াতটি হলো:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

-"ফেরেশতা ও আত্মাসমূহ এমন একদিন তাঁর (আল্লাহর) দিকে উঠবে যার পরিমাণ [তোমাদের হিসেবে] পঞ্চাশ হাজার বছর" [সূরা মাআরিজ (৭০):৪]।

এখানে স্পষ্ট একদিন (আল্লাহর নিকট) আমাদের হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ বলা হয়েছে। সুতরাং সময় যে আপেক্ষিক এবং এটা আমাদের নিজস্ব হিসাব ও ধারণার উপর নির্ভরশীল এ কথাটি স্বয়ং রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক উপায়ে গেল শতকে এর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন মাত্র।

সময় ভিন্নভাবে চলমান হতে পারে

আপেক্ষিকতাবাদ ভিন্নগতিশীল বস্তুর উপর দিয়ে সময় ভিন্নভাবে চলমান হওয়ার কথা প্রমাণ করেছে। বিশেষকরে আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে কেউ চলতে পারলে সময় যে তার উপর দিয়ে বাইরের জগতের তুলনায় ধীরে চলবে এ কথাটি জেনে আমরা সবাই অবাক হয়েছি। বাস্তবে পরমাণুকে উচ্চগতিশীল করে এই তথ্যটি পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে টুইন প্যারাডক্সের কাহিনীর বর্ণনা পড়েছি। সময় যে ভিন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে এবং ভিন্ন গতিশীল পর্যবেক্ষকের নিকট ভিন্ন হয়ে থাকে তা আজ বিজ্ঞানসম্মত সত্য। তবে এ ধারণাটি মূলত কুরআন শরীফের। আসহাবে কাহাফের ঘটনায় সময়ের কারসাজি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আহসাবে কাহাফের যুবকদেরকে জালিম বাদশাহর হাত থেকে রক্ষা করতে আল্লহ পাক একটি গুহার ভেতর তাদের শত শত বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলেন,

অথচ যুবকরা জেগে উঠে ভাবলেন তারা একদিন কিংবা এরচেয়ে কম সময় নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন। এতে এটাই বুঝা যাচ্ছে যুবকদের উপর দিয়ে সময় চলেছে অতি ধীর গতিতে, অপরদিকে গুহার বাইরে পৃথিবী স্বাভাবিকভাবেই চলেছে। সেই যালিম বাদশার যুগ অতিবাহিত হয়ে অনেক ইতিহাস রচিত হওয়ার পর একজন ঈমানদার বাদশাহ যখন ক্ষমতায় আরোহণ করলেন তখন এই যুবকরা আবার জেগে উঠলেন। [দেখুন, কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহাফের ঘটনা, সূরা কাহাফ আয়াত ৯-২২]

সময় যদি এই যুবকদের উপর দিয়ে স্বাভাবিকভাবে চলতো তাহলে তাদের দেহ পঁচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে যেতো। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা এই শত শত বছর গত হওয়ার কথা টেরই পেলেন না। এই ঘটনার সঙ্গে আইনস্টাইনের টুইন প্যারাডক্স কাহিনীটির কী অপূর্ব মিল বিদ্যমান, লক্ষ্য করেছেন কি? এ কাহিনীটি দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

সময়ের উল্টো গতি ও কিয়ামতের বর্ণনা

হ্যাঁ, কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব। অনেক বিজ্ঞানীরা এই সম্ভাবনার উপর থিওরী তুলে ধরেছেন। আর তাদের এসব কথা কুরআনে বর্ণিত কিয়ামত দিবসে পৃথিবী ও মহাকাশের করুণ দশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক থিওরী হচ্ছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনরুত্থানকে বুঝিয়ে দেওয়া এখন অসম্ভব নয়। বিজ্ঞান কি শেষ পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাসের এই সর্বাপেক্ষা মৌলিক বিষয়টিকেও গ্রহণ করতে যাচ্ছে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে এই পুনরুত্থান সম্পর্কেই কাফির-বেঈমানরা বেশি পীড়াপীড়ি ও তর্কবিতর্ক করেছিলো। আল্লাহ পাক তাই কুরআনে পাকের অনেক স্থানে কিয়ামত দিবসের উপর বহু তথ্য প্রকাশ করেছেন। এসব মহাসত্য পবিত্র আয়াতমালা ও বিজ্ঞানের ধারণার উপর এবার বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যাক।

পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফিরদের প্রশ্ন

কাফিররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করতো:

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

অর্থাৎ "আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?" [সূরা সাফ্ফাত (৩৭):১৬]। জবাবে রাব্বুল আলামীন বলেন:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

অর্থাৎ "মানুষ মনে করে, আমি তাদের কঙ্কাল আবার পুনর্গঠন করবো না [করতে পারবো না]; অবশ্যই [করবো], আমি তার প্রতিটি অঙ্গুলি পুনর্গঠন করতে সক্ষম" [সূরা ক্বিয়ামাহ (৭৫):৩-৪]। অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

অর্থাৎ "এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।" [সূরা হাজ্জ (২২):৭]।

পবিত্র কুরআন শরীফে পুনরুত্থান সম্পর্কে আরও বহু আয়াত আছে। মুসলমানদের এ ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা ঈমানের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু সন্দেহবাদী ও কাফিররা এ ব্যাপারে যুক্তির অভাবকে সম্বল করে তা উড়িয়ে দিতে চায়। যারা বিশ্বাসী তাদেরকে কোন যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝানো আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর পবিত্র কালাম, তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী তথা হাদীস শরীফই তাদের জন্য যথেষ্ট। তবে যে বিজ্ঞানকে

সম্বল করে ইসলামের এই মৌলিক বিশ্বাসকে তারা উড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে এবং ঈমানে দুর্বল অনেক মুসলমানকেও বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে, সেই বিজ্ঞান আজ কি বলছে, তা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখা যাক।

চরম যুক্তিবাদী ও কিছু বিজ্ঞানীর প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত্যুর পরে আমাদের কি হয়? আমাদের দেহ তো পঁচে-গলে মাঠির সঙ্গে মিশে যাবে। আর আত্মা? আত্মা কি দেহ থেকে বের হয়ে আধ্যাত্মিক কোন জগতে চলে যায়? বাস্তবে আত্মা যেহেতু কোন জড়বস্তু নয় তাই বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে অপারগ। কিন্তু দেহ তো জড়-পদার্থের তৈরী। আর পুনরুত্থান সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে যা বলা হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে, মানুষ কিয়ামত দিবসে সশরীরেই পুনরুত্থিত হবে। আর এখানেই বিজ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে সংঘাত।

তবে আজকের বিজ্ঞানই বলে দিচ্ছে, পুনরুত্থান একটি ফিজিক্যাল (বাস্তব) সম্ভাবনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই প্রমাণ আগেই বলেছি ঈমানদারদের জন্য জরুরী নয়। আর যারা অবিশ্বাসী তাদের কথা স্বতন্ত্র। হৃদয় যদি কিছু মানতে চায় না তবে কি করে তারা বিশ্বাস করবে? তারা চোখের সামনে শত শত প্রমাণ অবলোকন করেও বিশ্বাস করে না। কুরআন শরীফ যে আল্লাহর বাণী, তা আজ সর্বাপেক্ষা কট্টর নাস্তিকরাও স্বীকার করে নিয়েছে। তথাপি তাদের মুখে কালেমা তায়্যিবার পবিত্র বাণী উচ্চারিত হয় না। বস্তুত সত্য ধর্মবিশ্বাস (অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাস) ও সত্যোপলদ্ধি একটি নূর, যা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যক্তির মধ্যে জন্মলাভ করে। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া এ নূরের অধিকারী কোন মানুষই হতে পারে না, সে যতো বড় বিজ্ঞানী বা প্রজ্ঞাবানই হোক না কেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কুরআন শরীফের অনেক স্থানে এই মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে বহু তথ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি বর্ণনাই শেষ একটি ধ্বংসলীলার দিকে ইঙ্গিত করে। কোন একদিন যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট রক্ষিত, এই পৃথিবীসহ সমগ্র মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেক জায়গায় এই সর্বশেষ মহাপ্রলয় সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বার বার বলা হয়েছে,

মানুষ তখন দেখবে সে জীবিত থাকতে কি করেছিলো। তার হাত-পা সাক্ষী দেবে- অর্থাৎ সব কাজকর্ম সে পুনরায় করে দেখাবে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের এসব তথ্য ও একটি নতুন বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হবে। আমরা দেখবো কিভাবে বিশ্বজগত একদিন বিস্তৃত হওয়া থেকে থেমে আবার সংকোচিত (কনট্রাকশন ফেইজ) হবে এবং সময় উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়ে আমাদেরকে কবর থেকে উত্থিত করবে! সময় উল্টো দিকে চলার সম্ভাবনাই হচ্ছে এই নতুন থিওরীর মৌলিক বক্তব্য। এবার কুরআনে বর্ণিত কিছু আয়াতমালা নিয়ে একটু গবেষণা করে দেখা যাক।

কিয়ামত দিবসের উপমা বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা ফাতিরের ৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

অর্থাৎ "আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তদ্বারা সেই ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান।" (সূরা ফাতির (৩৫):৯)

মেঘমালা উত্থিতকরণ এবং বৃষ্টির পর মৃত বৃক্ষ-তরু-লতা জ্যান্ত হওয়াটা অবশ্যই একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আধুনিক যুগে এসে মানুষ বিজ্ঞানের সুবাদে কোন্ উপায়ে এই জ্যান্তকরণ হচ্ছে তা বুঝাতে সক্ষম হয়েছে। সেযুগের মানুষের নিকট অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার মতো এটাও একটা অলৌকিক ঘটনা বলে চিহ্নিত ছিলো। তবে এটা যে একটি সত্যিকার ফিজিক্যাল প্রসেস বা স্বভাবের আইনের আওতাভূক্ত একটি ব্যাপার তা কুরআন এবং বিজ্ঞান থেকে স্পষ্ট। আর এই ঘটনার সঙ্গে পুনরুত্থান দিবসের তুলনা করায় মনে হয় সেই ঘটনাটিও একটি ফিজিক্যাল প্রসেস হবে। সেসময় প্রাকৃতিক আইনের বিশেষ কোন উপায়ে তা

সংঘটিত হবে। আর মনে রাখতে হবে, প্রতিটি প্রাকৃতিক আইনও অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্ট এবং তাঁর দ্বারা সদা-নিয়ন্ত্রিত।

কুরআন শরীফে বিচারদিবস সম্পর্কে যেসব তথ্য দেওয়া আছে তা ৪টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এগুলো হলো: [১] শেষ মহাপ্রলয় এবং পৃথিবীটা একটি ফাঁফা বা শূন্যগর্ভ গোলকে পরিণত হওয়া (সূরা, যিলযাল: ১-২), [২] কবর থেকে পুনরুত্থান, [৩] একটি কাল যখন আমাদের নিজেদের হাত-পা-জিহ্বা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এবং [৪] আকাশের তোরণ বা গেইটসমূহ খুলে যাবে [সূরা নাবা (৭৮): ১৯] এবং মানুষ ধ্বংসের কবলে পতিত জড়বিশ্ব থেকে অন্য কোন বিশ্বে বা বিস্তৃতিতে চলে যাবে।

কুরআন শরীফে বর্ণিত এসব ফিজিক্যাল অবস্থা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুঝানো সম্ভব। সময় বা মহাকাল যদি উল্টো দিকে চলে তাহলে বিজ্ঞানের মতে মহাকর্ষ (গ্রাভিটি) পাল্টে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ সময় যদি পেছনের দিকে চলে তবে বস্তু নীচের দিকে পতিত না হয়ে উপরের দিকে পড়বে! এ কথটা যদিও অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা-ই হবে। কেন হবে, তা এবার আলোচনা করে দেখা যাক। আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন কজমোলজিক্যাল (বিশ্বতত্ত্বের উপর গবেষণামূলক) থিওরী নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এবার দেখা যাক কুরআন শরীফে কজমোলজিক্যাল তথ্যাদি কিভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনে বর্ণিত বিশ্বতত্ত্ব বা কজমোলজি

আমরা জানি আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এই মহাবিশ্ব বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল। এ ঘটনার কথা কুরআনে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ "যারা অবিশ্বাসী তারা কি জানে না যে, মহাবিশ্ব ও পৃথিবী একত্রে ছিলো এবং আমি তাদেরকে বিভক্ত করেছি, এরপর প্রত্যেক প্রাণীকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?" [আম্বিয়া (২১): ৩০]।

এখানে লক্ষণীয় যে, মহাবিস্ফোরণ থিওরী ও পানি থেকে প্রাণীর উৎপত্তি এই উভয়ের আবিষ্কারকরা ছিলেন মূলত যারা অবিশ্বাসী তারা। কুরআন থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে অবিশ্বাসীরাই আগে জানবে কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে কি না সেব্যাপারে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনই প্রশ্ন করছেন। বিষয়টা কি ভাববার নয়?

বিশ্বের প্রাথমিক পর্যায়ে যাবতীয় জড়বস্তু একত্রে ছিলো। তারপর এটা বিভিন্ন গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হয়। এছাড়া বিশ্বজগত যে দিন-দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে তা কুরআন শরীফের একটি আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

অর্থাৎ "এ আকাশ (আকাশের যাবতীয় কিছু - মহাবিশ্ব) আমি শক্তিসহকারে সৃষ্টি করেছি এবং আমি এটাকে সম্প্রসারিত করছি" [জারিয়াত (৫১):৪৭]।

বিশ্বজগতের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে অনেক আয়াত আছে। এটা যে একদিন ধ্বংস হবে সে ব্যাপারে আয়াতমালা ছাড়াও কুরআন শরীফে কন্ট্রাকশন ফেইজের (সংকোচণ হওয়ার) কথা স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে। একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

অর্থাৎ “সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র; যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।” [আম্বিয়া (২১):১০৪]।

এখানে বিছানো বা সম্প্রসারিত জগতকে আবার ছোট করে দেওয়া হবে একথা স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া আয়াতের দ্বিতীয় অংশে ‘পুনরায় সৃষ্টি’ কথাটি দ্বারা আমাদের ইহলৌকিক কাজকর্মের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞানও বলছে কনট্রাকশনের সময় কালের গতি উল্টো দিকে চলার সম্ভাবনা আছে। এরফলে জগতের যাবতীয় ঘটনা আবার ঘটবে- কিন্তু এসময় উল্টোদিকে এসব ঘটনা চলমান থাকবে। সময়ের এই অদ্ভুত ব্যপার নিয়ে আরও ব্যাপকভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সময় উল্টো চলার ব্যাখ্যা

সময় হচ্ছে জগতের সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত এক বস্তু। এটাকে দেখা যায় না অথচ এর প্রভাব থেকে কেউ বা কোন কিছুই মুক্ত নয়। সময় সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা তেমন বেশী কিছু জানেন না। এটা এক বিরাট রহস্য হয়েই আছে। বিংশ শতকের বিজ্ঞানী যেমন আইনস্টাইন সময়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেছেন মাত্র। বিভিন্ন অবস্থায় সময় কিভাবে দ্রুত বা আস্তে চলতে পারে তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন আপেক্ষিকতা থিওরীর মাধ্যমে। তার মতে সময় গতি বৃদ্ধির সাথে ধীরে চলে।

আলোকের কাছাকাছি গতিতে কোন বস্তু চলতে থাকলে সময় ঐ বস্তুর উপর দিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে অতিবাহিত হয়। অন্যকথায় সময়ের ক্রিয়া স্তিমিত হয়ে যায়। এছাড়া পৃথিবী, সূর্য প্রভৃতি মোটা অঙ্কের জড়বিশিষ্ট বস্তুর কাছাকাছি সময় ধীরে

চলে। অর্থাৎ যে বস্তুর মধ্যে মধ্যাকর্ষণ শক্তি যতো বেশী সে বস্তুর নিকটে সময়ও ততো বেশী ধীরে চলবে। ব্ল্যাক হোল নামক অত্যন্ত শক্তিশালী মহাকর্ষবিশিষ্ট বস্তুর ভেতর সময় প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। সময় সর্বদাই ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়। আমরা দেখতে পাই বৃষ্টির পানি নীচের দিকে পড়ে, মানুষ বুড়ো হয়। আমরা কখনও দেখিনা, কেউ বুড়ো থেকে জৌবন ফিরে পেতে, মত্যুর পর জীবিত হতে কিংবা কোন কাচখণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার পর এমনিতেই জোড়া লাগতে। তবে হ্যাঁ, কোন চলচিত্রে যদি একটি ঘটনা ধারণ করে রাখা হয় এবং ভিসিআর-এ ফিল্ম রিভার্স করে পরিচালিত হয় তবে উপরোক্ত ঘটনাবলী আমরা দেখতে পাই। নিশ্চয়ই পাঠকরা দেখেছেন কিভাবে ভাঙ্গা ঘর আবার উল্টো দিকে জোড়া লাগে কিংবা ছবির লোকেরা উল্টো দিকে চলে বিভিন্ন কর্ম করেন। চলচিত্রের ছবি রিভার্স করার সময় যেভাবে সবকিছু উল্টো দিকে ঘটতে থাকে ঠিক তদ্রূপ সময় যদি সত্যিকার অর্থেই উল্টো দিকে চলতে থাকে তবে আমরা অতীতে কৃত সবকিছু আবার করতে থাকবো। কিন্তু সময় কি কখনও এভাবে চলতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাবে এটুকু বলা যায় যে, সময় যখন আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে কিংবা ব্ল্যাক হোলোর কাছে স্তব্ধ হতে পারে তবে অন্য কোন অবস্থায় তা উল্টো দিকে না চলার নিশ্চয়তা কি? এই সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরাও আজ চিন্তাভাবনা করছেন। মাইকেল ব্যারী, থমাস গো এবং স্টিভেন হোকিং এর মতো প্রখ্যাত কজমোলজিস্টরাও এদের মধ্যে ক'জন। তারা থিওরী উপস্থাপন করেছেন যে, কনট্রাকশন ফেইজের সময় মহাকাল পাল্টে যেতে পারে।

পরবর্তী উক্তিগুলো বিজ্ঞানের এই অভিনব থিওরীর উপর ভিত্তি করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটা বিশ্বাস করা ঈমানদারদের জন্য মোটেই মূখ্য নয়। কারণ, এটা একটি বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা মাত্র। আল্লাহ পাক সত্যিকার অর্থে কোন্ উপায়ে পুনরুত্থান ঘটাবেন তা কেউ আসলে জানে না। তবে পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটবে- কারণ, এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন শরীফে। এছাড়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অনেক হাদীস শরীফেও কিয়ামত দিবস সংঘটিত হওয়া ও এর বিভিন্ন অবস্থার সুস্পষ্ট রিওয়ায়েত এসেছে। সুতরাং এখন যাকিছু বলা হচ্ছে তা

শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আশাকরি পাঠকরা ব্যাপারটিকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখবেন এবং যা বলা হচ্ছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কিংবা এটাকে আসল সত্য মনে করার প্রয়োজন বোধ করবেন না।

কুরআনের আয়াতমালা থেকে ধারণা করা যায় যে, কিয়ামত দিবসের সময় জগতটি কনট্রাকশন ফেইজে পতিত হবে এবং সময় উল্টোদিকে চলবে। আর সময় উল্টোদিকে চললেই কবর থেকে মানুষের পুনরুত্থান সহজেই ঘটবে। মানুষ এই উল্টোগতির সময়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে জীবিত থাকাবস্থায় যাকিছু করেছিলো তা করতে থাকবে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকবে না। সময়ের জালে আবদ্ধ তার নিজস্ব হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন কার্যাবলী করতে থাকবে, অর্থাৎ কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিতে থাকবে। কারণ সবকিছু সময়ের মধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে এ জগতে আমাদের কৃত কোন ঘটনাই অতীতে বিলীন হয়ে যায় নি। সময়ের জালে সবকিছু আবদ্ধ হয়ে আছে। সময় যখন আবার ফিরে আসবে তখন এসব কার্যাবলী আবার ঘটতে থাকবে। কিন্তু তখন কারো স্বাধীনতা থাকবে না। কৃত কোন লজ্জাষ্কর ঘটনাও তখন আর লুকানো সম্ভব হবে না। কিয়ামতের দিন তাই সবার সামনে এমন কিছু কার্যাবলী মানুষ করবে যার কারণে তাকে লজ্জা পেতে হবে।

আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ "এই কিতাব (সুরক্ষিত ফলক) তোমাদের বিরুদ্ধে সত্যসহ প্রকাশিত হবে, তোমরা যা করো আমি তা সুরক্ষিত করে রাখছি (সময়ের মধ্যে)" [জাসিয়া (৪৫):২৯]। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

অর্থাৎ "মহাবিশ্ব ও পৃথিবীতে কোন কিছুই গুপ্ত নয়, কিন্তু সবকিছু কিতাবে পরিষ্কারভাবে রক্ষিত (সময়ের মধ্যে)" [নাম্‌ল (২৭):৭৫]।

পৃথিবীর ইতিহাস যখন আবার সময়ের উল্টো গতির কারণে পুনারাবৃত্তি হতে থাকবে তখন একটার পর আরেকটি জাতি কবর থেকে জীবিত হয়ে বেরিয়ে আসবে। সময়ের পাল্টা গতি দ্রুত হবে কি না তা নিশ্চিত নয়। যদি তা দ্রুত হতে থাকে তবে মানুষ সবকিছু খুব দ্রুত করতে থাকবে। কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ "ফেরেশতা ও রূহসমূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে (কিয়ামত দিবসে) যা (এ পৃথিবীর) ৫০ হাজার বছরের সমান।" [সূরা মাআরিজ (৭০):৪]।

সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় মানুষের অবস্থান এ গ্রহে যতো দিনই হোক না কেন, কিয়ামত দিবসে ৫০ হাজার বছরের মধ্যে সব মানুষ পুনরুত্থিত হবে ও তাদের কৃত যাবতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি এই ৫০ হাজার বছরের মধ্যেই সম্পাদিত হবে। অবশ্য পাঠকদের একথা জেনে নেওয়া উচিত যে, কিয়ামত দিবস সম্পর্কে এখানে বর্ণিত সবকিছুই বিজ্ঞানের আলোকে ধারণা মাত্র। কিয়ামত দিসব ঠিক এভাবে সময়ের পাল্টা গতির মাধ্যমেই হবে তা নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই। এ ব্যাপারে যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। তিনি যদি চান, অন্য উপায়ে এই কিয়ামত সংঘটিত করতে তবে অবশ্যই তাঁর জন্য তা অত্যন্ত সহজ।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানীদের থিওরীর সঙ্গে শেষবিচার দিনের সামঞ্জস্য বর্ণনাই উদ্দেশ্য। এ থেকে মু'মিনদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং হিদায়াতের রাস্তায় চলার তাওফিক আল্লাহ পাক দান করবেন এটাই কাম্য। এছাড়া অমুসলিমরা হয়তো এটা পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবেন। এসব আশা নিয়েই এই গ্রন্থটি লিখতে মনস্ত করেছি।

কিয়ামত দিবস সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন:

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ "আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়, প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে- তোমরা যা করতে, অদ্য তোমারদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে।" [জাসিয়া (৪৫): ২৮]

উপর্যুক্ত এ আয়াত থেকেও ধরাণা করা যায় যে, সেদিন হয়তো সময় পাল্টে গিয়ে বিভিন্ন জাতির কৃতকর্ম আবার ঘটতে থাকবে।

সূরা নূরের ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ "সেদিন (কিয়ামত দিবসে) তাদের (মানুষের) জিহ্বা, হাত ও পা তারা যা করতো তাদের বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য দেবে"। [নূর (২৪):২৪]

সেই মহাবিপদের দিন কাফির বেঈমানরা আক্ষেপ করবে। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

অর্থাৎ "আমি এ দিবসের জন্য সতর্ক করেছি। সেদিন মানুষ তার নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হবে এবং কাফির চিৎকার দিয়ে বলবে, আফসোস! আমি যদি (আজ) ধূলায় পরিণত হয়ে যেতাম!" [নাবা (৭৮): ৪০]। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ

"এবং নবী-রাসূলরা আসবেন নির্দিষ্ট সময়মতো" [মুরসালাত (৭৭):১১]।

হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবায় বললেন:

أَلا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ◉ أَلا وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِى فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ ◉ أَلا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ ◉ أَلا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ ◉ أَلا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ ◉ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ◉ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

-"শুনে রাখ, দুনিয়া একটি অস্থায়ী, সাময়িক, উপস্থিত ও নগদ ব্যাপার। এতে প্রত্যেক সৎ ও অসতের অংশ রয়েছে এবং প্রত্যেকেই এর ফল ভোগ করে। কিন্তু বিশ্বাস কর, পরকাল নির্ধারিত সময়েই আসবে। এটা একটা অটল সত্য। সর্বশক্তিমান মহান প্রভু পরকালেই ফায়সালা করবেন। স্মরণ রেখো, যাবতীয় মঙ্গল সুখ-শান্তি তার সমস্ত প্রকারসহ জান্নাতে রয়েছে এবং যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা, অনিষ্ট তার সমস্ত প্রকারসহ দোযখে রয়েছে। সুতরাং সাবধান! যা কিছু কর, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে কর। বিশ্বাস কর, তোমরা স্ব-স্ব কর্মসহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ হবে। {"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ কোন সৎকর্ম করবে, সে তা-ও দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ কোন মন্দ কাজ করবে সে তা-ও দেখতে পাবে" (সূরা যালযালাহ (৯৯):৭-৮)}" [মুসনাদে ইমাম শাফিঈ (রাহ:), মা'আরিফুল হাদীস]।

এসব আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, কিয়ামত দিবসও সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিয়ামত দিবসের স্থায়িত্বকাল (পঞ্চাশ হাজার বছর), রাসূলদের নির্দিষ্ট সময়ে আগমন প্রভৃতি সময়ের সঙ্গেই জড়িত। অপর একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো এই: আমরা অহরহ শোনে থাকি, কাল-কিয়ামত বা কিয়ামত নিকটবর্তী প্রভৃতি কথা। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কাল-কিয়ামত বা কিয়ামত নিকটবর্তী বলা হলো অথচ ইসলামের আগমনের ১৪০০ বছর পার হয়ে গেছে। তাহলে এসব কথার অর্থ কি দাঁড়ায়? এ প্রশ্নের জবাবও সময়ের কারসাজির মধ্যে লুকানো আছে।

আমাদের জীবনে অনেকেই জানি সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় সময়ের কোন ধারণা বা প্রতিক্রিয়া আমাদের মোটেই অনুভূত হয় না। সুতরাং মৃত্যুর পর যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (সে দিবস কোটি বা কোটি কোটি বছর পরেই হোক কিংবা একদিন পরেই হোক) কেউ যদি অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে এবং এরপর (অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবসে) আবার জ্ঞান ফিরে পায় তবে সে কতকাল অজ্ঞান ছিলো তা কি কখনো জানতে পারবে? সে কি ভাববে না, সে কাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আবার আজ জেগে উঠেছে। সুতরাং এ দিক থেকে চিন্তা করলে, কিয়ামত কি আগামীকাল নয়, অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই সংগঠিত হতে যাচ্ছে না? কিয়ামত নিকটবর্তী এই অর্থেই বুঝতে হবে। অবশ্য আলমে বরযখ বা কবরের জিন্দেগী নামক একটি সময় আছে। এটা কিন্তু কবরে যাওয়ার পরও যাদের চেতনা বা কন্সিয়াসনেস আল্লাহর হুকুমে শাস্তির উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক বহাল থাকবে, তাদের ক্ষেত্রেই সত্য।

যারা এই কন্সিয়াসনেস থেকে সম্পূর্ণ গাফিল অর্থাৎ অজ্ঞাত থাকবে তাদের পক্ষে সময় অতিবাহিত হওয়ার অনুভূতি কোন ক্রমেই থাকবে না, তারা মনে করবে কাল মারা গেলাম আর আজ কিয়ামতের ময়দানে সমবেত হচ্ছি। এ হচ্ছে সময় ও আমাদের কন্সিয়াসনেস তথা চেতনার মধ্যে সম্পর্ক। সুতরাং মু'মিনদের চিন্তা করা উচিত মৃত্যুর পরই কিয়ামত দিবসের মহাবিপদ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে। এ মহাবিপদের দিন মোটেই দূরে নয়- অতি কাছে। বিষয়টা ভালো করে অনুধাবন করা একান্ত জরুরী।

আগেই বলেছি পবিত্র কুরআন শরীফে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রায় ৮০০ আয়াত আছে। এই গ্রন্থে এসব প্রতিটি আয়াতে করীমের বর্ণনা আদৌ সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও আছে বলে মনে করি না। উপরে বর্ণিত ক'টি আয়াত শরীফ থেকেই মূল বক্তব্যটা স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআন একটি বিজ্ঞানসম্মত ঐশীবাণী। এর মধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াত থেকে মানুষ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ করে যাবে এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য কোন তথ্যের সঙ্গে এতে কোন অসামঞ্জস্যতা কিংবা সংঘাত খুঁজে পাওয়া যাবে না। দীর্ঘকাল ইসলামবিরোধীরা এই সংঘাত বের করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন তারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কুরআন যে মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াতের বাণী তা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে কুরআন শরীফের আরও কিছু বৈজ্ঞানিক আয়াতমালা এসেছে। যাবতীয় ফিজিক্যাল প্রসেস যে মূলত আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ, সেই কথাটি নিয়েই আমরা এখন আলোচনা করবো। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন, দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত বিজ্ঞানের কিছু তথ্যাবলী এখানে পুনরুল্লিখিত হয়েছে। বিষয়বস্তু বর্ণনায় এটা জরুরী মনে করেই তা করা হয়েছে।

"মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাতের আবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন (গবেষক, চিন্তাশীল, বিজ্ঞানী) ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা আলে ইমরান: ১৯০]

পরিচ্ছেদ ৪

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতে আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন;

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-"আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" [ফাতিহা (১):১]
অর্থাৎ, "যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য"।

পবিত্র এ আয়াতে আল্লাহর গুণবাচক একটি নাম রব্ব বা প্রতিপালক শব্দটির মাধ্যমে আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর একটি মাত্র উল্লেখিত হয়েছে। তবে তাঁর এ গুণটি বিশ্বজগতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত। প্রতিপালন অর্থ হচ্ছে, যাবতীয় বস্তুর তত্বাবধান। বস্তু জগত ও প্রাণীজগতকে পালন করাসহ প্রতিটি অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আল্লাহর এ গুণটি কর্মশীল আছে। অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ পাকের গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র কালামে পাকে তাঁর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে ৯৯টি উত্তম গুণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এসব পবিত্র নামের একটিরও তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়ে বলা আমার জন্য কখনো সম্ভব হবে না। তথাপি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে উপর্যুক্ত রব্ব গুণবাচক নামটির উপর কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়োজন মনে করছি।

একথা আগেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞান এ পর্যন্ত যেসব তথ্যাদি আবিষ্কার করেছে তা মোটেই নির্ভুল মহাসত্য নয়। এ কথাটি আজ স্বয়ং বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করে নিয়েছেন। বিভিন্ন দার্শনিক ও তত্ত্ববিদরা যেরূপ ভিন্ন ধরনের মতবাদ তৈরী

করে থাকেন, বিজ্ঞানও সেরূপ অনেক মতবাদ তৈরী করেছে। এর মধ্যে কিছু আছে হাইপোথেসিস, কিছু আছে থিওরী আর কিছু আছে পরীক্ষিত সত্য তথ্যাবলী বা ফ্যাক্ট। হাইপোথিসিস পর্যায় হচ্ছে বিজ্ঞানীর এ্যডুকেইটেড গ্যাছ বা '**সুচিন্তিত ধারণা**'। থিওরীর পর্যায় হলো গাণিতিক মানদণ্ডে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর মতবাদ। এছাড়া কিছু পরীক্ষিত সত্য তথ্যাবলী প্রামাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলো সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। শেষোক্তটিই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট বা সত্য।

এটুকু বলার পর আমি এবার বিজ্ঞানের বিভিন্ন উপমা দিয়ে আল্লাহর এ সৃষ্ট জগতে রব্বুবিয়তের প্রক্রিয়া কিভাবে সক্রিয় আছে তা তুলে ধরছি। পাঠকরা এ থেকে সামান্যতম উপকৃত হলেও আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

রব্বুবিয়তের স্বরূপ

আল্লাহ পাকের রব্বুবিয়ত বা প্রতিপালনকারিতার স্বরূপ অনেক ধরনের। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীজগতের প্রতিটি জীবীকে বিশেষ আইন ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি অস্তিত্বদান করেন। কালের আবর্তে সবকিছু তাদের নির্দিষ্ট সময় অস্তিত্বশীল থেকে আবার ক্ষয় হয়, ধ্বংস হয়। জগত সৃষ্টির শুরু থেকেই এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এতে কোন হেরফের নেই। অর্থাৎ বস্তুজগতের প্রতিটি জড়-পদার্থ এবং অণু-পরমাণু রব্ব-প্রদত্ত কয়েকটি মৌলিক আইনের আওতাভূক্ত থেকে অস্তিত্ব বজায় রেখে আছে। মূলতঃ আল্লাহর দেওয়া রব্বুবিয়তের আইন ও তার গণ্ডিসীমার বাইরে কোন কিছুই যেতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এক্ষেত্রে প্রাণীজগতের বেলা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা হেরফের দেখা যায়, কিন্তু তা-ও আল্লাহর জ্ঞান ও রব্বুবিয়তের সীমানা বহির্ভূত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ যখন আল্লাহর অপছন্দ কিছু করে, তখন এটাকে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করা বলা যায়, তবে এ কার্য করার যে ক্ষমতা মানুষের মধ্যে উৎপন্ন হয় তা-ও কিন্তু আল্লাহর রব্বুবিয়তের (প্রদত্ত শক্তির) আওতাভূক্ত।

মনে করুন কেউ অন্যায়ভাবে কোন লোককে হত্যা করলো- এ কাজটি আল্লাহর অপছন্দ এবং দুনিয়া আখিরাতে এই পাপী ব্যক্তি শস্তি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু মানুষ মারার ক্ষমতা আল্লাহ তার প্রতিপালনের আওতায় তাকে দিয়েছেন। যদি সে ক্ষমতা দেওয়া না হতো, তবে অবশ্যই সে মানুষ মারতে পারতো না। এ উপমা থেকে ভালো মন্দ সবকিছু যে আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে আছে এবং তাঁর হুকুম ছাড়া সংঘটিত হয় না, এ কথাটি বুঝতেও সুবিধে হয়।

মোটকথা রব্বুবিয়তের আইনের বাইরে কোন কিছুই নেই। সবকিছু এর ভেতরে অবস্থান করে। আল্লাহর পবিত্র রব্ব নামের গুণাবলীর মধ্যেই প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব বজায় আছে ও প্রতিটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

বস্তুজগতে রব্ব গুণের স্বরূপ

সমগ্র বস্তুজগত নিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা। জড়ের রং, রূপ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, ফিজিক্যাল নেচার, রসায়নিক প্রক্রিয়া, অস্তিত্ব ও স্থিতিশীলতার কারণ, গুপ্ত ফোর্স প্রভৃতি বিষয়বস্তু সিস্টেমেটিক, গাণিতিক ও পরীক্ষালব্ধ পদ্ধতিতে জানার নামই হচ্ছে বিজ্ঞান। এককথায় আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ উন্মোচন করা এই জ্ঞানের শাখার কার্যকলাপ। এ জ্ঞানের সন্ধান আজকের ব্যাপার নয়। মানবসভ্যতার আদিকাল থেকেই অনুসন্ধিৎসু সৃষ্টির সেরা মানবজাতি এ জ্ঞানার্জনে ব্রত আছে। স্বয়ং রব্ব এ অনুসন্ধানে লেগে যাওয়ার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাতের আবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন (গবেষক, চিন্তাশীল, বিজ্ঞানী) ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা আলে-ইমরান (৩): ১৯০]

পবিত্র কালামে এরূপ আরোও বহু আয়াতমালা আছে যেগুলো মানুষকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জগত নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এব্যাপারে মু'মিনদের তাগিদ দিয়েছেন। জ্ঞানান্বেষায় লেগে যাওয়ার জন্য উপদেশ করেছেন। আর অবশ্যই ঈমান নিয়ে কেউ যদি এ গবেষণায় অগ্রসর হয়, তবে সে আল্লাহর পরিচিতি অর্জন করতে পারবে। আর এ পরিচিতির মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত ইনসানিয়্যাত হাসিল করতে পারে। আজ আমাদের বড় ভাগ্য যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে আমরা অতি সহজেই আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ জানতে পারি। এবার পাঠকদের সুবিধার্থে বর্তমান বিজ্ঞানের কিছু তথ্যাবলী পুনরুল্লেখ করছি। নিম্নোল্লিখিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আল্লাহর রব্ব গুণের বিকাশের স্বরূপ উন্মোচিত করেছে। একটু চিন্তা করলেই এ সত্য ধরা পড়ে।

বিজ্ঞানের আলোকে জগত পরিচালনার স্বরূপ

বিজ্ঞান আজ আমাদেরকে জগতের মৌলিক পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য দিয়েছে। জগতের যাবতীয় বস্তুর গঠনপ্রণালী, ফিজিক্যাল শক্তি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে এসব তথ্যাবলী একজন ঈমানদারকে অবাক করবে বৈকি। তবে এতে তার ঈমানী শক্তি যে দৃঢ়তর হবে সে কথা নিশ্চিত।

(ক) বস্তুর গঠনপ্রণালী

বস্তুজগৎ মূলত কিছু মৌলিক পার্টিকেল বা কণা থেকে সৃষ্ট। যে কোন বস্তুকে ভাগ করতে করতে এমন এক পর্যায়ে আমরা এসে যাবো, যখন আর ভাগ করাও সম্ভব হবে না। এ অবস্থাকে কণা বা পার্টিকেল এর পর্যায় বলা হয়। আর একাধিক পার্টিকেলের সমন্বয়ে এক একটি অণু বা এটম সৃষ্টি হয়েছে। এটম বস্তুর অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ। নগ্ন চোখে এটমকে কেউ দেখতে পারে না। অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত ইলেকট্রন

মাইক্রোস্কোপ নামক একপ্রকার শক্তিশালী অণুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এটমকে দেখা সম্ভব।

এটমের গঠনপ্রণালীর উপর নির্ভর করে, যে কোনো বস্তুর একক আলাদা পরিচিতি। এটমের মধ্যে সাধারণত দু'টি ভিন্ন স্তর বিরাজ করে। এর একটি হচ্ছে বাইরের ও অপরটি ভেতরের। বাইরের স্তরে এক বা একাধিক ইলেকট্রন নামক কণা ভেতরের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকে সর্বদা প্রদক্ষিণ করে। এ অবস্থা সূর্যকে যেরূপ গ্রহ-উপগ্রহগুলো প্রদক্ষিণ করে ঠিক তদ্রূপ।

কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে সাধারণত দু'টি ভিন্ন কণা আছে, এর একটি হলো প্রটোন আর অপরটি নিউট্রোন। এটমের ভেতর ক'টি প্রোটন, নিউট্রন আছে এবং বাইরে ক'টি ইলেকট্রন আছে, এথেকেই ভিন্ন পদার্থ হিসেবে বস্তু অস্তিত্ব বজায় রাখে। যেমন জগতের সর্বাপেক্ষা বেশী ও অত্যন্ত সহজভাবে অস্তিত্বশীল মৌলিক পদার্থ বা ইলেমেন্ট হচ্ছে হাইড্রোজেন। এ হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াসে দু'টি মাত্র কণা আছে, এর একটি নিউট্রোন ও অপরটি প্রটোন। এর বাইরে একটিমাত্র ইলেকট্রন আছে যা কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। পরবর্তী পদার্থ হিলিয়ামের কেন্দ্রে আছে দুটি প্রটোন ও দুটি নিউট্রোন এবং বাইরে আছে দুটি ইলেকট্রন। এরূপ ভিন্ন ইলেমেন্টের এটমগুলোতে ভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন, প্রটোন ও নিউট্রন আছে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ১১২টি ভিন্ন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে ১০৯টি পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম প্রভৃতি হচ্ছে স্বভাবের মৌলিক পদার্থসমূহ। কোন মৌলিক পদার্থ আবার একাধিক এটমের মাধ্যমে গঠিত। কয়েকটি এটম একত্রে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে যুক্ত হয়ে বণ্ড তৈরী করে পদার্থ সৃষ্ট হয়। এ অবস্থাকে মলিকিউল বলে।

একাধিক আলাদা পদার্থের মলিকিউল একত্রে থেকে জগতের অন্যান্য কোটি কোটি ধরনের বস্তু সৃষ্ট হয়েছে। মৌলিক পদার্থ ছাড়া এসব ভিন্ন বস্তুকে সাধারণত কম্পাউন্ড বা মিশ্র বস্তু বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে বস্তুর স্বাদ, গন্ধ, রং এবং অন্যান্য গুণাবলী এটমিক ও মলিকিউলার স্তরেই চিহ্নিত ও অর্জিত হয়। যেমন পানির কথা বলা যায়। পানির স্বাদ, রং ও গন্ধ যেরূপ আছে সেরূপ হয় এজন্য

যে, এটি (মলিকিউলার স্তরে) দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন এটমের তৈরী মলিকিউল থেকে সৃষ্ট। এ মলিকিউলটি পানির গুণাবলী ছাড়া অন্য কোন গুণাবলী বহন করতে পারে না। সুতরাং এ মলিকিউলটি সর্বদাই পানি থাকবে। মোটকথা মলিকিউলার স্তরে প্রতিটি বস্তুই একটি কেমিক্যাল ফর্মুলা দ্বারা সৃষ্ট। এ ফর্মুলা বলে দেবে বস্তুটি কিসব মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। পানির ক্ষেত্রে এ ফর্মুলা হচ্ছে এইচ$_২$ঝিরো (H_2O)। এর অর্থ হলো: দুটি হাইড্রোজেন এটম ও একটি অক্সিজেন এটম। সুতরাং বিজ্ঞানীরা যে কোন বস্তুর কেমিক্যাল ফর্মুলা দ্বারা এটা কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, তা সহজেই বুঝতে পারেন।

জগতের সব বস্তুর আরোও কিছু মৌলিক গুণাবলী আছে। যে কোন বস্তু সাধারণত তিনটি অবস্থার একটি হয়ে থাকে। এগুলো হলো, তরল, কঠিন ও গ্যাস। অন্য আরেকটি অবস্থা আছে যাকে প্লাজমা বলে। এ অবস্থা পৃথিবীর বুকে সাধারণত পাওয়া যায় না। সাধারণ এ তিনটি অবস্থার দৃষ্টান্ত পানি দিয়ে দেওয়া যায়: পানির তাপমাত্রা যখন ঝিরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকেও নিচে নেমে আসে তখন তা কঠিন পদার্থ বা বরফ হয়ে যায়। ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নিচে এবং ঝিরো ডিগ্রীর উপরে হলে তরল অবস্থায় থাকে এবং ১০০ ডিগ্রীর উপরে হলে বাষ্প বা গ্যাসে পরিণত হয়। সুতরাং বস্তু তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে, এ তিন অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা ধারণ করে অস্তিত্ব বজায় রাখে।

অতি সংক্ষেপে বস্তুর অবস্থা, স্থিতিশীলতা, গঠনপ্রণালী ও স্বরূপ এখানে আবারও বর্ণিত হলো (বিস্তারিত জানার জন্য দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন)। এ ব্যাপারে আর বলার প্রয়োজন নেই। তবে এথেকেই আল্লাহর রব্বুবিয়তের একটি দিক গবেষণা করা যায়। উপরে উল্লেখিত তথ্যগুলোর সবক'টিই আল্লাহর দান বা গুণাবলীর মাধ্যমে জগতে অস্তিত্বশীল হয়েছে। এর একটিও কোন মানুষ বা অন্যকিছু দ্বারা সৃষ্ট নয়। মানুষ পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা এ তথ্যগুলো আবিষ্কার করেছে মাত্র।

(খ) বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল মৌলিক শক্তিবলী

জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে কিছু মৌলিক শক্তি ও গুণাবলী নিহিত আছে। এগুলো অণু-পরমাণু থেকে বিশ্বব্যাপী সর্বত্র ক্রিয়াশীল আছে। আল্লাহর রব্ব নামের বিকাশে এসব শক্তি বা মৌলিক আইন বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞান চারটি ফান্ডামেন্ট্যাল ফোর্সেস অব নেচার বা স্বভাবের মৌলিক শক্তিবলী আবিষ্কার করেছে। এ চারটি শক্তির আওতাভূক্ত থেকে যাবতীয় ফিজিক্যাল ক্রিয়া সংঘটিত হয়। ফোর্সগুলোর এক একটি আলাদা গুণ আছে।

আমি এবার এ চারটি শক্তি বস্তুজগতে কিভাবে প্রভাব ফেলে তা সহজ ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা চালাচ্ছি (বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ বুঝতে গেলে এ ফোর্সগুলো সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য তাই এগুলো নিয়ে আরেকবার কিছু আলোচনা জরুরী।

(১) গ্রাভিটি বা মহাকর্ষ: বিশ্বজগতে মহাকর্ষ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক শক্তি। এ শক্তিটি প্রতিটি অণুকণা থেকে কোটি কোটি মাইল ও আলোক বৎসর দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত প্রতিটি ছোট-বড় বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল আছে। এটা এমন এক শক্তি যা দুটি বস্তুর মধ্যস্থিত আলো-বাতাসহীন শূন্যস্থানের উপরও সক্রিয় আছে। অর্থাৎ একটি তারা থেকে আরেকটি তারার উপর এ শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যদিও এ দুয়ের মধ্যস্থিত দূরত্বে সম্পূর্ণ শূন্যস্থান (কোন বস্তু বা আলো-বাতাস নেই) বিরাজ করে। এককথায়, মহাকর্ষ জগতের সর্বত্র বিরাজমান- বস্তু এবং শূন্যস্থানসহ। মহাকর্ষের ফলে আমরা পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারি, উপরের দিকে ঢিল ছুঁড়লে তা আবার মাটিতে পতিত হয়, বৈশাখে ঝড়ের ঝাপটে আম গাছ থেকে পাকা আম মাটিতে পড়ে, আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে আসে, সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, সৌরজগৎ ও বিশ্বজগত যেরূপ অস্তিত্ব বজায় রেখে মহাকাশে বিচরণ করছে সেরূপ আছে।

মহাকর্ষের একটি প্রধান গুণ হচ্ছে, এটা নিজের দিকে বস্তুকে টেনে আনে। দুটি বস্তু তা এটমিক পর্যায়ে হোক আর গ্রহ-উপগ্রহের ক্ষেত্রে হোক, তারা বা তারাজগতই হোক, একে অন্যের দিকে আকর্ষিত হয় মহাকর্ষের প্রভাবে। আমরা সবাই এবং সবকিছু পৃথিবীর কেন্দ্র বা সেন্টারের দিকে আকর্ষিত হচ্ছি। আপনি যদি পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত একটা সুদীর্ঘ গর্ত খুঁড়ে তাতে জাম্প দেন, তবে অবশ্যই আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যাবেন।

মহাকর্ষ সত্যিই আল্লাহর রব্বুবিয়তের আওতাভূক্ত একটি অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল। এ শক্তির প্রভাবে বস্তুর উপর পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র পথ আছে। আর তা হলো, ঘূর্ণন। এটমের উপর ইলেকট্রন যাতে পড়ে না যায়, এজন্য সে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘুরতে বা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। পৃথিবীর উপর চন্দ্র যাতে পড়ে না যায় এজন্য সে-ও একটি নির্দিষ্ট গতিতে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহও এভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে সেখানে অবস্থান করতে পারে। পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলোও প্রদক্ষিণ করে সূর্যের উপর পড়ে, পুড়ে ছাই হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে। পুরো সৌরজগত- অর্থাৎ সূর্য তার পরিবার-পরিবর্গসহও আমাদের গ্যালাক্সির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে।

ঘূর্ণন বা প্রদক্ষিণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার পেছনে কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে? বিজ্ঞানীরা এ রহস্যের নামকরণ করেছেন, আঙ্গুলার মমেন্টাম বা কৌণিক গতিশীলতা। এ ঘূর্ণনের মাধ্যমে বস্তুর ভেতর একটি শক্তি সঞ্চয়িত হয়। এ শক্তির ফলে বস্তুটি বাইরের দিকে ছুটে যেতে নিজের মধ্যে গতিশীলতা সৃষ্টি করে। এ গতির মাত্রা এবং মহাকর্ষের মধ্যে একটা ব্যালান্স তৈরী হয়। এর ফলে বস্তুটি পড়ে যায় না ঠিক, কিন্তু ছুটে যেতেও পারে না। সুতরাং ঘুরতেই থাকে। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর কী অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল এখানে কাজ করছে! অণু-কণা থেকে জগতের সবকিছু ঘূর্ণমান-গতিশীল কেন, তা অবশ্যই এবার আপনারা বুঝতে পারছেন। আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

অর্থাৎ "চন্দ্রকে ধরতে পারে না সূর্য, রাতও নহে দিবসের অগ্রগামী; প্রত্যেকেই (মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে) কক্ষপথে সন্তরণশীল"। [সূরা ইয়া-সীন (৩৬):৪০]

স্বভাবের মৌলিক এ শক্তিটি কোন মানুষ বা জ্বীন-পরীর সৃষ্ট নয়। এটা স্বভাবও সৃষ্টি করে নি। আসলে স্বভাব কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি আল্লাহর রব্ব গুণের বিকাশ মাত্র। আল্লাহ পাক সকল বস্তু সৃষ্টি করে কিছু মৌলিক আইন-কানুন দ্বারা এগুলোকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এসব আইনের বাইরে বস্তুজগত অকেজো, মূলতঃ স্থিতিহীন। আল্লাহ সব বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, অস্তিত্ব দান করেছেন। এগুলো এই প্রতিপালনের আওতায় থেকেই আবার অস্তিত্বহীন হবে, ধ্বংস হবে। পাঠকরা শীঘ্রই বস্তু ধ্বংসের কারণ ও স্বরূপ বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

(২) ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স বা ইলেকট্রচুম্বকীয় শক্তি: এ শক্তিটিও বিশ্বজগতের সর্বত্র ক্রিয়াশীল আছে। প্রতিটি বস্তুতে ইলেকট্রিক ও চুম্বকীয় শক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে। কেমিস্ট্রি ও বায়েলোজলিতে যেসব প্রতিক্রিয়া বা রিয়েকশন হয় তা এ শক্তির ফলেই হয়। ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন যেমন টিভি, রেডিও, এক্সরে, ইনফ্রারেড, আলট্রাভাইলোট প্রভৃতি সিগনালও এ শক্তির ফলে সংঘটিত হয়। আলোও এ শক্তির ফলাফল। বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে এনার্জি, বিকিরণ (রেডিয়েশন) ও আলো নির্গত হয়ে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। যদিও মহাকর্ষ নিয়ে আইজাক নিউটন চারশ বছর পূর্বে গভীর গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র শতাধিক বছর আগে।

(৩) স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বা সবল আনবিক শক্তি: প্রাকৃতিক আরেকটি মৌলিক শক্তি আছে যাকে সবল আনবিক শক্তি বা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বলা হয়। এ শক্তিটি প্রতিটি বস্তুতে আনবিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল আছে। প্রতিটি এটমের কেন্দ্রকে এ শক্তিই বেধে রাখে। কেন্দ্রের মধ্যে যে নিউট্রন ও প্রটোন নামক দুটি কণা আছে, এগুলো এ শক্তি থাকার ফলে একে অন্যকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে রাখে। আনবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে যে বিশাল এনার্জি বা উদ্যম বেরিয়ে এসে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ধ্বংসলীলা ঘটায়, তা এই প্রভাবশালী আনবিক শক্তির ফলেই হয়। মানুষ এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে আনবিক চুল্লীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করছে। নিউক্লিয়ার এনার্জির মূলে এ মৌলিক শক্তিই ক্রিয়াশীল আছে।

আল্লাহ পাকের রব্বুবিয়তের কী অপূর্ব আরেক নিদর্শন এ শক্তিটি। এ শক্তির ফলে যেমনি বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষা পাচ্ছে, তেমনি এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের বিরাট উপকার হচ্ছে। তবে আমাদের মানবীয় লোভ, হিংসা, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এ বিরাট শক্তিটি ব্যবহারে উন্মাদ কিছু বিজ্ঞানীরা এটম, হাইড্রোজেন ও নিউট্রন বোমার মত জঘন্য ধ্বংসশীল অস্ত্র বানিয়েছেন। এর ফলে এ পৃথিবীর নিরাপত্তা হয়ে উঠেছে ভীষণভাবে অনিশ্চিত। এটা সত্যিই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একটি জঘন্য কাজ, যার জন্য ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদরা ধিক্কার দেবেন, একথা নিশ্চিত। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত এ শক্তিটি জগতের জন্য অপরিহার্য। এ শক্তির ফলেই সূর্য ও তারাগুলো জ্বলন্ত আছে। সূর্যের কেন্দ্রে আনবিক স্কেলে বিস্ফোরণ হচ্ছে। সূর্যের কেন্দ্র একটি জ্যান্ত হাইড্রোজেন বোমা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভীষণ তাপমাত্রার ফলে হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং এ রিয়েকশনের ফলস্বরূপ সূর্য আলো ও তাপসহ অনেক ধরনের এনার্জি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ এনার্জি থেকে পৃথিবী ও এর অধিবাসীরা উপকৃত হচ্ছে। সূর্যের তাপ ও আলো ছাড়া এ গ্রহে কোন প্রাণী জ্যান্ত থাকতে পারতো না।

পাঠকরা একটু ভেবে দেখুন। আল্লাহর রব্ব নামের গুণাবলীর বিকাশ কিভাবে জগতে প্রকাশ হচ্ছে, তা নীরবে একটিবার চিন্তা করে দেখুন। মহাকর্ষের মাধ্যমে এই সৌরগজতসহ সমগ্র বিশ্বজগত একে অন্যের উপর ভিত্তি করে ঘুর্ণমান অবস্থায় থেকে, শৃংখলা বজায় রেখে চলছে। বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তির ফলে

বস্তুতে সৃষ্ট কিছু এনার্জি উৎপন্ন হয়ে জগতকে আলোকিত করছে ও শূন্যস্থানের উপর কোটি কোটি আলোক বৎসর পেরিয়ে চলে যাচ্ছে এক্স-রে, আলোক, লাল-তরঙ্গ প্রভৃতি এনার্জি। প্রভাবশালী আনবিক শক্তির ফলে সূর্যসহ কোটি কোটি তারারা জ্বলন্ত আছে। এটা আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল নয় কি? সন্দেহবাদী ও অবিশ্বাসী নাস্তিক-বেঈমানরা কী করে বলে যে, আল্লাহ ও ধর্ম মানুষের ধারণা মাত্র! এরা কি এসব দেখে না? এগুলো তো আধ্যাত্মিক ব্যাপার নয় যে, দিব্যদৃষ্টি অর্জিত না হলে বুঝা যাবে না। জগতের মধ্যে রব্বুবিয়তের অসংখ্য প্রমাণ ও কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখে ও জেনে তারা কিভাবে ধর্মহারা, প্রভু-বিরুদ্ধ হতে পারে তা আমি অনেক ভেবেও বুঝতে পারিনি। এরা কি ভাবে না? জগত নিয়ে সামান্যতম গবেষণাও করে না? আশ্চর্য মানুষ এসব অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীরা!

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে সন্দেহবাদী ও বেঈমানদের দলে জড়িত করেন নি। আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া।

(৪) দুর্বল আনবিক শক্তি ঃ বস্তু জগতে আরো একটি মৌলিক শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। এ শক্তির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স বা দুর্বল আনবিক শক্তি। অণু পরমাণুর স্কেলে এ শক্তিটি প্রভাবশালী।

মূলত বস্তুর ক্ষয় হওয়ার জন্য এ শক্তিটি দায়ী। এটমের কেন্দ্রে যে নিউট্রন নামে একটি পর্টিকেল আছে, এটি দুর্বল আনবিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয় হয়ে যায়। এ শক্তি, স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ও বৈদ্যুতিক-আনবিক শক্তির সমন্বয়ে কিছু এনার্জির সৃষ্টি হয়। এসব এনার্জিকে রেডিওএ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা বলে।

পাঠকরা লক্ষ করুন, উপরে বর্ণিত মৌলিক এই চারটি ফোর্সের আইন বহির্ভূত কোন বস্তুই এ জগতে নেই। সবগুলো এসব আইনের আওতাভূক্ত। বস্তু জগত এদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এখানে আল্লাহর পরিচালন ক্ষমতার স্বরূপ কী সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান এসব মৌলিক শক্তিবলী আবিষ্কার করে জড়জগতে রব্বুবিয়তের ক্রিয়া বলতে কি বুঝায় তা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

(গ) কিভাবে প্রতিটি অণুকণা ক্ষয় ও পরিবর্তিত হচ্ছে

আগে বর্ণিত মৌলিক শক্তিসমূহের ৪ নং শক্তি- দুর্বল আনবিক শক্তির প্রক্রিয়ায় যে বস্তু ক্ষয় হয়, তা উল্লেখিত হয়েছে। এবার আমি অত্যন্ত সরল ভাষায় জড় জগতের প্রতিটি বস্তু কিভাবে সময়ের আবর্তে ধ্বংস ও পরিবর্তিত হচ্ছে, সে আলোচনায় যাচ্ছি।

সময়ের আবর্তে মানুষসহ জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জগতের যেমন মরণ আছে, ঠিক তদ্রূপ বস্তুরও চিরমরণ আছে। বস্তুর স্থায়ীত্ব যে চিরন্তন নয়, তা এখন বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে।
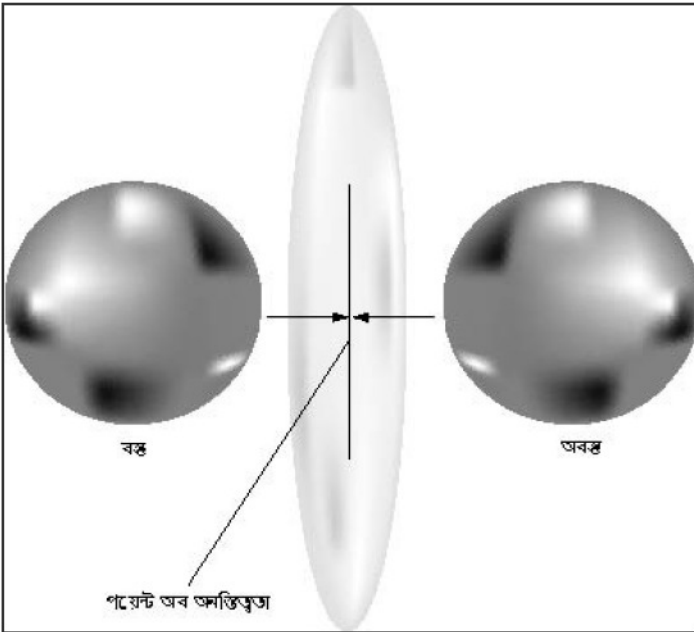
জড় জগতে পার্টিকেল (কণা) যেমন আছে, তেমনি এর বিপরিতধর্মী আরেকটি এ্যান্টিপার্টিকেল (অকণা) আছে। এ দুটো যেই মুহূর্তে একত্রিত হয় তখন দুটিই

ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ একটা আরেকটাকে ধ্বংস করে দিয়ে শূন্যে রূপান্তরিত হয়। ব্যাপারটা আরো বুঝিয়ে বলছি।

মনে করুন আমার হাতে একটি বল আছে যেটি মেটার বা বস্তু এবং আপনার হাতে আরেকটি বল আছে যা হচ্ছে এ্যান্টিমেটার বা অবস্তু। এখন আমরা দুজনেই যদি বলগুলোকে ছুঁড়ে দিই এবং একটা আরেকটার উপরে পড়ে তবে দুটিই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে! আপনার বল ও আমারটি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ এগুলোর অস্তিত্ব এখন আর এ জগতে নেই। তবে আপনার হাতে থাকাকালীন অবস্তুটিও অস্তিত্বশীল ছিলো এবং আমারটিও ছিলো। মেটার-এ্যান্টিমেটার এর ব্যাপারটা এরকম। সৌভাগ্যবশতঃ জগতসৃষ্টির পরমুহূর্তেই সিংহভাগ এ্যান্টিমেটার গায়েব হয়ে যায়। এর ফলে জগত তখনই ধ্বংস হয়ে যায় নি। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় যে মুহূর্তেই কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন হয়তো এগুলো আবার আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ্যান্টিমেটার বা অবস্তু আবিষ্কারের ফলে আল্লাহর এ দু'টি পবিত্র বাক্যের অর্থ পরিষ্কার হয়েছে:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থাৎ “জগতের সবকিছুই ধ্বংস হবে। থাকবেন শুধু তোমার রব্ব, যিনি মহামহিম ও সম্মানিত।” [সূরা আর-রাহমান (৫৫):২৬-২৭]।

আমরা জানি কিয়ামত দিবসে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন বস্তুই অস্তিত্বশীল থাকবে না। কিন্তু সাধারণতঃ কোন বস্তুই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় না। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয় মাত্র। আগুন যখন এক টুকরো কাগজকে পুড়িয়ে দেয় তখন কাগজ আর থাকে না বটে কিন্তু ছাঁই থেকে যায়। পানি যখন অগ্নির উত্তাপে বা খরায় শুকিয়ে যায় তখন তা বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে গিয়ে পৌঁছে। পানি আসলে ধ্বংস হয় না। এককথায়, কোন বস্তুই এ জগত থেকে ধ্বংস হয় না, শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

কিয়ামত আস্‌লে কিন্তু সমগ্র বস্তুজগত অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে, বস্তুজগত বলতে কিছুই থাকবে না। তা কিভাবে হবে আজকের বিজ্ঞান বলে দিচ্ছে।

এ্যান্টিমেটার ও মেটারে সংঘর্ষ লেগে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও অস্তিত্বহীন হবে। এটা হলো বিজ্ঞানের আবিষ্কার। কিন্তু ঠিক এভাবেই ধ্বংস হবে কি-না তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই ভালো জানেন। তবে আমরা বলতে পারি যে, যদি মেটার-এ্যান্টিমেটারের সংঘর্ষে সবকিছু সত্যিই ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে, আল্লাহর রব্বুবিয়তের মধ্যে এ জগত ধ্বংসের আইনও সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সুবহানাল্লাহ!

বস্তুজগত স্বভাবের মাঝে অন্য একটি উপায়েও পরিবর্তিত হচ্ছে। এটাকে বস্তুর বিবর্তন বলা চলে। বিজ্ঞানের ভাষায় এ প্রক্রিয়াকে হাফ-লাইফ বা অর্ধ-জীবন বলে।

যে কোন রেডিও-এ্যাকটিভ বা তেজষ্ক্রিয়াসম্পন্ন জড়বস্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বদলে গিয়ে অন্য আরেকটি জড়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বস্তুর মাত্রা (ওজন) বা ম্যাস এক একটি অর্ধ-জীবনের পক্রিয়ায় অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ প্রভৃতিতে নেমে আসে। মনে করুন আপনার কাছে ১ কেজি তেজষ্ক্রিয়াসম্পন্ন জড়বস্তু, যেমন রেডিয়াম (একটি মৌলিক পদার্থ) আছে। এ পদার্থের অর্ধ-জীবন হচ্ছে ১,৬০০ বছর। আপনি অতি যত্নে এ মূল্যবান পদার্থটি আপনার বংশধরদের জন্য রেখে গেলেন। তারা যদি আগেই তা বিক্রি না করে তবে অবশ্যই ১,৬০০ বছর পরে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ তখন আপনার এ রেডিয়ামটুকুর অর্ধেক বদলে যাবে এবং তা অন্য দু'টি পদার্থ- রেডন ও হিলিয়ামে রূপান্তরিত হবে। এ প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে অর্ধ-জীবন। বস্তুর হাফ-লাইফ এর মান এক মুহূর্ত থেকে ১০ বিলিয়ন বছর পর্যন্ত হতে পারে। আমরা অনেকেই মনে করি হীরা হচ্ছে চিরন্তন বস্তু। বলা হয়, **"ডায়মন্ড ইজ ফরেবার"**- কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। হীরারও হাফ-লাইফ আছে। তবে তা ৪ বিলিয়ন বছর! সুতরাং হয়তো আমাদের ক্ষেত্রে হীরাকে চিরন্তর বলাটা একেবারে অবাস্তব নয়।

য হোক, হাফ-লাইফ যে আছে বিজ্ঞান তা আবিষ্কার করে আল্লাহর রব্বুবিয়তের আওতাভূক্ত আরেকটি সত্য প্রমাণিত করলো।

(ঘ) সূর্যের জীবন কবে এবং কেন শেষ হবে?

বিজ্ঞানের মতে আজ থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন (পাঁচ হাজার মিলিয়ন বা পাঁচশ কোটি) বছর আগে সূর্যসহ এ সৌরজগতের জন্ম হয়। সূর্যটি হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল। সমগ্র সৌরজগতের ৯৯% ওজন বা বস্তু এই সূর্যের মধ্যেই নিহিত। মহাকর্ষের ফলে পৃথিবীসহ সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহগুলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এ উজ্জ্বল জ্বলন্ত বিশাল বস্তুটি আসলে কি?

সূর্য হচ্ছে বিশ্ব জগতের আরোও অগণিত তারাদের মতো একটি হলুদ বর্ণের জ্বলন্ত তারকা। এতে সিংহভাগ হাইড্রোজেন পদার্থ আছে। মহাকর্ষের প্রচণ্ড চাপে ও উঁচ্চতাপে সূর্যের ভেতরে আনবিক স্কেলে নিউক্লিয়ার রিয়েকশন বা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সূর্যের ভেতরের তাপমাত্রা ৬ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আনবিক এ রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন ক্ষয় হচ্ছে ইন্ধন হিসেবে। অর্থাৎ সূর্যকে জ্বলন্ত রাখতে যে পদার্থ ব্যবহার হচ্ছে তার মাত্রা দিন দিন কমে আসছে। অবশ্য এ প্রক্রিয়া সূর্যের জন্ম থেকেই সংঘটিত হচ্ছে।
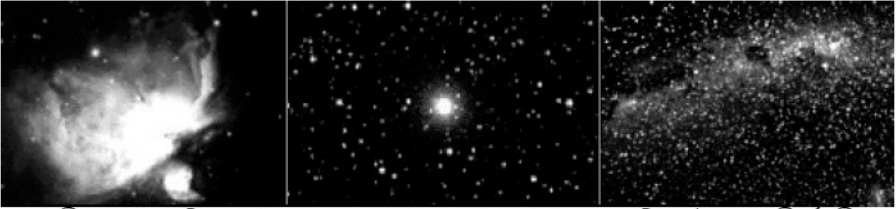
তারাজীবন: একটি তারার জন্ম হয় 'নেব্যুলায়' (বায়ের ছবি), উজ্জ্বল দীর্ঘ জীবন (মাঝের ছবি) এবং বিস্ফোরণের মাধ্যমে মৃত্যু (ডানের ছবি)।

সূদীর্ঘ ৫০০ কোটি বছর ধরে হাইড্রোজেন পুড়ে কিন্তু শেষ হয় নি। আনবিক চুল্লীতে অল্প বস্তুই অনেক এনার্জি বা উদ্যম সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের নিকটতম তারা এ সূর্যটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আনবিক রিকেশনের মাধ্যমে সূর্যটি জ্বলন্ত না থেকে যদি স্বাভাবিকভাবে পুড়তো, তবে মাত্র কয়েক হাজার বছর পরই

হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ পাক অপূর্ব কৌশলে সূর্যকে আনবিক রিয়েকশনের মাধ্যমে জ্বলন্ত রেখে এর জীবন সুদীর্ঘ করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ ও অনুগ্রহের বিকাশ।

তবে সূর্যের ইন্ধন বা জ্বালানী হাইড্রোজেন যে, চিরকাল স্থায়ী থাকবে না- তা আমাদেরকে আজ বিজ্ঞানই বলে দিচ্ছে। যদিও সূর্যটি সম্ভবত তার জীবনের অর্ধেক সীমায় পৌঁছেছে মাত্র, তথাপি এটা যে একদা ধ্বংস হবে তা নিশ্চিত। বিজ্ঞান আমাদেরকে ধ্বংস হওয়ার তারিখ সুদূর ভবিষ্যতে বলে, কিছুটা সুস্থির করেছে। আজ থেকে আরো ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্যের ভেতর আনবিক রিয়েকশন শেষ হবে। তখন এটা চতুর্দিকে বেড়ে যেয়ে এমনকি পৃথিবীকে পর্যন্ত তার ভেতরে নিয়ে যাবে। কেউ যদি সেদিন বেঁচে থাকে, তখন সে দেখতে পাবে সূর্যটা সত্যিই তার মাথার উপর অবস্থান করছে।

সূর্যের জীবন একদিন শেষ হবে এবং তা চন্দ্রকেও যে গিলে ফেলবে সে কথা আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

-অর্থাৎ "এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।" [সূরা ক্বিয়ামাহ (৭৫):৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

-"যখন সূর্য আলোকহীন হয়ে যাবে।" [সূরা তাকউইর (৮১):১]

উপর্যুক্ত প্রথম আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলতেই হয়, সূর্যের **'রেড জায়ান্ট'** পর্যায়টি এখানে ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এসময় চন্দ্রের কোন অস্তিত্বও থাকবে না। বাস্তবেই চন্দ্র ও সূর্য একত্রিত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় আয়াতে করীম দ্বারা সূর্যের পরবর্তী পর্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিজ্ঞান বলছে, লাল দৈত্যরূপ পর্যায় শেষে সূর্য একটি অনুজ্জ্বল **'বামন'** (ডোর্ফ) তারায় পরিণত হবে।

সূর্যের এরূপ শেষ পরিণতির কথা অতীতে কেউ জানতো না। এখন বিজ্ঞান আমাদেরকে গ্রহণযোগ্য যুক্তি ও তথ্যনির্ভর পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা দ্বারা এসব সত্য উদঘাটন করে দিচ্ছে।

(ঙ) পৃথিবীটা প্রাণীদের জন্য উপযোগী হলো কিভাবে?

আমাদের এ পৃথিবী সম্পর্কে বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করছে, তা একটু চিন্তা করে দেখা দরকার। মহাকাশে অবস্থান, সৌরজগতে সূর্য থেকে দূরত্ব, আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি অনেক ধরনের সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা থাকায়ই এ পৃথিবীতে প্রাণীদের বসবাস সম্ভব হয়েছে।

আমাদের পৃথিবীটা যদি সূর্য থেকে বেশী দূরত্বে অবস্থান করতো তবে অবশ্যই এর তাপমাত্রা বেশী হীম-শীতল থাকতো। অন্যদিকে বেশী কাছে হলেও তাপমাত্রা হতো অনেকগুণ বেশী। প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য সঠিক তাপমাত্রা ও আলো থাকাটা জরুরী। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মহাকাশে ঠিক সঠিক স্থানে এ পৃথিবীকে ঝুলন্ত রেখে প্রাণীদের জন্য উপযোগী করেছেন। এটা তাঁর রব্বুবিয়তের আওতাভূক্ত একটি পদ্ধতি।

পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির ফলে দিবা-রাত্র এবং বিভিন্ন মৌসুমের উৎপত্তি হয়। এছাড়া আগেই বলেছি এ দুটি গতি না থাকলে পৃথিবীটা সূর্যের উপর পড়ে গিয়ে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। সূর্যের মহাকর্ষ একে টেনে তার উপর নিয়ে ফেলে দিতো।

পৃথিবীতে যাকিছু জড়বস্তু আছে, তা একটি বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারে, এমন পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। পৃথিবী যদি চন্দ্রের মতো ছোট হতো তবে বায়ুমণ্ডল থাকতো না। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে জড়ের স্বল্পতাহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণ মহাকর্ষ থাকতো না। চন্দ্রের মহাকর্ষ পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম হওয়ায় (৬ ভাগের এক ভাগ) এটিতে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। আর বায়ুমণ্ডল না থাকলে কোন প্রাণী বাঁচতে

পারে না। জীবনের জরুরী পদার্থ হচ্ছে অক্সিজেন। এ গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলেই অবস্থান করে এবং আমরা তা শ্বাসগ্রহণ করি। বায়ুমণ্ডল অবশ্যই শুধু অক্সিজেনের যোগান দেয় না, ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে আয়োনোস্ফেয়ার নামে একটি স্তর আছে। এ স্তরটি সূর্য থেকে আগত মারাত্মক আলট্রাভাইলোট রেডিয়েশনকে আটকে রাখে। এ রেডিয়েশন ভূগোলকের উপরিভাগে যদি আস্তো তবে প্রাণীরা বাঁচতে পারতো না। বায়ুমণ্ডল আরোও অনেক উপকার করে থাকে। যেমন: পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলের নানাবিধ প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়।

মোটকথা মহাকাশে পৃথিবীর অবস্থান, গতি, এর মধ্যে জড়বস্তুর মাত্রা প্রভৃতি সবকিছুই আল্লাহর পালনকারিতার আওতাভূক্ত। এগুলো তিনি যথাযথ করেছেন। আমারেদকে পালন করতে তাঁর অনুগ্রহের কোন সীমা নেই। পাঠকরা একটু ভেবে দেখুন।

(চ) আমাদের উপকারে একটি বৃক্ষের অবদান

আমরা সর্বদাই এ পৃথিবীর বুকে সর্বত্র বৃক্ষ-তরু-লতা দেখি। কিন্তু আমরা কি একবারও ভাবি যে এই বৃক্ষটি, বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে আমাদের কিসব উপকার করছে। সবুজ পল্লবীবিশিষ্ট প্রতিটি গাছই আমাদের জন্য অপূর্ব পদ্ধতিতে একটি জিনিস উৎপাদন করে যাচ্ছে। এ জিনিসটি হচ্ছে অক্সিজেন। আর জীবন ধারণের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের প্রয়োজনীতা যে কতটুকু তা বলার উপেক্ষা রাখে না।

এবার দেখা যাক কিভাবে একটি বৃক্ষ, এ অক্সিজেন উৎপাদন করে।

যে সুনিপুণ পদ্ধতিতে সবুজ বৃক্ষরাজি অক্সিজেন উৎপাদন করে, তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ফটোসিনথেসিস বলে। এটা একটি বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করেই যাবতীয় প্রাণীজগত জীবনরক্ষা করে। ফটোসিনথেটিক প্রক্রিয়াকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো (১) সূর্যালোক শোষণের পর্যায়, যাকে আলোক প্রতিক্রিয়া বলা হয় ও (২) কার্বন (একটি পদার্থ) স্থিরীকরণ পর্যায়, যাকে কৃষ্ণ প্রতিক্রিয়া (কার্বনের রং কালো তাই) বলা হয়।

আলোক প্রতিক্রিয়াঃ সূর্য থেকে আগত অংশুজাল সবুজ পাতার রঙ্গিন কোষগুলো (ক্লোরোফিলস) গ্রহণ করে স্থিরীকৃত করে। অর্থাৎ সূর্যের এনার্জি আটকে রাখে। এর ফলে পাতার মধ্যে সামান্যতম বৈদ্যুতিক কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং এ থেকে এনার্জি (সূর্য থেকে আলোর সাথে আগত) পরিবর্তিত হয়ে দুটি কেমিক্যালে রূপান্তরিত হয়। এগুলোর নাম হচ্ছে এটিপি ও এনএডিপিএইচ। এ কেমিক্যালগুলো আসলে কি তা এখানে বলার প্রয়োজন নেই। তবে এ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণীদের উপযোগী অক্সিজেন কিভাবে উৎপাদিত হয় সেটিই এ প্রসঙ্গে মুখ্য।

কৃষ্ণ প্রতিক্রিয়াঃ এ প্রতিক্রিয়ার ফলে এটিপি ও এনএডিপিএইচ-তে যে এনার্জি বা উদ্যম সংগ্রহিত হয়েছে, তা ভেঙ্গে অর্গানিক বা জৈবিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত অক্সিজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রিলিজ হয়। এর ফলে আকাশে-বাতাসে অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত থাকে এবং এ গ্রহে প্রাণীদের বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে। অন্যথায় আমাদের দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে অক্সিজেন শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে নেওয়ার ফলে অচিরেই তা শেষ হয়ে যেতো। কারণ আমরা নিঃশ্বাসের সময় অক্সিজেন বের করি না। অক্সিজেন দেহের প্রতিটি অংশে সরবারাহ হয় রক্তের মাধ্যমে। যে বাতাস নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসে তা হলো কার্বন ডাইয়োক্সাইড গ্যাস ও পানি। মূলতঃ শ্বাস ও নিঃশ্বাসের মধ্যে একটা কেমিক্যাল রিয়েকশন হয়। এতে আমরা শ্বাস নেওয়ার সময় বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন এবং অর্গানিক পদার্থ গ্রহণ করি এবং নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইয়োক্সাইড ও পানি বের করি। অন্যদিকে ফটোসিনথেসিস রিয়েকশনের সময় কার্বন ডাইয়োক্সাইড এবং পানি থেকে অর্গানিক পদার্থ ও অক্সিজেন উৎপাদিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। সুতারাং ফটোসিনথেসিস আসলে শ্বাস-নিঃশ্বাসের বিপরিত একটি প্রসেস।

আল্লাহর কী অপূর্ব মহিমা যে, বৃক্ষ-তরু-লতা দ্বারা আমাদেরকে জীবিত রাখছেন। আসলে আল্লাহ পাক এ জগতের প্রতিটি বস্তুই কোন না কোন উপকার বা উদ্দেশ্যহেতু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে হাকীমে বলেন:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

অর্থাৎ "মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের কোন কিছুই বেহুদা সৃষ্টি করি নি। কিয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন" [সূরা হিজ্বর (১৫):৮৫]।

মূলত এ জগতের প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর পালনকারিতার গুণাবলীরই প্রকাশ।

(ছ) সমগ্র বিশ্বজগত মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, তার অর্থ কি?

ইতোমধ্যে যাকিছু বলা হয়েছে, তা থেকে পাঠকরা নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, এ জগতের সবকিছুই কোন না কোন বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্ট। স্বভাবের প্রতিটি বস্তুই উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি হয় নি। আর প্রতিটি প্রক্রিয়া ও ঘটনাও বিনা কারণে সংঘটিত হয় না।

বিজ্ঞান আজ আমাদেরকে মানুষের জীবন রক্ষার্থে সূর্য ও পৃথিবীর অনেককিছু যে অপরিহার্য তা দেখিয়ে দিচ্ছে। সূর্যের আলো ও তাপ, মহাকাশে এর অবস্থান, এর আয়তন ও জ্বলন্ত থাকার ক্ষমতা প্রভৃতি মানুষের জন্য শুধু উপকারী নয়, একান্ত জরুরীও বটে। এ পৃথিবীতেও আরো অনেক ধরনের সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা আছে যার ফলে মানুষসহ যাবতীয় প্রাণীজগতের জন্য এর উপর বেঁচে থাকাটা সম্ভবপর হচ্ছে। কতো ধরনের উত্তম ব্যবস্থা যে এই পৃথিবীর উপর মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছে তা লিখে কখনো শেষ করা যাবে না। আর এ কথাটি আমার নিজের নয়, এটা বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানই এসব তথ্য আবিষ্কার করছে।

সৌরজগত ও পৃথিবীটা আমাদের ধারে-কাছের বস্তু। এটা সুস্পষ্ট যে, মানুষের সেবায় সৌরজগতের সবকিছুই নিয়োজিত আছে। তাহলে প্রশ্ন আস্তে পারে, সূর্য ও পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহগুলো কিভাবে মানুষের উপকার করে?

উপকার অবশ্যই করে। শুধু এই সৌরজগতই নয় সমগ্র বিশ্বজগতই মানুষের উপকার করে যাচ্ছে। সৌরজগতের ভেতরের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহগুলো কিভাবে আমাদের উপকারে আসছে তার একটিমাত্র প্রমাণ দিচ্ছি।

আমাদের পৃথিবীঃ সবদিকে সুবিধাসম্পন্ন সৌরজগরে একমাত্র গ্রহ পৃথিবী।

এটা বিজ্ঞানসম্মত উক্তি যে, সৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা ও এগুলোর সমন্বিত ওজন বা জড়ের মাত্রা স্বল্প বা বেশী হলে পৃথিবীর অবস্থান (সূর্য থেকে

দূরত্ব) অন্যত্র হয়ে যেত। কারণ এটা মনে রাখতে হবে যে, সৌরজগতে শুধু সূর্যের মহাকর্ষই বিদ্যমান নয়। এসাথে গ্রহগুলোর মধ্যেও একে অন্যের উপর মহাকর্ষের প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছে। সমগ্র সৌরমণ্ডল মিলেই একটা ব্যালান্স তৈরী হয়েছে। এ ব্যালান্স না থাকলে সবকিছু লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেত।

আমি সমগ্র বিশ্বজগতই মানুষের উপকারে জড়িত এজন্যই বলেছি যে, মহাকাশের কোথায় কতদূরে তারাগুলো অবস্থান করে, তার উপর নির্ভর করে আমাদের এ সৌরজগতও ব্যালান্স সৃষ্টি করে ঘুর্ণমান আছে। সূর্যটা আসলে মহাকাশের এক বিরাট তারকাজগতের একটি তারা। এ তারাজগতে অন্তত ১০০ বিলিয়ন তারার বাসস্থান। এগুলো তারাজগতের কেন্দ্রের (গ্যালাক্সির) উপর নির্ভর করে ঘুর্ণমান অবস্থায় আছে। এখানে সেই মহাকর্ষই কাজ করছে। জগতে আরোও এরূপ শতকোটি গ্যালাক্সি বা তারাজগত আছে। এ সবগুলোই একে অন্যের উপর ভিত্তি করে ঘুরছে। সুতরাং সমগ্র জগতটা নিয়েই একটি সম্পূর্ণ রব্বুবিয়ত বা পালনকারিতা ক্রিয়াশীল আছে। পুরো বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট হয়েছে এক অপূর্ব ব্যালান্স। এর হেরফের হলেই কিন্তু মহাদুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।
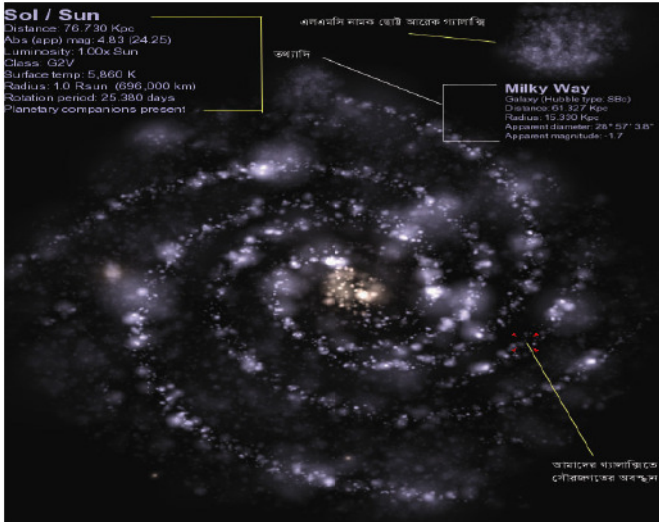
ছায়াপথে সৌরজগৎ: আমাদের সৌরজগৎ 'মিল্কিওয়ে' নামক বিরাট গ্যালাক্সির একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রে সূর্যের অবস্থান দেখা যাচ্ছে। গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে সঠিক দূরত্বে থাকার ফলেই এটি স্থিতিশীল ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী হয়েছে।

এ পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান সমগ্র জগতের এই সুবিন্যস্ত আয়োজনের উপরই নির্ভরশীল। আশাকরি পাঠকরা এবার সবকিছু যে মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, এর মর্ম কিছুটা অনুধাবন করতে পারছেন। আল্লাহর পবিত্র দরবারে আমাদেরকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে কী শেষ করা যাবে? আমাদের জন্য এতো আয়োজন! এ জন্যেই আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

অর্থাৎ "বল, সমুদ্র যদি কালি হয় তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাবাদ লেখার জন্য তবে তা লেখার আগেই সে সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, অনুরূপ আরেক সমুদ্র সাহায্যার্থে আনলেও।" [সূরা কাহফ (১৮):১০৯]

(জ) আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ উন্মোচনে সর্বাপেক্ষা কাছের জিনিস হচ্ছে মানবদেহ

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে পাঠকরা বস্তু বা জড়জগতে আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। কিন্তু রব্ব গুণের বিকাশ শুধুমাত্র জড়জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশে মানবদেহে সর্বাপেক্ষা অপূর্ব সৃষ্টিক্ষমতা বিকাশ করেছেন। মানুষ যদি তার নিজের দেহমন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তবে সে অবশ্যই রব্বুবিয়তের আসল স্বরূপ অনুধাবন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও আজকের বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করতে পারে। বিজ্ঞান মায়ের গর্ভে

একটি শিশুর গর্ভধারণ মুহূর্ত থেকে জন্ম পর্যন্ত যেসব তথ্য আবিষ্কার করেছে তা আমাদের অবাক করে বৈকি।

নারীর গর্ভাশয়ে একটি ডিম্বকোষে একটি মাত্র শুক্র প্রবেশ করে একজন নতুন মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায়। অথচ একক কোন শুক্রকে মানুষ নগ্নচোখে দেখতেই পায় না। এই ডিম্বকোষ ও শুক্রের ভেতর কিসব গুপ্ত জৈবিক পদার্থ আছে, যা থেকে আস্ত একটি মানবদেহ সৃষ্টি হয়ে যায়? শুধু তাই নয়, এ দুটোর মিলনে যে ভ্রূণটি অস্তিত্বে আসে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রং, রূপ, আকার, প্রভৃতি সবকিছুই ঐ দু'টি ক্ষুদ্রকায় জৈবিক পদার্থের মধ্যে লুকানো থাকে।

পাঠকরা এবার আসুন, মায়ের গর্ভে একটি শিশুর প্রতিপালন কিভাবে মহান রাব্বুল আলামীন করেন, তা বিজ্ঞানের ভাষায় তলিয়ে দেখি। লক্ষ করুন, প্রভুর রব্বুবিয়তের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক বিকাশ কিভাবে ঘটে। এখানে আমি দ্বিতীয় পর্বে বর্ণিত মানবদেহের স্বরূপ পুনরুল্লেখ করছি। তবে এখন আশাকরি পাঠকরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ অংশটি পড়বেন।

(১) ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA): মা-বাবা থেকে শিশুর দেহের যাবতীয় তথ্যের সূত্র

প্রাণীজগত কোষ বা সেল দ্বারা সৃষ্ট। আমাদের দেহটির মধ্যে অসংখ্য সেল আছে। এই সেলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অংশ আছে। প্রতিটি সেলকে মেমব্রেন নামে একপ্রকার পদার্থ ঘিরে রাখে। বৃক্ষ-তরু-লতার সেলের চতুর্দিকে আরো একটি আলাদা শক্ত মেমব্রেন থাকে। এটাকে দেওয়াল বলা যায়। তবে মানুষের সেলের এই দেওয়াল তেমন শক্ত নয়।

মেমব্রেন এর ভেতর আছে সাইটোপ্লাজম নামক একপ্রকার জৈবিক পদার্থ। প্রতিটি সেলের একটি কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আছে। এটির সাথে বাইরের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা হয় পোর্স বা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা। সেলের কেন্দ্রেই অবস্থান

করে এক বা একাধিক মৌলিক জৈবিক এসিড। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ডিএনএ (ডিওক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড) আর অপর আকেরটি হলো আরএনএ (রিবোনিউক্লিক এসিড)।
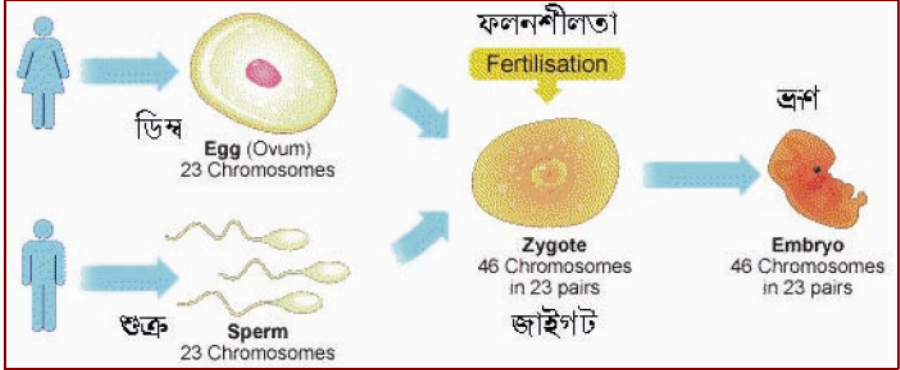
ডিএনএ এর মধ্যে ক্রমোজাম নামক দুটি বস্তু আছে। এর একটি হলো এক্স-ক্রমোজাম আর অপরটি ওয়াই-ক্রমোজাম। প্রতিটি নবজাতকের যাবতীয় সৃষ্টি-কৌশল এই ডিএনএর মধ্যে কোড করা আছে। অন্যদিকে আরএনএ এর কাজ হলো প্রোটিন সিনথেসিস বা প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা। ডিএনএ এর মধ্যে কোড দেওয়া আছে নতুন শিশুর চুল, চামড়ার রং কিরূপ হবে, নাক চাপা না খাড়া হবে, চোখ বড় না ছোট হবে প্রভৃতি দেহের প্রতিটি অংশের অবস্থান ও গঠনপ্রণালী এই ডিএনএ-তে কোড করা আছে। মূলতঃ ডিএনএ-কে মানবদেহ তৈরীর ব্লু-প্রিন্ট বলা যায়। এখানে অংকিত আছে সবকিছু। ডিএনএ থেকে নির্দেশ যায় দেহের কোথায় কি এবং কোন ধরনের অংগ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হবে। এবার দেখা যাক একটিমাত্র ক্ষুদ্র শুক্র ও ডিম্বাণূ থেকে কিভাবে আস্ত একটি মানুষের সৃষ্টি হয়।

গর্ভাশয়ে ভ্রূণের জন্ম মুহূর্ত থেকে নতুন সৃষ্ট একটি শিশু বেড়ে ওঠার বর্ণনা

মায়ের উদরে কিভাবে একটি শিশু পালিত হয় তা জানার বিজ্ঞানকে ভ্রূণবিদ্যা বা এ্যম্ব্রিয়োলজী বলে। এ প্রসঙ্গে এই জ্ঞানের শাখার উপর অত্যল্প আলোকপাত করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মায়ের উদরে কিভাবে পালন করলেন, তার একটি স্বরূপ বিজ্ঞানের ভাষায় তুলে ধরাই আমার কাম্য। সুতরাং কোন টেকনিক্যাল গবেষণায় না গিয়ে সরল ভাষায় ভ্রূণবিদ্যার উপর কিছুটা তথ্য আমি তুলে ধরছি মাত্র।

নারীদের গর্ভাশয়ে ফেলোপিয়ান টিউব নামে একটি অংশ আছে। এ টিউবে একটি বিশেষ স্থানে ডিম্বাণূ বা ওভিউম অপেক্ষা করতে থাকে। নারী-পুরুষের মিলনের ফলে পুরুষের শুক্রগুলো দ্রুত সেই অপেক্ষারত ডিম্বটির দিকে অগ্রসর হয়। অনেকের মতে ডিম্বের মধ্যে একধরনের কেমিক্যাল আছে যা এই শুক্রকে টেনে তার দিকে নিয়ে যায়। প্রতিটি শুক্রের আকার হচ্ছে ঠিক বেঙ্গাচির মতো। এদের একটি গোলাকার মাথা ও একটি লম্বা লেজ আছে। এগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে সাঁতার কেটে ডিম্বকোষের দিকে অগ্রসর হয়। ডিম্বের আয়তন শুক্র থেকে অনেকগুণ বড়। শুক্রগুলো ডিম্বের চতুর্দিকে একত্রে ভেতরে ঢুকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তবে একটিমাত্র ডিম্ব [সময় সময় দু'টি বা ততোধিক] ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই ডিম্বের মধ্য থেকে একটি সিগনাল এসে আর ভেতরে ঢুকার সম্ভাবনাকে রহিত করে দেয়। বাস্তবে এ সিগনালটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মস্তিষ্ক।

এই ভেতরে ঢুকার মুহূর্তই হচ্ছে **ফারটিলাইজ** হওয়া বা **গর্ভধারণ** করা। এ মুহূর্তের তিনদিন পরেই ডিমটি ইউটেরাস বা আসল গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। এর পরই ডিমের কেন্দ্রে ভ্রূণটি বাড়তে শুরু করে। অন্যদিকে ডিমের অন্যান্য অংশ থেকে প্লাসেন্টা বা নাভী সংযুক্তি সৃষ্টি হয়। এই প্লাসেন্টার মাধ্যমে নবজাতকের খাবার ও বর্জ্য পদার্থ মায়ের দেহের মাধ্যমে চলাফেরা করে।

ভ্রূণটি যাতে সহজে এবং নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারে এজন্য তার চতুর্দিকে মাত্র ৭ দিনের মধ্যেই একধরনের পানীয় দ্রব্য তৈরী হয়। এ তরল পিচ্ছিল পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ভ্রূণটি ভাসতে থাকে। মায়ের ছোটাছুটি ও নড়াচড়ায় যাতে ভ্রূণটির দৈহিক কোন ক্ষতি না নয়, এ নিশ্চয়তা দেয় এই পানীয়টুকু। এ পানীয়কে বিজ্ঞানের ভাষায় এ্যামনিয়োটিক ফ্লোইড বলে। ক্রমাগত বেড়ে ওঠা এই ভ্রূণের ভেতর সেলগুলো সর্বদাই বিভক্ত হতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত কয়েকদিনের মধ্যেই তিনটি আলাদা অংশে বিভক্ত হয়ে উন্নতি হতে থাকে। এ তিনটি অংশ থেকেই আস্ত মানবদেহ সৃষ্টি হয়। এ্যাক্সোডার্ম, মেসোডার্ম ও এ্যান্ডোডার্ম হচ্ছে এসব অংশের বৈজ্ঞানিক নাম। এ্যাক্সোডার্ম থেকে চামড়া, চুল, নখ, দাঁত প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। এটা নার্ভাস সিস্টেমকেও সৃষ্টি করে। মেরুদণ্ডের ভেতরের কোর্ড এবং মস্তিষ্কও এই অংশের দ্বারা তৈরী হয়। মেসোডার্মের মাধ্যমে মানবদেহের হাড্ডিগুলো এবং মাসুল বা পেশী তৈরী হয়। এছাড়া হৃদযন্ত্র, ছোটবড় ধমনী, কিডনী, ব্লাডার ও যৌনাঙ্গ এ অংশ থেকে সৃষ্টি হয়। মেসোডার্ম থেকে সৃষ্ট হৃদযন্ত্রটি মাত্র ২৪ দিনের মধ্যেই কম্পন বা বিট দেওয়া শুরু করে।

এ্যান্ডোডার্ম দ্বারা ডাইজেষ্টিভ টিউব বা আঁত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সিস্টেমের ভেতরের লাইনিং তৈরী হয়। প্রায় দশমাস মায়ের গর্ভে ভ্রূণটি এভাবে বড় হতে থাকে এবং অবশেষে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেঁচে থাকা ও আরোও দেড়যুগ যাবৎ বেড়ে ওঠার যাবতীয় উপায়-উপাদানসহ জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে অতি সংক্ষেপে মায়ের গর্ভে শিশুর জীবনবৃত্তান্ত। কোন উপাদান থেকে নবজাতক ছেলে না মেয়ে হিসেবে সৃষ্ট হয়, তা এবার একটু গবেষণা করে দেখা যাক।

মায়ের গর্ভের শিশু ছেলে না মেয়ে হবে তা একমাত্র পিতার উপর নির্ভরশীল

পুরুষের প্রতিটি শুক্র বা স্পার্ম দুটি অবস্থার একটি হয়ে থাকে। আগেই বলেছি ডিএনএ-এর মধ্যে ক্রমোজাম আছে। এর একটি হচ্ছে এক্স আর অপরটি ওয়াই ক্রমোজাম (এক্স বা ওয়াই নামগুলো ভিন্নতা বুঝাতে ব্যবহার করা হয় মাত্র)। পুরুষের শুক্রে থাকে এক্স এবং ওয়াই উভয় ক্রমোজাম। অন্যদিকে মহিলাদের

ডিম্বে আছে শুধুমাত্র এক্স ক্রমোজাম। আর ডিমের মধ্যে এই একক এক্স ক্রমোজাম সম্পূর্ণ অকেজো। তাই পুরুষের দুটি (এক্স এবং ওয়াই) ক্রমোজামের মধ্যে একটি মাত্র প্রয়োজন যা থেকে ডিমের মধ্যে একটি জোড়ার সৃষ্টি হয়। এই জোড়া হয় এক্স-এক্স না হয় এক্স-ওয়াই হবে। লক্ষ করুন ওয়াই-ওয়াই হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ নারীর ডিমের মধ্যে ওয়াই ক্রমোজাম অনুপস্থিত। এক্স-এক্স হলে শিশুটি মেয়ে হবে আর এক্স-ওয়াই হলে শিশুটি ছেলে হবে। এখানে লক্ষ করুন, যেহেতু নারীর ডিমের মধ্যে শুধুমাত্র এক্স আছে তাই নতুন শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে, তা নিশ্চিত করার কোন ক্ষমতা নারীদের নেই। কিন্তু পুরুষের এক্স এবং ওয়াই উভয়টি থাকায় নারীর এক্স এর সাথে উভয় জোড়া সৃষ্টি করতে পারে (অর্থাৎ, নারীর এক্স এর সাথে এক্স ক্রমোজাম দিয়ে এক্স-এক্স জোড়া বা ওয়াই দিয়ে এক্স-ওয়াই জোড়া তৈরী করে)। সুতরাং, নবজাতক শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে সেটা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপরই নির্ভরশীল।

মানুষের ২৩ জোড়া ক্রমোজাম: লক্ষ্য করুন, শেষোক্ত (২৩ নং) ক্রমোজামের নীচে ইংরেজী 'X' ও 'Y' অক্ষর দেওয়া আছে। এ দু'টিই মানুষের 'যৌন ক্রমোজাম'। পুরুষের কাছ থেকে কোনটি আসলো তা-ই নিধারণ করে শিশু ছেলে না মেয়ে হবে। কারণ মহিলাদের আছে শুধুমাত্র 'X' ক্রমোজাম।
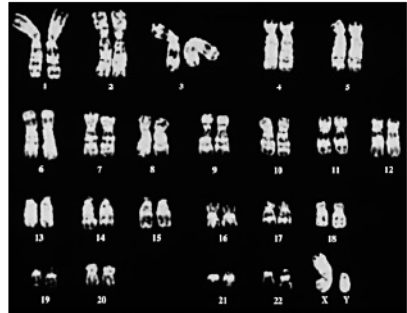
নতুন শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে সে ক্ষমতা একমাত্র পুরুষের মধ্যে আল্লাহ দান করেছেন। এটাও আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের একটি পদ্ধতি। অথচ বহুকাল ধরে অজ্ঞতাহেতু পুরুষরা শুধু মেয়ে (বা ছেলে) জন্ম হওয়ায় নারীদেরকে দোষারোপ করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে কোন দোষ থেকে থাকলে, তা তো তার নিজেরই!

ভ্রূণবিদ্যার উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত তথ্যানুসন্ধানের এখানেই শেষ। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ের উপর একাধিক আয়াত নাজিল করেছেন। নিম্নে এর একটি উদ্ধৃত করছি। আল্লাহ জাল্লে জালালাহু ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

-"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (ডিম্ব ও শুক্রকোষ) থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু (ফলনশীল ডিম্বকোষ) রূপে এক সংরক্ষিত আঁধারে (ফেলোপিয়ান টিউবে) স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে (জাইগোট) সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি (ভ্রূণ), এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় (পূর্ণ শিশুতে রূপান্তর) করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।" [মু'মিনূন (২৩):১২-১৪]

মায়ের গর্ভে শিশু ছেলে না মেয়ে হবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিলে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে। ইরশাদ হয়েছে:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى

-"এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল- পুরুষ ও নারী। একবিন্দু **বীর্য** থেকে যখন স্খলিত করা হয়।" [নাজম (৫৩):৪৫-৪৬]

এখানে লক্ষণীয় যে, নারী ও পুরুষ তাঁর নির্দেশেই সৃষ্টি হয়- এ ঘোষণা দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করছেন: যা থেকে নারী কিংবা পুরুষ হওয়ার সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় তাহলো পুরুষের **বীর্য**। আজকের বিজ্ঞান ঠিক এ কথাটিই বলছে: ছেলে বা মেয়ে হওয়া একমাত্র পুরুষের বীর্যের উপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ বীর্যের মধ্যে এক্স না ওয়াই ক্রমোজাম আছে- তা-ই নির্দিষ্ট করে নবজাতক শিশুটি মেয়ে না ছেলে হবে।

বাহ্যিক জ্ঞান আহরণের উপায় পঞ্চেন্দ্রিয়

আল্লাহ পাক একটি মানুষকে সৃষ্টি করে এর দেহে অনেকধরনের ভিন্ন বস্তু ও অংশ সৃষ্টি করেছেন। এর সবগুলো মিলেই একটি পূর্ণ মানবদেহ জ্যান্ত থাকে এবং জীবনভর বিভিন্ন ফাংশন করে থাকে।

মানবদেহের প্রতিটি অংশই এক বা একাধিক কার্যে নিয়োজিত আছে। হৃদযন্ত্র দেহের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করে, ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ নিশ্চিত করে এবং রক্তের মধ্যে অক্সিজেন সাপ্লাই দেয়। পকস্থলী খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাক করার পর উপকারী দ্রব্যাদি দেহে রেখে বর্জ্য পদার্থ ভাওয়েলে নিক্ষিপ্ত করে। মাথার খুলিতে রক্ষিত মোটা ব্রেনটি দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া কন্ট্রোল করে। এটা একটা মেমরী ষ্টোরেজ ও চিন্তার বস্তুও বটে। এছাড়া মানবদেহে আরোও কত কিছু বিদ্যমান, তার ইয়ত্তা নেই। ব্লাডার, কিডনী, লিভার প্রভৃতি যন্ত্রাংশও নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত আছে।

আল্লাহ পাক মানুষের সাথে বাইর জগতের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে ও এ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করেছেন। এগুলো হলো, চোখ (দৃষ্টি), কর্ণ (শ্রবণ), নাক (গন্ধ), জিহ্বা (স্বাদ) ও ত্বক (ছোঁয়া)।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলী সম্পর্কে সবারই জানা আছে। তবে এগুলো আমরা অহরহ ব্যবহার করে কিভাবে জগতে বিচরণ করছি তা কি গভীরভাবে একবার ভেবে দেখেছি? এখানে আল্লাহর রব্বুবিয়তের কী অপূর্ব কৌশল কাজ করছে তা কি আমরা চিন্তা করি?

পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষকে আল্লাহ পাক আরোও কয়েকটি ইন্দ্রিয় দান করেছেন। যেমন: বুদ্ধি, অনুভূতি, চিন্তা, চেতনা ও দিব্যদৃষ্টি। এবার সবগুলো

ইন্দ্রিয় সম্পর্কে একে একে আলোচনা করে দেখা যাক। এ আলোচনা থেকে পাঠকরা সহজেই আল্লাহর রব্বুবিয়তের আওতায় কী অপূর্ব কৌশল ক্রিয়াশীল আছে তা অনুধাবন করতে পারবেন।

(১) চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তি: মানুষের চোখ একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে চক্ষুকে একটি ক্যামেরার সাথে তুলনা করা যায়। ঠিক ক্যামেরার মতো বস্তু থেকে আগত আলো একটি লেন্সের ভেতর দিয়ে রেটিনা বা অক্ষিপটে (ক্যামেরার ক্ষেত্রে ফিল্মে) পতিত হয়ে বস্তুর একটি ছবি অংকিত হয়। এ ছবিটি পরে ব্রেনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে। তবে ঠিক সাধারণ ছবির মতো হয়ে যায় না। এই আলো-আঁধারের খেলা থেকে মস্তিষ্ক কিভাবে দেখে তা বিজ্ঞান এখনো পরিষ্কার করে বলতে সক্ষম হয় নি। আমাদের চোখগুলো আসলে দেখে না, দেখে আমাদের ব্রেন। চোখের কাজ হলো বাইর জগতের আলো-আঁধার ব্রেনে নিয়ে পৌঁছানো। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্রেন গবেষণা বা এ্যানালাইজ করে বোধশক্তিসম্পন্ন জিনিস হিসেবে দেখে। এ কঠিন কাজটি ঠিক কিভাবে মস্তিষ্ক সম্পন্ন করে তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি।

আল্লাহর কী অপূর্ব মহিমা এখানে কাজ করে তা বলে শেষ করার নয়। আমাদের ব্রেন শত শত ভিন্ন ধরন ও গঠনের বস্তু দেখতে পারে ও আলাদা করতে জানে। আল্লাহর পালনকারিতার কী অপূর্ব নিদর্শন এখানে লুকিয়ে আছে, তা-কি আমরা চিন্তা করেছি?

(২) নাক (গন্ধশক্তি) : নাকের সাহায্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদিত হয়। এর একটি হচ্ছে শ্বাস-নিঃশ্বাস আর অপরটি হলো গন্ধ অনুধাবন করার শক্তি। নাক থেকেও কিছু তথ্য ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে এবং ব্রেন গন্ধের অনুভূতি দান করে। নাকের গভীরে ওলফেক্টরী নামক একটি অংশ আছে। এখানে কিছু গন্ধ অনুধাবন করার সেল বা কোষ আছে। বাতাসের সাথে বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন কেমিক্যাল ও এদের আলাদা গন্ধ নাকের ভেতরে গিয়ে এই কোষগুলোতে প্রতিক্রিয়া করে। ওলফেক্টরী সেলে পতিত কেমিক্যাল তথ্য শেষ পর্যন্ত নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে।

ব্রেন এসব তথ্য থেকে বিভিন্ন গন্ধ অনুধাবন করে। এভাবে আমরা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসের অর্থ কি বুঝতে পারি। এ ক্ষেত্রে ঠিক কিভাবে আমরা গন্ধ অনুধাবন করি তা বিজ্ঞান বের করতে সক্ষম হয় নি। এর একটা বিশেষ কারণ হলো, মানুষের মধ্যে ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিক্ষমতা এবং চেতনা আছে। সর্বোপরি আত্মা নামক একটি অজড় জিনিসের নিবাস মানুষের মধ্যে। ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলির (চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বার) মাধ্যমে আগত তথ্যসমূহ ব্রেন বুঝতে পারে, কিন্তু কে বুঝে? এ প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান জানে না। এটা ফিলোসফি ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার। তবে এক্ষেত্রে এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, মানুষ একটি যন্ত্র নয়। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট রহস্যের জগত। বিজ্ঞান সৃষ্ট বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে। মানব দেহটিও একটি সৃষ্ট বস্তু, কিন্তু এটির সাথে জড়িত আছে অতিন্দ্রিয় জতগের সংযোজন, যা বিজ্ঞানের গণ্ডিসীমার বাইরে অবস্থান করে। মানবদেহের পরিচালন, এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েই বিজ্ঞানের গবেষণা সীমিত।

আল্লাহ পাক '**সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম**' নামক এই মগজকে কী অপূর্ব কৌশলে সৃজন করেছেন! আমাদের এই ব্রেন একইসঙ্গে একটি সুপার-সুপার কম্পিউটার ও চিন্তাক্ষমতার অধিকারী জৈবিক উপাদান। এতে 'ইনপুট' হয় পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য তথ্যাদি যা প্রসেস করে সে তা 'ইন্টেলিজেন্ট' নামক আমাদের অনুভুতিতে পৌছে দেয়- যা থেকে আমাদের মনে জন্ম নেয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভাব বা সাড়া। এছাড়া চিন্তা ও আধ্যাত্মিক জগতের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদিও সে তার মেমরী সেলগুলোতে রাখতে ও প্রসেস করতে জানে।

(৩) জিহ্বা বা স্বাদঃ স্বাদ গ্রহণ করা ও বুঝার বস্তুটি হলো আমাদের জিহ্বা। জিহ্বা ও নাক একত্রে কাজ করে থাকে। এ দুটো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে খাবারের মধ্যে বিষাক্ত কিছু আছে কি না তা অনুধাবন করা যায়। এছাড়া সুস্বাদু মাজাদার খাবারের অনুভুতি আমাদেরকে আনন্দ দান করে।

জিহ্বার মধ্যে স্বাদ কি তা বুঝার মতো সেনসিটিভ (অনুধাবনযোগ্য) সেল আছে। কোন খাদ্যদ্রব্য জিহ্বায় পড়লেই এসব সেল লালার সাথে মিশে খাদ্যের স্বাদ অনুযায়ী বিভিন্ন নার্ভ সিগনাল ব্রেনে পাঠিয়ে দেয়। স্বাদ ও গন্ধ ব্রেনের যে অংশটুকু বুঝতে পারে তা ব্রেনের গোড়ায় অবস্থিত। জিহ্বার স্বাদ ও গন্ধ থেকে আমাদের অনুভূতি বা ইমোশনও উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানেও কি উপায়ে আমরা ব্রেন দিয়ে স্বাদ অনুভব করি বা আসলে কে তা করে, বিজ্ঞান ঠিকমতো বলতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত মানুষের চেতনা ও নিজস্ব পরিচিতি বলতে যা বুঝায়, এসব না থাকলে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন তথ্য অনুধাবন করতে পারতাম না।

(৪) কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয়ঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ও আরেকটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। বাতাসে ভ্রমণকারী শব্দ-তরঙ্গ কানে পৌঁছলে কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর ফলে শব্দ-তরঙ্গ নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। যদিও শব্দের উৎপত্তি ভাইব্রেশন বা কম্পন থেকে কিন্তু ব্রেন এটাকে শব্দ হিসেবে শোনে। ব্রেনের ভেতর এমন কিছু গুপ্ত রহস্য লুকিয়ে আছে যে, ত্বক বা ছোঁয়া ৫টা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিটি নার্ভ সিগনালকে (এক ধরনের ইলেকট্রিক তরঙ্গ) আলাদাভাবে বুঝতে পারে এবং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে জানে। মূলতঃ ব্রেনকে এজন্যেই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিষ্টেম বলা হয়। একমাত্র হৃদযন্ত্র ছাড়া আমাদের দেহের যাবতীয় ফাংশন বা কার্যকারিতা এই ব্রেনই নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা, শোনা, অনুভব করা, চিন্তা, চেতনা, স্বাদ, গন্ধ, হাত-পায়ের চলাচলসহ প্রতিটি দৈহিক ফাংশন একমাত্র ব্রেনই কন্ট্রোল করে থাকে। মানবদেহে আল্লাহর রব্বুবিয়ত প্রকাশের সর্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হচ্ছে এই মগজ।

কর্ণের কার্যকারিতা অনেকটা স্পিকারের মতো। কানের ভেতরে ইয়ার-ড্রাম নামে একটি অংশ আছে। এ ড্রামের মধ্যে বাতাস ভর্তি থাকে। বাইর থেকে আগত শব্দ-তরঙ্গ এই ড্রামের মধ্যে কম্পন শুরু করে। ড্রামের মধ্যে কিছু নার্ভ-সেল আছে যা ব্রেনের সাথে সংযুক্ত। আগত শব্দ ড্রাম থেকে এই নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে পৌঁছে এবং ব্রেন তা শব্দ হিসেবে আমাদের চেতনায় জানিয়ে দেয়। এভাবে আমরা জগতের সকল শব্দ শ্রবণ করে থাকি।

(৫) ত্বক বা ছোঁয়াঃ আমরা চোখ বন্ধ করে রাখলেও কেউ যদি আমাদের হাতে একটি ছোট বল দেয় তবে আমরা বলতে পারি এটা গোলাকার একটি বল। অনুরূপভাবে এটা যদি অন্য কোন আকারের বস্তু হয় তবে তা আমরা সহজে বুঝতে পারি বস্তুটির আকার কি। এই ছোঁয়ার মাধ্যমে জানাও আল্লাহর রব্বুবিয়তের একটি বিকাশ মাত্র। এটাকে টাচ বা ছোঁয়ার ইন্দ্রিয় বলে। ত্বক বা চামড়ার মধ্যে সর্বত্র এক ধরনের নার্ভ সেল অনুধাবনযোগ্য কোষ আছে। আমরা যখন কিছু স্পর্শ করি তখন এগুলোর মাধ্যমে অনেক সিগনাল আলোকের গতিতে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। ব্রেন তখন এসব সিগনালকে ব্যাখ্যা করে চেতনার মধ্যে অনুভূতি জাগায়। আমরা তখন বুঝতে পারি যে বস্তুটি স্পর্শ করেছি, তা কী হয় এবং এটা গরম না ঠাণ্ডা, লম্বা না বেটে, ভারী না হালকা, কঠিন না তরল প্রভৃতি।

এ হচ্ছে আমাদের দেহের পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এক্ষেত্রে আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

এ পাঁচটি বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ছাড়াও আরো একাধিক চেতনা সৃষ্টিকারী ইন্দ্রিয়সমূহ মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে। যেমন: ব্যথা, উষ্ণতা, ব্যালান্স, হাড্ডির জোড়ার অবস্থান, পেশী ও এতে সৃষ্ট চাপ এবং রক্তচাপ। এসব ক্ষেত্রেও ব্রেনে তথ্যসমূহ আসে (মস্তিষ্ক ইনফরমেশন পায়)। এখানে উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু তথ্য ব্রেনে পৌঁছলেও আমাদের চেতনা বা কনশিয়াসনেছ তা বুঝতে পারে না। যেমন রক্তচাপের ক্ষেত্রে ব্রেনে আগত তথ্য অনুযায়ী চাপের মধ্যে ব্যালান্স তৈরী করে স্বাভাবিক করা হয়। অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, দেহের মধ্যে কোন রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের মধ্যে এ্যান্টিবডি নামে কিছু সেল আছে (সাদা সেল), এগুলো এই ফরেন (বাইরের) জীবাণুগুলোকে আক্রমণ করে। এটাকে দেহের ইম্যিউন সিষ্টেম [রোগজীবাণূ নির্মূল করার ক্ষমতা বা রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা] বলে। তবে রোগজীবণূগুলো যে দেহে প্রবেশ করেছে এ তথ্য ব্রেনে নার্ভ সেলের মাধ্যমে পৌঁছার পরই সেখান থেকে আক্রমণের ওর্ডার আসে। এরূপ অসংখ্য তথ্যাবলী ব্রেন ও দেহের মধ্যে চলাচল করছে যার খবর আমাদের চেতনা মোটেই জানে না।

আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এসব আয়োজন করা হয়েছে। অথচ কী আশ্চর্যের ব্যাপার যে, অবিশ্বাসীরা এসব বিষয়বস্তু জেনেও আল্লাহ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। আর এ জন্যেই তো আল্লাহকে অস্বীকার করা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জঘন্য অপরাধ। যে আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্বদান করতে এতো কিছু করলেন, এতো আয়োজন করলেন আর সেই বিচরণশীল জ্যান্ত মানুষ তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করবে? আল্লাহ পাক তাই এদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

وَهُوَ الَّذِى أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِى يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ “তিনিই তোমাদের চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তকরণ (যাবতীয় ইন্দ্রিয়সমূহ) দান করেছেন; তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞ। তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের ছড়িয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। তিনিই জীবন (চেতনা, অনুভূতি, চলনশক্তি, প্রাণ, আত্মা) ও মৃত্যু ঘটান, তাঁরই হুকুমে রাত্র-দিনের বিবর্তন ঘটে (জগত পরিচালিত হয়); তবুও কি (তোমরা) বুঝবে না?” [সূরা মু’মিনূন (২৩):৭৮-৮০]

সুবহানাল্লাহ! এই পবিত্র আয়াতমালায় কী সুন্দর উপরে আলোচিত সবক’টি বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হয়েছে।

সক্রিয় একটি অপূর্ব পাম্প হৃদযন্ত্র

মানবদেহের প্রতিটি কোষে বা সেলে যে যন্ত্রটি রক্ত সরবরাহ করে সেটি হলো হৃদযন্ত্র। এ যন্ত্রের সাথে সমগ্র দেহের বিভিন্ন অংশের সরাসরি যোগাযোগ আছে। ধমনী, শিরা, উপশিরা প্রভৃতির মাধ্যমে এ যোগাযোগ রক্ষিত হয়।

মানবদেহের খাদ্যদ্রব্য হিসেবে আমরা সাধারণত তরল ও কঠিন পদার্থ গ্রহণ করে থাকি। তবে দেহের বিভিন্ন অংশ এবং সেলগুলো কিন্তু এ অবস্থায় খাদ্য থেকে উপকার গ্রহণ করতে অসমর্থ। আর আগেই বলেছি মানবদেহের প্রতিটি সেলই জ্যান্ত, সুতরাং তাদের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যকে যেসব অবস্থায় সেলগুলো গ্রহণ (ব্যবহার) করতে পারে তাহলো অক্সিজেন, কার্বন ডায়োক্সাইড, জৈবিক নিউট্রিয়েন্স প্রভৃতি।

যে সিস্টেমের মাধ্যমে এই খাদ্যগ্রহণ সম্ভব হয় সেটিই হচ্ছে মানবদেহের সার্কুলেটরী সিস্টেম (রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া)। এ সিস্টেমের কেন্দ্রীয় যন্ত্রটির নামই হচ্ছে হৃদযন্ত্র বা হার্ট। হার্টের ভেতর চারটি চেম্বার (কামরা) আছে। এগুলো হলো ডান ও বাম এ্যাট্রিরাম। এ দুটি চেম্বার দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ফিরে-আসা রক্তকে গ্রহণ করে, বাকী আরো দুটি চেম্বার আছে যেগুলোকে ডান ও বাম ভেনট্রিকোল বলে। ভেনট্রিকোলগুলোর মাধ্যমে রক্ত দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। আর্টারী বা ধমনী হচ্ছে রক্ত-ভেস্যাল, যার মাধ্যমে রক্ত হার্ট থেকে বেরিয়ে যায়। অপরদিকে শিরা বা ভেইন রক্তকে হার্টে নিয়ে আসে।
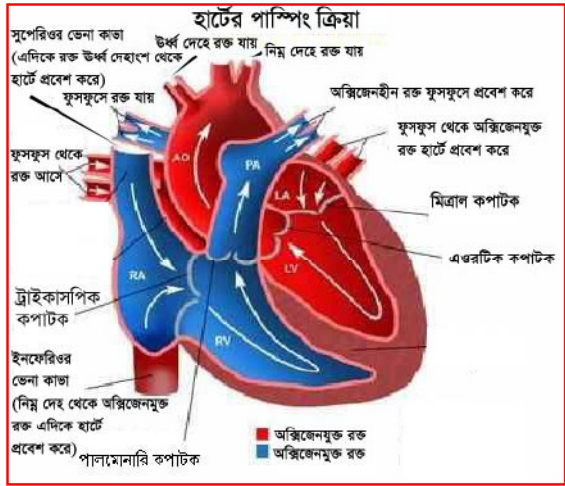
আর্টারী ও শিরার সাথে অসংখ্য ছোট ছোট উপশিরা বা ক্যাপিলারী সংযুক্ত আছে। এই ক্যাপিলারীর দেওয়াল থেকেই সেলগুলো রক্ত (রক্তে উপস্থিত খাদ্য) গ্রহণ করে এবং বর্জ্য (অনুপকারী বস্তু) ফিরিয়ে দেয়। এসব কার্য সম্পাদিত হয় হৃদযন্ত্রের পাম্প বা চাপ থেকে, যা একটি মানুষ যতোদিন বেঁচে থাকে ততোদিন পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, হৃদযন্ত্র কিভাবে কাজ

করে- কিন্তু এর পেশীগুলো যে অনবরত নিয়মমাফিক পাম্প করে যাচ্ছে তার সঠিক কারণ কি বলতে পারছেন না। দেহের প্রতিটি যন্ত্র ও অংশকে মস্তিষ্ক কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু হার্টকে পারে না।

আল্লাহর অপরিসীম করুণা যে, এই হৃদযন্ত্রকে অজানা শক্তি (অবশ্য তাঁর অজানা নয়) দিয়ে তিনি সক্রিয় রাখছেন। এসাথে দেহের প্রতিটি অংশকে জ্যান্ত রাখছেন, মূলতঃ প্রতিটি মানুষকেই জীবিত রাখছেন। আল্লাহর পালনকারিতার অপূর্ব আরেক নিদর্শন এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ যদি একটু চিন্তা করে তবে সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে।

আরবীতে হৃদযন্ত্রকে 'ক্বলব' (قلب) বলে। এই ক্বলব 'অন্তকরণ', 'অনুধাবনের স্থান', 'আধ্যাত্মিক কেন্দ্র' ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ক্বলবের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। একটি সহীহ হাদীসে আছে:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

-"নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এক টুকরো মাংস আছে, যখন এটি ঠিক হবে সমস্ত দেহটিই ঠিক হয়ে যাবে। আর এই মাংসখণ্ড খারাপ হয়ে গেলে সমস্ত দেহটিই খারাপ হয়ে যাবে। আর এই মাংস খণ্ডটির নামই হলো 'ক্বল্ব' (হৃদযন্ত্র)" [সহীহ বুখারী]।

উক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, মানুষের হৃদযন্ত্র শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজকের বিজ্ঞানও একই জিনিস আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে।

(ঝ) বিজ্ঞান এখনো যা বুঝাতে পারে নি

এপর্যন্ত বিজ্ঞান সম্পর্কে যাকিছু বলা হলো, তাতে একথা মনে করা উচিত নয় যে, এ জ্ঞানের মাধ্যমে জগতের সবগুলো দৃশ্যমান ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব বা দেওয়া হয়ে গেছে। বিজ্ঞান, ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীন যেসব দৃশ্যমান (অর্থাৎ সচরারচ সংঘটিত) বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আজো অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে, তার সংখ্যা অনেক। এ ক্ষেত্রে মানুষের সর্বাপেক্ষা নিকটে সংঘটিত ঘটনা, যেমন স্বপ্ন-থেকে বিশ্বজগতের সূচনার কারণ প্রভৃতি জড়িত। দু'একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে যাবে।

স্বপ্ন কি?

এ পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই, যে স্বপ্ন দেখে না। অথচ এই সচরাচর ঘটিত একটি বাস্তবতাকে বিজ্ঞান কোন সঠিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এব্যাপারে অনেক হাইপোথেসিস বা ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু কেউ এখনো কোন সুস্পষ্ট পাকাপুক্ত প্রমাণ দ্বারা স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

বিজ্ঞান যা বলছে তা হলো, স্বপ্ন একটি কাল্পনিক, অনুভূতিলব্ধ, চিন্তা-প্রক্রিয়া যা নিদ্রাকালে দেখা যায়- তবে নিদ্রা এবং স্বপ্ন এ উভয়েরই সঠিক কোন সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না। স্বপ্নকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, মানুষ ঘুমান্তাবস্থায় যে কোন সময় তা দেখা যেতে পারে। যদিও স্বপ্ন সংঘটিত হয়, কিন্তু সর্বদাই আমরা তা **দেখি** না। যারা জন্মান্ধ তাদের স্বপ্ন কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে।

স্বপ্নের ব্যাপারে আরো কিছু আইন-কানুন পরিলক্ষিত হয়। যেমন: স্বাভাবিকভাবে দৌড়া যায় না, নিজেকে বেশ হালকা মনে হয়, বাতি জ্বালানো যায় না প্রভৃতি। আরেকটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো, স্বপ্ন থাকাবস্থায় মানুষের চোখ দুটো অনবরত ঘুরতে থাকে। কোন কোন সময় দেখাগেছে স্বপ্নের কিছু ক্রিয়া যেমন- কিছু ধরা

বা ছোঁয়া বাস্তবে ঘুমান্তাবস্থায়ই অজ্ঞাত থেকেও হাত-পা দিয়ে নড়াচাড়া করে সেসব **দেখা** ক্রিয়া করে যাচ্ছে। অর্থাৎ কিছু ধরার জন্য হাত-পা নড়তে থাকে।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, একজন মানুষ তার জীবনে গড়ে **১** লাখ **৩৬** হাজারটি স্বপ্ন দেখে থাকেন। স্বপ্নের সময় মানুষের হার্ট-রেট, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ, পেশীর নড়াচড়া, অক্সিজেন গ্রহণ প্রভৃতি দেহের প্রক্রিয়াও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। স্বপ্নাবস্থায় মানুষের দেহের পেশীগুলোও অচেতন হয়ে যায়। এতে স্বপ্নে-দেখা দৌড়াদৌড়ি করাও মানুষের জন্য অসম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন মানুষের ক্ষেত্রে পেশী অবশ হয় না, তাই তারা সময় সময় স্বপ্নে চলতে পারে (ড্রিম ওয়াকিং)। অর্থাৎ স্বপ্নের মধ্যে থাকাবস্থায় বাস্তবে বিছানা থেকে ওঠে বেশ দূর পর্যন্ত চলতেও দেখা যায়।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, মানসিক ও শরীরবৃত্তিক কারণে স্বপ্ন মানুষের জন্য জরুরীও বটে। তবে এর কারণ জানা যায় নি। স্বপ্ন সম্পর্কে আরোও অনেক কথা শোনা যায়। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে, এ সম্পর্কে সঠিক কোন ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায় নি। কিছু কিছু স্বপ্ন আছে, যেগুলো পরবর্তীতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। এরূপ কেন হয়, তা বিজ্ঞান বলতে পারে নি।

বাস্তবে স্বপ্ন হচ্ছে আধ্যাত্মিক ব্যাপার-স্যাপার। আর বিজ্ঞান যতোক্ষণ পর্যন্ত আত্মা বলতে যে কিছু আছে, তা স্বীকার না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা পুরোপুরি করতে পারবে না। আর এখানেই সমস্যা। কারণ, আত্মা ও আত্মাকে নিয়ে গবেষণা, এগুলো বিজ্ঞানের গণ্ডীসীমার বাইরে অবস্থান করে। তবে মজার কথা হলো, বিজ্ঞান যদিও আত্মাকে চেনা বা জানার ক্ষেত্রে অপারগ তথাপি আগেকার দিনের মতো **এখন আর বলছে না, বিজ্ঞান দ্বারা যা পরীক্ষা করা যায় না, তা কাল্পনিক বা এর অস্তিত্ব নেই**। এখন বরং এটাই **বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে, রূহ, আধ্যাত্মিক জগত, ফিরিশতা, বেহেশত, দোযখ, পরকাল- প্রভৃতি হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু এগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে জানা সম্ভব নয়**। আর যা জানা সম্ভব নয়, তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, এ সবকিছুই কাল্পনিক বা এসবের অস্তিত্ব নেই!

আসলে মানবদেহে আল্লাহ পাক অনেক গুপ্ত বস্তু লুকিয়ে রেখেছেন। মানুষ যদি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে ইবাদত করে, নিজেকে নিয়ে, ঈমানের আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে, তাবে তার কাছে অনেক রহস্য উদঘাটিত হবে। সে স্বপ্নেরও সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে। স্বপ্ন তো আধ্যাত্মিক জতগের ব্যাপার-স্যাপার। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানুষের নিদ্রাকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু মরণ হলে যেখানে মানবদেহ থেকে আত্মা চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ঘুমের সময় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে দেহজগত ও আধ্যাত্মিক জগতের মাঝেই বিচরণশীল থাকে। মূলতঃ স্বপ্ন হচ্ছে মানবাত্মার চলাফেরা। আর আত্মা এমন এক বস্তু যা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে উঠে যেতেও সক্ষম। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীও আত্মা জানতে পারে। স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাক মানুষকে অনেক সময় হুঁশিয়ারীও দিয়ে থাকেন। স্বপ্নকে আমার মতে এই আধ্যাত্মিক সচেতনতা সহকারে গবেষণা করাটাই হবে সমুচিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা কিছু ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়।

যা হোক স্বপ্ন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন-হাদীস থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরছি। এতে আশাকরা যায়, স্বপ্নের গুরুত্ব অনুধাবন হবে।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে স্বীয় পুত্র কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইরশাদ হলো:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

-"অতঃপর সে (ইসমাঈল আ.) যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল: বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি? সে বলল: পিতা! আপনাকে যা আদেশ

করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।" [সূরা সাফ্ফাত (৩৭):১০২]

হযরত ইউসূফ আলাইহিস্‌সালাম যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা দীর্ঘদিন পর বাস্তবে রূপদান করে। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

-"যখন ইউসূফ পিতাকে বললেন: পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে।" [সূরা ইউসূফ (১২):৪]

পবিত্র হাদীস শরীফেও স্বপ্নের উপর বেশ কিছু রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। স্বপ্নের প্রকার, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য ইত্যাদির উপর সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান। আমরা নিম্নে চারটি রেওয়ায়েত তুলে ধরছি।

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি, তিনি বলেন, "নবুওয়ত শেষ হয়ে গেছে তবে 'মুবাশ্‌শিরাত' থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'মুবাশ্‌শিরাত' কি? তিনি উত্তর দিলেন, নেক স্বপ্ন" [সহীহ বুখারী]।

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাতাদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সত্য ও বাস্তব স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে, মিথ্যা ও অবাস্তব স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই কেউ যখন মিথ্যা ও অবাস্তব স্বপ্ন দেখে এবং তাতে ভয় পায়, তখন যেনো বামদিকে থুথু ফেলে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট এর অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়। নিশ্চয় শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না" [সহীহ বুখারী]।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

-হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মু'মিনের সত্যস্বপ্ন নুবুওয়াতের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ" [সহীহ বুখারী]।

عن عليّ قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه فى الجسد ◉ فبذلك يرى الرؤيا ◉ فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة

-ইমাম বাগাভী রাহামাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে বাগাভীতে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বর্ণিত একটি রিওয়ায়েত তুলে ধরেছেন: হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "ঘুমন্তাবস্থায় মানুষের রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে শরীরের সঙ্গে তার নূরের একটি সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। এর মাধ্যমেই মানুষ স্বপ্ন দেখে। জাগ্রত হয়ে ওঠলেই তা দেহের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করে।" [তাফসীরে বাগাভী, সূরা জুমারের ৪২ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে]

বুদ্ধি ও চিন্তার মূলে কি আছে

বিজ্ঞান বুদ্ধি বা ইন্টেলিজেন্ট সম্পর্কে কি বলে? খুব একটা বেশী নয়। বুদ্ধি, চিন্তা, সৃজনশীলনা প্রভৃতি মূলত দর্শন জগতের ব্যাপার। আর মানবতৈরী দর্শনগুলো নানামুখী। কেউ এখনো কোন সর্বজনবিদিত মহাসত্য দার্শনিক থিওরী দিতে সক্ষম হন নি। তবে বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কিছুটা থিওরী উপস্থাপন করেছে। আমি সংক্ষেপে এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি।

আল্লাহর পালনকারিতার আওতায় মনুষ্য বুদ্ধি-চিন্তা-সৃজনী শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, তা বলার উপেক্ষা রাখে না। মানুষের মধ্যে এসব গুণাবলী থাকায়ই সে মানুষ নামের অধিকারী হয়েছে। জগতে প্রতিনিয়ত সামাজিক, আর্থিক, মানসিক, প্রযৌক্তিক উৎকর্ষ, সংস্কার ও বিবর্তন ঘটছে। মানুষ এসব গুণাবলীর ফলেই মহাকাশ পাড়ি দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কোন এক সময় বুদ্ধিকে বিজ্ঞানীরা একটিমাত্র বস্তু হিসেবে ভাবতেন। কিন্তু পরবর্তীতে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, বুদ্ধি মূলতঃ একাধিক বস্তুসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন: কোন এক ব্যক্তির স্মরণশক্তি, কথাবলা, চিন্তা করার ক্ষমতা প্রভৃতি জিনিষ থেকে বুদ্ধির উৎপত্তি ও তারতম্য ঘটে।

কে কতটুকু ইন্টেলিজেন্ট তা পরীক্ষা করে দেখারও উপায় আছে। যদিও এ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা-নিয়ে বিতর্কও হয়ে থাকে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের বয়স ও কোন বুদ্ধিসম্পন্ন কার্য সমাধান করার ক্ষমতা, এ দু'টি গবেষণা করা হয়। অল্প বয়সে যদি কেউ পরিণত বয়সের লোকদের মতো কাজ সেরে নিতে পারে তবে তার রেজাল্টের মাত্রা হবে বেশী। এ উপায়ে বুদ্ধিকে মাপা ইন্টেলিজেন্ট কৌশিয়েন্ট বা **আইকিউ** বলে। এ আইকিউ যার যতো বেশী হবে সে ততো বেশী বুদ্ধিমান হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। আইকিউ টেস্টের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এর মাত্রা ৪০ (বোকা?) থেকে ১৬০ (সুপার ইন্টেলিজেন্ট) পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বিজ্ঞান ইন্টেলিজেন্ট বা বুদ্ধি সম্পর্কে এটুকুই বলেছে। আরো দু'একটা বিষয় নিয়েও গবেষণা হয়ে থাকে, যেমন: মগজের আয়তন, পারিপার্শ্বিকতা, বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত (জিনের মাধ্যমে) প্রভৃতি। কিন্তু আসলে এই বুদ্ধি যে কী, তা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। অথচ স্বয়ং বৈজ্ঞানিক চেতনাসহ এ জগতের অনেককিছুই সংঘটিত হচ্ছে এই বুদ্ধি-চেতনার কারণেই। বিজ্ঞান বুদ্ধিকে চিনতে না পারলেও এটা যে আছে, তা অস্বীকার করতে পারছে না। এটা অস্বীকার করলে তো বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা হবে, নয় কি?

অন্যদিকে দর্শন বুদ্ধি সম্পর্কে নানাকথা বলে। এ প্রসঙ্গে দর্শন নিয়ে গভীর গবেষণা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাই কিছু না বলেই শুধু এটুকু উক্তি করছি, দর্শনও বিজ্ঞানের মতোই **'রেশন্যাল'** বা যুক্তির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রভুর গুণাবলীর সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট এ বুদ্ধি নামক জিনিসটি, ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা যুগে যুগে করে আসছে। কিন্তু আসল সত্য থেকে এ প্রচেষ্টা দূরেই পড়ে আছে। এর কারণ হলো, যুক্তি-চিন্তার আওতাভূক্ত অহির্জ্ঞান না থাকা। অহির্জ্ঞান ছাড়া এই অদেখা মানবিক গুণাবলী কিছুতেই উদঘাটিত হবার নয়।

আমরা জানি হীরা দ্বারা হীরা কাটা সম্ভব। কিন্তু তাই বলে হীরা দিয়ে হীরাকে জানা কী সম্ভব হতে পারে? মানুষ মূলতঃ বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধির সংজ্ঞা জানতে চাচ্ছে। অথচ বুদ্ধি যেখান থেকে প্রদান করা হলো, সে বিষয় খেয়াল রাখে না! আমার মতে বুদ্ধি-চিন্তা-বিবেক প্রভৃতি বুঝতে হলে এসব বস্তুর মূলে যে স্বয়ং প্রভুর দান নিহিত আছে, তা ভালকরে বিশ্বাস ও অনুধাবন করেই গবেষণা চালালে সুফল বেরিয়ে আসবে।

একমাত্র প্রভুই মহাসত্য, সুতরাং তাঁকে রেখে, তাঁর দেওয়া ওহিরজ্ঞানকে উপেক্ষা করে সত্যপোলব্ধি ঐ হীরা দ্বারা হীরাকে চেনার মতোই মনে হয়। মূলতঃ ইমানুয়েল কান্ট যে বলেছেন, **মানুষ সবকিছু একমাত্র যুক্তি, ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতা থেকেই জানতে পারে**, এ কথাটি আসলে সত্য নয়। জানার ক্ষেত্রেও মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে।

বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ গবেষণা করে জীবন দিয়েছে, কিন্তু একমাত্র অহিরজ্ঞানকে উপেক্ষা করায় তাদের সারাজনমের চেষ্টা-সাধনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। এবার চিন্তা করুন, যারা অহিরজ্ঞান ছাড়াই বড় জ্ঞানী হিসেবে জগতে পরিচিত হয়েছেন, তাদের সবাইকে কেন বলা হয়, অর্ধজ্ঞানী, বধির, বোবা ও অন্ধ বা জ্ঞানপাপী। অহিরজ্ঞান ও মানবীয় যুক্তিচিন্তা এ দুয়ের সমন্বয়েই সহাসত্যের দ্বার উদঘাটন হতে পারে। এরূপ মহাজ্ঞানীই ছিলেন আল-গাযযালী, ইবনে-সিনা, ইবনে-রুশদ, আল-বিরুনী, ইবনে খালদুন, ইবনুল আরাবী, জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ জ্ঞানতাপসগণ।

অহিরজ্ঞানকে উপেক্ষা করে জ্ঞানচর্চা আমার মতে অসাড়, নির্জীব এবং আসল সত্য থেকে অনেক দূরে থাকার সমান। আগেকার দিনের জ্ঞানতাপস বিশেষ করে আল-গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের বেশী করে জানা ও গবেষণা করা একান্ত জরুরী বলে মনে করি। অসাড় যুক্তিবাদ, মেটেরিয়ালিজম, ভাববাদ, প্রভৃতি দার্শনিক বাদ-মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাবার আগে এগুলো যে অসম্পূর্ণ ও ক্ষেত্রবিশেষে সত্যবিচ্যুত তা আগেই অনুধাবন করে বিশ্বাসীদেরকে অগ্রসর হতে হবে। এগুলো জানার মাধ্যমে আমরা হয়তো এ সত্যটি অনুধাবন করবো- **আসল সত্য এখনো এসব দর্শন উদঘাটন করতে পারে নি**। বস্তুত এসব থিওরী কখনো আসল সত্যে নিয়ে আমাদেরকে উপনিত করতে পারবে না। বিশ্বজগত ও মানুষের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীর স্বরূপ উন্মোচনে আমারেদকে **অবশ্যই ঈমানী শক্তি নিয়ে ও অহিরজ্ঞান সহকারে অগ্রসর হতে হবে**।

প্রাণ বলতে কি বুঝায়

প্রাণের সংজ্ঞা কি? অভিধানে প্রাণকে লাইফ (জীবন), ভাইটেলিটি (জৈবিক শক্তি), সউল (আত্মা), হার্ট (হৃদয়) প্রভৃতি শব্দাবলী দ্বারা বোঝানো হয়েছে। তবে কথা হলো বিজ্ঞান প্রাণের সংজ্ঞা এভাবে দেয় নি। আসলে বায়োলজিস্টরা পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। যদিও উল্লেখ্য শব্দাবলীর মধ্যে 'সউল' ছাড়া অন্যগুলোর আলাদা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।

জীবন্ত কোন কিছুকে (মানুষসহ) বিজ্ঞান তিনটি গুণাবলী দ্বারা পরিচিতি দেয়। আর তাহলো কোন জীবীর মধ্যে (১) শ্বাস-প্রশ্বাস (মেটাবলিজম) ক্ষমতা, (২) বাড়ার ক্ষমতা ও (৩) বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা, এ তিনটি গুণাবলী থাকাতে হবে। অজড় প্রাণহীন বস্তুতে উল্লেখিত যে কোন একটি গুণাবলী থাকতে পারে কিন্তু এর ফলে এগুলোকে জীবন্ত বলা চলে না। মানুষ ও জীবজন্তু ছাড়াও বৃক্ষ-তরুলতাকে জীবী হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। বৃক্ষের মাঝেও উপরোক্ত তিনটি গুণাবলী আছে।

মানুষের জন্মবৃত্তান্ত, বেড়ে ওঠা, খাদ্যগ্রহণ ও বংশবৃদ্ধি নিয়ে ইতোমধ্যে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বৃক্ষ কিভাবে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে শ্বাস-নিশ্বাস গ্রহণ করে তা-ও বলা হয়েছে। বৃক্ষ মাটি থেকেও খাদ্যগ্রহণ করে এবং বেড়ে উঠে। ফুল ও ফলের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

প্রাণকে এই তিনটি গুণাবলী দ্বারাই যদি সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে কিন্তু ভুল হবে। কারণ প্রাণের সাথে চেতনা জড়িত। আর চেতনার সাথে আত্মা জড়িত। প্রাণের সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে এসব বস্তুরও ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে আত্মা, চেতনা, বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতি বস্তু নিয়ে বিজ্ঞান সঠিক কোন গবেষণা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা পরিষ্কার। আল্লাহ পাক মানুষকে মূলতঃ আত্মা দান করেই চেতনাশীল করেছেন, প্রাণী হিসেবে পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবী বানিয়েছেন। এটা আল্লাহর রব্বুবিয়তের বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে বলেন:

الَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

"তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কাদা হতে মানবসৃষ্টি শুরু করেন। তারপর তার (মানবের) বংশবিস্তার করেন (বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি) তুচ্ছ তরল পদার্থের সার হতে (বীর্য)। তারপর তিনি তাকে (মানুষকে) ভারসাম্য রক্ষা করে আকৃতি দেন (সুগঠিত করে গড়ে তুলেন) এবং তার মধ্যে তাঁর (আল্লাহর) আত্মা থেকে ফুৎকার করেন (প্রাণ দেন, জীবন দেন); এবং তোমাদের জন্য তিনি কান (শ্রবণেন্দ্রিয়), চক্ষু (দৃষ্টিশক্তি) এবং অন্তকরণ (হৃদয় বা প্রাণশক্তি) প্রদান করেছেন; তেমারা অত্যল্প কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো!" [সূরা সিজ্দা (৩২):৭-৯]

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে অসম্পূর্ণ ফাঁকসমূহ

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার আলোচনা যা হয়েছে, তা ছিলো মানুষ ও তার মধ্যে লুকানো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আমরা দেখেছি মানুষের প্রাণ, বুদ্ধি, চেতনা, চিন্তা, স্বপ্নদেখা, সৃজনীশক্তি, পঞ্চেন্দ্রিয়ের আসল স্বরূপ প্রভৃতির সঠিক ব্যাখ্যা দিতে বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছে। এসাথে অহিরজ্ঞান-উপেক্ষিত মানবীয় দর্শনও বিফলমনোরথ হয়েছে। মূলত দর্শন বা ফিলোসফি সত্যের ধারেকাছে যেতে সদাসচেষ্ট, অথচ সর্বদাই দূরে অবস্থান করছে। অহিরজ্ঞান (কুরআনের জ্ঞান) এ সন্ধানে যে সহায়ক হবে, এ কথাটা আধুনিক দার্শনিকরা বিবেচনা করতেই যেন নারাজ। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মের শিক্ষা থেকে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে আজকের দার্শনিকরা (মূলতঃ ঈমানহীন জ্ঞানীরা) একটি কনভেনশন বা আইন করে নিয়েছেন- যুক্তি ও দার্শনিক গবেষণায় ধার্মিক বিশ্বাস জড়িত হলে তারা তা কিছুতেই গ্রহণ করতে চান না।

জগতের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে দর্শন আজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এ সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেও অনেক **'মিছিং লিংক'** বা ফাঁক আছে। এবার বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের উপর কিছুটা আলোচনা করে দেখা যাক।

(ক) জগতসৃষ্টির সূচনা

বিজ্ঞানের মতে, আজ থেকে প্রায় ১৫ শতকোটি বছর পূর্বে (কারো কারো মতে ২ হাজার কোটি বছর আগে) এ জগতের সূচনা হয়। এ শুরু হওয়ার মুহূর্তে একটা মহাবিস্ফোরণ ঘটে- যাকে 'বিগ ব্যাং' বলা হয়ে থাকে। আসলে বিস্ফোরণ বলা হলেও, এ ঘটনাটি ছিলো মূলত স্থান এর (স্পেইস) জন্ম। বিজ্ঞানীদের মতে এর পূর্বে স্থান বলতে কিছু ছিল না, আর স্থান ছাড়া বস্তু ও সময় বলতে কিছু অস্তিত্বশীল হতে পারে না। সুতরাং এ ঘটনার সাথে স্থান-কাল ও বস্তুর জন্ম হয়। জন্মমুহূর্তে জগতটি অত্যন্ত ঘণবস্তুসম্পন্ন এবং এর তাপমাত্রা ধারণাতীতরূপে বেশী ছিলো।

সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা মনে করেন, এই বিগ ব্যাংগের সাথে সাথেই যাবতীয় কণা (বস্তু), এনার্জি (শক্তিসমূহ), সময় ও স্থান সৃষ্টি হয়। এ হচ্ছে সৃষ্টিমুহূর্তের কথা। এর পূর্বে কি হয়েছিল বা কোন্ কারণে এ বিস্ফোরণ ঘটলো এসম্পর্কে বিজ্ঞান কিছুই সুস্পষ্টভাবে বলতে পারছে না। যা বলছে তাহলো, 'এর পূর্ব একটি ব্যাখ্যাহীন ধারণা'। কারণ সময়ের পূর্বে কোনো সময় নেই, সুতরাং সেসম্পর্কে প্রশ্ন করাও অর্থহীন। আর কোন্ কারণে সেই বিস্ফোরণ ঘটলো? এ প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞানীরা সেই সময় নিয়েই জবাব দেন। তারা বলেন, যেহেতু বিস্ফোরণের আগে সময় বলতে কিছু ছিলো না, তাই কোন্ কারণে তা হয়েছে এ প্রশ্নও অনর্থক! কিন্তু প্রশ্ন তো থেকেই যায়।

পাঠকরা এখানে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার স্বরূপ লক্ষ্য করুন। কোন এক মহাশিক্তিধর প্রভু এ বিস্ফোরণের কারণ ছিলেন, বা তাঁর ইচ্ছায় তা হয়েছে এ কথাগুলো বিজ্ঞান বলতে নারাজ। এর কারণ কি? কারণ হলো, যদি তা বলা হয়, তবে বিজ্ঞান বাধ্য হয়ে ধর্মবিশ্বাসকে গ্রহণ করতে হবে। কার্যকারণ নীতিতে বিজ্ঞানও বিশ্বাসী। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ার পেছনে এক বা একাধিক কারণ থাকে। এটাই হলো 'কার্যকারণ নীতি'। অথচ এ মৌলিক প্রশ্নে এসে বিজ্ঞান তার নিজস্ব একটি আইনকে অমান্য করতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে, বিজ্ঞানী হয়েও আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করায় কোন ত্রুটি নেই, এ কথাটি আজ বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে নিতে হচ্ছে। এবার দেখা যাক সৃষ্টিতত্ত্বের বাকী অংশ কি বলে।

(খ) গ্রান্ড ইউনিফিকেশন ইপোক বা মহা-একক সময়

সৃষ্টি মুহূর্তের অত্যল্প সময়ের মধ্যে কিসব কাণ্ড ঘটেলিছ তা-ও বিজ্ঞান জানে না। তবে খুব দ্রুত স্থান বর্ধিত হচ্ছিলো। এ ক্রমবর্ধমান স্থানের মধ্যে অত্যন্ত বেশী এনার্জি সহকারে একটি পার্টিকেল (কণা সম্বলিত) সুপ বা ধূয়া ছিলো। এই সুপের মধ্যে কণা ছাড়াও এ্যন্টিপার্টিকেল (বিপরীত কণা) জন্ম নেয়। পাঠকরা আগেই এই এ্যন্টিপার্টিকেল সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এসময় এনার্জি বা উদ্যম পার্টিকেলের মধ্যে এতো বেশী ছিলো যে, মূলত যাবতীয় বস্তু ও শক্তি একই সাথে অবস্থান করছিলো। এই ক'টি ক্ষণকে বিজ্ঞানীরা গ্রাণ্ড ইউনিফিকেশন ইপোক বা মহা একক সময় বলে আখ্যায়িত করেছেন। এসময় বস্তু ও স্বাভাবিক শক্তিসমূহ সবকিছু একত্রে অস্তিত্বশীল ছিলো। এসময় প্রাকৃতিক চারটি শক্তিসমূহের (এ সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে) তিনটিই (শক্তিশালী ও দুর্বল আনবিক শক্তি এবং বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় শক্তি) একত্রে ছিলো। তবে মহাকর্ষ এ ইপোক শুরু হওয়ার সময় আলাদা হয়ে যায়।

সময় বৃদ্ধির সাথে বিশ্বটি দ্রুত বর্ধিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এর তাপমাত্রা অনেকটা কমে আসে। এ হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির প্রাথমিক স্তর। এ ব্যাখ্যায় কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায়, যার সঠিক উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারছে না।

প্রথমতঃ বিস্ফোরণের কারণ কি? কোন্ মহাশক্তি এ বিস্ফোরণ ঘটালো? এর একমাত্র জবাব হচ্ছে, অসীম শক্তিধর এক আল্লাহই এর কারণ।

দ্বিতীয়তঃ স্থানের জন্মের সাথে বস্তু আস্লো কোত্থেকে? এ প্রশ্নের জবাবও বিজ্ঞান জানে না। এক্ষেত্রেও বলতেই হয়, বস্তুর অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহই দিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ গ্রাণ্ড ইউনিফিকেশনের কালে যে চারটি মৌলিক শক্তি (স্বভাবের আইনের মূল) সৃষ্টি হলো, তা কেন হলো? এবং কিভাবে হলো? এগুলো না হয়ে অন্য কিছু হলো না কেন? এগুলোর মধ্যে যেসব গুণাবলী আছে তার পেছনে কি আছে? এখানে অবশ্যই বলতে হয়, এ হচ্ছে আল্লাহর রব্বুবিয়াত বা জগতকে পালন করার পদ্ধতিসমূহ। আর অবশ্যই তিনি যদি চাইতেন এরূপ নেচারেল আইন-কানুন না করে অন্যভাবে করার, তবে তিনি পারতেন। বিজ্ঞান যে বস্তুজগতের শক্তিসমূহ ও আইন-কানুন নিয়ে শুধু গবেষণা চালাতে পারে আর এর আসল কারণ তা জানতে পারে না, এসব প্রশ্ন থেকে সেটা স্পষ্ট নয় কি?

(গ) ইনফ্লেশন স্টেজ বা স্ফীতি হওয়ার কাল

সৃষ্টির কয়েক মুহূর্ত পরেই বিশ্বটা ইনফ্লেশন স্টেজে উপনিত হয়। একটা বেলুনকে বাতাস দিয়ে যেভাবে স্ফীত করা হয় ঠিক তদ্রূপ বিশ্বটা দ্রুত স্ফীত হতে থাকে। আগের তুলনায় তাপমাত্রাও অনেকটা কমে আসে (তবে এটাও আমাদের ধারণাতীত। নাম্বার দশের সাথে সাতাশটি শূণ্য যোগ করলে যে বিরাট অঙ্ক হয়, তাপমাত্রা তখনো সেরূপ জঘন্য ছিলো।) এটা ছিলো এক বিশেষ ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রা। এমসয় কিছু মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পানি যেরূপ ঝিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নেমে আসলে বরফে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এরূপ বিশ্বটাও হঠাৎ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়।

বস্তুর শক্তিশালী আনবিক ফোর্স (স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স) অন্যগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে বিরাট অঙ্কের এনার্জি রিলিজ হয়। তারপরই একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সমগ্র বিশ্বটা মাত্র ক্ষণকালের মধ্যেই জ্যাতিমিক হারে স্ফীত হয়ে

যায়। এই একটি মাত্র ক্ষণে (বাস্তবে এই ক্ষণটির মাত্রা ছিলো একসেকেণ্ডের কোটি কোটি অংশের একটি অংশ মাত্র!) বিশ্বটা কোটি কোটি গুণ বর্ধিত হয়ে যায়।

এই ইনফ্লেশন ইপোক সংঘটিত হওয়ার পরে, বিশ্বের গতি-মতি অনেকটা স্তিমিতি হয়। তবে বিশ্বের বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে, যদিও তা অনেকটা ধীর গতিতে হচ্ছিলো। অবশ্য এ বিস্তৃতি আজো হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এর প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন।

বিশ্বজগত যে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে তা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখিত আছে। আল্লাহ পক ইরশাদ করেন:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"এবং আমিই (আল্লাহ) আকাশমণ্ডল (বিশ্বজগত) সৃষ্টি করেছি স্বীয় ক্ষমতায়; এবং অবশ্যই, আমি ক্রমান্বয়ে তা বর্ধিত করছি।" [সূরা জ্বা-রিয়াত (৫১):৪৭]

(ঘ) পার্টিকেল বা পরমাণু সৃষ্টির কাল

প্রাচীন যুগে ডিমোক্রিটাস [খ্রি.পূ. ৪৬০-৩৭০] নামক এক গ্রীক বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম অণু বা এটমের ধারণা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা স্বভাবের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম পার্টিকেল অণুকে মনে করেন না। তারা বলছেন, ১২টি ভিন্ন পার্টিকেল হচ্ছে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। এদের ছ'টিকে ক্যুয়ার্ক এবং বাকী ছ'টিকে লেপটন নামকরণ করা হয়েছে। প্রথম ছটি দ্বারা এটমের কেন্দ্রীয় কণা প্রোটোন সৃষ্ট হয়েছে এবং বাকী ছ'টি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে নিউট্রন (এটমের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কণা)। এগুলো সৃষ্ট হয় জগতসৃষ্টির মাত্র ক্ষণকাল পরে। এ সময়কে বিজ্ঞানীরা পার্টিকেল ইপোক বলেছেন।

(ঙ) অণুর জন্মকাল

জগতসৃষ্টির মাত্র ১ সেকেন্ড পরে সব অণু সৃষ্টি হওয়া শুরু করে। এগুলো সৃজন হতে মাত্র ১০০ সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এ ইপোককে নিউক্লিওসিনথেসিস ইপোক (অণুর কেন্দ্রসৃষ্টির কাল) বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান মনে করে সাধারণ হাইড্রোজেন এটম সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয় নি, এটা আগে থেকেই ছিলো! এটা বিজ্ঞানের একটি অদ্ভুত আবিষ্কার বৈকি।

সৃষ্টির ১০০ সেকেন্ড পর তাপমাত্রা অনেকটা কমে আসে, যার ফলে এটমের কেন্দ্রের কণাগুলো (নিউট্রন ও প্রটোন), একত্রে থাকতে সক্ষম হয়। বেশী তাপমাত্রা হলে এগুলো '**ফটোন**' নামক কণার আক্রমণে বিভক্ত হয়ে যেতো।

এক্ষেত্রে বেশী টেকনিক্যাল জটিলতায় না গিয়ে এটুকু বলা যায় যে, সৃষ্টির মাত্র ১০০ সেকেন্ড পরই স্বভাবের সর্বাপেক্ষা বেশীরভাগ পদার্থ হাইড্রোজেনের জন্ম হয়। এ হাইড্রোজেনই বিশ্বজগতের অগণিত তারার ইন্ধন হিসেবে কাজ করছে। আমাদের সূর্যের মধ্যেও ৯৮% হাউড্রোজেন আছে। মূলত জগতজুড়ে হাইড্রোজেনের মাত্রাও মোট পদার্থের ৯৮%।

এই হাইড্রোজেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর পালনকারিতার একটি পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে। হাইড্রোজেন দ্বারা পরবর্তীতে সৃষ্ট জগতের অসংখ্য তারাকে জ্বলন্ত করা হয়েছে এবং এ থেকে বিশ্বব্যাপী আলো ও এনার্জি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির শুরুতেই জগতে আলো তৈরী করতে মহাপ্রভু হাইড্রোজেন নামক গ্যাস সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তথাপি কাফিররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে!" [সূরা আনআম (৬)ঃ১]

আলো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা এখন আমরা জানতে পেরেছি। তবে প্রাথমিক অবস্থায় যেহেতু যাবতীয় পদার্থ একত্রে 'সুপ' বা একটিমাত্র খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো তাই প্রথমে শুধু আলোই ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে তারা ও তারাজগতের (গ্যালাক্সি) জন্ম হয় এবং এগুলো একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তারাগুলো ও তারাজগতের মধ্যে এই দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় অন্ধকার সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধু আলো থাকলে যেমন হতো না, তেমনি শুধু অন্ধকার থাকলেও সামঞ্জস্য বজায় থাকতো না। আল্লাহ পাক এই আলো-আঁধার সৃষ্টি করে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। এটা আল্লাহর রব্বুবিয়তের অপূর্ব এক পদ্ধতি।

(ছ) বিচ্ছিন্নতার শুরু

বিজ্ঞানের মতে সৃষ্টির (বিং ব্যাংগের) তিন লক্ষ বছর পর থেকে প্রাথমিক 'সুপ' আলাদা হওয়া শুরু করে। এসময় তাপমাত্রা কমে তিন হাজার কেলভিনে নেমে আসে। এবার বর্ধিত বিশ্বের সর্বত্র মেটার বা জড় বিচ্ছিন্ন হওয়া আরম্ভ করে। এই ইপোক বা যুগকে '**রিকমবিনেশন ইপোক**' বা পূণর্মিলন কাল বলা হয়। বিশ্ব এ অবস্থায় ১০ লক্ষ বছর ছিলো। এসময় জগতের বিভিন্ন অংশে মধ্যাকার্ষণের ফলে জড়বস্তু একত্রিত হয়ে তারা, তারাজগত, মহাতারাজগ ও মহা-মহাতারাজগত সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়। এর পর থেকেই আমাদের সৌরজগত ও পৃথিবীসহ গ্রহ-উপগ্রহগুলোর জন্ম প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে।

একটিমাত্র প্রাথমিক ম্যাস বা জড়বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্ট জগতটা যে পরবর্তীতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এ তথ্য পবিত্র কুরআন থেকেও পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক তাঁর কালামে অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রশ্ন করে বলেন:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

-"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, মহাবিশ্ব ও যমিন (শক্ত গ্রহগুলো) (একত্রে) জড়ানো ছিলো (সুপ); পরে আমি এগুলোকে পৃথক (বিচ্ছিন্ন) করেছি এবং পানি দ্বারা প্রত্যেক প্রাণবান বস্তু পয়দা করেছি; এর পরেও কি ওরা (অবিশ্বাসীরা) ঈমান আনবে না?" [সূরা আম্বিয়া (২১):৩০]

এখানে উল্লেখ্য যে মানুষসহ যাবতীয় প্রাণীরা মূলত পানি থেকেই সৃষ্ট। আমাদের দেহের বিল্ডিং ব্লকস্ নামে খ্যাত কোষগুলো ৮০% পানি থেকে তৈরী।

তাহলে অবিশ্বাসীরা আজ বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেখে নিয়েছে আল্লাহর এই পবিত্র বাক্যের সত্যতা। এবার কি তারা ঈমান আনবে? আল্লাহ পাক অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীদের মধ্যে ঈমানের আলো দান করুন, এটাই কামনা।

অত্যন্ত সংক্ষেপে জগতসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপন করেছি। এব্যাপারে এ প্রসঙ্গে আরোও কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

একটা জিনিসের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই। উপরের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বসৃষ্টির ক্ষেত্রে ছ'টি আলাদা মৌলিক ইপোক বা যুগ ছিলো। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনেও এরূপ ছ'টি যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ...

"আপনার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি ছ'দিবসে মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।..." [সূরা আরাফ (৭):৫৪, অংশ]

এ আয়াতে এবং আরোও বহু আয়াতমালায় **'সিত্তাতে আইয়্যাম'** শব্দদ্বয় এসেছে। এই আইয়্যামের সাধারণ অর্থ দিবস হলেও মূলত এর আসল ব্যাখ্যা হচ্ছে, ৬টি

স্টেজ বা ইপোক বা যুগ। এর কারণ হলো, অন্যত্র আল্লাহ পাক তাঁর এক দিবসকে আমাদের হিসাবে হাজার বছর বা পঞ্চাশ হাজার বছর বলেছেন। [সূরা সাজদাহ (৩২):৫, সূরা মাআরিজ (৭০):৪ দ্রঃ]

সুতরাং এই সিত্তাতে আইয়্যাম বলতে ৬টি অনির্দিষ্ট ছোট-বড় কালকেই বুঝাচ্ছে। আর আমরা ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের ভাষায় এ ৬টি ইপোক নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ইপোকগুলো মৌলিক ছিলো।

আল্লাহ পাক তাঁর রব্বুবিয়তের আওতায় জগতটি যে ৬টি যুগে সৃষ্টি করেছেন একথা আজ বিজ্ঞানই প্রমাণ করেছে। সুবহানাল্লাহ! বিজ্ঞানীদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কি অন্য কোন পথ খোলা আছে? একমাত্র ইসলামের ঐশীজ্ঞানই যে তাদের আবিষ্কারের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে যাচ্ছে, একথা কি আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে? কখনই নয়।

"তিনি আকাশেও মা'বুদ এবং পৃথিবীতেও মা'বুদ; এবং তিনিই মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।" [সূরা যুখরুফ (৪৩): ৮৪]

উপসংহার

রব্বুবিয়াতের ব্যাপক অর্থ আদি-অনন্ত পালনকারিতা

(ক) জগতটি যান্ত্রিক নয়

আল্লাহর রব্বুবিয়াত নিয়ে আগের পরিচ্ছেদে বর্ণিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, এ মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু থেকে যাবতীয় বস্তুজগত প্রভু প্রদত্ব নির্দিষ্ট কিছু নিয়মমাফিক পরিচালিত। প্রকৃতি নিজে তার আইন-কানুন সৃষ্টি করেনি এবং খাম-খেয়ালীভাবে কোন ঘটনাও ঘটছে না।

প্রকৃতিবাদী তথা বস্তুবাদীরা স্বভাবকে (নেচারকে) জগতের সৃষ্টি, ঘটনাবলী, বিবর্তন, পরিবর্তন প্রভৃতির জন্য একটি মেশিনের মতো ক্রিয়াশীল স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মনে করে। অথচ এরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তা আমরা ইতোমধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সীমাবদ্ধতা ও অনিশ্চয়তার বাস্তবতা থেকে প্রত্যক্ষ করলাম।

সবকিছুর পেছনে যে একটি সক্রিয় শক্তি নিহিত আছে যা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সিস্টেমেটিক গবেষণার বাইরে, তা আজ আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর এ শক্তিই হচ্ছে আল্লাহর রব্বুবিয়াত বা পালনকারিতা। ব্যাপক অর্থে রব্বুবিয়াত হচ্ছে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বভাব এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু পরিচালনা। মূলত প্রাকৃতিক প্রতিটি ক্রিয়ার সাথে জড়িত এই পালনকারিতা যার মূলে আছে অলৌকিকতা। এককথায়, যাবতীয় ঘটনাই মৌলিকভাবে অজানা অদৃশ্য জগত থেকে উৎপন্ন হয়ে বাহ্যিক মহাবিশ্বে প্রকাশ

পায়। বিজ্ঞান তার নিজস্ব গণ্ডীসীমায় থেকে বাহ্যিক ক্রিয়ার ব্যাখা-বিশ্লেষণ করে মাত্র, এর আসল কারণ কি তা জানে না।

রেশন্যালিজম বা যুক্তিবাদের মাধ্যমে জগত নিয়ে গবেষণা মোটেই আপত্তিকর নয়। তবে এর সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করতে হবে। যুক্তিবাদের দোহাই দিয়ে বিজ্ঞান দ্বারা প্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না- এরূপ যুক্তি উপস্থাপন করা আর গ্রহণযোগ্য হবে না।

যুক্তিবাদ বিজ্ঞানকে কষ্টিপাথর হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু এই কষ্টিপাথর নির্ভেজাল বা খাঁটি কি না সেটা তো আগে যাচাই করতে হবে! বিজ্ঞান নিজেই আজ স্বীকার করেছে, জগত গবেষণায় কোন এক ক্ষেত্রে এসে সে অচল বা অপারগ। তাহলে এই বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করা যায় কি ভাবে? তবে যুক্তিবাদ দিয়েই কিন্তু আস্তিকতাবাদের প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়।

(খ) দর্শন চূড়ান্ত মহাসত্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছে

দর্শনের ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ জ্ঞানচর্চায় চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে আজো উপনিত হওয়া সম্ভব হয়নি। একটি বিশ্বজনিন দার্শনিক মহাসত্য এখনো কেউ উপস্থাপন করেননি। এর কারণ কি হতে পারে? সক্রেটিস, এ্যারিষ্টটল, প্লেটো থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কতো দার্শনিক যে এই ধরায় জন্ম নিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মহাসত্য আজো দর্শন থেকে অনেক দূরেই পড়ে আছে। কতো ইজম, কতো বাদ আর কতো গবেষক ও মহাজ্ঞানী এ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলেন কিন্তু কোথায় সে কাংখিত মহাদর্শন, মহাসত্য? তবে হ্যাঁ, দর্শন মানুষের জীবনকে পরিবর্তিত করেছে, মানবজীবন করেছে কোনো কোনো সময় দুর্বিষহ এবং অত্যল্প ক্ষেত্রে শান্তিময়। কিন্তু দর্শনই মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরূপ বললে বিরাট ভুল হয়ে যাবে। মানবীয় ভুল দর্শন-ধারণার মাধ্যমে বিপথগামী মানবগোষ্ঠীকে সুপথে ফিরে আনতে বার বার একটি ঐশীশক্তি ইতিহাসে সদাক্রিয়াশীল আছে। এ শক্তিটি হচ্ছে ধর্ম।

সভ্যতার শুরু থেকে- বাস্তবে মানবসৃষ্টির শুরু থেকেই ধর্ম মানবজীবনে বিরাট এক নিয়ন্ত্রণ-শক্তি হিবেসে কাজ করছে। ধর্মহীন মানুষ এ পৃথিবীতে অত্যল্প বসবাস করেছে। ধর্ম মানুষকে ক'টি মৌলিক চাহিদাও মেটায়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জরুরী যেটি সেটি হলো আধ্যাত্মিক খোরাক। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছি, বর্তমান পশ্চিমা ধনাঢ্য সমাজে আধ্যাত্মিক খোরাকের অভাবে অনেকেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বস্তুতান্ত্রিক দর্শন-জ্ঞান মানুষের মৌলিক আত্মিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ। সুতরাং যে দর্শনে ধর্মের স্থান নেই, সেটি মূলত স্থিতিহীন নড়বড়ে জ্ঞান, বাহ্যিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে তা পরিপূর্ণ কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে তার বিচরণ একেবারে নেই। আসলে দর্শনে যদি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ ঘটে তবেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারে। প্রভুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে প্রভুর সৃষ্ট জগত নিয়ে গবেষণা করে জ্ঞানার্জন হয় বটে, কিন্তু আসল ঐশীজ্ঞান থেকে বিস্মৃত থাকতে হয়। এককথায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে জ্ঞানচর্চা যদি ঈমানী শক্তি সহকারে সম্পাদিত হয় তবে প্রকৃত জ্ঞানবান হওয়ার সম্ভাবনা উন্মোচিত হতে পারে। অতীতে অনেক জ্ঞানতাপসরা এ উপায়েই জ্ঞানচর্চা করে জগতে চিরন্তন সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেসাথে পৃথিবীর মানুষের জন্য রেখে গেছেন স্থায়ী কল্যাণ।

(গ) বৈষয়িক উৎকর্ষতা ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা

মানবেতিহাস ঘাটালে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইতিহাসের শুরু থেকেই ক্রমান্বয়ে বৈষয়িক দিক থেকে মানুষ উন্নতিসাধন করে আসছে। সুতরাং আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যে বৈষয়িক উন্নতিসাধনে ধর্মবিরোধী দার্শনিক চিন্তা-চেতনা ক্রিয়াশীল ছিলো বা আছে তা বলা মোটেই যুক্তিসম্মত নয়। আসলে এ প্রতিক্রিয়ার মূলে ছিলো, ইউরোপীয় চার্চ কর্তৃক বিজ্ঞান-বিরোধী অবস্থান।

মধ্যযুগের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত এই চার্চ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধনে বাঁধা দিতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবেই চার্চের নিজস্ব ব্রাণ্ডের ধর্মের বিরুদ্ধে রেশনালিজম, যুক্তিবাদ, মেটেরিয়ালিজম, রোমান্টিসিজম প্রভৃতি দার্শনিক ও

অর্থনৈতিক থিওরী আত্মপ্রকাশ করে। অথচ এই একই সময়ে বা পিরিয়ডে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা পুরোদমে হচ্ছিলো অন্যত্র। এই গবেষকরা ধার্মিক ছিলেন। এরা কখানো ধর্ম থেকে বা ধর্ম-বিশ্বাস ধেকে বিজ্ঞানচর্চায় কোন ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হন নি।

বিজ্ঞানের এই ধর্ম থেকে মুক্ত গবেষণার ক্ষেত্রটি ছিলো ইসলামী দুনিয়া। ইসলাম এবং এর নিষ্কলুষ সত্যবিশ্বাস এতোই পবিত্র যে, মানবীয় জ্ঞানচর্চায় এটা কোনদিনই বাঁধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হয় যে, বর্তমানে কিছু কছু মুসলমান নামধারী চিন্তাশীলরা এ সত্য উপলদ্ধি করতে পারেন না। তারা পশ্চিমা দার্শনিক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে অতীতে পশ্চিমারা যেরূপ খস্টবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, এখন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপচেষ্টায় মরিয়া হয়ে লেগেছে। অথচ আসল সত্য হলো, বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে ইসলামের সংঘাত মৌলিকভাবে কাল্পনিক। হ্যাঁ, সংঘাত তখনই হয়, যখন প্রগতিবাদের নামে, সেক্যুলারিজমের নামে, ইসলামকে উৎখাত কারার চেষ্টা চলে। দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান মানুষের যেসব মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য চেচামেচি করছে, তা সবই ইসলাম দান করেছে। বৈষয়িক উন্নতিসাধনের জন্য যে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কথা পাশ্চাত্যবাদীরা বার বার উচ্চারণ করে যাচ্ছেন, তা-ও ইসলামের সাথে সংঘাতময় নয়। বরং ইসলামই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অতীতে বিরাট অবদান রেখে গেছে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যাটা আসলে শিক্ষাক্ষেত্রে। পশ্চিমে যে শিক্ষা আধুনিক যুগের শুরুতেই প্রয়োজনীয় ছিলো, অর্থাৎ খৃস্টবাদের অদ্ভুত মানবতৈরী ধর্ম-বিশ্বাস বিরোধী শিক্ষা- তা আজো আমাদের সমাজে বিদ্যমান। আমাদের বাচ্চাদের এটা শিক্ষা দেওয়া হয় না যে, ইসলামী চেতনা ও বিশ্বাসকে বুকের মধ্যে লালন করেও এ জগতে আমরা আর্থ-মাসাজিক ও নৈতিক দিক থেকে সুসভ্য ও উন্নত জাতি হিসেবে শির উত্তোলন করতে পারবো। এটা শিক্ষা দেওয়া হয় না যে, অতীতে আমাদেরই পূর্বসুরী শত শত বিজ্ঞানী ও জ্ঞানতাপসরা সমগ্র মানবজাতির জন্য অশেষ অবদান রেখে গেছেন। বস্তুত তাদেরকে একথা জানানো হচ্ছে না, “ধর্ম-বিশ্বাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে এক অপরূপ সামঞ্জস্য ইসলামে বিদ্যমান।”

মুসলমান নতুন প্রজন্ম এসব সত্য থেকে বঞ্চিত। অবশ্য এর জন্য দায়ি আমাদের তথাকথিত পাশ্চাত্যের বস্তাপঁচা জ্ঞানে জ্ঞানবান মুসলমান নামধারীরাও। এ অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন এখনই আনা জরুরী। শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামী ধর্ম-দর্শন ছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একই সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ অপরিহার্য।

ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন ও আধ্যাত্মিক খোরাকের যোগান দেওয়া হবে। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে বৈষয়িক উন্নতিসাধন ও রব্বুবিয়াতের স্বরূপ জানা যাবে। এ দু'টি জ্ঞানের শাখার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে এক অপরূপ সামঞ্জস্যতা। এ সামঞ্জস্যতার স্বরূপ আসলে কী তা জানতে হলে যে কোন 'ইসলাম ধর্মে অটল বিশ্বাসী' বিজ্ঞানীর সাথে আলাপ করে দেখুন। ঈমানের অধিকারী বিজ্ঞানীদের চিন্তা-চেতনা উন্মোচিত। আল্লাহর রব্বুবিয়তের অত্যাশ্চর্য পদ্ধতি তাদের সামনে খোলা। এতে তাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের ভেতর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মানুষের চিন্তা-চেতনা-প্রাণ থেকে বস্তু জগতের প্রতিটি অণু-কণা যে আল্লাহ পাক নিয়ন্ত্রণ করছেন, একজন বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তা স্বচ্ছ পানির মতো পরিষ্কার, দিবালোকের মতো উজ্জ্বল।

শেষকথা: ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের উপর এই গবেষণামূলক গ্রন্থটির মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সকাশে অল্প-বিস্তর কিছু তথ্যাদি তুলে ধরলাম। বিষয় যেহেতু ব্যাপক, তাই একটিমাত্র গ্রন্থে পুরো তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। এই গ্রন্থটি পাঠকসমাজে যদি সমাদৃত হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছা হলে এবং আমাকে তিনি হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে হয়তো এ বিষয়ের উপর আরও লেখালেখি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেব- আমি আপনাদের সবার কাছে দোয়াপ্রার্থী।

উপসংহারের শেষে মানবতার ভবিষ্যৎ নিয়ে দু'চারটে কথা ব্যক্ত করতে চাই। ঈসায়ী একবিংশ শতকের নতুন ঊষার আলো আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে। বিগত সহস্রাব্দিতে পাশ্চাত্যে উদ্বুদ্ধ ধর্ম-বিরোধী তথা কলুষিত চার্চ-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবজীবনে দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশা নেমে এসেছিলো। মধ্যযুগের শুরুতে অন্ধকারকে ভেদ করে চিরন্তন সত্যের আলো আল-ইসলাম জগতে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেছিলো। তারপর পঞ্চদশ শতক থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইসলামসহ পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসে পাশ্চাত্যের উত্থান ও এর প্রতিক্রিয়া বিরাট ক্ষতিসাধন করে। এ ক্ষতির খেসারত আজো পৃথিবীর মানুষ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মহাসত্য কখনো চাপা দিয়ে রাখা যায় না। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন প্রভৃতি প্রতিটি কোণ থেকে প্রচণ্ড চাপের মুখে একমাত্র ইসলাম ধর্মই শির উত্তোলন করে ঠিকে আছে, থাকবেও। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস বিশেষ করে খৃস্টবাদ আজ সমূলে ধ্বংস হতে যাচ্ছে। খৃস্টানরা চাপের ঠেলায় ঐশীগ্রন্থ বাইবেলকে পর্যন্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংস্কার করতে বাধ্য হচ্ছেন। অবশ্য শুরু থেকেই আসল ইঞ্জিল কিতাবকে পরিবর্তন করা হয়েছিলো, এটা এখন ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু হাজার বছরের বুদ্ধিভিত্তিক, প্রযৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ষড়যন্ত্রমূলক চাপের সম্মুখে একটিমাত্র ধর্মবিশ্বাস বীরের মতো ঠিকে আছে। প্রতিটি আক্রমণকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়ে একবিংশ শতকে পদার্পন করেছে। এ ধর্মটিই হচ্ছে ইসলাম। ইসলামই তৃতীয় সহস্রাব্দি এবং পরবর্তী যুগসমূহের একমাত্র ধর্ম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম এ উন্নতির যুগে যে ধর্মবিশ্বাস সামঞ্জস্য ও শান্তির উৎস দিতে সক্ষম তা হচ্ছে ইসলাম। এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুত সম্প্রসারিত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইসলামে কোন অন্ধবিশ্বাসের স্থান নেই। কাল্পনিক তত্ত্ব-বাদ-মতবাদ-প্রতিবাদ নেই। প্রগতিবিরোধী কোন ইলেমেন্ট নেই। নেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে কোন সংঘাত। মানুষের নৈতিক দিক-নির্দেশনা, সুসভ্য সমাজ গঠনের উপাদান, জীবনের মূল্যবোধ, মানবাত্মার আধ্যাত্মিক খোরাক প্রভৃতি মানবিক মৌলিক প্রতিটি চাহিদা একমাত্র ইসলামই সঠিকভাবে যোগান দিতে পারে। ইসলামের

পবিত্র ঐশীসূত্রের সত্যতা আজ সর্বাপেক্ষা কট্টর ইসলামবিরোধীও স্বীকার করে নিয়েছে।

এখন কেউ যদি ধার্মিকতার খোঁজে বের হয় তবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও খোঁজার কোন পথ খোলা আছে কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর মানুষ একমাত্র ইসলামী জ্ঞান-দর্শন ও ঈমান থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি উপকৃত হবে। বৈষয়িক উৎকর্ষ সাধনে মনের শান্তি নিহিত নয়। মনের শান্তি নিষ্কলুষ ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক খোরাক থেকে আসে। এটা যে মহামন্ত্র যোগান দেয় তা হলো, **'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**। এই পবিত্র বাক্য প্রচার করার উদ্দেশ্যেই ধরার কোলো মানুষের অবির্ভাবের শুরু থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এঁর আগমন পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন প্রভুর পক্ষ থেকে।

আল্লাহর রব্বুবিয়াত বা পালনকারিতার উপরই ছিলো এই দীর্ঘ গ্রন্থের আলোচনার বিষয়বস্তু। এ থেকে আশাকরি পাঠকরা অনুধাবন করেছেন, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা একমাত্র ইসলাম ও এর মৌলিক মহাসত্যের চিরন্তন বাণী, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ -**'আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রেরিত রাসূল (বার্তাবাহক)'**-এর মধ্যে নিহিত। মানবসৃষ্ট কোন তন্ত্রমন্ত্র তথা দার্শনিক জ্ঞান ঈমানহীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে তা মূল্যহীন। মূলত মানুষ জ্ঞানকে সৃষ্টি করে নি বা করতে পারে না। জ্ঞান হচ্ছে প্রভুর সৃষ্ট দান। ঈমান সহকারে জ্ঞানার্জনে অগ্রসর হলেই উপকৃত হওয়া যায়- জ্ঞানবান হওয়া যায়। অথচ বিগত সহস্রাব্দিতে এর বিপরিত ধারায় জ্ঞানার্জনের চেষ্টা চালানো হয়েছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে। এখন এর ব্যর্থতা উপলব্ধি করা যাচ্ছে। আজ পশ্চিমা জগতই ঈমানহীন জ্ঞানচর্চার অসাড়তা অনুভব করতে পেরে স্বীকার করছে, এক 'মহাপ্রভু' আছেন, যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্তা, পালনকর্তা। তাঁকে স্বীকার করে মানবিক উৎকর্ষের চিন্তা করলে সুফল বেরিয়ে আসবে। এটা হবে স্থায়ী সুফল।

বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মানুষ তারায় তারায় ভ্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু এ ধরায় আজো নৈতিকতার বিড়ম্বনায় হাহাকার করছে শত শত কোটি মানুষ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যদি আমাদেরকে মহাবিশ্ব ঘুরে দেখার উপায় বের করে দেয়, তাহলে নৈতিকতা, জীবনবোধ, আধ্যাত্মিক খোরাক, সভ্যতা ও সামাজিক সাদৃশ্য কোন জিনিসটি দান করবে? মানবসৃষ্ট দর্শন-জ্ঞান তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে যাবতীয় মানবতৈরী বাদ-মতবাদও। ঐশীসূত্রে আলোকিত মহাসত্য একটি ধর্মবিশ্বাসই হবে এসব মৌলিক চাহিদা মোটাতে সক্ষম। আর এ মহাসত্য ধর্মের নামই হচ্ছে আল-ইসলাম। এ মহাসত্যের ঐশীসূত্র হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এর প্রাপক ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামান্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মাদ আহমাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিন্তাশীল, মানবতার কল্যাণকামী, প্রভুপ্রেরিত রাহমাতে আলম।

পৃথিবীর মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মহান ঐশিগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাহমাতুল্লিল আলামীনের জীবনাদর্শ পুরোপুরিভাবে অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যেই নিহিত।

পরিশিষ্ট-১

ইসলামী স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান: ইতিহাসবিদদের মতামত

[দ্রঃ আগেকার দিনের পশ্চিমা লেখকরা '**আরব**', '**মুহামেডান**' ইত্যাদি শব্দাবলী ইসলাম, মুসলমান, ইসলামী সভ্যতা প্রভৃতি বুঝাতে লিখতেন। পাঠকরা নিম্নোল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে এরূপ অনেক শব্দাবলী দেখতে পাবেন। এছাড়া আরও কিছু শব্দ আছে যেমন, '**সারাসিন**', '**মুরিশ**', এগুলোও মুসলামানদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু উদ্ধৃতি বদলানো যায় না তাই এসব শব্দাবলীর অর্থ সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে।]

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান ছিলো বিরাট। এ ব্যাপারটি আধুনিককালে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। তবে অতীতে ইউরোপীয় লেখকরা মুসলমানদের অবদানের কথা স্বীকার করতে বেশ কষ্টবোধ করেছেন। ইতিহাস বিকৃতির এসব ব্যাপার-স্যাপার আজ সর্বজনস্বীকৃত। কোন কোন লেখকরা তো এরূপ কার্যকলাপকে নিন্দা করেছেন। এর প্রমাণ আমরা পরবর্তীতে উদ্ধৃত ইউরোপীয় কিছু লেখকের কথার মধ্যেই দেখতে পাবো।

তবে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে, প্রাচ্যের মুসলিম লেখকরা পর্যন্ত ইউরোপীয়দের ঐসব বিকৃত ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করে নিয়েছেন এবং মুসলিম স্বর্ণযুগে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে নীরবতা পালন করছেন। আমাদের পূর্বসুরী মুসলিম জ্ঞানবানদের গৌরবময় অবদান সম্পর্কে জানা থেকে বঞ্চিত থাকাটা তো আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক আত্মঘাতী ব্যাপার। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে আমরা 'এলিয়েন' বা 'ফরেন' কিছু বলে মনে করছি- যা মোটেই সত্য নয়।

যা হোক, এই গ্রন্থের অন্যান্য পরিচ্ছেদ ও বিশেষকরে ইউরোপীয় লেখকদের উদ্ধৃতি থেকে এসব ভ্রান্ত ধারণা চিরতরে মুছে যাবে এটাই আশা। আমরা এবার

গৌরবের সঙ্গে বলতে পারবো যে, বিজ্ঞান ইসলাম ও মুসলমানদের স্বর্ণযুগে শতধাপ এগিয়েছিলো, আর মুসলমান হিসেবে সত্যিই আমরা গর্বিত। এছাড়া এটাও স্পষ্ট যে, ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সংঘাত নেই- কিন্তু এ কথাটি ইহুদী-খস্টবাদের বেলা ভিন্ন। তাদের পাদ্রীরা গ্যালিলিও গ্যালিলাই [১৫৬৪-১৬৪২] এর মতো বিজ্ঞানীকে গৃহবন্দী করেছিলেন। অথচ মুসলিম বিজানীদের অনেকে ছিলেন আল্লাহর ওলি- তথা একদিকে ধার্মিক ও অপরদিকে বিজ্ঞানী। এতে পরিষ্কার হয়েছে যে, বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে সামঞ্জস্য ছাড়া আর কিছু নেই।

১.
George Sarton's Tribute to Muslim Scientists in the "Introduction to the History of Science"

"It will suffice here to evoke a few glorious names without contemporary equivalents in the West: Jabir ibn Haiyan, al-Kindi, al-Khwarizmi, al-Fargani, al-Razi, Thabit ibn Qurra, al-Battani, Hunain ibn Ishaq, al-Farabi, Ibrahim ibn Sinan, al-Masudi, al-Tabari, Abul Wafa, 'Ali ibn Abbas, Abul Qasim, Ibn al-Jazzar, al-Biruni, Ibn Sina, Ibn Yunus, al-Kashi, Ibn al-Haitham, 'Ali Ibn 'Isa al-Ghazali, al-zarqab, Omar Khayyam. A magnificent array of names which it would not be difficult to extend. If anyone tells you that the Middle Ages were scientifically sterile, just quote these men to him, all of whom flourished within a short period, 750 to 1100 A.D." [George Sarton, "Introduction to the History of Science", Vol. I-IV," Carnegie Institute of Washington, Baltimore, 1927-31; Williams and Wilkins, Baltimore, 1950-53.]

ভাবার্থঃ মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি স্বরূপ জর্জ সারটন তার 'ইনট্রডাকশন টু দ্যা হিস্টরী অব সাইন্স' গ্রন্থে বলেন:
"এ প্রসঙ্গে ক'টি প্রখ্যাত উজ্জ্বল নাম প্রকাশই যথেষ্ট হবে যার তুলনা সমকালীন পাশ্চাত্যে ছিলো না: জাবির ইবনে হাইয়্যান, আল-কিন্দী, আল-খোয়ারিজমী, আল-ফারগানী, আর-রাজী, তাবিত ইবনে কুররা, আল-বাতানী, হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল-ফারাবী, ইব্রাহিম ইবনে সিনান, আল-মাসুদী, আত-তাবারী, আবুল ওয়াফা, আলী ইবনে আব্বাস, আবুল কাসিম, ইবনুল যাজ্জার, আল-বিরুনী, ইবনে সিনা, ইবনে ইউনুস, আল-কাসী, ইবনুল হাইসাম, আলী ইবনে ইসা আল-গাযযালী, আল-জারকাবী, উমর খৈয়াম। একটি উজ্জ্বল নামের তালিকা যা সহজে বর্ধিত করা যাবে। যদি কেউ আপনাকে বলে, মধ্যযুগ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নির্জীব ছিলো তাহলে, তাকে এসব নাম বলে দিন। এরা সবই ৭৫০ থেকে ১১০০ সাল- এই অল্প সময়ের মধ্যে কর্মশীল ছিলেন।"

২.

John William Draper in the "Intellectual Development of Europe"

"I have to deplore the systematic manner in which the literature of Europe has continued to put out of sight our obligations to the Muhammadans. Surely they cannot be much longer hidden. Injustice founded on religious rancour and national conceit cannot be perpetuated forever.
The Arab has left his intellectual impress on Europe." [John William Draper, "Intellectual Development of Europe"]

ভাবার্থঃ জন উইলিয়াম ড্রেপার তার "ইন্টেলেকচ্যুয়াল ডেভেলাপমেন্ট অব ইউরোপ" গ্রন্থে বলেন:

“সুপরিকল্পিতভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য মুহামেডানদের (মুসলমানদের) প্রতি আমাদের দায়িত্বাবলী যেভাবে উপেক্ষা করে যাচ্ছে তা ঘৃণার চোখে দেখতে আমি বাধ্য। অবশ্যই, এগুলো (মুসলমানদের অবদান) আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। ধর্ম ও রাজনীতিক স্বার্থে যেসব অবিচারের জন্ম হয় তা কোন দিনই সর্বকালের জন্য স্থায়ী হয় না।
ইউরোপের উপর আরবরা (মুসলমানরা) তাদের পাণ্ডিত্যের ছাপ রেখে গেছেন।”

৩.

Arnold and Guillaume in "Lagacy of Islam" on Islamic science and medicine.

"Looking back we may say that Islamic medicine and science reflected the light of the Hellenic sun, when its day had fled, and that they shone like a moon, illuminating the darkest night of the European middle Ages; that some bright stars lent their own light, and that moon and stars alike faded at the dawn of a new day - the Renaissance. Since they had their share in the direction and introduction of that great movement, it may reasonably be claimed that they are with us yet." [Thomas Arnold, "The Legacy of Islam," Oxford University Press, 1960.]

ভাবার্থঃ আরনল্ড এবং গিলাইউম তাদের “লেগেসী অব ইসলাম গ্রন্থে” বলেন:
“অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামিক মেডিসিন ও বিজ্ঞান হেলেনিক (গ্রিক) সূর্যের আলো ছিলো। দিনের শেষে তা ছিলো চাঁদের আলোর মতো যা ইউরোপীয় মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা অন্ধকার রাতকে আলোকিত করেছিল; কোন কোন উজ্জ্বল তারা নিজস্ব আলো দান করেছে এবং চন্দ্র ও তারাগুলো শেষ পর্যন্ত নব-প্রভাতের আলোতে বিলীয় হয়েছে- অর্থাৎ রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছে। যেহেতু এই মহান মুভমেন্টের গতি ও দিকনির্ণয়ে তারাও অংশগ্রহণ

করেছে তাই, এটা দাবী করা যায় যে, তারাও [মুসলামানরা] আমাদের সঙ্গে এখনও আছে।”

৪.

Robert Briffault in the "Making of Humanity"

"It was under the influence of the Arabs and Moorish revival of culture and not in the 15th century, that a real renaissance took place.

Spain, not Italy, was the cradle of the rebirth of Europe. After steadily sinking lower and lower into barbarism, it had reached the darkest depths of ignorance and degradation when cities of the Saracenic world, Baghdad, Cairo, Cordova, and Toledo, were growing centers of civilization and intellectual activity. It was there that the new life arose which was to grow into new phase of human evolution. From the time when the influence of their culture made itself felt, began the stirring of new life. [Robert Briffault, "The Making of Humanity," London, 1938.]

ভাবার্থঃ রবার্ট ব্রিফ তার “মেকিং অব হিউম্যানিটি” গ্রন্থে বলেন:

“আরব ও মুরিস (স্পেনীয়) কালচারেল প্রভাবের ফলেই- যা পঞ্চদশ শতকে ছিলো না- আসল রেনেসাঁ সংঘটিত হয়।

ইতালী নয়, স্পেন ছিলো ইউরোপের নবজন্মের সূত্র। (ইউরোপ) ক্রমাগত নীচের দিকে ধাবিত হয়ে বর্বরতায় পতিত হয়। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞতার ভীষণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যখন, একই সময় সারাসেনিক বিশ্ব তথা বাগদাদ, কায়রো, কুর্দোভা এবং টলেডো ছিলো পাণ্ডিত্য ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। ঐসব স্থানেই নব-

প্রাণের জন্ম নিয়েছিল, যা পরবর্তীতে মানব সভ্যতার বিকাশে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। যখন তাদের কৃষ্টির প্রভাব পড়া শুরু হলো, তখন থেকেই নতুন জীবনের নড়াচড়া ও সূচনা হয়।"

৫.

F.G. Alfalo in "Reguilding the Crescent"
"His (al-Khwarizmi) works in arithmetic and algebra were translated into Latin by the name of Algorithm (which should have been Algorism). His name is the origin of the word Logarithm."

ভাবার্থঃ এফজি আলফালো তার গ্রন্থ "রিগিল্ডিং দ্যা ক্রেসেন্ট"-এ বলেন:
"পাটীগণিত ও বীজগণিতের উপর তার (আল-খোয়ারিজমীর) গবেষণাকে লেটিন ভাষায় তরজমা করা হয় **'আলগরিথম'** নামানুসারে (যা বাস্তবে হওয়ার কথা ছিলো- আলগরিজম)। তার (আল-খোয়ারিজমীর) নামই হচ্ছে **'লগেরিথম'** শব্দের সূত্র।"

৬.

Joseph Hell in the "Arab Civilization"

"In the domain of trigonometry, the theory of Sine, Cosine and tangent is an heirloom of the Arabs. The brilliant epochs of Peurbach, of Regiomontanus, of Copernicus, cannot be recalled without reminding us of the fundamental and preparatory labor of the Arab Mathematician (Al-Battani, 858-929 A.D.)."

"The adoption of the sign of 'Zero' (Arabic Sifr or Cipher) was a step of the highest importance, leading up to the so

called arithmetic of positions. With the help of the Arab system of numbers, elementary methods of calculations were perfected; the doctrines of the properties of, and relations between, the equal and the unequal and prime numbers, squares and cubes, were elaborated; Algebra was enriched by the solution of the third degree and fourth degrees, with the help of geometry, and so on. About the year 820 A.D. the mathematician Al-Khawarizmi, wrote a text book of Algebra in examples, and his elementary treatise - translated into Latin - was used by Western scholars down to the sixteenth century." [Joseph Hell, "The Arab Civilization." Tr. Khuda Baksh, Lahore 1943.]

ভাবার্থঃ "আরব সিভিলাইজেশন" নামক গ্রন্থে জসেফ হেল লিখেছেন:
"ট্রিগোনমেট্রির ক্ষেত্রে সাইন, কসাইন ও টানজেন্ট এর থিওরী হচ্ছে আরবদের আবিষ্কার। পিউরবাখ, রিজিওমন্টেনাস, কোপারনিকাসদের মেধাপূর্ণ যুগকে আগেকার দিনের আরব গাণিতিকদের (আল-বাতানী, ৪৫৮-৯২৯ ঈসায়ী) কঠিন সাধনার কথা মনে রাখা ছাড়া স্মরণ করা সম্ভব হবে না।

তিনি আরো বলেন:
"শূণ্যকে (০-কে- আরবীতে সিফ্‌র বা সাইফার বলে) একটি সংকেত দ্বারা উপস্থাপন করার পদক্ষেপ ছিলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ ব্যাপার। এ থেকেই পজিশনের পাটীগণিত এর জন্ম হয়। আরবদের সংখ্যা সিষ্টেমের সাহায্যে মৌলিক অঙ্ককষা সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া হয়; সমতা ও অসমতার রূপ, প্রাইম নাম্বার (অবিভাজ্য সংখ্যা), সংখ্যার স্কোয়ার ও কিউব (গুণ ও ত্রি-গুণ), প্রতিষ্ঠিত হয়; তৃতীয় ও চতুর্থ ডিগ্রীবিশিষ্ট বীজগণিতের সমীকরণের সমস্যাবলীর সমাধান বের হয় জ্যামিতির সাহায্যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ৮৪০ সালে গণিতবিদ আল-খোয়ারিজমী দৃষ্টান্তসহ বীজগণিতের উপর একখানা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

এবং তার সেই মৌলিক গ্রন্থখানা লেটিন ভাষায় ভাষান্তর করা হয়, যা পশ্চিমা গবেষকরা ষষ্টদশ শতাব্দি পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন।”

৭.

Carra de Vaux in the "Legacy of Islam"

"Arithmetic and algebra also flourished alongside of astronomy. This was the period of the cerebrated al-Khwarizmi whose name, corrupted by the Latin writers of the West, gave us, it so believed, the term Algorism (sometimes written Algorithm)." [Carra de Vaux, "Legacy of Islam" and "The Philosophers of Islam."]

ভাবার্থঃ কারা ডি ভো তার প্রখ্যাত “লেগেসী অব ইসলাম” গ্রন্থে বলেন:
“পাটীগণিত এবং বীজগণিতও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সাথে উন্নত হতে থাকে। এটা ছিলো সুপ্রসিদ্ধ আল-খোয়ারিজমীর যুগ যার নাম লেটিন লেখকরা বদলে দিয়ে আলগোরিজম (কোন কোন সময় লেখা হয় আলগোরিথম) করেন।

৮.

De Lacy O'Leary in "Arabic Thought in History"

"The Greek material received by the Arabs was not simply passed on by them to others who came after. It has a very real life and development in its Arabic surroundings. In astronomy and mathematics, the work of the Greek and Indian scientists was coordinated and there a very real advance was made. The Arabs not only extended what they had received from the Greeks but checked and corrected older records."

ভাবার্থঃ ডি লেসী ওলিয়েরী "আরাবিক থট ইন হিস্টরী" গ্রন্থে মন্তব্য করেন: "গ্রীস বিষয়াদি আরবদের হাতে এসে সরলভাবে পরবর্তীদের নিকট শুধু পৌঁছে দেওয়াই হয় নি, এগুলো আরব পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস্তব জীবনপ্রাপ্ত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতে গ্রীক ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে একত্রিত করে তারা (আরবরা) বাস্তব উন্নয়ন সাধন করেন। আরবরা গ্রীকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিষয়াদিগুলো শুধু বর্ধিত করেননি বরং পরীক্ষা করে পুরাতন রেকর্ডকে সংশোধিত করেছেন।"

পরিশিষ্ট-২

ইতিহাস বিকৃতি ও সত্যকে চাপানোর কয়েকটি দৃষ্টান্ত

এ প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে পশ্চিমা লেখকদের ইতিহাস বিকৃতি ও সত্যকে চাপানোর বেশ ক'টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরবো। এ লেখা পাঠ শেষে ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অনেকের ধারণা বদলে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পাঠকরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবেন- এ অনুরোধ করছি।

আমরা অনেকেই এই ধারণা পোষণ করে থাকি যে, বিজ্ঞান মূলত পশ্চিমা চিন্তাবিদদের একক চেষ্টার ফসল। অনেক জ্ঞানকোষে বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় ঠিক এ কথাটিই ঢালাওভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এসব গ্রন্থাবলী পাঠ করলে সত্যিই মনে হয় অতীতে ও বর্তমানে বিজ্ঞান মূলতঃ ইউরোপ-আমেরিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি জ্ঞানচর্চা। যেমন বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপর লেখালেখি বা আলাপচারিতায় আমরা যেসব নাম দেখতে পাই তাদের ক'টি হলো: গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, কেপলার, বেকন, নিউটন, ডা-ভিনসি, বেনজামিন ফ্রাংকলিন প্রমুখ। যদিও ইতিহাসের শেষের দিকে এসব নাম উল্লেখ করা জরুরী। কিন্তু তাই বলে আগেকার দিনের মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম ও অবদান সম্পর্কে গাফিল থাকার মধ্যে রহস্য কী হতে পারে? এতে তারা এটাই বুঝাতে চান যে, ইউরোপ-আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রসিদ্ধ কালচার থেকে বিজ্ঞানের উপর অবদান ছিলো অত্যল্প! অধিকাংশ লেখায় আমরা ভারতবর্ষ, চীন এবং বিশেষকরে মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম খুব বেশী দেখি না।

পশ্চিমা সভ্যতা যে বিজ্ঞানের উপর মহামূল্যবান অবদান রেখেছে তা আমরা কখনো অস্বীকার করি না। কিন্তু একই অবদান অন্যান্য সভ্যতা থেকেও এসেছে, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। বিজ্ঞান মূলত সমগ্র মানবতার অবদান। এজন্য কোন বিশেষ দেশ, জাতি বা সভ্যতাকে এককভাবে গৌরবান্বিত করা

আদৌ ঠিক হবে না। হ্যাঁ- ভারত, চীন, মেসোপটামিয়া, মিশর, গ্রীক, রোম, মুসলিম ইত্যাদি সভ্যতা তাদের স্বর্ণযুগে কালজয়ী অবদান রেখেছে।

পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের বেশ ক'টি আবিষ্কার অনেক আগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা করে গেছেন। সুতরাং বিজ্ঞানের মৌলিক অনেক বিষয়াদি যে মুসলমানদের আবিষ্কার তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এবার দেখা যাক পশ্চিমা লেখকরা কিভাবে ইতিহাস বিকৃত করেছেন।

এখানে উল্লেখিত তথ্যাবলীর সূত্র হলো 'ওয়ার্লড বুক ইনসাইক্লোপিডিয়া', 'ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা', 'এনকার্টা ইনসাইক্লোপিডিয়া' এবং আইজাক আসিমভের 'ক্রোনোলজী অব সাইন্স এন্ড ডিসকোভারী'। অন্যান্য তথ্যাবলী এসেছে এই গ্রন্থের প্রমাণপুঞ্জীতে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক থেকে।

১.

মানুষ আকাশপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে- রজার বেকন [১২২০-১২৯২] উড়ো দেওয়ার একটি যন্ত্র অঙ্কন করেছেন। এছাড়া লিনার্ডো দা-ভিনসি [১৪৫২-১৫১৯] অনেক আগে উড়োজাহাজ বা হেলিকপ্টারের কল্পনা এবং অনেক চিত্রাঙ্কনও করে গেছেন।

তবে এ দু'জনার অনেক আগে ৮০০ সালে আব্বাস ইবনে ফিরনাস [৮১০-৮৮৭ ঈ.] নামক এক স্পেনীয় মুসলিম বিজ্ঞানী একটি উড়োজাহাজ ডিজাইন, তৈরী ও টেস্ট ফ্লাইট করে গেছেন। রজার বেকন ইবনে ফিরনাসের আরবী লেখা থেকে উড়ন্ত মেশিন সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য বেকন ফিরনাসের ৫০০ বছর এবং দা-ভিসনি ৭০০ বছর পর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। সুতরাং কে সর্বপ্রথম উড়োজাহাজের ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন, এ প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে ইবনে ফিরনাসের নাম উল্লেখ করাটাই হবে সঠিক।

২.
কাচের তৈরী আয়না কবে প্রথম নির্মিত হয়েছিল, এর জবাবে বলা হয়- **১২৯১** সালে ইতালির ভেনিস শহরে তা প্রথম তৈরী হয়।

ইসলামী ইতিহাস থেকে জানা যায়, একাদশ শতাব্দিতেই কাচের তৈরী আয়না মসুলিম স্পেনে ব্যবহৃত হয়েছে। ভেনিসের লোকেরা তাদের কাছ থেকেই আয়না তৈরীর পদ্ধতি শিখেছিল। সুতরাং প্রথম কাচের আয়নার আবিষ্কারক ছিলেন মুসলিম স্পেনিশরা- ভেনিসের কেউ নয়।

৩.
ঘড়ি সম্পর্কে বলা হয়েছে- চতুর্দশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র পানি-ঘড়ির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। **১৩৩৫** সালে ইতালির মিলান শহরে একটি বড় আকারের যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মিত হয়। এটাই সম্ভবত প্রথম 'ওজন দ্বারা চালিত' ঘড়ি।

স্পেনের মুসলিম ইঞ্জিনিয়াররা একাধিক ধরনের ঘড়ি নির্মাণ করেছিলেন। এগুলো বড় ও ছোট আয়তনের ছিলো। তাদের ঘড়ি তৈরির জ্ঞান পরবর্তীতে লেটিন ভাষায় অনুদিত বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ঘড়ি ছিলো ওজন চালিত। ঘড়ির ডিজাইনের মধ্যে গিয়ার ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। একটি ঘড়ির মধ্যে মারকারী বা পারদের ব্যবহার লক্ষণীয়। এটা পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয়ানরা নকল করেছিল। এছাড়া আব্বাস ইবনে ফিরনাস [৮১০-৮৮৭ ঈ.] নবব দশকে একটি ঘড়ি তৈরী করেছিলেন বলে জানা যায়। এটা সঠিক সময় নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। মসুলমানরা অবজারভেটরী বা মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্যও উচ্চমানের এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ঘড়ি তৈরী করেছিলেন।

৪
বলা হয়েছে- সপ্তদশ দশকে গ্যালিলিও টিনেজ থাকাকালেই সর্বপ্রথম পেন্ডালাম আবিষ্কার করেন। তিনি একটি ঝাড়বাতির গতি লক্ষ্য করার পর বাড়িতে ফিরে পেন্ডালাম তৈরী করেন।

তবে ইতিহাস থেকে জানা যায়, দশম শতকে মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে ইউনুস আল-মিসরী [৯৫০-১০০৯ ঈ.] সর্বপ্রথম পেন্ডালাম আবিষ্কার করেন। তিনি এর গতির উপর গবেষণা করে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই গবেষণা পনর শতকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় ব্যবহার করেছেন। তাহলে বুঝা গেল, কে পেন্ডালামের আসল আবিষ্কারক।

৫

আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয় যে, গতিশীল টাইপ-মেশিন ও প্রিন্টিং প্রেস পঞ্চদশ শতকে জার্মান বিজ্ঞানী জোহান্স গোথেনবার্গ [১৪০০-১৪৬৮] আবিষ্কার করেন।

বাস্তবে, ১৪১৫ দশকে গোটেনবার্গ যা আবিষ্কার করেছিলেন তা ছিলো মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের প্রিন্টিং প্রেস। কিন্তু, প্রিন্টিং প্রেসের আবিষ্কারক তিনি ছিলেন না- কারণ, এর ১০০ বছর আগে মুসলিম স্পেনে গতিশীল টাইপ-মেশিন ও প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহৃত হয়েছে বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

৬

বলা হয়েছে, আধুনিক অপটিক্স বা আলোকবিজ্ঞানের আবিষ্কারক ছিলেন আইজাক নিউটন [১৬৪২-১৭২৭]। সপ্তদশ শতকে তিনিই সর্বপ্রথম প্রিজম, লেন্স ইত্যাদি ব্যবহার করে আলোকবিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছেন।

কথাটি মোটেই সঠিক নয়! নিউটনের অনেক আগে একাদশ শতকে মুসলিম বিজ্ঞানী আল-হাইসাম [৯৬৫-১০৪০ ঈ.] অপটিক্স সম্পর্কে নিউটন যা করেছেন তার প্রায় সবক'টি তথ্যই আবিষ্কার করে ফেলেন। অপটিক্স বা আলোকবিজ্ঞানের জন্মদাতা যে আল-হাইসাম ছিলেন এখন তা সবাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মানেননি ইউরোপীয় স্বার্থবাদী কিছু লেখক ও ইতিহাসবিদ।

নিউটন যে আল-হাইসাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে ব্যাপারে খুব বেশী সন্দেহ নেই। মধ্যযুগে সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্ধৃতি যার দেওয়া হতো তিনি ছিলেন আল-হাইসাম।

৭

আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়, সপ্তদশ দশকে আইজাক নিউটন আলোর মধ্যকার সাতটি রং বা স্পেকট্রাম আবিষ্কার করেছিলেন। এ কথাটি অবশ্য আমিও বিজ্ঞানের ইতিহাস খণ্ডে বোধ হয় উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরবর্তীতে যা জানতে পারলাম তাতে অবাক হয়েছি।

আসলে আল-হাইসাম ব্যাপারটি পুরোপুরিভাবে আবিষ্কার করেছেন। এর উপর গবেষণায় অপর এক বিজ্ঞানী- যার নাম ছিলো কামাল উদ্দীন, আরও অগ্রসর হন। উল্লেখ্য কামাল উদ্দীন চতুর্দশ শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন। স্পেকট্রামের আবিষ্কারক একজন মুসলিম বিজ্ঞানী- এ কথাটি বোধহয় কারো জানা ছিলো না। এখন থেকে আমরা বিষয়টি জেনে সত্যিই আগেকার যুগের এসব মহাত্মনদের কথা স্মরণ করে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

৮

শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, বস্তুর মৌলিকত্ব যে অপরিবর্তনীয় তা প্রথম আবিস্কার করেন অষ্টাদশ শতকে লেভোইজিয়ার [১৭৪৩-১৭৯৪] নামক এক বিজ্ঞানী। তিনি লক্ষ্য করেন, বস্তু বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার আয়তন ও আকার বদলায় বটে কিন্তু তার ওজন বা ম্যাস সর্বদাই সমান থাকে। যেমন, পানি তাপের ফলে বাষ্পে পরিণত হওয়া কিংবা লবণ পানিতে গলে যাওয়া অথবা একখণ্ড কাঠ যদি জ্বালিয়ে ছাই করা হয়- এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বস্তুর ওজন অপরিবর্তন অবস্থায় থাকে।

এই ব্যাপারটির আবিষ্কারক কিন্তু লেভোইজিয়ার মোটেই নন। এই তথ্য নিয়ে অনেক অনেক আগে প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী আবু রাইহান আল-বিরুনী [৯৭৩-১০৪৮ ঈ.] আলোচনা করেছেন। স্বয়ং লেভোইজিয়ার আল-বিরুনীর পুস্তকাদি ও আবিষ্কারের কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন। তিনি বলতেন, আমি তার শিষ্য।

৯

বলা হয়, ট্রিগোনমেট্রি (ত্রিকোণমিতি) নামক গণিত শাস্ত্রের আবিষ্কারক ছিলেন গ্রীকরা। কিন্তু তা কী বাস্তব?

গ্রীসে ট্রিগোনমেট্রি ছিলো থিওরিটিক্যাল বিজ্ঞান। এটা আসলে মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে এসে উৎকর্ষ লাভ করে। আর এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী গবেষণা করেছিলেন আল-বাতানী [৮৫৮-৯২৯ ঈ.]। এই বিষয়ের মৌলিক শব্দাবলীও আরবী থেকে এসেছে। যেমনঃ- সাইন, কোসাইন এবং টানজেন্ট। সুতরাং ট্রিগোনমেট্রিতে গ্রীকদের মৌলিক অবদান ছিলো অত্যল্প।

১০

বলা হয়ে থাকে- অঙ্ক শাস্ত্রে ডেসিমেল পয়েন্টের ব্যবহার আবিষ্কার করেন ১৫৮৯ সালে ডাচম্যান সাইমন স্টিভেন [১৫৪৮-১৬২০]। তিনিই গাণিতিক ভগ্নাংশকে ডেসিমেল পয়েন্ট দ্বারা লেখার পদ্ধতি দেখিয়েছেন। যেমনঃ- ১/২ কে ০.৫- এভাবে লেখা।

কিন্তু আমরা জানি এই ডেসিমেলের ব্যবহার ইসলামী বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গিয়াস উদ্দীন আল-কাসী [১৩৯০-১৪৫০ ঈ.] তার গ্রন্থ (অনূদিত নাম) 'কী টু এরিথম্যাটিকক্স'-এ ডেসিমেলর ব্যবহারের কথা বলেছেন। তিনি স্টিভেনের শতাধিক বছর আগে জীবিত ছিলেন।

১১

বলা হচ্ছে, বীজগণিতে ব্যবহারের জন্য অনেক সংকেত ব্যবহৃত হয়। এগুলোর ব্যবহার সর্বপ্রথম শুরু করেন ফ্রাংকয়েস ভিয়েতা [১৫৪০-১৬০৩] নামক এক গাণিতিক। তিনি ১৫৯১ সালে বীজগণিতের উপর একখানা বই লিখেছিলেন। এতে বীজগণিতের সমীকরণে বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত x এবং y অক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। আইজ্যাক আসিমভ [১৯২০-১৯৯২] বলেন, এটা এতোই

গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে- রোমান নাম্বার সিষ্টেম থেকে আরবী নাম্বার ব্যবহারের সাথে এর তুলনা চলে।

এসব কথা বলেন পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা। কিন্তু আসল সত্য কী তাই?

বীজগণিতের আবিষ্কারক মুসলিম বিজ্ঞানীরা। সেই নবম শতকেই সমীকরণের অজানা বস্তুকে অক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপন তারাই করেছেন। এরই মাধ্যমে তারা বীজগণিতের কঠিন সমীকরণ যেমন, কোয়াড্রেটিক (দু'টি পাওয়ারবিশিষ্ট সমীকরণ) এবং কিউবিক (তিনটি পাওয়ারবিশিষ্ট সমীকরণ) ইত্যাদির সমাধান করেছেন। তারা অবশ্য ইংরেজী বা লেটিন অক্ষর কিংবা x-y-z ব্যবহার করেন নি। এর বদলে ব্যবহার করেছেন আরবী অক্ষর। কিন্তু তাই বলে কিভাবে ইতিহাস বিকৃতিকরণে পারদর্শী ওসব লেখক বলেন, বীজগণিতে অক্ষর ব্যবহার প্রথম করেছিলেন ফ্রাংকয়েস?

১২

অঙ্ক শাস্ত্রের ক্ষেত্রে আরও বলা হয় যে, কঠিন কিউবিক সমীকরণ ষোল শতক পর্যন্ত সমাধানহীন অবস্থায় ছিলো। এরপর নিকোলো টারটাগিলা [১৪৯৯-১৫০০] নামক এক ইতালীয় গাণিতিক তার সমাধান দেন।

কথাটি একেবারেই ভ্রান্ত! ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি- বীজগণিতের তিন পাওয়ার-বিশিষ্ট সমীকরণ (কিউবিক) এর সমাধান মুসলমানরা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এরচেয়ে উচ্চতর ডিগ্রীবিশিষ্ট (চারটি পাওয়ার-বিশিষ্ট সমীকরণ) ইক্যুয়েশনের সমাধান তারা করে গেছেন। আর এসব হয়েছে সেই নবম ও দশম শতকে। উমর খৈয়াম [১০৪৮-১১৩১] এ বিষয়ের উপর বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর হাতে বীজগণিত বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।

১৩

অঙ্ক শাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা আরও দেখতে পাই, ইতিহাসবিদরা বলেন- সংখ্যা যে শূন্যের চেয়ে কম হতে পারে- অর্থাৎ নেগেটিভ নাম্বারের ধারণা ১৫৪৫ সালের

পূর্বে কোথাও জন্মে নি। এ বছর জিরোনিমো কারডানো [১৫০১-১৫৭৬] নামক এক ইতলীয় গাণিতিক এই ধারণার জন্ম দেন।

কিন্তু বাস্তবে এ ধারণার জন্ম হয়েছিল অনেক আগে। প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে মুসলিম গাণিতিকরা নেগেটিভ নাম্বারের ব্যবহার করেছেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

১৪

বলা হয়েছে, ১৬১৪ সালে স্কটিশ গাণিতিক জন নাপিয়ার [১৫৫০-১৬১৭] লগেরিথম নামক গণিতের শাখার আবিষ্কার করেন। তিনি লগ-টেবিলও তৈরী করেছিলেন।

কথাটা খাঁটি নয়! মুসলিম বিজ্ঞানীরা এর অনেক আগে লগেরিথমিক টেবিল তৈরী করেছিলেন। এই তালিকা ত্রয়োদশ শতকে ব্যবহৃত হয়েছে বলে সন্ধান পাওয়া যায়।

১৫

শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, সপ্তদশ দশকে ফরাসী বিজ্ঞানী রেনী ডেসকার্ট [১৫৯৬-১৬৫০] দেখিয়েছেন, বীজগণিত ব্যবহারের মাধ্যমে জ্যামিতি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি যে সিষ্টেম আবিষ্কার করেন তার নাম হলো 'কারটেসিয়ান সিষ্টেম'। এরই মাধ্যমে তিনি জ্যামিতির উৎকর্ষ সাধন করেন।

কিন্তু এই একই উৎকর্ষ সাধন অনেক আগেই মুসলিম গাণিতিকরা করেছিলেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। নবব শতকে ইবনে তাবিত আল-কুররা [৮২৬-৯০১ ঈ.] এবং পরবর্তীতে আবুল ওয়াফা [৯৪০-৯৯৮] কারটেসিয়ান সিষ্টেম ব্যবহার করেছেন। ওয়াফা একটি গ্রন্থে বিষয়টি তুলে ধরেন। অবশ্য সে সময় এর নাম 'কারটেসিয়ান সিস্টেম' ছিলো না- এই-যা।

১৬

অঙ্ক শাস্ত্রের ব্যাপারে আরও বলা হয়ে থাকে, আইজাক নিউটন [১৬৪২-১৭২৭] সর্বপ্রথম 'বাইনোমিয়েল থিওরেম' নামক গাণিতিক থিওরী আবিষ্কার করেন। এই থিওরীটি বীজগণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ।

অথচ শতাধিক মুসলিম বিজ্ঞানী নিউটনের ৭০০ বছর পূর্বেই বাইনোমিয়েল থিওরেম প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। দশম শতকে বীজগণিতের সমাধান করতে যেয়ে তারা এই থিওরেম ব্যবহার করেছেন।

১৭

বলা হয়, ত্রয়োদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রহগুলোর গতিবেগ সম্পর্কে গবেষণা তেমন বেশী হয় নি। এরপর স্পেনের আলফোনসো দ্যা ওয়াইজ [১২২১-১২৮৪] নামক এক বাদশাহ-বিজ্ঞানী আলফোনসাইন টেবিল আবিষ্কার করেন যা মিশরের আলেকজান্ড্রিয়ার ক্লোডিয়াস টলেমীর [১০০-১৭০ ঈ.] টেবিল থেকেও নির্ভুল ছিলো।

এ কথাগুলো সম্পূর্ণ সঠিক নয়। টলেমীর আবিষ্কারের উপর মুসলিম বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। তারা এসব তথ্যাদি আরও অধিক নির্ভুল করার জন্য ভীষণ চেষ্টা করেছেন। তারাই সর্বপ্রথম গ্রীক বিজ্ঞানীদের ধারণাকে খণ্ডন করে বলেন, সৌরজগতের কেন্দ্র হচ্ছে সূর্য এবং গ্রহগুলো এর চতুর্দিকে ডিম্বাকৃতি (এ্যলিপটিক্যাল) পথে ঘুর্ণমান আছে।

তারা শত শত, অনেকটা নির্ভুল জ্যোতির্বিজ্ঞানের টেবিল তৈরী করেছিলেন। এগুলো তারাসমগ্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি কিভাবে হয় তা বুঝাতো। তাদের কিছু কিছু অঙ্ক ও গবেষণা এতোই সঠিক ছিলো যে, এখনও অনেকে মনে করেন এগুলো আজকের যুগের। বাস্তবে আলফোনসাইন টেবিল মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণার নকল বৈ কিছু নয়!

১৮

আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, ইংরেজ বিজ্ঞানী রজার বেকন (১২২০-১২৯২) সর্বপ্রথম কাচের তৈরী চশমার ব্যবহারের মাধ্যমে চোখের দৃষ্টি উন্নতর করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন। আর এই একই সময়েই চীন ও ইউরোপে চশমার ব্যবহার শুরু হয়।

এই তথ্যটি সত্যিই ব্রেন-ওয়াস করার প্রয়াস মাত্র! কারণ, ইবনে ফিরনাস [৮১০-৮৮৭] মুসলিম স্পেনে নবব শতকেই চশমা আবিষ্কার করেছিলেন। স্পেনে প্রায় দুই শতাধিক যাবৎ চশমা তৈরী ও বিক্রি হয়েছে। বেকন যদি এ ব্যাপারে কিছু বলে থাকেন তাহলে অবশ্যই তিনি ইবনে হাইতামের কথার পুণরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। রজার বেকন প্রায়ই ইবনে হাইতামের গবেষণার কথা উদ্ধৃত করতেন।

১৯

জ্ঞানপুঞ্জিতে লেখা হয়েছে, ১২৪২ সালে রজার বেকনের গবেষণার ফলে ইউরোপে গানপাউডার আবিষ্কৃত হয়। সর্বপ্রথম গানপাউডারের ব্যবহার হয় চীনে। তারা বাঁশের চুঙ্গা দ্বারা বন্দুক বানাতো। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তারা এই বন্দুক ব্যবহার করেছে। সালফার ও কয়লা যুক্ত করে তারা গানপাউডার তৈরী করতো।

কিন্তু বাস্তব ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন! চীনারা গানপাউডার ব্যবহার করেছে সত্য। কিন্তু শুধুমাত্র স্ফূলিঙ্গ সৃষ্টিতে। সামরিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পর্কে তারা ছিলো সম্পূর্ণ গাফিল। সুতরাং এর ফরমুলাও তারা আবিষ্কার করে নি। রেইনোড ও ফেইভ নামক দুজন ইতিহাসবিদ পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে, মুসলিম কেমিষ্টরাই সর্বপ্রথম গানপাউডারের ফরমুলা আবিষ্কার করেন। এছাড়া তারা আরও দাবী করেছেন, মুসলমানরাই সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী করেন। বিশেষকরে চতুর্দশ শতকে ইউরোপের আক্রমণ থেকে আলগেরিকাস অঞ্চলের নিরাপত্তায় মুসলিম সৈন্যরা গ্রেনেডের ব্যবহার করেছেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

জিন মাথিস নামক একজন ইতিহাসবিদের মতে মুসলিম শাসকদের অস্ত্রাগারে রাইফেল, ক্রুড কেনন, সালফারের তৈরী বোমা ও গ্রেনেডের কারখানা ছিলো। অথচ এসব আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার তখনও ইউরোপে শুরুই হয় নি। কেননের ব্যবহার সম্পর্কে সর্বপ্রথম রেকর্ড মেলে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে লিখিত একখণ্ড আরবী পাণ্ডুলিপি থেকে। রজার বেকন গানপাউডারের তথ্যাদি সম্পর্কে লেটিনে ভাষান্তরিত আরবী পুস্তকাদি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সুরতাং এ ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক কিছুই আবিষ্কার করেন নি।

২০

আমাদেরকে বলা হচ্ছে, কম্পাসের ব্যবহার সর্বপ্রথম চীনারা করেছিলো। ১০০০ ও ১১০০ সালের মধ্যে মধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে তারা এর ব্যবহার করে। ইংলিশম্যান আলেকজান্ড্রার নেকাম (১১৫৭-১২১৭) মহাকর্ষ সম্পর্কে কম্পাসের ব্যবহার করেছিলেন। সর্বপ্রথম ব্যবহারের রেকর্ড এটাই।

বাস্তবে মুসলিম ভূগোল বিশেষজ্ঞরা সম্ভবত সর্বপ্রথম চুম্বকীয় সূচ সম্পর্কে চীনাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন। মুসলিম নাবিকরাই সর্বপ্রথম চুম্বকীয় সূচের ব্যবহার শুরু করেন। তারা পরে কম্পাস আবিষ্কার করেন ও এই জ্ঞান পশ্চিমে ছড়িয়ে দেন। বিশেষকরে পৃথিবী অনুসন্ধানের প্রাথমিক যুগে ইউরোপীয় নাবিকরা মুসলিম পাইলট ও তাদের কম্পাসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। গোল্ডাব লি বন এর মতে, মেগন্যাটিক সূচ ও কম্পাস মুসলমানদের আবিষ্কার। এর সাথে চীনাদের কোন সম্পর্ক নেই। চীনারা ও আলেকজান্ড্রার নেকাম মুসলমানদের কাছ থেকেই হয়তো এ সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন।

২১

আমাদেরকে বলা হয়েছে, ভূগোল বিদ্যাকে পুরাতন যুগের টলেমীর গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে পঞ্চদশ, ষষ্টদশ ও সপ্তদশ শতকে পুনর্জাগরণ করা হয়েছিল। ক্রুসেড ও স্পেনীয় / ওলন্দাজদের এক্সপিডিশনও এই পুনর্জাগরণের জন্য অনেকটা দায়ী। ভূগোলের উপর সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ইউরোপীয় স্কোলাষ্টিক যুগে লিখিত হয়েছিল।

এই কথাগুলো সম্পূর্ণ বাস্তববিরোধী! আসলে যা বলার কথা তাহলো, মুসলিম ভূগোলবিদরা অসংখ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। এতে আফ্রিকা, এশিয়া, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদির ম্যাপ তৈরী করা হয়। অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত এই তৎপরতা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু ছিলো। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা [১৩০৪-১৩৬৮/৬৯ ঈ.] পুরাতন বিশ্বের ভুগোলকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। ক্রুডেসের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল- এসাথে এসব সেক্টরে কর্মরত স্কলারদেরকে হত্যা ও গ্রন্থাদী ধ্বংস করা হয়। এর ফলে ভূগোলের ক্ষেত্রে পশ্চিমা জগত তেমন কিছুই পায় নি।

২২

পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা বুক ফুলিয়ে বলেন, রবার্ট বয়েল [১৬২৭-১৬৯১] সপ্তদশ দশকে কেমিষ্ট্রি বা রসায়নশাস্ত্রের শুরু করেন।

কিন্তু আসলে একাধিক প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী এই বিদ্যার জন্ম দেন। এরা হচ্ছেন আর-রাজী [৮৫৪-৯২৫ ঈ.], জাবির ইবনে হাইয়ান [৭২১-৮১৫ ঈ.], আল-বিরুনী [৯৭৩-১০৪৮ ঈ.] এবং আল-কিন্দী [৮০১-৮৭৩ ঈ.]। এদের জন্ম হয়েছিল বয়েলের ৭০০ বছর পূর্বে। দুরা নামক একজন ইতিহাসবিদ বলেন, মুসলমানরা এই বিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক উপায় সংযুক্ত করেছিলেন। অনেকের মতে মুসলমানরাই হচ্ছেন কেমিস্ট্রি শাস্ত্রের জন্মদাতা।

২৩

বলা হয়, লিনার্দো দা ভিনসি [১৪৫২-১৫১৯] ষষ্ঠদশ শতকে জিওলোজির (ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান) জন্ম দেন। তিনি লক্ষ করেন, পাহাড়ে প্রাপ্ত ফসিল থেকে বুঝা যায় পৃথিবীর সৃষ্টির মৌলিক বস্তু হচ্ছে পানি।

কথাটি বানানো ছাড়া আর কিছুই নয়! কারণ, আল-বিরুনী (১১ শতকে) এই একই জিনিস লক্ষ করেছিলেন। তিনি শুধু বিষয়টি আবিষ্কার করেন নি, এর উপর আরও গভীর গবেষণা চালান। জিওলোজির উপর তার লেখা একটি বিরাট গ্রন্থে

তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইবনে সিনাও [৯৮০-১০৩৭ ঈ.] এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন। এটা হয়তো সম্ভব যে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের লেখা বই-পুস্তক পাঠ করে দা ভিনসি বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। তার সময়ে অনেক আরবী গ্রন্থাদি লেটিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। তিনি নিজে এই বিষয়ের উপর কিছুই অতিরিক্ত করেন নি।

২৪

আমাদেরকে বলা হচ্ছে, গ্যালিলিও [১৫৬৪-১৬৪২] (সপ্তদশ শতকে) ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহান পরীক্ষক বিজ্ঞানী।

হ্যাঁ, তিনি পরীক্ষা-নীরিক্ষা অনেক করেছেন। তবে সর্বপ্রথম মহান পরীক্ষক তিনি মোটেই নন! কারণ, তার জন্মের শত শত বছর পূর্বে মহান বিজ্ঞানী আল-বিরুনী [৯৭৩-১০৪৮ ঈ.] শত শত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে গেছেন। বাস্তবে তিনিই ছিলেন মহান পরীক্ষক। তার লিখিত দুই শতেরও অধিক গ্রন্থে এসব পরীক্ষার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিজ্ঞানের উপর তার লেখলেখি ১৩,০০০ পৃষ্টার চেয়েও অধিক। গ্যালিলিওর লেখা থেকে তা অনেক বেশী।

২৫

আমাদের বলা হচ্ছে, উপত্যকা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল- সে ব্যাপারে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ফরাসী বিজ্ঞানী নিকোলাস ডেসমারেজ [১৬৫০-১৭৪০]। তিনি বলেন, যুগ যুগ ধরে গতিশীল পানির ফোর্স থেকে উপত্যকার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক আগেই ইবনে সিনা [৯৮০-১০৩৭ ঈ.] ও আল-বিরুনী [৯৭৩-১০৪৮ ঈ.] অনেক কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, তারা উপত্যকা সৃষ্টি কিভাবে হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২৬

বলা হয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখা প্যাথোলজির জনক ছিলেন ইতালীর জিওভানী মরগানি [১৬৮২-১৭৭১]। তিনিই নাকি সর্বপ্রথম রোগের স্বরূপ বুঝিয়ে দেন।

এ কথাগুলো সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। কারণ, এটা আজ সর্বজনবিদিত সত্য যে, মুসলিম ডাক্তাররাই ছিলেন প্যাথোলজির জন্মদাতা। তারা রোগের স্বরূপ শুধু বুঝতেন না বরং এ ব্যাপারে অনেক তথ্যবহুল বক্তব্য প্রদান করেছিলেন যা আধুনিক মেডিসিনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। ইবনে জোহর [১১৬২-১০৯৪ ঈ.] সঠিকভাবে বিভিন্ন রোগের স্বরূপ তুলে ধরেন যেমন- যক্ষ্মা। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে পানির ব্যাপারে আজ-জাহরাবী [৯৩৬-১০১৩ ঈ.] সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মানবদেহে রক্তের চলালন নিয়ে বিস্তারিত ও সঠিকভাবে আলেচনা করেন ইবনুল কুফ [১২৩৩-১২৮৬ ঈ.] ও ইবনুন নাফিস্ [১২১৩-১২৮৮ ঈ.]। মুসলিম ডাক্তাররা পেট ও ভাওয়েল এর ক্যান্সার নিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং প্যাথোলজির জনক জিওভানীকে বানানোর চেষ্টা সত্যিই অদ্ভুত ও যুক্তি-চিন্তার বাইরে।

২৭

আমাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আধুনিক অ্যানেসথেসিয়া (অজ্ঞান করার পদ্ধতি) উনবিংশ শতকে হামফেরী ডেভী [১৭৭৮-১৮২৯] ও হরেস ওয়েল্স [১৮১৫-১৮৪৮] আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু বাস্তবে তা মোটেই নয়! আধুনিক অ্যানেসথেসিয়ার ব্যবহার মুসলিম ডাক্তাররা আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে করে গেছেন। তাহলে এর আবিষ্কারক হামফেরী ডেভী ও হরেস ওয়েল্স হলেন কি করে? মুসলিম সার্জেন্টরা অসংখ্য অপারেশন করেছেন মানুষকে অজ্ঞান করে। অ্যানেসথেসিয়ার ব্যবহার ছাড়া তা কি কখনও সম্ভব ছিলো?

২৮

আরও একটি অবাস্তব তথ্য দেওয়া হয়ে থাকে। তাহলো, সপ্তদশ শতকে ইংরেজ ডাক্তার উইলিয়াম হারভি [১৫৭৮-১৬৫৭] সর্বপ্রথম রক্ত চলাচলের সঠিক তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সনাক্ত করেন, দেহের ভেতর রক্ত চলাচলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হচ্ছে হৃদপিণ্ড- যা মূলতঃ একটি পাম্পের মতো কাজ

করে। সুতরাং তাকেই মানবদেহের কার্যকারিতার সঠিক ব্যাখ্যাদাতা বলে প্রচার করা হচ্ছে।

এসব কথা সত্যিই অদ্ভুত! মানবদেহ সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলো উইলিয়াম হারভি বলে থাকতেও পারেন। এ নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তিনিই এসব কথা সর্বপ্রথম বলেছেন- এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এর কারণ হলো, তার জন্মের অনেক অনেক আগে এসব তথ্যাদি মুসলিম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে গিয়েছেন।

দশম শতাব্দিতে মুসলিম বিজ্ঞানী আর-রাজী [৮৫৪-৯২৫ ঈ.] এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত লিখে গেছেন। এতে তিনি সঠিকভাবে শিরা-উপশিরার কার্যাবলী তুলে ধরেন। হারভির ৩০০ বছর পূর্বে ইবনুন নাফিস্ [১২১৩-১২৮৮ ঈ.] ও ইবনুল কুফ [১২৩৩-১২৮৬ ঈ.] পুরোপুরিভাবে হৃদযন্ত্রের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করে গেছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, উইলিয়াম হারভি যখন ইতালির প্রখ্যাত পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন, তখন বেশিরভাগ পাঠ্যপুস্তক ছিলো ইবনে সিনা ও আর-রাজির গ্রন্থাদি। তিনি যে এদের পুস্তকাদি থেকে শেখে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

২৯

বলা হচ্ছে, কেরোসিন ১৮৫৩ সালে আব্রাহাম গেসনার [১৭৯৭-১৮৬৪] নামক এক ইংরেজ সর্বপ্রথম তৈরী ও উৎপাদন করেন। অ্যাসফাল্ট থেকে তিনি এটা ছেঁকে বের করেন।

কিন্তু আসলে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গেসনারের হাজার বছর পূর্বে পেট্রোল থেকে ছেঁকে কেরোসিন তৈরী করেছিলেন। ইতিহাসে থাকা সত্ত্বেও প্রতীচীর লেখকরা তা উপেক্ষা করে নিজেদের নাম-দাম বুলন্দ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এটা সত্যিই দুঃখজনক।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পাঠকরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন কিভাবে ইউরোপীয় লেখকরা কৌশলে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চালিয়েছেন এবং এখনো চালাচ্ছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু স্বার্থান্বেষী নন-মুসলিম ও বিশেষকরে ইউরোপীয় লেখকদের উপর আমরা কতটুকু আস্থাবান হতে পারি, তা ভাবার বিষয় বৈ কি।

আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে আমাদের উচিৎ মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর গভীর অধ্যয়ন করা। বিশেষ করে আমাদের মহাত্মন পূর্বসুরী বিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্মের উপর ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে সঠিক ঐতিহাসিক সত্য সর্বমহলে প্রচার করা একান্ত জরুরী বলে মনে করি। আর এ মহৎ কাজের মাধ্যমেই হিংসাতুর অ-মুসলিম কিছু লেখকের সত্যবিচ্যুত বক্তব্য ও লেখালেখির সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও জানা হবে মুসলমান হিসাবে আমাদের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সঠিক তথ্যাদি। আশাকরি পাঠকরা আমার সাথে একমত হবেন।

পরিশিষ্ট-৩

ইসলামী স্বর্ণযুগের প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানী

ইসলামী ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমণের পর থেকে মানবেতিহাসের চরম রদবদল শুরু হয়। কুরআনে পাক ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ মুতাবিক মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনা হয়। ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে মুসলিম বিজ্ঞানীরা সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়ে বিজ্ঞানের চরম উন্নয়নে গবেষণা শুরু করেন। যার ফলে সুদীর্ঘ ৭০০ বছর যাবৎ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিজ্ঞানের এরূপ দ্রুত উন্নয়ন ইতোমধ্যে কেউ দেখে নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলামী আদর্শ-খিলাফতের পতন ও মুসলিম জাতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন হওয়ার সাথে সাথেই বিজ্ঞানচর্চার চরম ভাটা পড়ে যায়। সেই থেকে পশ্চিমা দেশসমূহে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার নিয়ে চরম নড়াচড়া শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তারা এগিয়ে যায়। এই অবস্থা এখনও বিদ্যমান আছে। মুসলমানদের অনেকেই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকে যায় আর এই সুযোগে তাদেরই দ্বারা উৎকর্ষিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অন্যরা ব্যবহার করে দ্রুত বৈষয়িক উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়।

এই পরিশিষ্টে আমরা ইসলামী স্বর্ণযুগের ক'জন মুসলিম প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের সময়রেখা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের সময়রেখা

৭২১ খৃ:- জাবির ইবনে হাইয়্যান (ইউরোপে যাকে গেবের নামে উল্লেখ করা হয়)- তিনিও একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম আলকেমিষ্ট বা রাসায়নবিদ ছিলেন। অনেকের মতে এই প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী অত্র শাস্ত্রের অর্থাৎ কেমিস্ট্রির জন্মাদতা। খালিদ ইবনে ইয়াজিদ (মৃ: ৭০৭ খৃ:) - আলকেমি বা রসায়ন শাস্ত্রে তিনিও মৌলিক অবদান রাখেন।

৭৪০ খৃ:- আল-আসমায়ী - তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রাণীবিদ্যার উপর গবেষণা করেন।

৭৮০ খৃ:- আল-খোয়ারিজমী (ইউরোপে তাকে আলগোরিজম নামে সম্বোধন করা হয়) - তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী, অ্যালজেবরা বা বীজগণিতের জনক।

৭৮৭ খৃ:- জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-বলখী - (ইউরোপে তার নাম হয়েছে, আলবুমাসার) - তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে গেছেন।

৭৯৬ খৃ: (মৃ:) - ইব্রাহিম ইবনে হাবীব আল-ফজরী - জ্যোতির্বিদ ও অনুবাদক।

৮০০ খৃ:- ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী (ইউরোপে- আলকিন্দাস) - তিনি ছিলেন দার্শনিক, পদার্থবিদ ও আলোকবিজ্ঞানী।

৮০৮ খৃ:- হুনাইন ইবনে ইসহাক - ঔষধবিদ ও অনুবাদক।

৮১৫ খৃ:- আবু হানিফা আহমদ ইবনে দাউদ দিনাওয়ারী - ভাষাবিদ ও গাণিতিক।

৮৩৬ খৃ:- তাবিত ইবনে কুররা (ইউরোপে- তেবিত) - তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও মেকানিক্স।

৮৩৮ খৃ:- আলী ইবনে রাব্বান আত-তাবারী - তিনি গণিত ও ঔষধবিজ্ঞানের উপর গবেষণা করেন।

৮৫২ খৃ:- আবু আব্দুল্লাহ আল-বাতানী (ইউরোপে - আলবাতেঙ্গী) - অঙ্ক শাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৮৫৭ খৃ:- ইউহানা ইবনে মাসাওয়ী - চিকিৎসক।

৮৫৮ খৃ:- আল-বাতানী (ইউরোপে- আলবাতেঙ্গিয়াস) - জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গাণিতিক।

৮৬০ খৃ:- আল-ফারগানী (ইউরোপে- আলফাগানাস) - তিনি ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

৮৭০ খৃ:- আল-ফারাবী (ইউরোপে- আলফারাবিয়াস) - বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার উপর তিনি মৌলিক গবেষণা করে গেছেন।

৮৪৮ খৃ:- আর-রাজী (ইউরোপে- রাজেজ) - মেডিসিন, অপটিক্স ও রসায়ন শাস্ত্রবিদ হিসেবে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

৯০০ খৃ: (মৃ:)- আবু হামিদ আল-আস্তুরলাবী - জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

৯০৩ খৃ:- আস-সুফী (ইউরোপে- আজফী) - জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

৯০৮ খৃ:- তাবিত ইবনে কুররা - মেডিসিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর মৌলিক অবদান রাখেন।

৯১২ (মৃ:) খৃ:- মুহাম্মদ ইবনে আমল আত-তামিমী - (ইউরোপে- আতমিমি) - আলকেমিষ্ট।

৯২৩ (মৃ:) খৃ:- আল-ফাহাদী ইবনে আহমদ আন-নাইরিজী (ইউরোপে- আলটিবরিজি!) - গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর গভীর গবেষণা করেছেন।

৯৩০ খৃ:- আহমদ আবু আলী ইবনে মিসকাওয়ী - মেডিসিন ও অস্ত্রোপচার বিশেষজ্ঞ।

৯৩২ খৃ:- আহমদ আত-তাবারী - মেডিসিন।

৯৩৬ খৃ:- আবুল কাসিম আজ-জাহরাবী (ইউরোপে- আলবুকাসিস!) - অস্ত্রোপচার ও ঔষধের উপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

৯৪০ খৃ:- মুহাম্মদ আল-বুজ্জানী - অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গাণিতিক ছিলেন।

৯৫০ খৃ:- আবুল কাসিম আল-মাজরেতী - তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও কেমিস্ট্রির উপর গবেষণা করেন।

৯৬০ (মৃ:) খৃ:- আবু বকর ইবনে ওয়াসিয়া - কেমিস্ট্রি ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করেন।

৯৬৫ খৃ:- ইবনে হাইসাম (ইউরোপে- আলহাজেন!) - এই প্রখ্যাত ডাক্তার চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রোপচার, আলোকবিজ্ঞান ও গণিতের উপর গভীর গবেষণা করে গেছেন।

৯৭৩ খৃ:- আবু রাইহান আল-বিরুনী - প্রখ্যাত এই বিজ্ঞানী গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর মৌলিক গবেষণা করেছেন।

৯৭৬ খৃ:- ইবনে আবিল আসহাত - তিনি ছিলেন মেডিসিনের উপর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার।

৯৮০ খৃ:- ইবনে সিনা (ইউরোপে- আবিসিনা) - তিনি মেডিসিন, দর্শন ও অঙ্ক শাস্ত্রের উপর মৌলিক গবেষণা করে গেছেন।

৯৮৩ খৃ:- ইখওয়ানুস সাফা (ইউরোপে- আসাফা) - মুসলিম বিজ্ঞানীদের একটি দলের নাম।

১০১৯ খৃ:- হাসিব আল-কারজী - গাণিতিক।

১০২৯ খৃ:- আজ-জারকালী (ইউরোপে- আরজাকেল) - জ্যোতির্বিজ্ঞানী - অ্যাস্ট্রলেব নামক যন্ত্রের আবিষ্কারক।

১০৪৪ খৃ:- উমর খৈয়াম - তিনি ছিলেন কবি ও গাণিতিক।

১০৬০ (মৃ:) খৃ:- আবুল হাসান আলী ইবনে রিদওয়ান - মেডিসিন।

১০৭৭ খৃ:- আবুল কাসিম ইবনে আবু সাদিয়া - মেডিসিন।

১০৯০ খৃ:- ইবনে জোহর (ইউরোপে- আভেনজোর) - অস্ত্রোপচার, মেডিসিন।

১০৯৫ খৃ:- মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে বাজাহ (ইউরোপে- আভেনপেস!) - দর্শন ও মেডিসিন।

১০৯৭ খৃ:- জিয়াউদ্দীন ইবনে বাইতার (ইউরোপে- বিতার) - উদ্ভিদবিজ্ঞান, মেডিসিন ও ফার্মেকোলজি।

১০৯৯ খৃ:- আল-ইদ্রিসী (ইউরোপে- ড্রেজেজ!) - তিনি ছিলেন ভৌগোলিক, সর্বপ্রথম পৃথিবীর ম্যাপসহ ভূ-গোলক তৈরী করেন।

১১০০ খৃ:- ইবনে তুফায়েল আল-কায়েসী - দর্শন, মেডিসিন।

১১২০ (মৃ:) খৃ:- হোসাইন ইবনে আলী আল-তুহরায়ী - কবিতা, আলকেমি (রসায়ন)।

১১২৮ খৃ:- আলী ইবনে রুশদ (ইউরোপে- আভেরস!) - প্রখ্যাত দর্শনিক ও ডাক্তার।

১১৩৫ খৃ:- মূসা ইবনে মাইমুন (ইউরোপে- মাইমোনাইডিজ) - দর্শন ও মেডিসিন।

১১৪০ খৃ:- আল-বাদিউল উস্তারলাবী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত।

১১৫৫ (মৃ:) খৃ:- আব্দুর রহমান আল-কাজিন - জ্যোতির্বিজ্ঞান।

১১৬২ খৃ:- আব্দুল লতিফ মুয়াফফাক্ব আল-বাগদাদী - মেডিসিন, ভূগোল।

১১৬৫ খৃ:- আবুল আব্বাস ইবনে রুমাইয়্যা (ইউরোপে- আনাবাতি!) - শিলাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা।

১১৭৩ খৃ:- রশীদুদ্দীন আস-সুরী - উদ্ভিদবিজ্ঞান।

১১৮৪ খৃ:- শিহাবুদ্দীন তিফাসী (ইউরোপে- আত্তিফাসী), শিলাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা।

১২০১ খৃ:- নাসিরুদ্দীস তুসী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইউক্লিডের ধারণাবিরোধী জ্যামিতির প্রতিষ্ঠাতা যা আধুনিক জ্যামিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।

১২০৩ খৃ:- মুয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইবনে উসাইবিয়াহ - মেডিসিন।

১২০৪ (মৃ:) খৃ:- আল-বিরতুজী (ইউরোপে- আলপেট্রাগিয়াস!) - জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

১২১৩ খৃ:- ইবনে নাফিস আল-দামেস্কী - জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

১২৩৬ খৃ:- কুতুবুদ্দীন সিরাজী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল।

১২৪৮ (মৃ:) খৃ:- ইবনে বাইতার - ফার্মেসী, উদ্ভিদবিজ্ঞান।

১২৫৮ খৃ:- ইবনুল বান্না - মেডিসিন, গণিত।

১২৬২ (মৃ:) খৃ:- হাসান আল-মুরাকিশী - গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল।

১২৭৩ খৃ:- আল-ফিদা (ইউরোপে- আব্দুলফিদা) - জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল।

১৩০৬ খৃ:- ইবনুস সাতির আদ-দামেস্কী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত।

১৩২০ (মৃ:) খৃ:- কামালুদ্দীন আবুল হাসান আল-ফারসী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান।

১৩৪১ (মৃ:) খৃ:- মুহাম্মদ ইবনে আদিমির আল-জিলদাকী - রসায়ন।

১৩৫১ খৃ:- আবু আব্বাস ইবনে তাম্বুগা ইবনুল মাগদী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত।

১৩৫৯ খৃ:- শিহাবুদ্দীন ইবনে তাম্বুগা ইবনুল মাগদী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত।

পরিশিষ্ট-৪

ইংরেজী ভাষায় আরবী শব্দব্যবহারের একটি তালিকা

মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতার ছাপ পশ্চিমা বিশ্বে কতো শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী ছিলো তা নিম্নোল্লিখিত তালিকা থেকে কিছুটা ধারণা করা যাবে। অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দসহ বহু আরবী শব্দ ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রবেশ করে। আমরা এখানে আজও ব্যবহৃত ইংরেজীতে আরবী শব্দব্যবহারের এই তালিকাটি তুলে ধরছি। বলাই বাহুল্য, আমাদের জানা-অজানা আরও বহু ইংরেজী শব্দ আছে যার উৎপত্তি আরবী। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সংক্ষিপ্তাকারে এ তালিকাটি দেওয়া হয়েছে।

ইংরেজী শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ	আরবী শব্দ	শাব্দিক অর্থ
Admiral	এডমিরাল	নৌবাহিনীর প্রধান	আমীরুল বাহর	সাগরের শাসক
Adobe	এডোব	এক ধরনের মাটি	আত-তুবা	ইট
Alchemi	আলকেমী	কেমিষ্টির প্রতিশব্দ	আল-কীমিয়া	বস্তুর কেমিস্ট্রি
Alcohol	আলকোহল	নেশাযুক্ত পানীয়	আল-কহল	নেশাযুক্ত পানীয়
Alcove	আলকোভ	গুপ্ত জায়গা	আল-কুব্বাহ	গম্বুজ, কবর ইত্যাদি
Algebra	অ্যালজেবরা	গণিতশাস্ত্রের শাখা	আল-জবুর	একত্রিকরণ
Algol	আলগল	গউল জাতি	আল-গুল	গউলরা
Algorith	আলগরিথম	কম্পিউটার বিজ্ঞানের লজিক (অঙ্ক)	আল-খোয়ারিজমী	মুসলিম বিজ্ঞানী
Alkaline	আলকালিন	রসায়ন শাস্ত্র	(খোয়ারিজমবাসী)	আল-কালী
Almagest	আলমাজেষ্ট	গ্রীক বিজ্ঞানী টলেমী প্রণিত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ	পুড়ানো	আলমাজিস্তি
Almanec	আলমানেক	বাৎসরিক	আল-মানাক	স্পেনে ব্যবহৃত আরবী শব্দ-

				অর্থ অজানা
Antimony	অ্যান্টিমোনি	পঞ্জিকা	আল-ইতমিদ	পদার্থের নাম
Apricot	এপ্রিকট	একজাতীয় ফল	আল-বুরকুক	ফলের নাম
Arsenal	আরসিনেল	অস্ত্রাদি (বা অস্ত্রাগার)	দারুস্‌সানাআহ	তৈরীর-ঘর অর্থাৎ ফেক্টরী
Assassin	এসাসিন	আততায়ী	হাশ্‌শাশিন	গাঁজাখোর
Attar	আত্তার	আতর (সুগন্ধি)	আতর	সুগন্ধি
Azimuth	আজিমাত	রাস্তাসমূহ	আস-সুমুত	রাস্তাসমূহ
Azure	এজিউর	নীলাম্বরী	আল-লাজওয়ারিদ	লাপিজ লাজোরী (ফার্সী থেকে)
Bazar	বাজার	বাজার	বাজাহর (ফার্সী?)	বাজার
Cable	ক্যাবল	তার	হাবল	তার
Canon	ক্যানন	ক্যানন (কামান)	কানুন	আইন
Carat	কার‍্যাট	অল্প-ওজন	কিরাত	ছোট্ট ওজনবিশিষ্ট
Carafe	কারাফ	ছোট্ট গলাবিশিষ্ট পাত্র	গ্বাররাফ	নিমজ্জিত হওয়া
Carmine	কারমিন	রঙ্গিন	কিরমাজা	ক্রিমসন - রং
Cassock	কাছক	একধরনের জামা	খাজাগান্দ	গাঁথা জামা
Checkmate	চেকমেইট	দাবা খেলায় ব্যবহৃত একটি শব্দ	শাহমাউত	(সম্ভবত ফার্সী থেকে) বাদশাহর মৃত্যু
Chemistry	কেমিস্ট্রি	রসায়নশাস্ত্র	আলকেমী	বস্তুর জৈবিক গুণাগুণ
Cipher	সাইফার	শূন্য	সিফ্‌র	শূন্য
Coffee	কফি	কফি	কাহওয়াহ	কফি
Cork	কর্ক	ভাসমান বস্তু	কুরক	ভাসমান জিনিস
Cotton	কটন	সূতা	কুতন	সূতা
Crimson	ক্রিমসন	রং	কিরমাজি	কিরমিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত
Earth	আর্থ	পৃথিবী	আরদ্ব	পৃথিবী
Elixir	এলিক্সার	যাদুর মন্ত্র	আল-ইকসির	দার্শনিকের পরশপাথর
Fakir	ফাকির	ফকির	ফাক্বির	গরীব ব্যক্তি
Garble	গারবল	জগাখিচুড়ী	গ্বারবালা	ছাঁকা

Jinni	জিনি	জ্বিন	জ্বিন	জ্বিন জাতি
Gaul	গউল	দানব - দৈত্য	গুল	খারাপ দানব
Giraffe	জিরাফ	জিরাফ নামক জন্তু	জারাফা	জিরাফ
Harem	হারেম	অন্দরপুরী (বিশেষকরে মুসলিম মহিলাদের কক্ষ)	হারাম	নিষিদ্ধ
Hashish	হাশিশ	গাঁজা	হাশিশ	শুকনো শস্য
Hazard	হাজার্ড	অশনি (ডেনজার)	ইয়াসারা	গুটির খেলা
Jar	জার	পাত্র	জাররা	বড় আয়াতের মাটির তৈরী ফুলদানী
Jasmine	জাসমিন	ফুলের নাম	ইয়াসমিন	একটি ফুলের আরবী নাম
Kismet	কিসমেত	ভাগ্য	ক্বিসমা	অংশ
Lemon	লেমন	লেবু	লাইমুন	আরবী ও ফার্সি ভাষায় লেবুর নাম
Lime	লাইম	একজাতীয় লেবু	লিমাহ	টক ফল
Lute	লিউট	একজাতীয় তারের তৈরী বাদ্যযন্ত্র	আলউদ	কথিত যন্ত্রের আরবী নাম
Magazine	ম্যাগাজিন	ছোট্ট আয়তনের সংবাদপত্র	মাখা-জিন	মূল্যবান দ্রব্যাদি জমা রাখার কক্ষ
Musk	মাস্ক	মুখোশ	মিশ্‌ক	একজাতীয় সুগন্ধি
Mattress	মাট্রিস	শয্যা (বেড)	মাতরাহ (আরবী শব্দ তারাআ নিক্ষেপ করা থেকে এসেছে)	যেখানে কোন কিছু নিক্ষিপ্ত করা হয়
Monsoon	মনসুন	ঋতু	মৌসিম	ঋতু
Mummy	মামী	মিশরের মামী	মুমিয়া	সংরক্ষিত দেহ
Muslin	মাসলিন	মসলিন কাপড়	মউসিল	মুসল শহর
Nadir	নাদির	সর্বনিম্ন	নাদিরাস-সাম্‌ত	জেনিথের (সর্বোচ্চ এর) বিপরিত
Ream	রীম	কাগজের রীম	রিজমাহ	প্যাকেজ (আঁটি)
Rice	রাইস	ভাত- চাউল	রুজ	চাউল
Safari	সাফারী	ভ্রমণে যাওয়া	সাফার	ভ্রমণ

Saracen	সারাসেন	প্রাচ্যের মানুষ	সারক্বিয়্যুন	প্রাচের
Satin	সাটিন	সূক্ষ্ম কাপড়	জায়তুনী	জায়তুন শহরে (চীনের একটি শহর)
Scarlet	স্কারলেট	রক্তবর্ণ	সিক্বিলাত	ছবিসহ কাপড়
Sine	সাইন	ট্রিগোনমেট্রির ফাংশন	জায়েব শব্দের বিকৃত অনুবাদ	অঙ্কশাস্ত্রের শব্দ
Sofa	সোফা	বসার চেয়ারসেট	সুফ্ফা	উন্নত প্লাটফর্ম যেমন- আসহাবে সুফ্ফা
Spinach	স্পিনাচ	শাক	ইসফানাক	শাক
Sugar	শুগার	চিনি	সুক্কার	চিনি
Syrup	সিরাপ	সুমিষ্ট ঘন রস বা তরল পানীয়	শরাব	পানীয়
Tamarind	টামারিন্ড	তেতুঁল	তামর-হিন্দী	ভারতীয় খেজুর
Tariff	টারিফ	কর ইত্যাদির রেট	তাআরিফ	নোটিস দেওয়া
Zenith	জেনিথ	সর্বোচ্চ	সাম্ত	রাস্তা
Zero	জিরো	শূন্য	সিফর	খালি বা শূন্য

পরিশিষ্ট - ৫

কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি ও বিজ্ঞানসম্পর্কিত আয়াতমালা

পবিত্র কুরআন শরীফে এমক অনেক আয়াত আছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। আমি নিজে গবেষণা করে এরূপ হাজার খানেকেরও বেশী আয়াতমালার সন্ধান পেয়েছি। এসব আয়াতে অসীম জ্ঞানী আল্লাহ পাক মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করার উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক তথ্যাদি উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

বিভিন্ন বিষয়ে আয়াতমালা দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে স্থান, কাল, গ্রহ-উপগ্রহ, তারাজগত, ভ্রূণবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয় আছে। এছাড়া প্রায় আয়াতেই মূল বিষয়ের আগে বা পরে, তারা কি চিন্তা করে না? তারা কি ভাবে না? কিংবা গবেষণা করে না? ইত্যাদি প্রশ্নাবলী দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং কুরআন শরীফ যে মানুষকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য উৎসাহ দান করছে তা স্পষ্ট। আর এ কারণেই অতীতে অসংখ্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটে। সে যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিলো উপাসনার মতো। কারণ, বিজ্ঞানীরা মনে করতেন তারা কুরআন শরীফের নির্দেশকে মান্য করছেন।

যা হোক, নিম্নে আমরা কুরআন শরীফ থেকে কিছু আয়াতমালা তুলে ধরেছি। পাঠকরা ইচ্ছে করলে প্রতিটি আয়াতে করীম কুরআন শরীফ দেখে পাঠ করে নিতে পারেন। এখানে অবশ্য মূল আরবীসহ এবং বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ২৫৫]

اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

-"আল্লাহ (এরূপ যে) তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই; (তিনি) চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত, না তন্দ্রা তাঁকে অভিভূত করতে পারে, না নিদ্রা। তাঁরই আয়ত্তাধীন রয়েছে আকাশ ও যমীনসমূহে যা কিছু আছে। এমন ব্যক্তি কে আছে যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।"

২. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ২৫৬]

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

-"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই বিভ্রান্তি হতে হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন যে কেউ বিভ্রান্তকারীকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর

উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে এমন এক মজবুত শৃংখল আঁকড়ে ধরল যা কখনও ভাঙবার নয়। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।”

৩. [সূরা ইখলাস (১১২): আয়াত ১-৪]

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ * اللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“বলুন, তিনি আল্লাহ এক।”
“আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।”
“তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্মায়নি।”
“এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।”

৪. [সূরা হাশর (৫৯): আয়াত ২২-২৪]

هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-“তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই; তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত; তিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।”
“তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই; যিনি বাদশাহ, পবিত্র, নির্দোষ, ক্ষমাকারী, রক্ষক, পরাক্রান্ত, সংশোধক, মহান; কাফিরগণ কর্তৃক বর্ণিত অংশীদারদের হতে আল্লাহ পবিত্র।”

"তিনি আল্লাহ, স্রষ্টা, নির্মাতা, রূপদাতা, তাঁর বহুসংখ্যক উত্তম-সুন্দর নাম আছে, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে আসমান ও যমীনের সমুদয় বস্তু; তিনি প্রতাপশালী, সুকৌশলী।"

৫. [সূরা তাগ্বাবুন (৬৪): আয়াত ১৮]

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-"তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত; পরাক্রান্ত সুকৌশলী।"

৬. [সূরা বনী ইসরাঈল (১৭): আয়াত ১১০-১১১]

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

-"বল, তোমারা আল্লাহ ও রহমান নামে ডাকো; যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর সকল নামই উত্তম-সুন্দর; নামাজ উচ্চস্বরে পাঠ করো না এবং অধিক ক্ষীণ শব্দেও পড়ো না; বরং উভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।"

"বল, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি না সন্তান রাখেন না কোন তাঁর শরীক আছে বাদশাহীতে এবং না আছে কেহ তাঁর সাহায্যকারী এবং তাঁর গর্ব-তাকবীর করতে থাকো বেশী বেশী।"

৭. [সূরা যুখরুফ (৪৩): আয়াত ৮৪-৮৫]

وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِى الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ * وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

-"তিনি আকাশেও মা'বুদ এবং পৃথিবীতেও মা'বুদ; এবং তিনিই মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।"
"তিনি মহিমান্বিত- পৃথিবী, মহাকাশ ও এর মধ্যস্থিত সমুদয়ের আধিপত্য একামত্র তাঁরই, তাঁরই নিকট আছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।"

৮. [সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ১৮০-১৮১]

وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

-"আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাকবে; যাঁরা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে।"
"যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে।"

৯. [সূরা নিসা (৪): আয়াত ১৭১]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

-"হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য-সঠিক কথা ছাড়া বলো না। নিশ্চয়ই মারয়াম তনয় ঈসা মহান আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী। যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে রূহ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে মেনে নাও। এবং বলো

না, আল্লাহ তিন। এ কথা ত্যাগ করো, তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে। আল্লাহ তো একমাত্র মা'বুদ। সন্তান হওয়া তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। কর্ম বিধায়করূপে আল্লাহ যথেষ্ট।"

১০. [সূরা নূর (২৪): আয়াত ৩৫]

اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-"আল্লাহ আসমান-যমীনের নূর (আলো); তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত যেমন প্রদীপাধারে এক প্রদীপ; প্রদীপটি এক কাঁচাবরণের মধ্যে রক্ষিত; কাঁচাবরণ এক নক্ষত্র সদৃশ, এটা প্রজ্জ্বলিত হয় পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যা না প্রাচ্যের, না প্রতিচীর, অগ্নিসংযোগ না করলেও দেখা যাবে তার তৈল সমুজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে; নূরের উপর নূর; যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাঁর নূরে পথ দেখান; এবং আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন, আল্লাহ সবকিছু জ্ঞাত।"

১১. [সূরা 'আছর (১০৩): আয়াত ১-৩]

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

-"কসম যুগের!

"নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।"

"কিন্তু মু'মিন, নেককার, সৎকর্মশীল এবং পরস্পরকে ন্যায়ের ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশদানকারী যারা তারা ছাড়া।"

জগতসৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা ফাতিহা (১): আয়াত ১-২]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি যাবতীয় জগতসমূহের রব (প্রতিপালক)।"
"অসীম দয়াময়, পরম করুণাময়।"

২. [সূরা আলে ইমরান (৩): আয়াত ৮৩]

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

"তাহলে কি তারা আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা আছে তা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরই আজ্ঞাধীন এবং তাঁরই দিকে সকলে ফিরে যাবে।"

৩. [সূরা আম্বিয়া (২১): আয়াত ৩০]

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না যে, আসমান ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম; এবং প্রাণবান সবকিছু আমি সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?"

৪. [সূরা ফুরক্বান (২৫): আয়াত ৫৯]

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

“তিনি এমন সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন ছয় দিবসে আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনিই পরম দয়াময় রহমান। তাঁর সম্বন্ধে যে খবর রাখে তাকে জিজ্ঞেস করো।”

৫. [সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ৫৪-৫৬]

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন ছয় দিবসে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন। তিনিই আবৃত করেন রাত্রি দ্বারা দিনকে যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আদেশে অনুবর্তী। জেনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদান করা। আল্লাহ বরকতময়, সারা জাহানের প্রতিপালক।”

“তোমরা ডাক তোমাদের রবকে কাকুতি মিনতি করে এবং গোপনে। তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।”

“জমিনে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।”

৬. [সূরা হা-মীম সিজ্দাহ (৪১): আয়াত ৯-১২]

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ

فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

"বলুন, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করো, যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তাঁর জন্য শরীক সাব্যস্ত করো? তিনিই সারা জাহানের প্রতিপালক।"

"তিনি পৃথিবীতে তার উপরিভাগে সুদৃঢ় পর্বতরাজি স্থাপন করেছেন এবং তাতে নিহিত রেখেছেন বরকত। আর চারদিনের মধ্যে তাতে তার অধিবাসীদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন; যা গণনায় পরিপূর্ণ রয়েছে প্রশ্নকারীদের জন্য।"

"অতঃপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, তখন তা ছিল ধূম্রবৎ। তারপর তিনি তাকে (আসমানকে) ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আসো। তারা উভয়ে বললো, আমরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এলাম।"

"তারপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দু'দিনে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আসমানে তার জন্য আদেশ প্রেরণ করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি নক্ষত্ররাজি দিয়ে এবং তাকে হিফাজত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।"

৭. [সূরা ত্বালাক্ব (৬৫): আয়াত ১২]

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

"আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান ও অনুরূপ যমীনও, এসবের মধ্যে নাজিল হয় তাঁর আদেশ; যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ

সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সব কিছুকে আল্লাহ স্বীয় জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।"

৮. [সূরা ইয়া-সীন (৩৬): আয়াত ৩৭-৪০]

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত। আমি তার উপর থেকে দিনকে অপসারিত করি। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।"
"আর সূর্য স্বীয় গন্তব্যস্থানের দিকে চলতে থাকে। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"
"আমি চন্দ্রের নির্ধারিত করেছি বিভিন্ন মনযিল, এমনকি তা ভ্রমণশেষে ক্ষীণ হয়ে খেজুরের পুরাতন ডালের মতো হয়ে যায়।"
"সূর্যের সাধ্য নাই যে, সে চন্দ্রকে ধরে ফেলে এবং রাতও দিনের পূর্বে আসতে পারে না; (মহাকাশে) প্রত্যেকেই নির্ধারিত কক্ষপথে সন্তরণ করে।"

৯. [সূরা ফুরক্বান (২৫): আয়াত ৬১-৬২]

تَبَارَكَ الَّذِى جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا * وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

"মহামহিমান্বিত তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশে বিশালকায় গ্রহসমূহ এবং তিনি সেখানে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপী সূর্য ও আলোকময় চন্দ্র।"
"আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে অথবা শোকর করতে চায়।"

১০. [সূরা লুকমান (৩১): আয়াত ১০]

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

"তিন আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এখানে সব ধরনের জীব-জন্তু দিয়েছেন। আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর পৃথিবীতে উৎপন্ন করেছি সর্বপ্রকার উত্তম উদ্ভিদ।"

১১. [সূরা জ্বারিয়াত (৫১): আয়াত ৪৭-৪৯]

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ * وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ * وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ * وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আসমানকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি অবশ্যই ক্ষমতাশালী।"

"আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি। কত সুন্দরভাবে আমি বিছিয়েছি!"

"প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।"

১২. [সূরা নূর (২৪): আয়াত ৪৪]

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

"আল্লাহ রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান। নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ।"

১৩. [সূরা রূম (৩০): আয়াত ৮]

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

“তারা কি নিজেদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ তো আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাকিছু আছে তা সবই সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; কিন্তু অনেক মানুষই তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।”

জগতের মধ্যে ব্যালান্স সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা মুল্‌ক (৬৭): আয়াত ৩-৪]

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

“তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার ফেরাও দৃষ্টি, কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি?”

“তারপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফেরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তোমার দিকে।”

“আর আমি তো নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের জন্য বিতাড়নের উপকরণ, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি দোযখের আজাব।”

পাহাড় সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা নামল (২৭): আয়াত ৮৮]

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

"আর তুমি পর্বতসমূহকে দেখে অটল-অচল মনে করো অথচ এগুলো সেদিন মেঘরাশির ন্যায় চলমান হবে। এ হল আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুষম-সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছো তিনি তা সম্যক অবগত আছেন।"

২. [সূরা আম্বিয়া (২১): আয়াত ৩২]

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

"আর আমি যমীনের উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি যাতে তাদেরকে নিয়ে যমীন ঝুঁকে না পড়ে; আমি সেখানে প্রশস্ত রাস্তা [গিরিপথ] সৃষ্টি করেছি যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে।"

৩. [সূরা নাবা (৭৮): আয়াত ৬-৭]

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

"আমি কি যমীনকে কিরিনি বিছানা সদৃশ? এবং পাহাড়সমূহকে পেরেক স্বরূপ?"

অণু-পরমাণু সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা ইউনুস (১০): আয়াত ৬১]

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক এবং সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যাকিছু তিলাওয়াত কর, আর তোমরা যে কাজই কর, আমি তোমাদের কছে উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আসমান ও যমীনের অণু পরিমাণও তোমার রবের থেকে গোপন থাকে না এবং এর চেয়ে কোন কিছু ক্ষুদ্রতর কিংবা বৃহত্তর নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"

মানবসৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ১৮৯]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"তিনিই তোমাদেরকে একব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার [আদমের (আঃ)] স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও, তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবই।"

২. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ২৮-৩০]

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা কিভাবে আল্লাহর নাফরমানী কর, অথচ তোমরা ছিলে নির্জীব, তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তারপর তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।"

"তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"

"স্মরণ করুন যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।"

৩. [সূরা হিজ্বর (১৫): আয়াত ২৮]

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِى كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ

"স্মরণ করো, তোমাদের রব্ব যখন ফেরেশতাদের বলেছিলেন, শুষ্ক টনটনে মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করছি।"

৪. [সূরা ফাত্বির (৩৫): আয়াত ১১]

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে পয়দা করেছেন, এরপর শুক্রকীট হতে, পুনঃ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে যুগল; আল্লাহর অজ্ঞাতে কোন নারী না গর্ভধারণ করে, না প্রসব করে; কারো আয়ূ বৃদ্ধি বা হ্রাস হলে তাতো হয় সংরক্ষিত কিতাব অনুযায়ী; এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ কাজ।"

৫. [সূরা মু'মিনুন (২৩): আয়াত ১২-১৪]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"আর আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে।"
"তারপর তাকে শুক্ররূপে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করি।"
"এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি এমন 'আলাকে' যা লেগে থাকে, তারপর সে আলাককে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, অতঃপর সে মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করি অস্থি, পরে অস্থিকে ঢেকে দিই গোশত দিয়ে, তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে। সুতরাং কত মহান কল্যাণময় আল্লাহ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।"

৬. [সূরা ত্বারিক (৮৬): আয়াত ৫-৮]

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

"সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"
"তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নিঃসৃত পানি থেকে।"
"যা বহির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে।"
"নিশ্চয় আল্লাহ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম।"

৭. [সূরা তাগ্বা-বুন (৬৪): আয়াত ৩]

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, আর সুন্দর শোভন করেছেন তোমাদের আকৃতি, আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।"

৮. [সূরা মু'মিনুন (২৩): আয়াত ৭৮-৮০]

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ; তোমরা খুব অল্পই শোকর করে থাক।"
"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।"
"তিনিই জীবন দান করেন এবং প্রাণ সংহার করেন, আর রাত ও দিনের বিবর্তন তাঁরই ইখতিয়ারে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?"

৯. [সূরা আম্বিয়া (২১): আয়াত ৭]

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"আমি আপনার পূর্বে শুধু মানুষকেই রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম। যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে যাদের কিতাবের জ্ঞান আছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।"

১০. [সূরা আলে ইমরান (৩): আয়াত ৩৩]

قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ * إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ মনোনিত করেছেন আদমকে, নূহকে, ইব্রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্ববাসীর জন্য।"

১১. [সূরা ক্বিয়ামাত (৭৫): আয়াত ৩৬-৩৯]

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি বেহিসাবে ছেড়ে দেওয়া হবে?"
"সে কি একবিন্দু শুক্র ছিল না, যা মাতৃগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছিল?"
"তারপর তা আলাদা রূপলাভ করে, পরে আল্লাহ তাকে মানুষ আকৃতি দান করেন, অতঃপর সুঠাম করেন।"

১২. [সূরা দাহার (৭৬): আয়াত ১-২]

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

"অবশ্যই মানুষের উপর কালপ্রবাহে এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।"

"আমি তো মানুষকে মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ কারণে আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।"

১৩. [সূরা নূহ (৭১): আয়াত ১৪]

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

"অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।"

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা ইয়া-সীন (৩৬): আয়াত ৩৬]

سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"পবিত্র মহান তিনি, যিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে।"

২. [সূরা শুরা (৪২): আয়াত ১১-১২]

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পাদ জন্তুগুলোরও জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এভাবে জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন বস্তুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।"

"আসমান ও যমীনের চাবিকাঠি তাঁরই আয়ত্বে, তিনি যাকে ইচ্ছে প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে সংক্ষীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

৩. [সূরা আর-রাহমান (৫৫): আয়াত ৫২-৫৩]

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"উভয় বাগানে রয়েছে সব ধরনের ফল দুই দুই প্রকার।"

"অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে?"

৪. [সূরা রা'আদ (১৩): আয়াত ৩]

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"তিনি বিস্তৃত করেছেন ভূমণ্ডলকে এবং সেখানে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা ও নদনদী এবং সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি দিনকে রাত্রি দিয়ে আবৃত করেন। এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।"

৫. [সূরা ক্বিয়ামাহ (৭৫): আয়াত ৩-৪]

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلٰى قَادِرِينَ عَلٰى أَنْ نُسَوِّىَ بَنَانَهُ

"মানুষ কি ধারণা করে যে, আমি হাড়সমূহ একত্র করতে পারবো না?"
"হ্যাঁ, অবশ্যই আমি একত্র করব। কেননা আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে ঠিক করে দিতে সক্ষম।"

শিশু ছেলে-মেয়ে হওয়া পিতার উপর নির্ভরশীল সম্পর্কিত

১. [সূরা আন্নাজ্বম (৫৩): আয়াত ৪৫-৪৬]

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى

"আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন জোড়া নর ও নারী।"
"শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা পরিত্যক্ত করা হয়।"

পানি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা নূর (২৪): আয়াত ৪৫]

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلٰى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

২. [সূরা রূম (৩০): আয়াত ৪৮]

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"আল্লাহ্ এমন সত্তা যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর বায়ু মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে; তারপর তিনি মেঘরাশিকে যেমন ইচ্ছে আসমানের শূন্যমণ্ডলের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে দেন, এবং কখনও তা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন; অতঃপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসে বৃষ্টিধারা। তিনি যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে তা পৌঁছে দেন, তখন তারা আনন্দ করতে থাকে।"

৩. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ২২]

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তিনি সেই পালনকর্তা যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ [বায়ুমণ্ডল] করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল ফসল উৎপাদন করেন। অতএব, তোমরা জেনে বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।"

৪. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ১৬৪]

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য কল্যাণ সাধনকারী সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর যে পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে সব ধরনের জীবজন্তু সেথায় বিস্তার করেন, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।"

৫. [সূরা কাহফ (১৮): আয়াত ৪৬]

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, এবং স্থায়ী নেক কাজ আপনার রবের কাছে সওয়াবের দিক দিয়েও শ্রেয় এবং আশার দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট।"

৬. [সূরা মু'মিনুন (২৩): আয়াত ১৮]

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ
لَقَادِرُونَ

"আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমাণ মত, তারপর আমি তা যমীনে সংরক্ষণ করি। আর আমি তা অপসারিত করতেও অবশ্যই সক্ষম।"

৭. [সূরা ক্বামার (৫৪): আয়াত ১২]

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

"এবং যমীন থেকে জারি করে দিলাম ফোয়ারাসমূহ; তারপর আসমান ও যমীনের পানি মিলিত হল এক অবধারিত ব্যাপারের জন্য।"

৮. [সূরা মুল্‌ক (৬৭): আয়াত ৩০]

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

"আপনি বলে দিনঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি- যদি তোমাদের পানি নিম্নদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমাণ পানি?"

৯. [সূরা ফুরক্বান (২৫): আয়াত ৪৭-৪৮]

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا * وَهُوَ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

"আর তিনি তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণস্বরূপ এবং বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন নিদ্রা আর দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময়।"
"তিনিই স্বীয় রহমতের বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ুকে প্রেরণ করেন এবং আমি আসমান থেকে পবিত্র বিশুদ্ধ পানি বর্ণষ করি।"

১০. [সূরা ফাত্বির (৩৫): আয়াত ১২]

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর সমুদ্র দু'টি সমান নয়- একটি তো মিঠা পানিবিশিষ্ট পিপাসা নিবারণকারী, এর পানি পান করা সহজ, আর অপরটি লবনাক্ত পানিবিশিষ্ট, বিস্বাদ। তোমরা

প্রত্যেকটি থেকেই টাটকা গোশত খাও এবং আহরণ কর মণিমুক্তার অলংকার যা তোমরা পরিধান কর। এবং তুমি দেখতে পাও তার বুক চিরে জাহাজ চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

১১. [সূরা আন'আম (৬): আয়াত ৫৯]

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি; তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। তিনি জানেন যাকিছু আছে স্থলে ও জলে। একটি পাতাও ঝরে না তাঁর অজ্ঞাতসারে। কোন শস্যকণা যমীনের অন্ধকারে অঙ্কুরিত হয় না অথবা আদ্র কিংবা শুষ্ক কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্টরূপে কিতাবে নেই।"

১২. [সূরা জ্বাসিয়া (৪৫): আয়াত ৫]

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে, এবং আসমান থেকে আল্লাহ যে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে, আর বায়ুর পরিবর্তনে, বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।"

স্থান ও কাল সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা হাজ্জ (২২): আয়াত ৪৭]

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

"আর তারা আপনাকে আজাব তরান্বিত করার জন্য তাগাদা করছে। অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। নিশ্চয় আপনার রব্বের কাছে একদিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।"

২. [সূরা মা'আরিজ্ব (৭০): আয়াত ৩-৪]

مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ * تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

"যা সংঘটিত হবে আল্লাহর তরফ থেকে, যিনি সোপানসমূহের অধিপতি।"
"ফেরেশতাগণ ও রূহ আল্লাহর সমীপে আরোহণ করে যায় এমন একদিন যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।"

৩. [সূরা মু'মিনুন (২৩): আয়াত ১৭]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

"আর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপর সাতটি কক্ষপথ এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে গাফিল নই।"

৪. [সূরা ইয়া-সীন (৩৬): আয়াত ৪১-৪৪]

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ * وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

"আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।"

"এবং তাদের জন্য আমি এর অনুরূপ সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।"

"আর আমি ইচ্ছে করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন কেউ তাদের আর্তনাদে সাড়া দেবে না এবং তারা মুক্তিও পাবে না।"

"কিন্তু আমারই তরফ থেকে রহমত ও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা করি না।"

৫. [সূরা আন'আম (৬): আয়াত ১-৬]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ * هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ * وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ * وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

"সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন আঁধার ও আলো। তথাপি কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।"

"তিনিই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটি কাল, আর একটি নির্দিষ্ট কাল আছে যা তিনিই জানেন। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর।"

"তিনিই আল্লাহ আসমানে এবং যমীনে। তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও তোমাদের প্রকাশ্য সবকিছু এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।"

"তাদের কাছে আসে নি তাদের রবের নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন যা থেকে তারা মুখ ফিরায় নি।"

"সুতরাং তারা তো সত্যকে অস্বীকার করেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। অতএব অচিরেই তাদের কাছে সে বিষয়ের প্রকৃত সংবাদ পৌঁছবে যা নিয়ে তারা উপহাস করত।"

"তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের আমি দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমন তোমাদেরও করি নি। আর আমি তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং প্রবাহিত করেছিলাম তাদের নিম্নদেশে নহরসমূহ। তারপর তাদের পাপের দরুন আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।"

৬. [সূরা 'আনকাবুত (২৯): আয়াত ১৯-২২]

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ * وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, তারপর তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করেন? অবশ্য এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।"

"বলুন: তোমারা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তারপর আল্লাহই সৃষ্টি করবেন শেষবারের সৃষ্টিও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

"তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন, তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"

"তোমরা তাঁকে যমীনে ও আসমানে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন হিতাকঙ্ক্ষী নেই, সাহায্যকারীও নেই।"

৭. [সূরা রূম (৩০): আয়াত ৮-৯]

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"তারা কি নিজেদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ তো আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা সবই সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; কিন্তু অনেক মানুষই তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।"

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতে পেত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন ভয়াবহ হয়েছিল। তারা শক্তিতে ছিল এদের চেয়ে প্রবল, তারা যমীন চাষ করত এবং তারা যমীনকে আবাদ করেছিল এরা যে পরিমাণ আবাদ

করেছে তার চেয়ে অধিক। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ তো এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করতেন, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল।"

৮. [সূরা হিজ্বর (১৫): আয়াত ১৬]

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

"আর নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি আসমানে গ্রহ-নক্ষত্র এবং তাকে সুশোভিত করে দিয়েছি দর্শকদের জন্য।"

৯. [সূরা নাহল (১৬): আয়াত ১২-১৩]

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

"তিনিই তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে, সূর্য ও চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজি তাঁরই নির্দেশে বশীভূত রয়েছে। নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিদর্শন।"

"আর বিভিন্ন ধরনের বস্তু যা তোমাদের জন্য তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন (তাও তোমাদের উপকারার্থে নিয়োজিত করেছেন)। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ ভ্রমণ সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা আম্বিয়া (২১): আয়াত ৩৩]

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“আর তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।”

২. [সূরা যুমার (৩৯): আয়াত ৫]

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন। তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।”

৩. [সূরা আর-রাহমান (৫৫): আয়াত ৩৩]

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

“হে জ্বিন ও মানবজাতি! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান ও যমীনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার, তবে বের হয়ে যাও; কিন্তু ক্ষমতা ব্যতিরেকে তোমরা বের হতে পারবে না।”

ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা 'আলাক্ব (৯৬): আয়াত ১-২]

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

"পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"
"যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে "আলাক" (জমাট রক্ত) থেকে।"

২. [সূরা হাজ্জ (২২): আয়াত ৫-৬]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক তবে ভেবে দেখ, আমি তো তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর এমন কিছু থেকে যা লেগে থাকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে যা পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে, তোমাদের কাছে আমার কুদরত প্রকাশ করার জন্য। আর আমি গর্ভাধারে স্থিত রাখি যা ইচ্ছে করি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুর আকারে মাতৃগর্ভ থেকে বের করি, অতঃপর তোমরা যৌবনে উপনিত হও। আর তোমাদের মধ্যে এমন কতক আছে যারা যৌবনের পূর্বে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাদেরকে পৌঁছানো

হয় অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত, ফলে যে বিষয়ে তার জানা ছিল, তা মনে রাখতে পারে না। তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক, তারপর যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে আন্দোলিত হয় এবং নানা রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।"

"এসব একারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণদান করেন আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

৪. [সূরা নাহল (১৬): আয়াত ৬৬]

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় গৃহপালিত চতুষ্পাদ পশুর মধ্যে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যস্থল থেকে খাঁটি দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

৫. [সূরা সিজ্দাহ (৩২): আয়াত ৭-৯]

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

-"তিনি অতি সুন্দররূপে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং মানবসৃষ্টি সূচনা করেছেন কাদা মাটি দিয়ে।"

"তারপর তার বংশধরকে সৃষ্টি করেন নগন্য পানির নির্যাস থেকে।"

"অতঃপর তিনি তাকে সুঠাম করেন এবং তাতে নিজের তরফ থেকে রূহ ফুঁকে দেন, আর তোমাদেরকে দান করেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর কর।"

ফিরাউন ও তার লাশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা ইউনুস (১০): আয়াত ৯০-৯২]

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

-"আর বনী ইসরাঈলকে নদী পার করিয়ে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদ অনুসরণ করল ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী নিপীড়ন ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলল: 'আমি ঈমান আনলাম, কোন মা'বুদ নেই তিনি ছাড়া, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল এবং আমি একজন মুসলিম'।"

"এখন ঈমান এনেছ? অথচ এর পূর্বমুহূর্তেও তুমি নাফরমানী করেছিলে এবং তুমি ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত।"

"আজ আমি তোমার (ফিরাউনের) লাশকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তু হয়ে থাক। আর বাস্তবিকপক্ষে অনেক লোক আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল রয়েছে।"

পরিশিষ্ট - ৬

পবিত্র হাদীস শরীফের আলোকে স্বাস্থ্য

বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ভবিষ্যৎবাণী ও তথ্যাদি প্রকাশ করে গেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব ভবিষ্যৎবাণী ইতোমধ্যে বাস্তবে রূপলাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ক'টি প্রসিদ্ধ বাণী হাদীস শরীফ থেকে তুলে ধরছি।

১. বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ পাক পৃথিবীতে এমন কোন রোগ অবতরণ করেন নি যার প্রতিকার বা ঔষধ নেই।"

২. অন্যত্র রোগ সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন:

كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ

"প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে" [আবু দাউদ ও মুসলিম শরীফ]।

৩. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের চিকিৎসার উৎসাহ প্রদান করে বলেন:

يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

"হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমারা রোগের চিকিৎসা করো। আল্লাহ এমন কোন রোগ দেন নি, যার ঔষধও তিনি দেন নি, কেবলমাত্র একটি রোগ ছাড়া। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ রোগটি কি? জবাব দিলেন, বার্ধক্য" [তিরমিযী, ইবনে মাযাহ]।

৪. মহামারী থেকে বাঁচার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

"তোমরা যদি শুনতে পাও যে, কোথাও মহামারী রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে তাহলে তাতে গিয়ে প্রবেশ করো না; আর তোমরা যেখানে থাকো সেখানে যদি সংক্রামক রোগ হানা দেয়, তাহলে সেখান থেকে পলায়নপর হবে না।" [বুখারী, মুসলিম শরীফ]।

আজকাল কোথাও মহামারী দেখা দিলে আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে 'কুয়ারেন্টিন' অবস্থায় রাখা হয়। উক্ত হাদীস শরীফেও এই একই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৫. পবিত্রতার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য বাণী রেখে গেছেন। পবিত্রতা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। এছাড়া পবিত্রতা হচ্ছে স্বাস্থ্যের জন্য জরুরী। মুসলিম শরীফে একটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ

“যদি কোন কুকুর তোমাদের খাবার পাত্রে মুখ লাগিয়ে থাকে (জিহ্বা দ্বারা চটে থাকে) তাহলে এ পাত্রটিকে সাতবার ধুয়ে ফেলবে। প্রথমবারে মাটি ও বাকী ৬ বার পানি দ্বারা” [মুসলিম শরীফ]।

৬. পবিত্রতা সম্পর্কে অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

“ঘুম থেকে জেগে উঠে তোমরা হাত ধুয়ে নেবে কারণ, ঘুমন্ত অবস্থায় তা কোথায় ছিলো, তোমরা জানতে না” [মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ]।

আধুনিক যুগের ডাক্তররা বলেন, অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি অপরিষ্কার হাত থেকে হয়ে থাকে। এ কথাটি উক্ত হাদীস শরীফের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

৭. রোগজীবাণু সম্পর্কে মানুষ আধুনিক যুগে অবগত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এব্যাপারে অনেক আগেই আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

“আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন বলে মনে হতো না, তাহলে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মিসওয়াক দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করা ফরজ করে দিতাম” [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ শরীফ]।

উল্লেখ্য দাঁতের মাড়িতে খাবার পরে রোগজীবাণূ থেকে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। মিসওয়াক দ্বারা ভালো করে পরিষ্কার করে নিলে রোগজীবাণূ থেকে মুক্ত থাকা সহজ। দাঁত মাঝার ব্যাপারটি ইউরোপে অনেক পরে প্রচলিত

হয়েছিল। এখন দন্ত ডাক্তাররা দাঁত মাঝার গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে থাকেন।

৮. খাদ্য ও পরিপাক সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত খাদ্য যে শরীরের জন্য ক্ষতিকর তা আজকালকার ডাক্তাররা বলছেন। কিন্তু এর সঠিক দিক-নির্দেশনা আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি ইরশাদ করেন:

"তোমরা পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, অপর অংশ পানি দ্বারা ভর্তি করবে। বাকী অংশটুকু খালি রাখবে। পরিপূর্ণ পেট আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়" [তিরমিযী শরীফ]।

৯. অতিরিক্ত খাদ্য ভক্ষণ, বেশী নিদ্রা, অলসতা ইত্যাদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন না। একটি হাদীস শরীফে আছে:

أخشى ما خشيت على أمتي كبر البطن ◉ ومداومة النوم الكسل وضعف اليقين

"আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে যা ভয় করি তাহলো অতিরিক্ত খাবার, বেশী নিদ্রা, অলসতা ও অনিশ্চয়তাবোধ" [কানযুল উম্মাল, ৩; পৃঃ ৪৬০]।

১০. চোখের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন এভাবে:

اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

"তোমাদের চোখে সুরমা ব্যবহার করবে কারণ, সুরমা দৃষ্টি প্রখর করে ও চোখের পাতার জন্য উপকারী" [আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ]।

১১. কালিজিরার উপকার সম্পর্কে একটি হাদীসে আছে:

فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ

"এই কালো বিচির মধ্যে [কালিজিরায়] আছে মৃত্যু ছাড়া সবধরনের রোগের ঔষধ" [বুখারী শরীফ]।

১২. একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ

"মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো ৫টি। খতনা হচ্ছে এর একটি" [মুসলিম, আবু দাউদ শরীফ]।

আজকের বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে, পুরুষাঙ্গের মাথার চামড়াটুকুতে রোগজীবাণু বাস করে ও এ থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই মুসলিম, অমুসলিম সকলেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী খতনার প্রচলন শুরু করেছেন।

১৩. মাছির মধ্যে রোগজীবাণু থাকার ব্যাপারটি আজকাল সর্বজনবিদিত সত্য। কিন্তু এ সত্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু জানতেন না, এর প্রতিকারের কথাও তিনি বলে গেছেন:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى
جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً

"তোমাদের পানপাত্রে যদি মাছি পড়ে যায় তাহলে তাকে (মাছিকে) বের করে ফেলার আগে সম্পূর্ণরূপে পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। কারণ, মাছির এক পাখায় থাকে রোগ আর অপরটিতে এর নিরাময়" [বুখারী শরীফ]।

এখানে উল্লেখ্য যে, মাছির ব্যাপারে কিছু তথ্য অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যা উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। মাছি যখন কোন পাত্রে পতিত হয় তখন সে একটি পাখা খাবার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। এর কারণ হলো আবার উড়ে যেতে তার বেশ সুবিধা হয়। সুতরাং যে পাখায় সে রোগজীবাণু নিয়ে আসে তা খাবারের মধ্যে রেখে নির্বিঘ্নে চলে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন তার অপর পাখাও খাবারের মধ্যে ডুবে যাবে তখন এতে রক্ষিত জীবাণুনাশক উপাদানের ছোট্ট ব্যাগটি খুলে গিয়ে সকল রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। এটা মেডিসিনের একটি অত্যাধুনিক আবিষ্কার।

১৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে:

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ

"একদা হযরত আবু হুবায়েশ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মেয়ে ফাতিমা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রক্তঝরা বন্ধ হচ্ছে না; আমি কি ফরজ নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকবো? তিনি জবাব দিলেন: না অবশ্যই নয়, কারণ এটা তোমার হায়েজের (পিরিয়োডের) রক্ত নয়। এটা হচ্ছে যখমের রক্ত" [বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফ]।

এখানে উল্লেখ্য যে, সে যুগে এটা জানা ছিলো না কোন্‌টি হায়েজ আর কোন্‌টি যখমের রক্ত।

১৫. হযরত তারিক ইবনে সুয়াইদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনায় আছে:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

"তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলাম, আমরা আঙ্গুরের রস বের করে মদ বানিয়ে তা পান করি। তিনি জবান দিলেন, না পান করো না। আমি বললাম, এটি অসুস্থ ব্যক্তির জন্য শিফা। তিনি বললেন, না শিফা হতে পারে না। বাস্তবে এটাই হচ্ছে একটি রোগ" [মুসলিম, ইবনে মাযাহ শরীফ]।

উল্লেখ্য, বিজ্ঞানীরা এব্যাপারে একমত: মদ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।

সহায়ক গ্রন্থাদি / References

1. Ben David, Joseph, The Scientist's Role in Society, 2d ed. (1984)
2. Brush, Stephen G., The History of Modern Science (1987)
3. Cohen, Morris R., Reason and Nature: An Essay on the Meaning of Scientific Method (1931; repr. 1985)
4. Serton, G., Introduction to the History of Science (1982)
5. Harre, R., The Philosophies of Science (1972)
6. Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, 2d ed. (1970)
7. Latakos, Imre, and Musgrave, A., Criticism and the Growth of Knowledge (1970)
8. Lindberg, David, ed., Science in the Middle Ages (1978) and The Beginnings of Western Science (1992)
9. Lindberg, David, and Numbers, Ron, eds., God and Nature (1986)
10. Lloyd, G. E. R., Early Greek Science (1970)
11. Mason, Stephen F., A History of the Sciences (1962)
12. Nasr, Sayyed H., Science and Civilization in Islam (1968)
13. Needham, Joseph, Science and Civilization in Islam, 6 vols. to date (1954-86)
14. Neugebauer, Otto, The Exact Sciences in Antiquity (1957)

15. Porter, Roy, ed., Man Masters Nature (1989)
16. Richards, Stewart, Philosophy and Sociology of Science (1984)
17. Sambursky, Samuel, Physical Thought from the Pre-Socratics to the Quantum Physicists (1975)
18. Chalmers, Alan, What is This Thing Called Science? (1985)
19. Dahlstrom, D. O., ed., Nature and Scientific Method (1990)
20. Goodlad, J. S., Science for Non-Scientists (1983)
21. Landau, Larry, Science and Relativism (1990)
22. Morris, Richard, Dismantling the Universe (1983)
23. Morrison, Philip and Phyllis, The Ring of Truth (1987)
24. Crease, R.P., and Mann, C.C., The Second Creation: Makers of the Revolution in Twentieth-Century Physics (1986)
25. Snow, C.P., The Physicists (1981)
26. Einstein, Albert, and Infeld, Leopold, The Evolution of Physics (1961)
27. Heilbron, J. L., Elements of Early Modern Physics (1982)
28. Kevles, Daniel J., The Physicists: The History of a Scientific Community in Modern America (1978; repr. 1989)
29. Motz, L., and Weaver, J., The Story of Physics (1989)
30. Pais, A., Inward Bound: Of Matters and Forces in the Physical World (1987)
31. Park, D., The How and the Why (1988)

32. Weiner, C., ed., History of Twentieth Century Physics (1977)
33. Mader, Sylvia, Human Biology (1987)
34. Powis, R. L., The Human Body and Why It Works (1985)
35. Beyer, Robert, ed., Foundations of Nuclear Physics (1949)
36. Feinberg, Gerald, What is the World Made Of? (1977)
37. Lapp, Ralph, and Andrews, Howard, Nuclear Radiation Physics (1972)
38. Van Melsen, Andrew, From Atomos to Atom (1952)
39. Duffin, W.J., Electricity and Magnetism, 3d ed. (1989)
40. Mulvey, J.H., ed., The Nature of Matter: Wolfson College Lectures, 1980 (1981)
41. Alekseev, G. N., Energy and Entropy (1986);
42. Challoner, Jack, Energy (1993)
43. Lapedes, Daniel L., ed., McGraw-Hill Encyclopedia of Energy (1976)
44. Youmans, Edward L., The Correlation and Conservation of Forces (1981)
45. Bergmann, P. G., The Riddle of Gravitation (1968)
46. Hawking, S. W., and Israel, W., Three Hundred Years of Gravitation (1987, repr. 1989)
47. Hawking, S. W., A Brief History of Time (1999)
48. Mathews, P. M., et al., eds., Gravitation, Quantum Fields and Superstrings (1988)

49. National Research Council, Gravitation, Cosmology, and Cosmic-Ray Physics (1986)
50. Thorne, K. S., Gravitational Radiation (1989)
51. Asimov, Isaac, Asimov's New Guide To Science (1987)
52. Lezende, Lisa, Ph.d., Chronology of Science (2007)
53. Hitti, Philip K., History of the Arabs (2002 Ed.)
54. Russell, Betrand, History of Western Philosophy (1995 Ed.)
55. Chambers Dictionary of World History (1994 Ed.)
56. The Bible, the Quran and Science- Dr Maurice Bucaille; Seghers (1993 edition).
57. Encyclopedia of Science (CD)- Dorling Kindersley Multimedia
58. Redshift (CD)- Maris Multimedia
59. Grolier Multimedia Encyclopedia (CD)
60. Encyclopedia Britannica
61. The Internet
62. MS Encarta Premium Encyclopedia
৬৩. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন; আল্লামা শফী (রহঃ); অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৬৪. তাফসীরে আশরাফী; এমদাদিয়া লাইব্রেরী।
৬৩. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন; ইমাম গাযযালী (রহঃ); অনুবাদ; এ এন এম ইমদাদুল্লাহ; বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী।
৬৪. হিকায়াত-ই-সাহাবা, মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্ধালভী (রহঃ); বাংলা অনুবাদ- আব্দুর রশীদ আরশাদ; তাজ কোম্পানী।

৬৫. ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন, আল্লামা শিবলী নোমানী; বাংলা অনুবাদ- কাউছার বিন খালেদ; কোহিনূর লাইব্রেরী।

৬৬. সত্যের সন্ধানে- ইমাম গায্যালী (র); অনুবাদ- মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন; ছারছীনা লাইব্রেরী।

৬৭. তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) [প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড], হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা); অনুবাদ- অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬৮. কুরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ- ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান; খোশরোজ কিতাব মহল।

৬৯. সিরাত বিশ্বকোষ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৭০. মিশকাত শরীফ।

৭১. আল-মাকতাবাতুশ্ শামিলা (ইলেকট্রনিক্স লাইব্রেরী)।

৭২. বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোষ।